অধ্যায় : ১

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় ও প্রকৃতি

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়

অনেকেই মনে করেন, কেবল সুদমুক্ত লেনদেনকারী ব্যাংকই হলো 'ইসলামী ব্যাংক'। এটি ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে একটি আংশিক ধারণামাত্র। বাস্তবে ইসলামী ব্যাংকের পরিধি অনেক ব্যাপক।

বস্তুতপক্ষে ইসলামী ব্যাংক একটি আইডিওলজিক্যাল ব্যাংক, এথিক্যাল ব্যাংক—যা আর্থসামাজিক কল্যাণ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়তের আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতায় বিশ্বাস করে, এর সকল কার্যক্রমে তা সুষ্ঠুভাবে মেনে চলে এবং একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

বিজ্ঞ গবেষকগণ ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংককে নানা ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছেন; তবে সবকটি সংজ্ঞার মূলকথা এক ও অভিন্ন। আর তা হলো—ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার বাণিজ্যিক কারবারগুলোর ইসলামীকরণ এবং এর সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন থেকে বেঁচে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

ইসলামী ব্যাংকগুলোর আন্তর্জাতিক সংস্থা IAIB (International Association of Islamic Banks) 'ইসলামী ব্যাংক'-এর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে—

> The Islamic Bank basically implements a new banking concept in that it adheres strictly to the rulings of Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank when functioning in this way must reflect Islamic principles in real life. The Bank should work

towards the establishment of an Islamic society; hence, one of its primary goals is the deeping of religious spirit among the people.

ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা ফাইন্যান্স ও অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সেজন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো—জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।[২]

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা 'OIC' বলেছে—

An Islamic bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা মান্য করে চলে এবং এর সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে চলে।[৩]

এ সংজ্ঞাটি ১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অধিকতর স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত *Guidelines for Islamic Banking*-এ বলা হয়েছে—

Islamic Banking Business means such banking business, the goals, objectives, and activities of which is to conduct

---

২. *জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স*, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস, করাচি : করাচি আঞ্চলিক অফিস থেকে প্রকাশিত জার্নাল, ভলিউম ৪:১, পৃ. ৩১

৩. আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৮১

> banking business/activities according to the principles of Islamic Shari`ah and no part of the business either in form and substance has any elements not approved by Islamic Shari`ah.
>
> ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাবসা বলতে এমন ধরনের ব্যাংকিং ব্যাবসাকে বোঝায়, যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম হচ্ছে শরীয়া নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকিং/ব্যাবসা পরিচালনা করা এবং ব্যাবসার বাহ্যিক বা অন্তর্নিহিত কোনো অংশেই শরীয়া অননুমোদিত কোনো উপাদান থাকে না।[৪]

কারও কারও মতে, ইসলামী ব্যাংক দুটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—১. লাভ ও লোকসানে অংশীদারত্ব এবং ২. সুদ লেনদেন নিষিদ্ধ।[৫]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো অনুসারে—

১. ইসলামী ব্যাংকের মূলভিত্তি হলো ইসলামী মতাদর্শ। এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে।

২. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে ইসলামী শরীয়তের বিধিনিষেধ মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। এর একান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে—ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

৩. ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার নীতি অনুসারে বিশেষভাবে সুদকে পরিহার করে তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকিং খাতে সুদের নির্মূল করে সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা কায়েমে এ প্রতিষ্ঠান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৪. কেবল সুদ বর্জন করলেই কোনো ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক হয়ে যায় না; বরং তা আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, মুনাফা অর্জন ও বণ্টন এবং অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডে সততা, স্বচ্ছতা, আমানতদারিতা ও ইনসাফসহ ইসলামী শরীয়তের রীতিনীতি মান্য করে চলে।

---

৪. Bangladesh Bank Guidelines for Islamic Banking 2009, *p* .1 https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/islamicbanking/guideislamicbnk.pdf, Accessed Dec. 7, 2021.

৫. *Farooq, Mohammad Omar, The Riba-Interest Equation and Islam: Re-examination of the Traditional Arguments, 2005, p.3-6*

৫. ইসলামী ব্যাংক প্রধানত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, এটি উৎপাদনমুখী শিল্প ও অন্যান্য ব্যাবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে এবং লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ করে। অন্যকথায়, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগব্যবস্থা ঝুঁকির অংশীদারত্ব ও প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ওপর ভিত্তিশীল। ইসলামী পদ্ধতি পুঁজি ফেরত বা মুনাফা প্রদানের কোনো গ্যারান্টি অনুমোদন করে না।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'অর্থনীতি' মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেকেই মনে করেন, ইসলামী অর্থনীতি মানেই ইসলামী ব্যাংক। এ ধারণা সর্বার্থে সঠিক নয়; তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম অর্জন। ইসলামী ব্যাংক ইসলামের অর্থনৈতিক চিন্তার একটি প্রধান প্রায়োগিক ক্ষেত্র হিসেবে তার শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে। কেবল মুনাফা অর্জন করা কিংবা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়; বরং দেশ ও সমাজের উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দরিদ্র-অভাবীদের সমৃদ্ধি আনয়ন প্রভৃতি—এককথায় ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইসলামী ব্যাংকের প্রধান পথিকৃৎ ও বিশ্বে প্রথম ইসলামী ব্যাংক মিশরের মিটগামার ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. আহমাদ ইবনু আবদিল আযীয আন নাজ্জার (১৯৩২-১৯৯৬ খ্রি.) লিখেছেন—

> ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্যে ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করা এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন; কেবল মুনাফা অর্জন এ ব্যাংকের প্রধানতম উদ্দেশ্য নয়।[৬]

আমরা সকলেই মুসলিম হিসেবে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা' এবং সেইমতে সেখানে অর্থনীতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য,

---

৬. নাজ্জার ও অন্যান্য, *১০০ সওয়াল ওয়া ১০০ জওয়াব হাওলাল বুনুকিল ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো : আল ইত্তিহাদু দুওয়ালী লিল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৮, পৃ. ১৪

লেনদেন প্রভৃতি সবকিছুরই শাশ্বত নিয়মনীতি ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে; কিন্তু আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যাপকভিত্তিতে সুদপ্রথা ও নানা অন্যায্য লেনদেন চালু থাকায় আমাদের পক্ষে ইসলামের সেই নিয়মনীতি ও নির্দেশনা মেনে সেসব কাজে অংশগ্রহণ করা মোটের ওপর অসম্ভব বলা চলে। আমরা সকলেই—ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়—নানাভাবে সুদিব্যবস্থা ও অন্যায্য লেনদেনের সাথে কমবেশি জড়িয়ে পড়েছি বা যাচ্ছি। অথচ একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের একান্ত ঈমানি কর্তব্য হলো—আমাদের যেকোনো কারবার ও লেনদেনে সুদ বর্জন করা এবং ইনসাফ ও ন্যায্যতার চর্চা করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধনতান্ত্রিক সমাজে সামষ্টিক উদ্যোগ (হয় সেটা ইসলামী ব্যাংক হোক কিংবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হোক) ব্যতীত কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সুদ বর্জন করা এবং অন্যায্য লেনদেন থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংক মূলত এই সমস্যা সমাধানের জন্যই এগিয়ে এসেছে। AAOIFI-এর ভাষ্যমতে—

> IFIs came into existence as a collective religious obligation (Fard Kifayah) on the larger community (Ummah).
>
> ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃহত্তর সম্প্রদায় বা উম্মাহর ওপর সামষ্টিক ধর্মীয় দায়িত্ব-বাধ্যবাধকতার ফলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।[৭]

বলার অপেক্ষা রাখে না, আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে হালাল ও পবিত্র করতে এবং সুদের ভয়াবহতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইসলাম আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যেসব নীতিমালা উপহার দিয়েছে, সেগুলো আধুনিক যুগেও সব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা ইসলামী নীতিমালার আলোকে পরিচালিত করার জন্য মূলনীতি তৈরির চেষ্টা চলছে। এ প্রচেষ্টার প্রথম সফলতা হলো ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

---

৭. AAOIFI [Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instititions], *Governance Standard for Islamic Financial Instititions* (GSIFI), 2010, p. 1

সহজ কথায়—ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বাধুনিক প্রায়োগিক ক্ষেত্র হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উৎপত্তির পেছনে মূল লক্ষ্যই হচ্ছে উম্মাহকে সুদ ও অন্যায্য লেনদেনের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে শরীয়াভিত্তিক উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমূলক খাতগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরত মানবতার কল্যাণসাধন, আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ।

নিম্নে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো :

ক. শরীয়াভিত্তিক লেনদেন ও কারবার পরিচালনা

ক.১. সুদ এবং এর পাপ ও ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করা

সুদ মানবতার ঘৃণ্য শত্রু। ইসলামে সুদ দেওয়া ও নেওয়া দুটিই নিষিদ্ধ ও জঘন্য পাপের কাজ। আধুনিক অর্থনীতিতেও সুদ একটি বড়ো সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক অস্থিরতার মূলেও রয়েছে সুদের কুপ্রভাব। এর ফলে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়; সমাজের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমা হয়ে যায়; দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদা হ্রাস পায়; ...। উল্লেখ্য, গবেষকগণের মতে—বিশ্বে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বৃহৎ দুটি ইকোনমিক ক্রাইসিসের একটি প্রধান কারণও হলো সুদ।[৮]

---

৮. ইতিহাসে ১৯৩০ সালের ইকোনমিক ক্রাইসিস খুবই বিখ্যাত। ওই সময় সেই ক্রাইসিস কেন হলো, উত্তরণের উপায় কী—তা গবেষণা করে গবেষক টিম মন্তব্য করেছিলেন—

> 'In order to ensure that money performs its true function of operating as a means of exchange and distribution, it is desirable that it should cease to be traded as a commodity.' (*The Repot of Economic Crisis Committee,* Southampton Chamber of Commerce, 1933, part 2)

বলার অপেক্ষা রাখে না, মুদ্রাকে দ্রব্য হিসেবে ব্যবহারের অর্থই সুদচর্চা করা। ২০০৮ সালের ইকোনমিক ক্রাইসিসের পেছনেও মূল কারণ হিসেবে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ মুফতি তকী উসমানী মোট চারটি কারণ দেখিয়েছেন। এর মাঝে প্রথমটিই হলো—সুদ। অর্থাৎ, মুদ্রাকে দ্রব্যের মতো বিনিময়যোগ্য হিসেবে ব্যবহার করা। তিনি লিখেছেন—

> 'In order to save the world from such evil consequences, trading in money itself should stopped.' (Taqi Usmani, Causes and remedies of the present financial crisis from Islamic perspective.)

ইতোমধ্যে পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরাও তাদের মতো করে সুদের বিকল্প অনুসন্ধান করছেন; তারা কিছু সমাধানও দিয়েছেন। বাস্তবে কিছু অনুশীলনও হয়েছিল। তবে প্রভাবশালী ব্যাংকারদের পক্ষ থেকে বাধা আসায় তা আর অগ্রসর হয়নি।

এ ক্ষেত্রে Margrit Kenney-এর লেখা *Interest and Inflation free money* বইটি পড়া যেতে পারে। তিনি তাতে এ বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কথা বলেছেন। তাতে বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্যোগী কিছু অর্থনীতিবিদ সুদমুক্ত ফিন্যান্স অনুশীলন করেছিলেন; তবে তা পরবর্তী সময়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এখানে মূলত যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো—সুদের বিকল্প নিয়ে পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরাও আলোচনা করছেন, ভাবছেন। তাই বোঝা গেল, তাদের গবেষণায়ও এটি পরিহারযোগ্য। এ ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ বিকল্প পথ হলো—ডিপোজিটরদের টাকা থেকে যে মুনাফা ঋণগ্রহীতারা অর্জন করবে, তাতে সরাসরি ডিপোজিটরদেরও অংশগ্রহণ করানো। ব্যবসায়ীরা এতে রাজি থাকবে; কারণ, ডিপোজিটররা মুনাফার পাশাপাশি লোকসানেও অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে চ্যালেঞ্জ হলো—শুধু এক-দুইটি ব্যাংক তা শুরু করলে বাধার সম্মুখীন হবে। অন্য ব্যাংকগুলো সহজে ঋণ দিয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পুরো ব্যাংকিংব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার বিকল্প নেই। সুদমুক্ত ব্যাংকিংব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকের যাত্রার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে সুদমুক্ত ব্যাংকিংব্যবস্থা প্রবর্তন; মানুষকে সুদের যাবতীয় লেনদেন এবং এর ভয়াবহ পাপ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। আশার কথা হলো—ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নানাভাবে এর প্রয়োগিক অনুশীলন হচ্ছে। বলা চলে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সুদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি অবশ্যই প্রশংসিত। তবে এর আদর্শিক প্রয়োগ ও ভারসাম্য আরও বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয়ভাবে ধীরে ধীরে সুদ থেকে বের হয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবেই বৃহত্তর পরিসরে এর সুফল স্পষ্ট অনুভব করা যাবে।

ক.২. নিষিদ্ধ আর্থিক কারবার ও লেনদেন থেকে মানুষকে রক্ষা করা

ইসলামী ব্যাংক সুদের পাশাপাশি ইসলামে নিষিদ্ধ বিভিন্ন আর্থিক কারবার ও লেনদেন (যেমন—মজুতদারি, জুয়া, একচেটিয়া কারবার, ফটকাবাজি, লটারি, মুনাফাখোরী, জালিয়াতি, ভেজাল মিশ্রিতকরণ, ঋণের ক্রয়-বিক্রয়, নিষিদ্ধ পণ্যসমূহের বেচাকেনা, ক্রয়-বিক্রয়ের কতিপয় নিষিদ্ধ পদ্ধতি, ... প্রভৃতি) থেকে মানুষকে রক্ষা করে, যা বাজারব্যবস্থা স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা পালন করে।

ক.৩. ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে শরীয়া পরিপালন

ইসলামী ব্যাংকের অপর একটি উদ্দেশ্য হলো—ব্যাংকের লেনদেনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কারবারগুলো থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও নির্দেশনা (যেমন—সততা, স্বচ্ছতা, আন্তরিকতা, আমানতদারিতা, ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি) মান্য করে চলা, যাতে ইসলামী ব্যাংক বিশ্বের দরবারে একটি মডেল ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

খ. আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো এবং তার সকল আর্থিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম এভাবে রূপায়ণ করা হয়, যাতে সমাজের লোকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক শোষণের পথ বন্ধ হয়; ধনী আরও ধনী হওয়ার এবং গরিবকে আরও গরিব করার পথ তৈরি না হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾—“সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।”[৯] এ নীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সম্পদকে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত না রেখে সামষ্টিক কল্যাণে বিনিয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করে।[১০]

---

৯. আল কুরআন, ৫৯ (সূরা আল হাশর) : ৭

১০. সম্প্রতি প্যারিস স্কুল অব ইকোনমিকস থেকে ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক বৈষম্য-বিষয়ক প্রতিবেদন-২০২২’-এ উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বের ৭৬ শতাংশ সম্পদ হোল্ড করছে বিশ্বের শীর্ষ মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। মধ্যম শ্রেণির ৪০ শতাংশ মানুষ হোল্ড করছে

এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যষ্টিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও সীমা নির্ধারণ করে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত এলাকাগুলোতে বিনিয়োগ তৎপরতার মাধ্যমে দেশের সুষম প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখে এবং এভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্য নিরসনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা রাখে।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কারবারের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয় বলে এ ব্যবস্থায় বড়ো-ছোটো কারবারের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হয় না। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পায়। সরকারের এসএমই (Small to Medium Enterprise) খাতের এই অগ্রাধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে; সম্পদের সমবণ্টনের লক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষদেরও এসএমই খাতে বিনিয়োগ প্রদানে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি আরডিএস এবং ইউপিডিএস-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গ. মানবতার কল্যাণসাধন

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণসাধন ইসলামী শরীয়তের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক শরীয়তের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক উৎপাদনশীল ও কল্যাণকর খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে; সম্ভাবনাময় নতুন নতুন ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে; গরিব, অসহায়, বেকার ও স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে এবং তাদের

মাত্র ২২ শতাংশ সম্পদ। আর নিম্নের ৫০ শতাংশ মানুষ হোল্ড করছে মাত্র ২ শতাংশ সম্পদ। অদ্রূপ আয়ের ৫২ শতাংশ ধারণ করে আছে বিশ্বের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। মধ্যম শ্রেণির ৪০ শতাংশ মানুষ ধারণ করছে মাত্র ৩৯.৫ শতাংশ আয়। আর নিম্নের ৫০ শতাংশ মানুষ ধারণ করছে মাত্র ৮.৫ শতাংশ আয়।

এ বিষয়ে আরেকটি তথ্য হলো—সুইজারল্যান্ডের দাভোসে গত জানুয়ারি-২০২০-এ অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের আন্তর্জাতিক বাৎসরিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দাতব্য ফেডারেশন 'অক্সফাম' তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, 'বিশ্বের দরিদ্রতম ৪৬০ কোটি মানুষের মোট সম্পদের চেয়েও বেশি সম্পদ রয়েছে মাত্র দুই হাজার ১৫৩ জন শীর্ষ ধনীর হাতে। দরিদ্রতম এ মানুষগুলো দুনিয়ার মোট জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশ।' (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২১ জানুয়ারি, ২০২০)

আর্থিক সহায়তাদান করে। যাকাত, সাধারণ দান ও সন্দেহজনক আয়ের অর্থ থেকে কল্যাণ তহবিল গঠনের মাধ্যমে নানারূপ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তা ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্রয় প্রক্রিয়ায় সামাজিক পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সম্পৃক্তকরণ, সরবরাহ প্রক্রিয়ায় নৈতিক মান সংরক্ষণ, সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে অধিকসংখ্যক সরবরাহকারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধিত হয়।

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় যেখানে কেউ ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়, সেখানে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ঝুঁকি বহনে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের অংশগ্রহণ আর্থিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। তা ছাড়া ইসলামী ব্যাংক সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ে গুরুত্ব প্রদান করে, যা মানবকল্যাণসাধন করে। পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের দোরগোড়ায় সহনীয় মূল্যে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে ব্যাপক জনকল্যাণসাধনে তৎপর রয়েছে। আওফি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা দরিদ্র, অসহায় ও ঋণগ্রস্তসহ নিম্নোক্ত আটটি খাতে বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে :

১. দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তি বা পরিবারসমূহের জন্য ব্যাবসার সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং শিক্ষামূলক খাতে সহযোগিতা প্রদান;

২. এতিমদের সাহায্যকরণ;

৩. হতভাগ্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারসমূহকে সহযোগিতা প্রদান;

৪. হতদরিদ্র এলাকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান;

৫. অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সমাজে ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টিকরণ। এ লক্ষ্যে গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগ উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;

৬. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং পারিবারিক ব্যবসায় উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান;

৭. ইসলামিক এবং দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নের উৎসাহ প্রদান এবং

৮. সমকালীন সামাজিক ব্যাধি ও অনাচার প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।[১১]

---

১১. AAOIFI, *Governance Standard for Islamic Financial Instititions* (GSIFI), 2010, p. 78

ঘ. উম্মাহর উন্নতি ও সংহতি জোরদার করা

ইসলামী ব্যাংকের অপর একটি উদ্দেশ্য হলো—মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে উম্মাহর আর্থসামাজিক উন্নতি ও সংহতি জোরদারে অবদান রাখা। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসির উদ্যোগে জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি বহুমুখী উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য নির্দেশিত। সদস্য নয় এমন দেশগুলোতেও এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য বিশেষ তহবিল প্রদান করে। বর্তমানে আইডিবি গ্রুপ ৫টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত। সংস্থাগুলো হলো—ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আইআরটিআই), বিনিয়োগ ও রপ্তানি সক্ষমতায় ইন্স্যুরেন্সের জন্য ইসলামী সহযোগিতা (আইসিআইইসি), বেসরকারি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ইসলামী সহযোগিতা (আইসিডি) এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাবসা ও অর্থনৈতিক কর্পোরেশন (আইটিএফসি)। বাংলাদেশে আইডিবির কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সাল থেকে।

কেবল সুদমুক্ত ব্যাংকই কি ইসলামী ব্যাংক

কারও কারও ধারণা হলো—কোনো ব্যাংকের কার্যক্রম কেবল সুদমুক্ত হলেই 'ইসলামী ব্যাংক' হয়ে যায়। যেমন—ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকের একটি প্রধান মূলনীতি হলো সুদি লেনদেন থেকে বিরত থাকা। এ ধারণা থেকে সর্বসাধারণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক 'সুদবিহীন ব্যাংক' নামেও পরিচিত।

এরূপ ধারণা সর্বার্থে সঠিক নয়; বরং কোনো ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক' নামে পরিচিত হওয়ার জন্য তার আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, মুনাফা অর্জন ও বণ্টনসহ সকল কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া শরীয়াভিত্তিক পরিচালিত হতে হবে। একটি ব্যাংকের নামের সাথে কেবল 'ইসলামী' শব্দ যোগ করলেই সেই ব্যাংককে 'ইসলামী ব্যাংক' বলা যায় না; বরং যে ব্যাংক সুদবর্জনসহ ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় আর্থিক নীতিমালা অনুসরণকরত পূর্ণ স্বচ্ছতা, সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়-ইনসাফের সাথে পরিচালিত হয়, তাকে 'ইসলামী ব্যাংক' বলা হয়।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং একটি সংকীর্ণ ধারণা, যা নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া মেনে চলে এবং সুদ বর্জন করে। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমে সুদ এড়িয়ে চলে, চাই তা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে হোক কিংবা তা বরাদ্দের ক্ষেত্রে হোক; তবে কেবল সুদ এড়িয়ে চললে এবং ব্যবসায় লিপ্ত হলেই তাকে 'ইসলামী ব্যাংক' বলা যায় না। একে বড়োজোর 'সুদমুক্ত ব্যাংকিং', 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক' বা 'ইসলামিক বাণিজ্যিক ব্যাংক' বলা যায়।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংক কেবল সুদকেই এড়িয়ে চলে না; বরং ইসলামী শরীয়া ও ইসলামী অর্থনীতির সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করে এবং সকল অনৈতিক ও অকল্যাণকর কর্মকাণ্ড ও কারসাজি থেকে বিরত থাকে। এটি এমন একটি ব্যাংক, যা লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শরীয়তের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী ব্যাংক যেমন কোনোরূপ সুদি লেনদেনে অংশ নেয় না, তেমনি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয় কিংবা সমাজ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর—এরূপ কোনো খাতে লেনদেন থেকেও বিরত থাকে। কেবল মুনাফা অর্জন নয়, উচ্চহারে মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা নয়; অর্থনৈতিক সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক কল্যাণসাধন ও পরিবেশের উন্নয়নের দিকটিকেই ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়। আর্থিকভাবে লাভজনক কোনো ব্যবসায় পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচনায় অকল্যাণকর হলেও এথিক্যাল ব্যাংকিং উদ্যোগের প্রেরণায় উজ্জীবিত ইসলামী ব্যাংক তাতে অংশ নেয় না।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সুদবিহীন নিছক লেনদেন ইসলামিক কার্যক্রম হতে পারে না, যে যাবৎ না তাতে ইসলামের অন্য নির্দেশনাগুলো অনুসৃত হয়। পশ্চিমা বাজারভিত্তিক সমাজগুলোতেও অনেক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসান ও অংশীদারত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। কেউ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে শূকরের খামার পরিচালনা করছে, কেউ মদের ব্যাবসা করছে বা মদের কারখানা স্থাপন কিংবা নাইট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করছে। লাভ-লোকসান ও অংশীদারত্বের ভিত্তিতে চললেও এ ধরনের কার্যক্রম ইসলামিক হতে পারে না। ইসলাম শরীয়া-নির্ধারিত হারাম খাতে অর্থায়ন নিষিদ্ধ করেছে।

মোটকথা, অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সুদের কৌশলগত পরিবর্তন ইসলামের সঠিক চেতনাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না, যদি তা সঞ্চয়কারী, বিনিয়োগকারী, উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনাসংবলিত একটি

ন্যায়নিষ্ঠ অংশীদারত্বের প্রেরণা সঞ্চার করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে না পারে। ইসলামী ব্যাংককে শরীয়তসম্মত পন্থায় সম্পদ আহরণ করতে হবে; অন্যায্য কোনো পন্থায় নয়, যে পন্থায় কপটতা, দুরভিসন্ধি, চাতুর্য ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থোপার্জন ও পুঁজি বৃদ্ধির বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সুদবিহীন ব্যাংকিং বা মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও কাজে ইসলামী জীবনাদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে না। পূর্বনির্ধারিত (প্রাক্কলিত) লাভে আমানত গ্রহণের প্রসঙ্গটিই এ ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পূর্বনির্ধারিত থাকায় এসব লাভকে অনেকেই সন্দেহমূলক লেনদেন ও সুদের অবিকল দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নেয়।

অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংকের স্বাতন্ত্র্য কেবল লেনদেনের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত নয়; বরং এটি বস্তুগত দিক থেকে সামাজিক পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক কল্যাণসাধন এবং নৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পরকালীন জবাবদিহিতায় পরিব্যাপ্ত। এ আলোকে ব্যবসায় পরিচালনায় ঐতিহ্যগত পদ্ধতি—মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল ও অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতি ও কৌশলকে এমনভাবে বিন্যাস করা প্রয়োজন, যাতে এর নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকসমূহে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সকল বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়।

মোটকথা, ইসলামী ব্যাংক ও সুদবিহীন ব্যাংকের মধ্যে আসল পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতিতে। শরীয়া-নির্ধারিত হালাল-হারাম প্রসঙ্গ যেমন এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও শারয়ী শিষ্টাচার ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি। ইসলামী ব্যাংক শরীয়াকে মানবজাতির কল্যাণের উৎসরূপে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিছক সুদবিহীন ব্যাংকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ওয়েবসাইটে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে।[১২] এতে বলা হয়েছে—

> Interest free banking is a narrow concept denoting a number of banking instruments or operations which avoid interest. Islamic banking, the more general term, is based not only to avoid interest-based transactions prohibited in

---

১২. নুরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৬৪

Islamic Shariah but also to avoid unethical practices and participate actively in achieving the goals and objectives of an Islamic economy.[১৩]

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলি

ইসলামী ব্যাংক তার লেনদেন ও বিনিয়োগসহ সব ধরনের কার্যক্রমে প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোই একে অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংক থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে, তার পৃথক পরিচয় তুলে ধরে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে আমরা এর বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি। নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

ক. আইডিওলজিক্যাল (আদর্শভিত্তিক) ব্যাংকিং

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকিং বলতে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা ব্যাংকব্যবস্থাকেই বোঝায়। এ ব্যবস্থা দৃশ্যত কাঠামোগত দিক থেকে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মতো মনে হলেও আদর্শ ও মূল্যবোধের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটি ইসলামী জীবনাদর্শভিত্তিক একটি ব্যাবসায়িক-উন্নয়নমূলক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান, যা শরীয়তের নির্দেশাবলি মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। এর বুনিয়াদ গড়ে ওঠে ইসলামের নিজস্ব জীবনদর্শনের ওপর; এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কার্যবিধি ও কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়তের অনুসারী। শরীয়তের নীতিমালা অনুসারে এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর কাজই হলো—ইসলামী জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কাজ করা।

খ. শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটি

ইসলামী ব্যাংকের একটি প্রধান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এর একটি শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটি থাকে। এই কমিটির প্রধান কাজ হলো—ব্যাংকের

১৩. https://www.sbp.org.pk/ibd/faqs.pdf

লেনদেন, ব্যাবসা-বাণিজ্য, তহবিল বিনিয়োগ ও নিজস্ব প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদিসহ তার যাবতীয় কার্যক্রমে শরীয়তের নীতিমালা অনুসারে পরামর্শদান করা এবং তা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কি না তদারক করা। এ কমিটি কেবল যে ব্যাংককে শরীয়া নীতিমালা মেনে চলতে পরামর্শ দেবেন বা তদারকি করবেন, তা নয়; বরং ব্যাংক ভুল ও অন্যায় পথে অগ্রসর হতে চাইলে ব্যাংকের আর্টিকেলস অব অ্যাগ্রিমেন্ট অনুসারে তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও এ কমিটির রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাননির্ধারণী আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instititions (AAOIFI) প্রণীত এবং Organization of Islamic Cooperation (OIC) কর্তৃক অনুমোদিত শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে শরীয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিল/বোর্ড গঠনের অপরিহার্যতা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়—

> Every Islamic financial institution shall have a Shari`ah Supervisory Board.

গ. শরীয়াসম্মত পদ্ধতিতে শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায় অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষত্ব হলো—এটি প্রচলিত ব্যাংকের মতো অর্থের কারবার করে না; বরং অর্থ দিয়ে শিল্পোদ্যোগ ও ব্যাবসায়ে অংশগ্রহণ করে। সাথে পুঁজি বিনিয়োগের সময় বিচার করা হয়—এ উদ্যোগ বা অংশগ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল নাকি হারাম, সমাজ ও পরিবেশের জন্য কল্যাণকর নাকি ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে প্রচলিত পদ্ধতিতে কোনো ঋণ দেওয়ার সময় সাধারণত বিচার করা হয় না, যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেই কাজটি সমাজ ও পরিবেশের জন্য কল্যাণকর না ক্ষতিকর। এতে সমাজ ও পরিবেশের মঙ্গল হবে নাকি সর্বনাশ ডেকে আনবে। সমাজের বিপর্যয় ও সর্বনাশ সৃষ্টিকারী মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাবসা, চরিত্র বিধ্বংসী নানা ধরনের উপকরণসহ সিনেমা, নাচ-গান ও তামাক-সিগারেটের মতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, মজুতদারী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি নানা কাজে সুদি ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়ে থাকে। এতে সমাজ ও পরিবেশের সর্বনাশ আরও বেশি করে ডেকে আনা হয়। সমাজ থেকে অনাচার, পাপাচার, অশ্লীলতা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করা দূরে থাক, সুদি ব্যাংকগুলো নির্বিচারে ঋণ দেওয়ার ফলে এসব আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রতিরোধ করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক কেবল শরীয়াসম্মত পদ্ধতিতে শিল্পকারখানা, ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে সহযোগিতা করে। ব্যাংক এটি দুভাবে করে থাকে :

গ.১. লাভ-লোকসানের অংশীদারত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কলকারখানা প্রভৃতি তৈরিতে তার মূলধন বা তহবিল দিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সাথে অংশগ্রহণের চুক্তিতে পুঁজির অংশবিশেষ বা পুরোটাই সরবরাহ করতে পারে। এসব কাজে লাভ-লোকসান যা-ই হোক না কেন পূর্ব-নির্ধারিত শর্তানুসারেই ব্যাংক তা ভাগাভাগি করে নেবে। অর্থাৎ, লাভ হলে যেমন তার পূর্ব-নির্ধারিত অংশ পাবে, তেমনি লোকসান হলে তারও অংশ ব্যাংক বহন করবে। এ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট আয়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই; লোকসানের ঝুঁকি বহনের একটা দায়িত্ব সবসময় উভয় পক্ষের থাকে।

উল্লেখ্য, এ প্রক্রিয়ায় আমানতদারদের সাথে ব্যাংকের দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নয়; অংশীদারত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে এ ব্যাংকব্যবস্থায় সকল পক্ষই তাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও সৃজনশীল শক্তিকে সমন্বিত করে সামষ্ঠিকভাবে কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ হন। গ্রাহক-সম্পৃক্ততার এ আদর্শ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়।

গ.২. প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল এবং আমানতকারীদের সম্মতিক্রমে তাদের তহবিল থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে নিজস্ব মালিকানাতেই শরীয়া অনুমোদিত ব্যাবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান যা-ই হোক না কেন তার দায়দায়িত্ব ব্যাংকেরই; আমানতকারীদের নয়। সুদি ব্যাংকগুলো এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেয় না। এগুলো ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয় ঠিকই; কিন্তু নিজেরা এসব প্রকল্প বা ব্যাবসাতে জড়িয়ে পড়ে না। তাই এসব কারবারের লাভ-লোকসান বা সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাংকের কোনো মাথাব্যথা নেই।

অনেকেই 'ইসলামী ব্যাংকিং' বলতে কেবল লাভ-লোকসানের অংশীদারত্ব চুক্তিতে অংশগ্রহণকেই মনে করেন। উল্লেখ্য, লাভ-লোকসান ভাগাভাগির পদ্ধতিই একমাত্র ইসলামী পদ্ধতি নয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি ভাগাভাগি না করেও ইজারা, বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইসতিসনা ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যাবসা পরিচালনা করাও ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করে।

ঘ. সুদ পরিত্যাগ ও মুনাফা অর্জন

ইসলামী ব্যাংকের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোনো ধরনের লেনদেন বা ব্যাবসা-বাণিজ্য করবে না। যে সুদ হারাম, ঘৃণ্য ও সমাজবিনাশী সেই সুদের অনুপ্রবেশ যেন ইসলামী সমাজে ঘটতে না পারে, সেজন্য এই ব্যাংক নিজেই শুধু সুদি কারবার থেকে বিরত থাকবে না; বরং অন্যকেও বিরত থাকতে সহায়তা করবে। এর দর্শনই হলো—নিজে কোনো সুদ গ্রহণও করবে না, প্রদানও করবে না। বস্তুতপক্ষে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি অর্থই হলো 'সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা'। এর নীতি ও কৌশল হচ্ছে, ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা স্থাপন, বৈদেশিক লেনদেনসহ সবক্ষেত্রেই সুদ বর্জন করা এবং ধীরে ধীরে সমাজ থেকে সুদের মূলোচ্ছেদ করা।

সুদের পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকার জন্য নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় এবং নিজস্ব ব্যাবসা ও বিনিয়োগ থেকে ন্যায়ানুগ মুনাফা অর্জনের নানা উপায়-উপকরণ বের করে এবং এগুলোর ওপর নির্ভর করে।

ঙ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ। এ লক্ষ্যে ব্যাংক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প বা ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে, যদি তা ইসলামী শরীয়ার আলোকে বৈধ এবং সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, মুদ্রাস্ফীতি আধুনিক প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বড়ো প্রতিবন্ধক। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য অন্যতম প্রধান দায়ী। অথচ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। যেসব কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, যেমন—অর্থের বৃদ্ধির বা সরবরাহ বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমতা না থাকা, অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটানো এবং সরকারের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, এসবের কোনোটাই ইসলামী অর্থনীতির বেলায় ঘটতে পারে না। ইসলামী ব্যাংক সরাসরি উৎপাদনশীল খাতে এবং পণ্যে বিনিয়োগ করায় উৎপাদনশীলতা ঠিক থাকে। ফলে অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ ধাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। শুধু শুধু অর্থকে বাজারে ছেড়ে দেওয়া বা প্রয়োজনের বাইরে অর্থের সরবরাহ বাড়ানোর কোনো সুযোগ ইসলামী

ব্যাংকিংব্যবস্থাপনায় নেই। তাই মুদ্রাস্ফীতি ঘটার মতো অবস্থা এখানে তৈরি হয় না। লুতফুর রহমান সরকার বলেছেন—

> ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অংশীদারত্বের ভিত্তিতে যে বিনিয়োগ করা হয়, তাতে মুদ্রাস্ফীতির কোনো অবকাশ নেই। কারণ, উৎপাদনের সাথে তা সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত।[১৪]

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে যে অর্থায়ন ব্যবস্থার কথা বলে তা যদি সত্যিকার অর্থে ব্যাপকভাবে চালু করা যায়, তবে আশা করা যায়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে; উদ্যোক্তা ও ব্যাংকসমূহের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি বণ্টিত হবে। ফলে বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে; অর্থনীতিতে অস্থিরতা হ্রাস পাবে, অনিশ্চয়তা দূর হবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবে।

চ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণ

ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। ফলে এখানে অনায়াসেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংক তার সম্পদ গুটিকতক সম্পদশালী মানুষের কাছে জমা হতে দেয় না। ইসলামী বিধানের লক্ষ্যই হচ্ছে—যেমন, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—সম্পদকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সমাজে একটা বৈষম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করা। ফলে স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের কাছেও ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হয়। এতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। পরিণামে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে সমাজ অনেকটা মুক্ত হয়।

ছ. সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এটি কেবল ব্যাবসা-বাণিজ্য করে না; বরং সামাজিক উন্নয়নেও অংশগ্রহণ করে। এটি অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে। বলা বাহুল্য, এ দুয়ের মধ্যে সুসমন্বয় ও সুসম্পর্ক না থাকলে কারোরই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই

---

১৪. সরকার, লুতফুর রহমান, *সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা*, *দৈনিক সংগ্রাম*, আইআইবিএল-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪, পৃ. ৬১

ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবসময় এ লক্ষ্য সামনে রাখে যে, তা সমাজের উন্নতিতে কতটা সহায়ক হবে? ব্যক্তির উন্নতির সাথে সাথে জনসাধারণের উন্নতি কতটা হবে? কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, দাতব্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, সমাজের সকল শ্রেণির কাছে আর্থিক সেবা পৌছানো, পরিবেশ ও সমাজের ওপর প্রকল্পসমূহের প্রভাব কতটা পড়ছে—তা বিশেষভাবে যাচাই করা হয়। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে লাভ হলেও সমাজের জন্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত কোনো প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে না।

উল্লেখ্য, সমাজের প্রয়োজন ব্যাপক ও বহুমুখী। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো যেখানে সিনেমা হল নির্মাণ বা সিনেমা শিল্পে অর্থ ঋণ দেয়, সেখানে ইসলামী ব্যাংক তা আদৌ চাইবে না। কারণ, সিনেমার প্রসারের ফলে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় আরও দ্রুত ও ব্যাপক হবে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আদৌ এ বিষয়ে মাথাব্যথা নেই। আবার ইসলামী ব্যাংকগুলো সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিত্তহীন লোককে কর্জে হাসানা বা মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করবে; কিন্তু সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো এ উদ্যোগ নেবে না। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য থাকে, ব্যক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে সমাজে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো কেবল নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৎপর। এগুলো কেবল বিবেচনা করে, তাদের প্রদেয় ঋণ সুদে-আসলে ফেরত আসবে কি না; সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ।

জ. যাকাতব্যবস্থার বাস্তবায়ন

ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষত্ব হলো—যাকাতব্যবস্থার বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য, যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বের দিক থেকে সালাতের পরেই এর স্থান। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্‌বৃত্ত তহবিল ও অব্যবহৃত অর্থের ওপর যাকাত আদায় করে থাকে। তা ছাড়া ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট থেকেও তাদের সম্মতিক্রমে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। যাকাত তহবিলের এ অর্থ শরীয়াসম্মত খাতেই ব্যয় করা হয়।

আজকের সমাজে মুসলিমরা প্রায়ই বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের স্থায়ী কল্যাণসাধন হয়

না। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই ইসলামী ব্যাংক চেষ্টা করে—যাকাত তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানমুখী উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করতে। এভাবে যাকাতের অর্থ ব্যয় করে একই সাথে কর্মসংস্থান ও নিয়মিত আয়ের একটা নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংক বদ্ধপরিকর। সমাজে ধনী-দরিদ্রের শ্রেণি-বৈষম্য হ্রাস করার জন্য এটি একটি কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।[১৫]

ঝ. জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

ইসলামী ব্যাংক কেবল আর্থিক লেনদেন ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দেশের ব্যাপক গণমানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। আর্তমানবতার সেবা এবং বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্নমুখী কার্যক্রম ইসলামী ব্যাংক গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক 'কর্জে হাসানা' নামে ব্যক্তিগত ও জনকল্যাণমূলক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। বিশেষ ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনে ব্যাংক কোনো প্রকার লাভ ছাড়াই এ ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। 'ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব'-ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় জনকল্যাণের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে চালু হয়েছে। বলতে গেলে, এ থেকে অর্জিত মুনাফা ব্যয়ের প্রায় সকল খাতই জনকল্যাণমূলক। পরিবার পুনর্বাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা এবং অন্যান্য যেকোনো কল্যাণ ও সেবামূলক খাতে ক্যাশ ওয়াকফের মুনাফা বণ্টন বা ব্যয় করা যায়।

জনকল্যাণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের আয়ের একটি অংশ দিয়ে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন জনহিতকর সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। এ সকল ফাউন্ডেশন বা সহযোগী দাতব্য প্রতিষ্ঠান গরিব, দুস্থ ও দুর্যোগপীড়িত লোকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণসাধন করে। এ ছাড়াও তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও কল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের সুস্থ শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ, ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুনের উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষাকারী নানাবিধ ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

---

১৫. হাবীবুর রহমান, শাহ মুহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ১১-১৩

ইসলামী ব্যাংকের প্রকারভেদ

যে পরিবেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো কাজ করে, সেই পরিবেশ বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায় :

ক. যেসব দেশে আইনগতভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য সুদের লেনদেন করা নিষিদ্ধ। যেমন—সুদান ও পাকিস্তানের ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থা।

খ. যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদের লেনদেন না করার জন্য আইনগতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। যেমন—আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশ এবং অমুসলিম দেশগুলোতে বিদ্যমান বেশিরভাগ ব্যাংকের অবস্থা।

মালিকানাগত দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকগুলোকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায় :

ক. সরকারি ইসলামী ব্যাংক। সরকারি ব্যাংকগুলো আবার দু-ধরনের—

ক.১. আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক

এ ব্যাংকগুলো আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র মিলে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সকলে মিলে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। এ ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলো—জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট বাদশাহ ফয়সালের বিশেষ অনুপ্রেরণায় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশগুলো সম্মিলিতভাবে এর মূলধন জোগান দেয়। বর্তমানে ৫৭টি দেশ ব্যাংকটির সদস্য।

ক.২. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ইসলামী ব্যাংক

এ ধরনের ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রের অধিভুক্ত সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সংস্থাগুলো ব্যাংকগুলোর বেশির ভাগ শেয়ারের মালিক হয়। এ ধরনের প্রসিদ্ধ একটি ব্যাংক হলো মিশরের নাসির সোশ্যাল ব্যাংক (এনএসবি)। এটি মিশরে সরকারিভাবে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে মিশর ও আরব বিশ্বের সামাজিক ও ইসলামী ব্যাংকগুলোর অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খ. বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক

এ ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি মিলে প্রতিষ্ঠা করে এবং তারাই এ ব্যাংকগুলোর মালিক। বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকই হলো এ প্রকৃতির।

প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

বস্তুত ইসলামী ব্যাংকিংকে বলা হয় 'শরীয়া ব্যাংকিং'। অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলভিত্তিই হলো ইসলামী শরীয়া। শরীয়া নেই তো ইসলামী ব্যাংকিং নেই। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্পদভিত্তিক লেনদেন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্বময় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কদর দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জনপ্রিয়তার কারণে একদিকে যেমন বৃহদায়তন পুঁজি নিয়ে নতুন নতুন ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, অন্যদিকে তেমনি অনেক প্রচলিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও তাদের বিদ্যমান খোলস পালটে ইসলামী অবয়ব ধারণ করছে, প্রতিষ্ঠা করছে ইসলামিক শাখা। আবার কেউ কেউ বিদ্যমান অবয়ব বহাল রেখেই পরিবেশন করছে ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট। অর্থাৎ, প্রচলিত ব্যাংক হয়েও তার প্রচলিত ব্যাংকিং প্রোডাক্টের পাশাপাশি বিক্রয় করছে ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট। এমনকি অনেক অমুসলিম মালিকের বিদেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিট খুলেছে এবং অধিক হারে মুসলিমদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমতে, কেবল বাংলাদেশেই ১৫টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা রয়েছে ৩০টি এবং উইন্ডো রয়েছে ৫৪টি। ১২টি প্রচলিত সনাতনী ব্যাংক ইসলামী উইন্ডো পরিচালনা করে। তাদের উইন্ডো রয়েছে ৫৩০টি। উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াটা স্বাভাবিক যে, এসব আবার কেমন ইসলামী ব্যাংকিং? কারণ, এটি একটি অদ্ভুত ধারণা, যা না ঘরকা না ঘাটকা। কেননা, হিসাবায়ন পৃথক হলেই সেটাকে ইসলামী বলার কোনো কারণ নেই। সারা দুনিয়ায় এটা নির্জলা সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত যে, দুটি আলাদা

জলধারা। একটি নোনা, অন্যটি মিষ্ট। একই ব্যাংকে এ দুটোর সমান্তরাল চলা প্রায় অসম্ভব, অথচ অনেকেই এটা দিব্যি চালিয়ে দিচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির সাবেক এএমডি মুহাম্মাদ শামসুজ্জামান বলেন—

> প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের কথা শুনলেই আমরা ধরে নিই, 'কখগঘ ব্যাংক লিমিটেড' রূপান্তরিত হয়ে 'কখগঘ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড'-এ পরিণত হওয়ার মতো কিছু। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছরের ব্যাংক রূপান্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরো একটি প্রচলিত ব্যাংক রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ একটি ইসলামী ব্যাংকে যেমন পরিণত হয়েছে, তেমনি একটি প্রচলিত ব্যাংক শাখাও ইসলামী শাখায় রূপান্তরিত হয়েছে। আবার প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে এক বা একাধিক উইন্ডো বা ইউনিট খুলেও ইসলামী ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ দু-একটি ইসলামী প্রোডাক্ট প্রবর্তন করেও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে ব্যাংক রূপান্তরের বিদ্যমান বাস্তবতা। রূপান্তরিত সকল সত্তাই কি সমান? না, যারা পুরোপুরি ইসলামী ধারা ফলো করে, তাদের জন্য সুদ পরিহার করে ইসলামী মতে চলা তাদের থেকে তুলনামূলক সহজ, যারা সংযুক্ত ধারা ফলো করে চলছেন? কেননা, দিনের শেষে তো সব নদীর জল বঙ্গোপসাগরেই পড়ছে।[১৬]

সত্য কথা হলো—বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সুদি ব্যাংকগুলো তাদের প্রফিট মেক্সিমাইজ করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করে থাকে, তার একটি হলো হালাল প্রোডাক্ট পরিবেশন। এটা তাদের একটি বাণিজ্যিক টেকনিক। প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে যেসব হালাল প্রোডাক্ট পরিবেশন করতে দেখা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো মুশারাকা, মুরাবাহা ও ইজারা ইন্সট্রুমেন্ট। মুসলিম দেশগুলোতে যেসব বিদেশি ব্যাংক ব্যাবসা করে, তারা মুসলিম গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য এসব ইন্সট্রুমেন্ট অফার করে থাকে। এসব প্রোডাক্ট যে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ম্যানেজ করা হয় তা নয়; বরং এগুলো তাদের প্রচলিত ব্যাংকিং সেবারই অংশ। অনেকের বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, এসবের মধ্যে শুধু নামটি ব্যতীত সুদি ব্যাংকের আর কিছু দৃশ্যত তফাত নেই।

---

১৬. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে-৩য় পর্ব*,

https://www.facebook.com/share/p/mZM2uYyM88r1p9gA/?mibextid=oFDknk

এ কারণে এসব প্রোডাক্ট সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহ অনেক। তাই এসব প্রোডাক্ট ব্যবহার করার আগে অধিকতর সতর্কতার সাথে সৎ ও নিষ্ঠাবান শরীয়া স্কলারদের মতামত জেনে নেওয়া উচিত। অবশ্য ফকীহগণ এ ব্যাপারে নানা মত পোষণ করেন। এক দল ফকীহ মনে করেন, মুসলমানদের এসব সেবা এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ, এখানে শরীয়ত পরিপালনের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তদুপরি শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য ওইসব ব্যাংকের নিয়মিত কোনো শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ড বা মুরাকিব নেই। ফকীহদের আরেকটি দল মনে করেন, যদি বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংক না পাওয়া যায় তখন মন্দের ভালো হিসেবে এসব সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুনাফাটা পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। আর দেখতে হবে লেনদেনের কত ভাগ হালাল আর কত ভাগ হারাম।

বিশেষজ্ঞদের মতামত :

প্রচলিত ব্যাংক কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো বা ইউনিট পরিচালনাকে ঘিরে শরীয়া স্কলার ও ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা মতভিন্নতা রয়েছে। একদল এ ব্যবস্থার পক্ষে; অন্যদল বিপক্ষে।

ফকীহদের একদল মনে করেন, প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিট খোলা যেতে পারে, যদি উদ্যোক্তারা তাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিটগুলোর সব কাজে পূর্ণ ইসলামী শরীয়তের বিধান মেনে চলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এ মতের পক্ষে তাদের যুক্তি হলো—

ক. ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিটগুলো অন্তত সুদটা পরিহার করে, যা আর্থিক লেনদেনে ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে বড়ো উদ্‌বেগ।

খ. কিছু কিছু দেশে পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সে ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিট খোলা হলো তার একমাত্র বিকল্প। তাতে এই ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিটগুলো যদি ব্যবসায় সফল হয় এবং প্রচলিত শাখাগুলোর তুলনায় বেশি মুনাফা দিতে পারে, তাহলে শেয়ারহোল্ডাররা পুরো ব্যাংকটিই রূপান্তরে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারেন। অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিট চালু করাটা হতে পারে ওই ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম পদক্ষেপ।

গ. ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিটগুলো তাদের প্রচলিত মাতৃশাখার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারবে। এটি ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিট কনসেপ্টের বিরোধীরা মনে করেন, এটি হলো মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার এক নতুন পন্থা। এখানে আল্লাহ তায়ালার বিধানের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ও আনুগত্য নেই, আছে ইসলামের নামে ইসলামী তহবিল হস্তগত করার অপকৌশল।

প্রচলিত ব্যাংকের মূলধন দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিট প্রতিষ্ঠার বৈধতা নিয়েও কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলছেন, এর মাধ্যমে হারাম ও হালালের মিশ্রণ ঘটবে।

আবার অনেকেই মনে করেন, একটি পুরোপুরি সুদভিত্তিক ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার চেয়ে প্রচলিত ব্যাংকের একটি ইসলামী শাখা বা ইসলামী উইন্ডো/ইউনিটের সাথে লেনেদেন করা অনেক ভালো। তাদের মতের পক্ষে তারা ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযী রাহি.-এর একটি অভিমত পেশ করেন, যাতে তিনি বলেছেন—'যখন হালাল টাকার সাথে হারাম টাকা মিশে যায়, তখন আমাদের উচিত অপবিত্র টাকাকে পবিত্র করে নেওয়া। অর্থাৎ, মোট টাকার মধ্যে যে পরিমাণ হারাম টাকা রয়েছে, তা আলাদা করে চ্যারিটিতে ব্যয় করতে হবে। আর হালাল অংশ রেখে দিতে হবে।'[১৭]

আমরা মনে করি, এ প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত মতটি গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি উদ্যোক্তারা তাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডো/ইউনিটগুলোর সব কাজে পূর্ণ ইসলামী শরীয়তের বিধান মেনে চলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন। একইসাথে ইসলামী ব্যাংকিংজনিত সকল লেনদেন হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষিত হয়, তার ব্যালেন্সশিটও সুদ অংশের তহবিল থেকে আলাদা থাকে, শরীয়া মুরাকিব ও বোর্ড সদস্যগণ কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয় এবং এই মর্মে নিশ্চিত হতে পারেন, সেই লেনদেনসমূহে পরিপূর্ণভাবে শরীয়ার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।[১৮]

---

১৭. নূরুন্নবী, *প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং*, https://www.dailynayadiganta.com/diganta-islami-jobon/756695/-প্রচলিত-ব্যাংকের-ইসলামী-ব্যাংকিং

১৮. বিস্তারিতের জন্য দেখুন, ড. লুতফ মুহাম্মদ সরহী, الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح, https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/20 10/03/

এখন প্রশ্ন হলো—বাস্তবে কি প্যারালাল ব্যাংকিংয়ে এতসব আয়োজন প্রস্তুত আছে?! একটি উদাহরণ দেখুন—

শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তা দেখে দেশে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকও প্রায় দেড় দশক আগে ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করে। কিন্তু শরীয়া উইন্ডোর মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়া নীতিমালা মানছে না ব্যাংকটি। শরীয়া ব্যাংকিংয়ের নামে মূলত নির্ধারিত হারে সুদের ব্যাবসা করছে ব্যাংকটি। এ নিয়ে সতর্ক করে ব্যাংকটিকে একাধিকবার চিঠিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু সোনালী ব্যাংক এসবের কোনো তোয়াক্কা করছে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, সোনালী ব্যাংক সম্প্রতি ৯০ দিনের জন্য ৩৭ কোটি টাকা ঋণ দেয় বেসরকারি গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংককে। সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জিয়াউল হাসান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে পরিচালনা পরিষদের ৮৬০তম সভায় এ ঋণ অনুমোদন দেওয়া হয়। শরীয়া উইন্ডো থেকে দেওয়া এই ঋণের সুদ ধরা হয়েছে ১২ শতাংশ। যদিও শরীয়া ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগে সুদের হার বেঁধে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একটি ব্যাংকের শরীয়া উইন্ডো থেকে নির্দিষ্ট সুদহারে অপর একটি ব্যাংকে বিনিয়োগ শরীয়াসম্মত নয় বলে আপত্তি তুলে খোদ কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সেই সঙ্গে কোনো ব্যাংক যেন ইসলামিক ব্যাংকিং নীতিমালা লঙ্ঘন করে ব্যাবসা পরিচালনা করতে না পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগকে লিখিত নির্দেশনাও দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা। এরপর অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগ সোনালী ব্যাংককে বারবার সতর্ক করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সময় শুধু সোনালী ব্যাংক কেন, অনেক ব্যাংকই বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মানত না। এ নিয়ে অনেক চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জবাব মিলত না। সেই ধারাবাহিকতায় সোনালী ব্যাংকও চিঠির জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। এ নিয়ে কথা বললে গভর্নর রউফ তালুকদার কখনও কখনও কর্মকর্তাদের শাসিয়ে বলতেন, 'দেশের কোথাও শরীয়া নেই। রাখেন এসব নীতিমালা। সরকারের ওপর থেকে যা চায়, তা-ই করেন।'

অনেক শরীয়া-বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সোনালী ব্যাংক যেটা করেছে, তা শতভাগ সুদ এবং ইসলামী শরীয়ার পুরোপুরি লঙ্ঘন।

উল্লেখ্য, সোনালী ব্যাংক ২০১০ সালের ২৯ জুন ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে শরীয়াভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। সোনালী ব্যাংক বর্তমানে মুদারাবা এবং ওয়াদীয়াসহ ৮ ধরনের ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।[১৯]

এখানে এ বিষয়টিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশে প্রচলিত ব্যাংকগুলো যে হারে ক্রমশ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি ঝুঁকছে, তার কারণ অবশ্যই আদর্শিক নয়। অর্থাৎ, তারা আদর্শ হিসেবে ইসলামকে ভালোবেসেই যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তা নয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সহায়তা লাভজনক হওয়ায় দেশে বেশ কিছু প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং খাতে বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (এসএলআর) ও বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (আইডিআর) কম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে, প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের ১৩ শতাংশ এসএলআর হিসেবে রাখতে হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে রাখতে হয় মাত্র সাড়ে পাঁচ শতাংশ। একই সঙ্গে প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে এডিআর (অ্যাডভান্স টু ডিপোজিট রেশিও) ৮৭ শতাংশ এবং শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে ৯২ শতাংশ এডিআর বজায় রাখতে হয়। প্রচলিত ব্যাংকগুলো ১০০ টাকা আমানতের বিপরীতে ৮৭ টাকা এবং ইসলামী ব্যাংকগুলো ৯২ টাকা ঋণ দিতে পারে। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি)-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আমিন বলেন—'এ ধরনের নীতিগত সুবিধার কারণে বিনিয়োগকারী ও অংশীদাররা শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক গঠনে আগ্রহী।'[২০]

---

১৯. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে-৩য় পর্ব,*
https://www.facebook.com/share/p/mZM2uYyM88r1p9gA/?mibextid=oFDknk

২০. ইসলামী ব্যাংকিং কোন পথে?
https://bangla.thedailystar.net/economy/bank/news-600671

যেমন, প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ২০২১ সালে শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। অধিকাংশ প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ছাড়া অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা আছে। ফলে তারা অনেক গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে, যারা আগে এসব ব্যাংকের সেবা নিত না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ প্রচলিত ব্যাংকগুলো ইসলামের আদর্শের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি ঝুঁকছে এবং বিভিন্ন শাখা বা উইন্ডো/ইউনিট খুলছে, তা নয়; বরং তারা একান্তই ব্যাবসায়িক সুবিধা অর্জন ও পুঁজি বৃদ্ধির স্বার্থেই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি ঝুঁকছে এবং বিভিন্ন শাখা বা উইন্ডো/ইউনিট খুলছে। যেহেতু তাদের মধ্যে আদর্শিক দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে, উপরন্তু তাদের শরীয়া গভর্নেন্সও কাঙ্ক্ষিত মানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে না বা করতে পারে না, তাই তারা যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে শরীয়া-বিধি ও নিয়মাবলি যথাযথভাবে মেনে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, তা খুব একটা আশা করা যায় না।

অধ্যায় : ২

ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন ব্যবস্থা : ত্রুটি ও সুপারিশ

ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং কর্মপ্রক্রিয়ার সকল স্তরে ইসলামী শরীয়ার বিধিনিষেধ ও নীতিমালা বাধ্যগতভাবে মান্য করে চলে। উল্লেখ্য, এ বাধ্যবাধ্যকতা যেমন একজন মুমিন হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর তাদের ঈমানের দিক থেকে আরোপিত হয়, তেমনি আইনগতভাবেও তাদের ওপর বর্তায়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একটা ইসলামী ব্যাংককে ইসলামী শরীয়তের বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন মেনে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার শর্তেই অনুমোদন দেয়। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাননির্ধারণী আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instititions (AAOIFI) প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডেও শরীয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তাবলির অনুসরণ অপরিহার্যতা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

> The Fatwa and rullings of the Shari`ah Supervisory Board shall be binding for the Islamic Financial Institutions.
>
> শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের ফাতওয়া ও সিদ্ধান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

এখন প্রশ্ন হলো 'ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন' বলতে কী বোঝায় বা এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো কী কী?

এককথায়, শরীয়া পরিপালন বলতে ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রমে ইসলামী শরীয়তের বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন মেনে চলাকে বোঝায়। এর অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয় হলো—

ক. প্রত্যেকটি লেনদেনে তার সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়তের বিধিবদ্ধ সকল নিয়মনীতি ও শর্তাবলি পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করা।

খ. লেনদেনের যেকোনো পর্যায়ে সুদের আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকা।

গ. ইসলামে বৈধ নয়—এ ধরনের যেকোনো ব্যবসায় পদ্ধতিতে কোনোরূপ বিনিয়োগ না করা।

ঘ. ইসলামে বৈধ নয়—এ ধরনের যেকোনো পণ্যের উৎপাদন, বেচাকেনা ও বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকা।

ঙ. ইসলামে বৈধ নয়—এ ধরনের যেকোনো সেবায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকা।

চ. ইসলামে হালাল না হারাম সংশয় আছে—এ ধরনের যেকোনো কারবার থেকে বিরত থাকা।

ছ. সমাজ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর—এ ধরনের কোনো খাতে বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকা।

জ. অগ্রাধিকারমূলক ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা। বিলাসিতামূলক খাতে বিনিয়োগ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা। উল্লেখ্য, যেসব খাতে সকল স্তরের মানুষের জরুরিয়্যাত বা মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণ হয়—সেসব খাতে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করবে—এটাই শরীয়তের দাবি।

ঝ. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দলপ্রীতি থেকে বেঁচে থাকা। বিনিয়োগ গ্রাহকের দক্ষতা ও সততা বিবেচনা করে উপযুক্ত লোকদেরকেই বিনিয়োগ দেওয়া।

ঞ. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা, যাতে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়। ইসলামে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে—সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণসাধন। ফলে সামগ্রিকভাবে বড়ো শিল্প বা ব্যাবসার পাশাপাশি এসএমই খাত ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহজে বিনিয়োগ সুবিধা দান করা।

ট. বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা আমানতদারদের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে পূর্ণ ইনসাফ বজায় রাখা। ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে ন্যায়ানুগ আনুপাতিক হারে মুনাফা বণ্টন করা। মুনাফা—কম হোক বা বেশি—সবসময় (কিংবা প্রায়ই) নির্ধারিত হারে বণ্টন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। মুনাফা বেশি হলে গ্রাহকদের আনুপাতিক হারে যথাযথ অংশ দান করা।

ঠ. জুলুমের পর্যায়ভুক্ত হয়—এ ধরনের অতিরিক্ত কোনো চার্জ, ফি, কমিশন গ্রাহকদের ওপর আরোপ না করা। অনুরূপভাবে যেকোনো লেনদেন, যা সামাজিক অবিচার ও শোষণের দিকে ধাবিত করে, তা থেকে বিরত থাকা।

ড. গ্রাহকদের ঋণ ও সেবা দিয়ে সার্ভিস চার্জের নামে প্রকৃত খরচের অতিরিক্ত দাবি না করা। (ক্রেডিট কার্ডের সার্ভিস চার্জ এবং ওকালা চার্জও এর অন্তর্ভুক্ত)।

ঢ. ব্যাংক কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, সততা ও আমানতদারিতা রক্ষা করা এবং কোনোরূপ মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও কারসাজি-হীলাবাজির আশ্রয় না নেওয়া।

ণ. গ্রাহকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলোর মর্যাদা রক্ষা করা এবং যথাযথভাবে মেনে চলা; চুক্তির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা।

ণ. ব্যাবসার কৌশলে সুদে ঋণ দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থাকা।

ত. ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ ও আয় থেকে নিয়মিত যাকাত দান করা।

থ. সংশয়মূলক খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকের মূল তহবিলের অন্তর্ভুক্ত না করা। এ অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

দ. মুনাফার হার, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি সুদি ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া। যদি সুদি ব্যাংকের সুদের হারের সাথে ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার হার সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফিও সমান বা কাছাকাছি হয়, তাহলে জনমনে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে সন্দেহ দানা বাঁধবে—এটাই স্বাভাবিক। মুনাফার হার, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি একান্তই বাস্তব ও যুক্তিসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যাংকের সার্বিক পরিবেশ ইসলামসম্মত হওয়া। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সদাচারী হবেন। গ্রাহকদের সাথে উত্তম আচরণ, তাদের কল্যাণকামিতা, সততা, বিনয়, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভালোবাসা, ধর্মীয়-প্রাতিষ্ঠানিক-রাষ্ট্রীয় সকল নিয়মকানুন যথাযথ পরিপালন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দাবি। অসাধুতা, মেজাজের ভারসাম্যহীনতা, নেশা, ধুমপান, পর্দাহীনতা প্রভৃতি নেতিবাচক গুণাবলি ইসলামী ব্যাংকের কর্মীদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ধরনের আচরণ ইসলামী ব্যাংকের প্রতি গ্রাহক ও সাধারণ মানুষের মাঝে নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি করতে পারে। তাই ইসলামী ব্যাংকের কর্মীদের প্রতিটি কথা, কাজ ও জীবনাচারে ইসলামী বিধানের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

ন. ব্যাংকের নিয়মিত খরচাদির ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া; অপচয় থেকে বিরত থাকা।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, আমরা যখনই ইসলামী ব্যাংকে Shariah Compliant বা শরীয়া পরিপালনের কথা বলব, এর অর্থ কেবল লেনদেনে শরীয়া অনুসরণই নয়; বরং যে কয়টি বিষয় এর দ্বারা কভার করা হয় সংক্ষেপে তা হলো :

ক. ডিপোজিট প্রোডাক্টে শরীয়া পরিপালন;

খ. ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টে শরীয়া পরিপালন;

গ. সার্ভিস ডেলিভারিতে শরীয়া পরিপালন;

ঘ. জনশক্তির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম;

ঙ. ব্যক্তিজীবনে আচরণ ও কর্মে শরীয়ার প্রতিফলন।

খুবই হতাশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, বর্তমানে আমরা ইসলামী ব্যাংকে Shariah Compliant বা শরীয়া পরিপালনের কথা বলে কেবল আর্থিক লেনদেনের শরীয়াকেই বুঝি। এর বাইরে অন্যগুলো আমরা সাধারণত এড়িয়ে যাই। এটিই বর্তমান সময়ের বাস্তবতা।[২১]

---

২১. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে-৪র্থ পর্ব*, https://www.facebook.com/share/p/5XKyBeZA51uM1dGm/?mibextid=oFDknk

বলতে গেলে বর্তমানে দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে আগের সেই শরীয়াবান্ধব ইসলামী পরিবেশ বিদ্যমান নেই। নারী কর্মকর্তাদের পর্দাহীনতা; সালাতের প্রতি অবহেলা, সালাতের সময়ে কেউ সালাত পড়ছে, কেউ পড়ছে না, অনেকে ধূমপানের জন্য গোপন কুঠরীতে চলে যাচ্ছে; নানা আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে, ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি হচ্ছে, শরীয়াবিধি ও প্রচলিত ব্যাংকিং নর্মস লঙ্ঘন করে বিনিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, গ্রাহকদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে, নানারূপ হয়রানি করা হচ্ছে ... ।

শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়া নিয়মনীতি পরিপালনে বাধ্য। এটি নিশ্চিত করার চূড়ান্ত দায়িত্ব যদিও ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের, তবে কার্যত তাদের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করে শরীয়া গভর্নেন্স। প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের একটি নিয়মিত শরীয়া বোর্ড/শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটি (هيئة الرقابة الشرعية) থাকে। একে সহযোগিতা করার জন্য থাকে শরীয়া সেক্রেটারিয়েট। এর পাশাপাশি শরীয়া অডিট নামে একটি অডিট ব্যবস্থাও রয়েছে।

শরীয়া বোর্ডের সদস্যগণ ব্যাংকের শরীয়া পরিপালন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। যেমন, ব্যাংকের কার্যক্রমে কোন বিষয়গুলো শরীয়াসম্মত এবং কোন বিষয়গুলো শরীয়াসম্মত নয়; গ্রাহকদের সাথে করা চুক্তিগুলো শরীয়াসম্মত পদ্ধতিতে সম্পাদন হয়েছে কি না; গ্রাহকের সাথে লেনদেন, বিশেষ করে বিনিয়োগে কোনো শরীয়া-বিচ্যুতি থাকলে সমাধানমূলক পদক্ষেপ কী হবে; ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে .. ইত্যাদি। তারা সময়ে সময়ে বিনিয়োগ মডিউল প্রণয়ন, পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেন, আরও রিফাইনমেন্ট সাজেস্ট করেন এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শাখা পর্যায়েও তদারকি করেন। শরীয়া বোর্ড নতুন নতুন প্রোডাক্ট বা বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুমোদন দেন। তাদের নিরীক্ষা সনদ ব্যতীত ব্যাংকের ব্যালেন্সশিট পরিচালনা বোর্ড এপ্রুভ করে না। শরীয়া পরিপালনে দুর্বলতা বা অগ্রগতির বিষয়ে শরীয়া বোর্ডের মতামত ব্যাংক যথাযথ গুরুত্বের সাথে প্রায়োরিটির সাথে বিবেচনা করে। এটাই হলো নিয়ম।

বলার অপেক্ষা রাখে না, একটি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া পরিপালনের মান অনেকটাই শরীয়া বোর্ডের সদস্যদের যোগ্যতা-দক্ষতা ও মসৃণ কর্মশৈলীর ওপর নির্ভর করে। সুতরাং অনুমেয় যে, বোর্ডের সদস্যদের কতটা দায়িত্বসচেতন ও সজাগ থাকতে হবে? একটি সুদমুক্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সুদমুক্ত থাকা না থাকা বলতে গেলে তাদের একান্ত তৎপরতার ওপরই নির্ভর করে। সুতরাং এটা অনেক বড়ো দায়িত্ব, জিম্মাদারী।[২২]

কিন্তু প্রশ্ন হলো—এ শরীয়া বোর্ড শরীয়া নীতিমালা পরিপালনের ক্ষেত্রে কতটুকু সাফল্য দেখাতে সক্ষম হচ্ছে বা তার দায়িত্বই-বা কতটুকু পালন করছে? অনেকের ধারণামতে, উক্ত বোর্ড শরীয়া মানদণ্ড রক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারছে না এবং এর ভূমিকাও নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। তাহলে বোর্ডের ব্যর্থতার কারণগুলো কী অথবা এর সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতাসমূহ কী?

ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে আমরা শরীয়া বোর্ড ও অডিট ব্যবস্থার প্রচলিত বিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব, অতঃপর এদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে চেষ্টা করব, পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে কিছু সুপারিশও তুলে ধরব।

ক. শরীয়া বোর্ড/সুপারভাইজারি কমিটি

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকের একটি প্রধান বিশেষত্ব হলো—এর যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার জন্য একটি শরীয়া-বিশেষজ্ঞ পর্ষদ থাকে, যা সাধারণত 'শরীয়া বোর্ড' বা 'শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটি' নামে অভিহিত হয়। ব্যাংকের কার্যাবলি শরীয়তের নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনাদানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এ পর্ষদের।

সাধারণত ব্যাংক অব ডিরেক্টরসের সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হলে এবং এ ব্যাপারে শরীয়া বোর্ডের আগের কোনো সিদ্ধান্ত না থাকলে তারা

---

২২. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে-১ম পর্ব*, https://www.facebook.com/share/p/tC7YkfE6667K5cz3/?mibextid=oFDknk

প্রথমেই বোর্ডের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করেন। বোর্ডের নিকট থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত পেলেই সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয় এবং তা কার্যকর করা হয়।

উল্লেখ্য, ব্যাংকের সংঘ স্মারক বিধি ও পরিমেল নিয়মাবলি (memorandun & articles of associations) অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ এ বোর্ডের সদস্যদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। নিয়মানুযায়ী শরীয়া বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে ইসলামী শরীয়া বিষয়ে বিশেষ করে ইসলামী মুয়ামালাত, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ হতে হয়। পাশাপাশি তাকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবেও সুপরিচিত হতে হয়।

খ. শরীয়া সেক্রেটারিয়েট

শরীয়া বোর্ডকে সহযোগিতা করার জন্য একটি শরীয়া সেক্রেটারিয়েট থাকে। এতে সাধারণত ইসলামী শরীয়া ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। শরীয়া-বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে সেক্রেটারিয়েট শরীয়া বোর্ডকে সহযোগিতা করে; শরীয়া-বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর ওপর ওয়ার্কিং পেপার প্রস্তুত করে, বোর্ডের কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে, বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং তা বাস্তবায়নের অবস্থা বোর্ডে উপস্থাপন করে।

তা ছাড়া শাখাসমূহের শরীয়া-নিরীক্ষা ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে শরীয়া পরিপালনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনমূলক রিপোর্ট তৈরি করে সেটা শরীয়া বোর্ড ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদের অবহিত করে। অধিকন্তু, বিনিয়োগ কার্যক্রমসহ ব্যাংকের সকল ক্ষেত্রে শরীয়া পরিপালন এবং এ ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের জনশক্তি ও গ্রাহকদের শরীয়া-বিষয়ক প্রশিক্ষণ, শরীয়া উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

গ. শরীয়া অডিট

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে 'শরীয়া অডিট এন্ড ইনস্পেকশন' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংকের কার্যক্রমে শরীয়া পরিপালিত হচ্ছে কি না, শরীয়া মানদণ্ড কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে, তা তদারক করার জন্য শরীয়া সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত মুরাকিবগণের মাধ্যমে 'শরীয়া অডিট এন্ড ইনস্পেকশন' পরিচালিত হয়। তারা

জেনারেল ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য তথা ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তারা যাচাই-বাছাই করে দেখেন—গ্রাহকের আবেদনপত্র, ব্যাংকের অনুমোদন, ডিসবার্সমেন্ট, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তিপত্র, পাওনা পরিশোধসহ সকল কিছু ঠিকঠাক মতো সম্পন্ন হয়েছে কি না। এ ছাড়া গ্রাহকদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচার-ব্যবহার, শাখার সার্বিক পরিবেশ ও সেবার মান ইত্যাদি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেন। তারা সাধারণত প্রতিটি শাখায় বছরে একবার তাদের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বিধিব্যবস্থাগত ত্রুটি

আমরা মনে করি, ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক নীতিগতভাবে যেসব বিধিব্যবস্থার কথা বলে এবং ম্যানুয়েলে লিপিবদ্ধ আছে তা স্ব স্ব স্থানে সঠিক, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে কিছু আপডেটের প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু বড়ো আপত্তি হলো—এসব বিধিব্যবস্থার যথার্থ কার্যকারিতা ও সাফল্য নিয়ে। অনেকেই মনে করেন, এসব বিধিব্যবস্থা কাগজে-কলমে থাকলেও সব জায়গায় ও সর্বক্ষেত্রে এর যথার্থ ও পরিপূর্ণ প্রয়োগ নেই। ফলে ব্যাংকের নানা কার্যক্রমে নিয়মিত শরীয়া লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে এবং ব্যাংকের ভেতরকার পরিবেশও দিনের পর দিন কলুষিত হচ্ছে। নিম্নে আমরা এর প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি—

ক. ব্যাংকের শরীয়া ম্যানুয়ালে শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটিতে দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের নিয়োগের কথা লিপিবদ্ধ থাকলেও কার্যত বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির অধিকাংশ সদস্য ব্যাংকের বাস্তব ব্যাবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, আবার অনেকের শরীয়া বিষয়েও প্রয়োজনীয় যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার জানামতে, অনেক সদস্য শরীয়া বিষয়ে কোনোরূপ গবেষণা ও কনসেপ্ট দেওয়ার মতো ন্যূনতম যোগ্যতাও রাখে না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. এম কবীর হাসান বলেন—

> তবে এ তারল্য সংকটসহ আরও অন্যান্য ব্যাংকিং অনিয়মের পেছনে দুর্বল শরীয়া বোর্ড, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের শরীয়া আইনের প্রতি অনীহাও অনেকাংশে কাজ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গভীর শরীয়া জ্ঞান রাখেন—এমন গ্রহণযোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ স্বাধীন শরীয়া বোর্ড থাকলে সেখানে অনিয়মের মাত্রা অনেকাংশেই

কমে আসবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানের বিভিন্ন ব্যাংকে যারা শরীয়া স্কলার হিসেবে কর্মরত আছেন, দেখা যায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগই স্বীকৃত ব্যাংকিং শরীয়া স্কলার নন বা ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো অধ্যয়ন নেই।

কোনো কোনো সমালোচকের মন্তব্য এরূপ যে, বর্তমানে বাংলাদেশে শরীয়া বোর্ডের কার্যকারিতা বলতে বাস্তবে তেমন কিছু নেই। এখানে শরীয়া বোর্ড গঠন করা হয় একান্তই মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য। তাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তরিকতের শাইখ, জনপ্রিয় আলিম, টিভি ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় বক্তা, মসজিদের খতীব, কোনো প্রসিদ্ধ মাদরাসার শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা মুহতামিম অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক প্রমুখ—এরূপ অনেককেই তাদের বোর্ডে নিয়ে আসেন, যাদের অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং-অপারেশন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই।

উল্লেখ্য, শরীয়া বোর্ড ইচ্ছা করলে নিয়মিত রুটিন অডিটের অতিরিক্ত বিশেষ অডিট করতে পারেন, সেই স্বাধীনতা তাদের আছে বলে দাবি করা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে কোনো শরীয়া বোর্ড তার এ অধিকার কখনও প্রয়োগ করেছে বলে আমার গবেষণায় খুঁজে পাইনি। এ প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির সাবেক এএমডি বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মাদ শামসুজ্জামান তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এভাবে—

> আমার ব্যাংকিং লাইফে কখনও স্বাধীনভাবে তারা ব্যাংকের বুকস অব অ্যাকাউন্টসে হাত দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। উপরন্তু, ম্যানেজমেন্টের প্রতিকূলে যায়—এরকম সিদ্ধান্ত তারা কদাচিৎ নেন।

তিনি আরও বলেন—

> শরীয়া বোর্ড ব্যাংকের কোন কোন বিভাগ দেখবে, কোথায় কোন বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ দেবে এবং কোন কোন বুকস অব অ্যাকাউন্টসে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ঢুকতে পারবে—এমন কোনো Terms of Reference (TOR) নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক যে গাইডলাইন দিয়েছে তার কোথাও তা বলা নেই। একইভাবে ব্যাংকগুলোর বোর্ড অব ডিরেক্টরগণও (TOR) ঠিক করে দেননি। ফলে ব্যাংকগুলোর শরীয়া

বোর্ডসমূহের কার্যক্রম ও পদক্ষেপের মধ্যে খুব একটা সমন্বয় ও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক বিষয়েই শরীয়া বোর্ডগুলো নিরুত্তর ও নির্বাক থাকে। আরও আশ্চর্যজনক যে, Central Shariah Board (CSB)-এর কোনো জুরিসডিকশানও কারও ওপর নেই। কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ডের ভূমিকা অনেকটাই জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির মতো। বসেন, মিটিং করেন এবং যাওয়ার বেলায় বন্ধ খামের হাদিয়া নিয়ে প্রস্থান করেন। শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবে তা-ই হচ্ছে।[২৩]

গত কয়েক বছরে দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যাপকভাবে অন্যায় ও অনিয়ম ঘটেছে—যার কারণে ব্যাংকগুলো এখন সিরিয়াসলি ভুগছে—, এর জন্য কি কেবল অফিসাররাই দায়ী? ধরেই নিলাম অফিসাররা অসৎ, ধান্ধাবাজ; তবে শরীয়া গভর্নেন্স—বোর্ড, সেক্রেটারিয়েট ও মুরাকিবরা তাহলে কী করলেন? তারাও এগুলো হজম করে নিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে। গত কয়েক বছরে দেশে ব্যাংকগুলোতে যে লুণ্ঠন হয়েছে, তার কি কোনো দায় শরীয়া গভর্নেন্সের নেই? কেউ কি এমতাবস্থার অবসান চেয়ে প্রতিবাদ করে পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন? নাকি সব দোষ কেবল অফিসারদের?

খ. ব্যাংকের শরীয়া ম্যানুয়ালে শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটিতে সদস্যদের নিয়োগের কিছু নীতিমালা থাকলেও তাদের নিয়োগের প্রক্রিয়াটি পুরো স্বচ্ছ ও আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত নয়। ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছা ও সুবিধামতো যে কাউকে কমিটিতে নিয়োগ দিতে পারে, আবার বাদও দিতে পারে। এ অবস্থায় যোগ্যতা ও নীতিনৈতিকতার দিক থেকে দুর্বল কেউ কেউ যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকার কারণে সুপারভাইজারি কমিটির সদস্য হয়ে যায়, এমনকি কমিটির চেয়ারম্যানও হয়ে যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ অবস্থায় তাদের পক্ষে ব্যাংকিং কার্যক্রমে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করা, ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম পূর্ণ আন্তরিকতা ও সাহস নিয়ে তদারকি করা, এমনকি অনিয়ম বা দুর্নীতি কিছু হলে বাধাদান করা সম্ভবও নয়।

---

২৩. শামসুজ্জামান, ইসলামী ব্যাংকে শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত কল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে, ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টে শরীয়া পরিপালন কতটুকু হয়? সপ্তম পর্ব : চতুর্থ অংশ, (কিছুটা পরিবর্তন সহকারে)
https://www.facebook.com/share/p/dQyYUog3NkiQkT12/?mibextid=oFDknk

গ. অনুরূপভাবে শরীয়া সেক্রেটারিয়েটের ক্ষেত্রেও ইসলামী শরীয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ও যোগ্যদের নিয়োগের কথা থাকলেও কার্যত বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া সেক্রেটারিয়েটে যোগ্য লোকের সংখ্যা খুবই কম। ব্যাংকগুলোতে শরীয়া পর্যালোচনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোনো বিভাগ নেই। এ দুটি কাজই অনেকটা শরীয়া সেক্রেটারিয়েটের লোকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু এদের অধিকাংশই শরীয়া বিষয়ে কোনোরূপ গবেষণা-পর্যালোচনা ও কনসেপ্ট পেপার প্রস্তুত করার মতো যোগ্যতা রাখেন না।

ঘ. শরীয়া অডিট বিভাগের কর্মকর্তাগণ (মুরাকিব) অধিকাংশই পেশাগতভাবে সুদক্ষ নন; তদুপরি তারা ব্যাংকের বেতনভোগী কর্মকর্তা। তারা কখনোই ব্যাংকের মালিক ও পরিচালকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শরীয়া লঙ্ঘন, বড়ো অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করার সাহস রাখবেন না—এটাই স্বাভাবিক। কার্যতও তা-ই হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক ব্যাংকে এ কাজে নিয়োজিত লোকবল এতই স্বল্প যে, সময়ের অভাবে তাদের পক্ষে ব্যাংকের সকল শাখার সকল বিনিয়োগ ডিল পরখ করে দেখাও সম্ভব হয় না।

সুপারিশ

নিম্নে শরীয়া পরিপালনের সূচক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য এবং শরীয়া নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় সুপারিশ পেশ করছি। আশা করছি, এসব সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়া লঙ্ঘন বন্ধ হবে, অন্তত উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং ব্যাংক 'ইসলামী' হওয়ার বিষয়টি যথার্থ হবে।

১. শক্তিশালী শরীয়া বোর্ড গঠন

১.১. শরীয়া বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন। এজন্য তাদের শরীয়া বিষয়ে বিশেষ করে ফিকহুল মুয়ামালাত বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রির পাশাপাশি বাণিজ্য, অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও (জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) স্বীকৃত গবেষণা/প্রকাশনা থাকতে হবে; বর্তমান সময়ের ব্যাংকগুলোর লেনদেন ও চুক্তিগুলো ভালোভাবে বোঝে তাতে সংঘটিত নানা ভুলক্রটি ধরতে পারা ও তা সংশোধন করার যোগ্যতা

থাকতে হবে। তদুপরি তুলনামূলক ফিকহ সম্পর্কেও তাদের প্রচুর ধারণা থাকা প্রয়োজন, যাতে ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন মাযহাবের মতগুলোকে তুলনামূলক পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে অধিকতর যুক্তিসম্মত ও জনহিতকর অভিমতকে বেছে নেওয়া যায়।

১.২. শরীয়া বোর্ডের সদস্য নিয়োগের জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন শরীয়া সেলের অনুমোদন ব্যতীত কোনো সদস্য নিয়োগ বা বরখাস্ত করা যাবে না। এর ফলে একদিকে যেমন যথেষ্ট যোগ্যতা ব্যতীত কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ কমে যাবে, তেমনি যথাযথ কারণ ব্যতীত কোনো সদস্যকে বাদ দেওয়ার সুযোগও হ্রাস পাবে।

১.৩. শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব বোর্ডের সদস্যগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছা ও সুবিধামতো যে কাউকে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব করতে পারবে না।

১.৪. শরীয়া বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য সততা ও দ্বীনদারির ক্ষেত্রে সুখ্যাত হবেন। এ কারণে সততা ও দ্বীনদারির ব্যাপারে প্রশ্নবিদ্ধ বা দুর্বল চরিত্রের কোনো লোককে বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে এমন সত্যনিষ্ঠ, নির্লোভ ও সাহসী হতে হবে যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি শরীয়া-সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গড়িমসি করে এবং তিনি চেষ্টা করেও তাদেরকে শরীয়া-সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাতে সক্ষম না হন, তাহলে তিনি ঘোষণা দিয়ে পদত্যাগ করতে দ্বিধা করবেন না; নাজায়িয কাজগুলোকে অযথা হীলা-বাহানার আশ্রয় নিয়ে জায়িয করার চেষ্টা করবেন না এবং নিজে কমিটিতে আছেন—কেবল এ স্বার্থে কাউকে 'ইসলামী' হওয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন না।

১.৫. একজন ব্যক্তি একইসাথে একাধিক ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন না। এর ফলে নির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির ওপর শরীয়া-বিষয়ক নির্ভরতা এড়ানো সম্ভব হবে।

১.৬. ব্যাংকের প্রভাবশালী কোনো শেয়ারহোল্ডার, ব্যাংকের ডিরেক্টর পদে আসীন কোনো ব্যক্তি এবং নির্বাহী কোনো কর্মকর্তা শরীয়া বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন না।

১.৭. শরীয়া বোর্ডের শরীয়া-বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ অবহেলা করতে পারবে না বা অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করতে পারবে না। (শরীয়া ম্যানুয়াল অনুসারে শরীয়া বোর্ডের যেকোনো সিদ্ধান্ত ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক—এমন কথা বলা হলেও কার্যত বোর্ডের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ করা যায়।)[২৪]

১.৮. ব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস' ও 'এক্সিকিউটিভ কমিটি'তে শরীয়া বোর্ডের অন্তত একজনকে অন্তর্ভুক্ত করা। এর ফলে শরীয়া বোর্ড ও ব্যাংকের মূল পর্ষদগুলোর মধ্যে দূরত্ব অনেকখানি কমে যাবে।

১.৯. শরীয়া বোর্ডের সদস্যদের কর্মক্ষমতা ও পরিধি বৃদ্ধি করা। তারা কেবল বোর্ডের মিটিংয়ের জন্যই ব্যাংকের সভাকক্ষে আসবেন এবং মিটিং শেষে কিছু সিদ্ধান্ত দিয়ে চলে যাবেন—তা নয়; বরং ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে শরীয়তের নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কিংবা বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবে কার্যকর করা হচ্ছে কি না—তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তারা যেকোনো সময় ব্যাংকের যেকোনো শাখায় গিয়ে তার কার্যক্রম তদারকি ও নিরীক্ষা করতে পারবেন এবং কোথাও কোনো শরীয়া লঙ্ঘন হচ্ছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করতে পারবেন।

---

২৪. সিরীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ ড. মনজের কাহফ বলেন—
"শরীয়া বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা সবসময় 'পরামর্শ দানের ক্ষমতা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শরীয়া বোর্ড অংশ নেয় না বা ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীর কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করায় কোনো ভূমিকা রাখে না। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা প্রায়ই শরীয়া উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেয়। শরীয়া উপদেষ্টাদের মতামত নেওয়ার কথা বলা হয় আসলে সময়ক্ষেপণ ও অধিকতর পর্যালোচনার জন্য, যাতে জনগণের আস্থা না হারিয়ে কাজটি করা যায়। যেকোনো অবস্থায় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে থাকে ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকদের বোর্ড এবং ব্যবস্থাপনাও থাকে তাদের সঙ্গে। তাদের সবাই বোঝেন যে, ওলামাদের সঙ্গে জোট আসলে তাদের ব্যাবসায়িক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণেই কাজ করছে।" (মনজের কাহফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী ব্যাংকিং ডিসেম্বর ২০১৪, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., পৃ. ১১)

১.১০. একটি প্রতিষ্ঠানের অস্বাভাবিক যত ফ্লাকচুয়েশন আছে, আর যত রকম প্রাতিষ্ঠানিক রিস্ক আছে, যার মাসিক রিপোর্ট আরএমডি (রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট ডিভিশন)-তে থাকে, তার এক কপি শরীয়া বোর্ডে নিয়মিত পেশ করা এবং সেগুলো পর্যালোচনায় দক্ষ ব্যক্তি শরীয়া বোর্ডে রাখা, যাতে বোর্ড ভবিষ্যতের জন্য করণীয় পথনির্দেশ দিতে পারে আর ব্যাংক দেউলিয়াত্বের আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

১.১১. ইসলামী ব্যাংক যেহেতু একটি আইডিওলজিক্যাল ব্যাংক, তাই অভীষ্ট আইডিওলজির যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকে বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে শরীয়া বোর্ডের সুপারিশের একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা রাখা। এতে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী নয় কিংবা ইসলামী জীবনাদর্শ মেনে চলে না—এরূপ কেউ ব্যাংকে অনুপ্রবেশের সুযোগ হ্রাস পাবে।

১.১২. ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় শরীয়া বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তত একজন যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলিমকে নিয়োগ দেওয়া। তার স্বাক্ষর ব্যতীত কোনো বিনিয়োগ অনুমোদিত হবে না। তিনি শরীয়া পরিপালনে সংশ্লিষ্ট শাখার লোকজনকে সাহায্য করবেন এবং ব্যাংকের ক্লায়েন্ট ও অন্যদের শরীয়া-বিষয়ক পরামর্শ ও অভিযোগ শুনবেন আর তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন।

১.১৩. রাজধানী ও বিভিন্ন জেলা শহরে শরীয়া-বিষয়ক অভিযোগ সেল থাকা। এখানে শরীয়া-বিশেষজ্ঞগণ এতৎসংক্রান্ত অভিযোগগুলো শুনানি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২. শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ড গঠন

২.১. শরীয়া বোর্ডগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ড থাকবে এবং এ কেন্দ্রীয় বোর্ড ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন বিষয়ে শরীয়াভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করবে, যা ইসলামী ব্যাংকগুলো অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে।

২.২. কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ডের সদস্যদের প্রত্যেকেই শরীয়া, অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতির অধিকারী হবেন এবং সৎ ও সাহসী হিসেবেও সুপরিচিত হবেন। ব্যাংকগুলোর শরীয়া বোর্ডের কোনো সদস্য কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন না।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে শরীয়া সেল গঠন

৩.১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু দেশের সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক, তাই এর অধীনেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটি শরীয়া সেল থাকতে হবে। এ সেল ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবে এবং ব্যাংকগুলো তার বিনিয়োগসহ সকল কাজে শরীয়া নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করছে কি না, তা তদারকি করবে।

৩.২. শরীয়া সেল কোনো ব্যাংকের কোনো ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়া নীতির ব্যত্যয় দেখতে পেলে সাথে সাথে সেল উক্ত ব্যাংককে সতর্ক করবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকটির বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরীয়া সেল প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংকের জন্য এক একজন শরীয়া পর্যবেক্ষকও নিয়োগ দিতে পারে।

৩.৩. এ সেলের সদস্যগণও শরীয়া, অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন এবং সৎ ও সাহসী হিসেবেও সুপরিচিত হবেন। ব্যাংকগুলোর শরীয়া বোর্ডের কোনো সদস্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরীয়া সেলের সদস্য হতে পারবেন না।

৪. শক্তিশালী শরীয়া সেক্রেটারিয়েট গঠন

ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়া নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকের শরীয়া গভর্নেন্সে শরীয়া বোর্ডের পর দ্বিতীয় দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো শরীয়া সেক্রেটারিয়েট, যা শরীয়া বোর্ডের একান্ত সহযোগী হিসেবে কাজ করে। মাঠপর্যায়ে শরীয়া নীতিমালার প্রয়োগ ও শরীয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূলত শরীয়া বোর্ডের চেয়ে শরীয়া সেক্রেটারিয়েটের ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে শরীয়া সেক্রেটারিয়েটকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করছি :

৪.১. শরীয়া সেক্রেটারিয়েটের প্রত্যেক সদস্য শরীয়া বিষয়ে বিশেষ করে ফিকহুল মুয়ামালাত বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রির পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রেও বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী হবেন। পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে তার কোনো স্বীকৃত ডিগ্রি (যেমন : CSAA সনদ) থাকতে হবে অথবা স্বীকৃত গবেষণাকর্ম/প্রকাশনা থাকতে হবে।

৪.২. শরীয়া সেক্রেটারিয়েটের প্রত্যেক সদস্য কর্মঠ, উদ্যোমী এবং সৃজনশীল যোগ্যতার অধিকারী হবেন। এজন্য কেবল পেশাগতভাবে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদেরকেই শরীয়া সেক্রেটারিয়েটে নিয়োগ দিতে হবে।

৪.৩. শরীয়া সেক্রেটারিয়েটের সদস্যগণ ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে শরীয়া নীতিমালা ও শরীয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একদিকে সরেজমিনে ব্যাংকের যেকোনো শাখায় গিয়ে তার কার্যক্রম তদারকি ও নিরীক্ষা করতে পারবেন এবং এর পাশাপাশি ব্যাংকের Management Information System (MIS) ব্যবহার করে অফসাইট শরীয়া নিরীক্ষা ও পরিদর্শন পরিচালনা করতে পারবেন। এর ফলে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে শাখাসমূহের বিনিয়োগে শরীয়া পরিপালনের বিষয়টি তদারকি করা এবং বছরব্যাপী শরীয়া পরিপালনের ব্যাপারে শাখাসমূহকে সচেতন রাখা, ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনে সহায়তা করা, সর্বোপরি শরীয়া পরিপালনে সর্বাধিক সহযোগিতা করা সম্ভব হবে।

৪.৪. শরীয়া সেক্রেটারিয়েট ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর শরীয়া পরিপালনের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR) তৈরি করবেন এবং পদোন্নতির সময় শরীয়া পরিপালনের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত পারফরমেন্স বিবেচনায় নিতে হবে।

৫. শরীয়া অডিট

৫.১. পেশাগতভাবে দক্ষ ও যোগ্য লোকদেরকে মুরাকিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া। এজন্য শরীয়া-বিষয়ক উচ্চ ডিগ্রির পাশাপাশি CSAA সনদ আছে— এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে মুরাকিবের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

৫.২. শরীয়া নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের সময় মুরাকিবদের যথার্থ সহযোগিতা করা এবং কোনো তথ্য গোপনের চেষ্টা না করা। যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাদের কাজে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৩. প্রতি মাসে শরীয়া অডিটের ভুলগুলোর মধ্যে কিছু বাড়ে আর কিছু কমে, আর প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী মাসের সতর্কতার জন্য মাসিকভাবে গুরুত্বের সর্টিন চেঞ্জ করে সকল ব্রাঞ্চ, সাবব্রাঞ্চ আর এজেন্ট ব্যাংককে ভার্চুয়াল

মিটিংয়ের মাধ্যমে সতর্ক করা আর ফিজিক্যাল মনিটরিংয়ের মাধ্যমে কাজগুলো করল কি না, তা নিয়মিত তদারকি আর ফাইনটিউন করা।

৫.৪. ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ শরীয়া অডিটের পাশাপাশি বছরে অন্তত একবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরীয়া সেল/কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ডের অধীনে স্বাধীন বহিঃশরীয়া অডিট (External Shariah Audit)-এর ব্যবস্থা করা। পেশাদার হিসেবে বিশেষজ্ঞ ও শরীয়া-বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্বাধীন অডিট কমিটি গঠন করা। এ কমিটি ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন, চুক্তি ও সামগ্রিক কার্যক্রমে শরীয়া বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা মানা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করবে এবং মূল্যায়ন করবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ওমান, পাকিস্তান, কুয়েত, বাহরাইন প্রভৃতি দেশগুলোর ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অভ্যন্তরীণ শরীয়া অডিটের পাশাপাশি বহিঃশরীয়া অডিট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বোর্ডের সদস্যগণের মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া

ইসলামী ব্যাংক মুয়ামালাত তথা লেনদেননির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে ফিকহের প্রসিদ্ধ সূত্র إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة ‘লেনদেন ও চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে অনুমতি ও বৈধতা’[২৫] অনুসারে যেকোনো লেনদেনের অবৈধতা সম্পর্কে যতক্ষণ না কোনো গ্রহণযোগ্য দলিল পাওয়া যায়, তা বৈধ ও অনুমোদিত বলেই ধরে নেওয়া হয়। দলিল পাওয়া ব্যতীত কোনো লেনদেনকে অবৈধ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় না।

শরীয়া বোর্ডের সদস্যগণ ব্যাংকের শারয়ী বিষয়গুলোতে প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য সহায়ক নির্ভরযোগ্য দলিলের আলোকে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও বৃহত্তর কল্যাণকে বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। এজন্য প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষ কোনো মাযহাবকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়ার নীতি অবলম্বন করা সমীচীন হবে না। তবে নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দেশের প্রচলনের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরি, যাতে বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত

---

২৫. তুওয়াইজিরী ও অন্যান্য, *মাওসূআতুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৮৩
http://www.al-eman.com/الكتب/موسوعة%20الفقه%20الإسلامي/i582&n83&p1

নিয়ে জনমনে অহেতুক বিভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে না পড়ে। অবশ্যই প্রয়োজনে বিশেষ কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে মাযহাবগুলোর মতামত ও যুক্তিগুলো একত্র করে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে যে মাযহাবের সিদ্ধান্তকে বা যে মতামতকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও জনহিতকর মনে হবে, সেটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

উল্লেখ্য, তুর্কী খিলাফতকালে ১২৮৬ হিজরীতে (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) হানাফী ফকীহগণ সরকারি নির্দেশে সিভিল ল'য়ের ওপর مجلة الأحكام العدلية (বিচারবিষয়ক বিধিবদ্ধ গ্রন্থ) নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো—এ সংকলনটি যদিও সাধারণভাবে ফিকহে হানাফী অনুসারে প্রস্তুত করা হয়; তবে অনেক ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের বাইরের মতও গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে চার মাযহাবের বাইরে থেকেও কোনো কোনো মত গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—শর্তাধীন বেচাকেনার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমাহ (মৃ. ১৪৪ হি.) রাহি.-এর মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।[২৬]

আধুনিক সমস্যাবলি পর্যালোচনা ও সমাধান বিবেচনার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গবেষকদের মতামত এবং আন্তর্জাতিক ফিকহ বোর্ডসমূহের ফাতওয়াসমূহ ও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলো জানারও চেষ্টা করতে হবে।

উল্লেখ্য, যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত বোর্ডের সকল সদস্যের সম্মতিতে গ্রহণ করাই কাম্য। তবে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে সদস্যদের মতদ্বৈততা দেখা দিলে এবং কোনো সদস্য তার মতের ওপর অনড় থাকলে, সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং ভিন্নমতটিও সিদ্ধান্তে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। কোনো সদস্য সিদ্ধান্তগ্রহণকালে অনুপস্থিত থাকলে পরে তিনি যখন উপস্থিত থাকেন, তখন তিনি বিষয়টিতে নতুনভাবে আলোচনার দাবি করলে সে ক্ষেত্রে তাকে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে এবং তিনি ভিন্নমত পোষণের অধিকারও সংরক্ষণ করবেন।

---

২৬. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিকহ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ২০২৪, পৃ. ৯০

অধ্যায় : ৩

ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া লঙ্ঘন : কারণ ও প্রতিকার

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়তের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এরই মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাবতীয় কার্যক্রমে শরীয়া নীতিমালা প্রয়োগের যথার্থ পন্থা উদ্ভাবন ও কার্যকর করার চেষ্টা চালু হয়েছে। তবে এটা সত্য যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সকল পর্যায়ে ও সকল কার্যক্রমে ইসলামী নির্দেশনা ও বিধিবিধানের পুরোপুরি প্রয়োগ এখনও সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে মানি মার্কেট, পুঁজিবাজার, বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান পুরো প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকগুলো যথাসাধ্য এসব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিনিয়োগে স্বচ্ছতা রক্ষা, ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করা, মালামাল গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকগুলো সতর্কতা অবলম্বন করছে। এজন্য শরীয়া নিরীক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। শরীয়া পরিপালন ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যাংকে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থাও আছে। তারপরও কার্যক্ষেত্রে কমবেশি শরীয়া লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে এবং সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মানে শরীয়া পরিপালন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা কারণ, বিভিন্ন বাধা ও প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। আমাদের কর্তব্য হলো— এসব বাধাবিপত্তি ধামাচাপা না দিয়ে কিংবা অস্বীকার না করে বরং সেগুলো দূরীভূত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শরীয়া লঙ্ঘনের কারণ

শরীয়া লঙ্ঘনের নানাবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে এমন কিছু কারণও রয়েছে,

কর্মচারীগণকে কোনোভাবেই দায়ী করা যায় না; এসবের জন্য সার্বিকভাবে বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাই একান্ত দায়ী। ব্যাংকগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অথবা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে তাদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে একান্ত বাধ্য হয়েই এমন কিছু নিয়মনীতি মান্য করে চলতে হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সেসব কারণ ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমরা কেবল সেসব কারণ তুলে ধরার প্রয়াস পাব, যেগুলোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অথবা দেশের সামগ্রিক পরিবেশকে দায়ী করা যায় এবং সরকার, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদ আন্তরিক হলে সেই কারণগুলোকে সহজেই নিরসন করা যায় অথবা এগুলোর প্রভাব অনেকখানি হ্রাস করা যায়।

এটা সকলেই স্বীকার করে যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়া পরিপালন করতে গিয়ে নানা ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ ও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তবে এসব পরিস্থিতি ও বাধা মোকাবিলা করার জন্য ব্যাংকগুলোও যে মোটের ওপর কিছু চেষ্টা করছে না, তা নয়; কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা নানা কারণে কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ছে, কোথাও আশানুরূপ সাফল্য বয়ে আনতে পারছে না। নিম্নে এ জাতীয় কিছু কারণ ব্যাখ্যা করা হলো :

ক. মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব

শরীয়া লঙ্ঘনের প্রধানতম কারণ হলো—ব্যাংকের মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব। ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া পরিপালন তথা ব্যাংকের আর্থিক কারবারগুলোর ইসলামাইজেশন নিশ্চিত করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন মালিকপক্ষ তথা বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের প্রশ্নাতীত সদিচ্ছা এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুর অদম্য আগ্রহ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতা। শরীয়া বিষয়ে যদি তারা আপসহীনভাবে ঐকান্তিক ও আন্তরিক না হন, শরীয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তাবলির প্রতি যথাযথ সম্মান না দেখান; যদি ব্যাংক ইসলামী হওয়া সত্ত্বেও তারা সুদের সাথে একই গতিতে, একই পথে ও একই পন্থায় (শুধু নাম ভিন্ন করে) দৌড়াতে থাকেন, তবে ইসলামাইজেশন কখনও সফল হবে না।[২৭]

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, বিগত কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তনের পর কয়েক বছরের মধ্যেই

---

২৭. https://www...

ব্যাংকগুলো পাহাড়সম অনিয়মে পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাংকগুলোর বিপুল অঙ্কের আমানত মালিকপক্ষ নিজস্ব ব্যাবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা শুরু করেছে। ফলে একেবারে মৌলিক সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করতেও ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন সময় হিমশিম অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলোর মালিকপক্ষ যদি শরীয়া বিষয়ে পূর্ণ আন্তরিক না হন এবং ব্যাংকের ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রসমূহ যথাযথভাবে রক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হন, তাহলে ব্যাংকগুলোতে নানা অনিয়ম ও ব্যত্যয় যে ঘটবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলামী ব্যাংকের মালিক, পরিচালক, বোর্ড মেম্বারদের প্রত্যেকেই দ্বীন ও শরীয়াকে সর্বাধিক প্রায়োরিটি দেবেন, তাদের কর্ম ও আচরণে ইসলামের বাস্তব অনুশীলন ও প্রতিফলন থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। যিনি ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনকে সহীহ মনে করবেন, তিনি তার ব্যবসায় সততার নীতিকেও প্রাধান্য দেওয়াকে সহীহ মনে করবেন। কিন্তু দেশে বাস্তবতা হলো—ইসলামী ব্যাংকের মালিক সুদি ব্যাংকেরও মালিক, ইসলামী ব্যাকের ইসি চেয়ারম্যান সুদি ব্যাংকেরও চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক সুদি ব্যাংকেরও বড়ো হিস্যার গ্রাহক, ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি সুদি ব্যাংকেও সমান্তরাল ব্যাবসা! বস্তুত এদের কাছে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং পুঁজি বৃদ্ধি করাই বড়ো উদ্দেশ্য। এরা দ্বীন ও শরীয়াকে দুনিয়া অর্জনের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এ প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির সাবেক এএমডি মুহাম্মাদ শামসুজ্জামানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

> শরীয়া পরিপালনে মূল সমস্যা ইসলামী ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ জনশক্তির সদিচ্ছার অভাব নয়। আমি এ কথা আবারও বলছি, মূল সমস্যা মালিকগণই আন্তরিকভাবে তা চান না। আগেও বলেছি, কেন ইসলামী ব্যাংক করার এত খায়েস? এটা কি ইসলামকে ভালোবেসে? আপনাদের কী মনে হয়? বরং আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, মালিকপক্ষের লোভ ও লুণ্ঠন চিন্তা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আজ গ্রাস করেছে। হ্যাঁ, একটা সময় ছিল, তারা সৎ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২৮]

---

২৮. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত কল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে, ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টে শরীয়া পরিপালন কতটুকু হয়?*, সপ্তম পর্ব : তৃতীয় অংশ,
https://www.facebook.com/share/p/j2d7D2JXwN2odr3L/?mibextid=oFDknk

খ. সুনির্দিষ্ট আইনের অভাব

বাংলাদেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করে বেশ কয়েকটি আইন : ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৯৩ এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪। তবে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাড়লেও দেশে এখন পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি; কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা (Regulatory Body) কর্তৃক শরীয়া গভর্নেন্স কাঠামো জারি করা হয়নি; এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা পর্যায়ে কোনো শরীয়া কমিটি গঠন করা হয়নি। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেখানে অন্যান্য অনেক দেশ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে, এমনকি অতীতে নেওয়া উদ্যোগে পরিবর্তন এনে উন্নততর করেছে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই নিষ্ক্রিয়। এ বিষয়ে ব্যাংকসমূহের সংগঠন Islamic Banks Consultative Forum (IBCF) এবং Central Shariah Board for Islamic Banks in Bangladesh (CSBB) কেউ কোনো জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলেও দৃশ্যমান হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি পরিচালনার জন্য ১৯৯১ সালে ব্যাংক-কোম্পানি আইন পাশ করা হয়। এই আইনের মধ্যে শরীয়া রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধারায়। কিন্তু দেশে 'ইসলামী ব্যাংকিং আইন' নামে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। দেশের পুঁজিবাজারে ইসলামী ব্যাংক কীভাবে অংশ নেবে—সেই বিষয়ে এবং ইসলামী সুকূক বন্ড সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সার্কুলারে বলা আছে। এসব বাজার প্রতিনিয়ত প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে এবং এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনি জটিলতা দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন থাকা দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালে একটি গাইডলাইন তৈরি করেছে এবং সেখান থেকে রেফারেন্স নিয়েই ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা করা হয়। দেশের ইসলামী ব্যাংকিং দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইন রয়েছে তা অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম দেখভাল ও তদারকি করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো এ গাইডলাইনের কত ভাগ মেনে চলছে, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।

ব্যাংকসংশ্লিষ্টগণ মনে করেন, দেশের বিশাল পরিসরের ইসলামিক ব্যাংকিং সুচারুরূপে দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং

গাইডলাইনই যথেষ্ট নয়; এর জন্য সুনির্দিষ্ট আইন থাকা প্রয়োজন। কেননা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ইসলামী ব্যাংকিং আইনের বিকল্প হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়। ইসলামী ব্যাংকিং আইন হলে প্রকৃতপক্ষে শরীয়া পরিপালন করে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না অথবা প্রশ্ন উত্থাপন অনেকটা হ্রাস পাবে।

উল্লেখ্য, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলোর নীতিনির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের 'ব্যাংকিং রেগুলেশন এ্যান্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট' রয়েছে। কিন্তু তারা ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়া-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর কোনো দিকনির্দেশনা দেয় না এবং এর জন্য যে শরীয়া-বিশেষজ্ঞ দরকার, তাও তাদের নেই। অনেকের অভিমত, ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য যে গাইডলাইন রয়েছে, সেটা সংসদে পাশ হওয়া কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নয়। তাদের মতে, ইসলামী ব্যাংকগুলো মূলত কিছুটা শরীয়াভিত্তিক এবং কিছুটা গাইডলাইন থেকে নিয়মনীতি নিয়ে মিশ্রভাবে ব্যাংক পরিচালনা করছে। এজন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটা কার্যকর ও সুনির্দিষ্ট আইন দরকার, যাতে করে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হলে সেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।[২৯]

গ. প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ

বলার অপেক্ষা রাখে না, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানকেই রাষ্ট্রীয় আইনের পাশাপাশি তার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ও কাঠামোর আলোকে চলতে দেওয়া দরকার, না হয় সেসব প্রতিষ্ঠান তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে নিয়মবহির্ভূত সুবিধা দিতে গিয়ে নানা অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়, যেটি যেকোনো শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই রাতারাতি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে যথেষ্ট। কাজেই ইসলামী ব্যাংকগুলোকে যতটা বাইরের প্রভাবমুক্ত রাখা যাবে, ততই ওদের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলা সম্ভব হবে।

আমরা বিভিন্ন সময় নানা সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানতে পাই যে, দেশের সিংহভাগ ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি/কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের

---

২৯. জিল্লুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বতন্ত্র আইন কতটা প্রাসঙ্গিক*, https:

মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হচ্ছে। যদি এ তথ্যগুলো সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুলো স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যাংক পরিচালনা করলেও অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সম্ভাব্য যেকোনো ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি পরিচালনাগত কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারের কারণে সেখানে নানাভাবে শরীয়া লঙ্ঘন ও বিভিন্ন অনিয়ম তৈরির সমূহ সম্ভাবনাও থেকে যায়।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকগুলো নিয়ে এ পর্যন্ত যত অ্যাকাডেমিক গবেষণা হয়েছে, তার বেশির ভাগই উদ্‌বৃত্ত তারল্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাম্প্রতিককালে তারল্য সংকট মোকাবিলা করছে। একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তারল্য সংকট দেখা দেওয়ার পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ হলো—রাজনৈতিক প্রভাব, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা না থাকা, এককভাবে কাউকে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য স্বাতন্ত্রিক ইসলামিক ব্যাংকিং আইনের অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সরকারের বিভিন্ন নিয়ম মেনেই পরিচালিত হচ্ছিল, তারা গাইডলাইনগুলো অনুসরণ করে চলত। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে যতটুকু জানা যায়, ব্যক্তিবিশেষের মালিকানায় যাওয়ার পর থেকেই ইসলামী ব্যাংকগুলোয় অবিশ্বাস্য রকম পরিবর্তন আসতে শুরু করে, যেখানে শরীয়া আইন লঙ্ঘন তো বটেই; আর্থিক ও ব্যাংকিং নিয়মের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থাকার বিষয়টিও বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। সরকার হয়তো ব্যাংকের মালিকানায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। কিন্তু নতুন মালিকানায় আসা কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের সম্পদের ওপর যেভাবে একক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ করেছে, তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাংকের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ও ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। অবশ্যই এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকও পরিপূর্ণভাবে দায়ভার এড়াতে পারে না। তদারকির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বলতা দৃশ্যমান। বড়ো বড়ো আকারের ঋণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জ্ঞাতসারেই দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারত, যার বৈধতা আইন ও চার্টারে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহলে অবস্থা আরও স্থিতিশীল ও আস্থাশীল থাকত।

ব্যাংকের পরিচালনা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাদের কাজে কতটা হস্তক্ষেপ করেন, তা আল আরাফাহ ইসলামী

ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এ. জেড. এম. শামসুল আলমের বক্তব্য থেকে অনেকটা আঁচ করা যায়। তিনি *ইসলামী ব্যাংকিং* বইয়ের ভূমিকাতে লিখেন—

> বেসরকারি ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় তার স্বাধীনতা কতটুকু? তিনি জবাব দিলেন, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় শত শত দায়িত্ব পালনীয় এবং কর্তব্য তার করণীয় আছে। কেবল দুটি বিষয় ছাড়া সর্ববিষয়ে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আছে। বিষয় দুটি অতি ক্ষুদ্র। তিনি একজন সুরসিক ব্যক্তিত্ব। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের স্বাধীনতা সীমিত—এই ক্ষুদ্র বিষয় দুটি কী জানতে চাইলাম। তিনি সহাস্যবদনে জবাব দিলেন, প্রথমটি হলো—কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ আর দ্বিতীয়টি বিনিয়োগকরণ বা ঋণ প্রদান। তার এ বক্তব্যটি অন্য একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে জানালাম। তিনিও হাসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তাহলে ব্যবস্থাপনার আর কতটুকু বাকি থাকে।[৩০]

ঘ. দুর্বল কর্পোরেট গভর্নেন্স ও অদক্ষ শরীয়া গভর্নেন্স

ভালো কর্পোরেট গভর্নেন্স সব সংস্থার জন্য, বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলে ব্যাংকের মূলধনের কম খরচ, ইক্যুইটিতে বেশি রিটার্ন এবং সম-স্টেকহোল্ডারের জন্য উন্নত স্তরের আস্থা তৈরি করে। ইসলামী আর্থিক পরিষেবাগুলোর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—শরীয়া-সম্মতি ও পরিপালন, যার অর্থ হলো—একটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (IFI)-কে নিশ্চিত করতে হবে যে, তার আর্থিক প্রোডাক্টগুলো তার ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে।

উল্লেখ্য, যদিও ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া অনুশীলনগুলো আলাদা, তারপরও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য নৈতিকতার জায়গাটি সর্বাগ্রে। রিবা (সুদ), গারার (অনিশ্চয়তা), মাইসির (জুয়া) ও অবৈধ লেনদেনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও ইসলামী আর্থিক প্রোডাক্টগুলো ঝুঁকি ভাগাভাগির নীতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

উপর্যুক্ত নীতিগুলো থেকে উদ্ভূত ধারণাগত ভিত্তি এবং ব্যাংকিং অনুশীলনগুলো অ্যাকাউন্টিং ও ডকুমেন্টেশন মানগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকদের কাছে চ্যালেঞ্জ

---

৩০. শামসুল আলম, এ. জেড. এম., *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ৪

তৈরি করে। তদুপরি ২০০১ সালে তুরস্কের ইখলাস ফাইন্যান্স হাউস (IFH)-এর পতন এবং ২০১৮ সালে তাবুং হাজি কেলেঙ্কারির বেশ কয়েকটি ঘটনার পরে বিচক্ষণ তদারকির জাল শক্ত করার চাপ উঠে আসে। মনে করা হয় যে, এই আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলোকে সহায়তা করেছিল দুর্বল কর্পোরেট গভর্নেন্স, যেখানে বোর্ডগুলো সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয় বা নিজেরাই বেপরোয়া ঝুঁকি নেওয়ার আচরণে জড়িত থাকে। আইএফআইয়ের দুর্বল কর্পোরেট গভর্নেন্স কেলেঙ্কারির সাথে আরও কিছুও বিষয় বিবেচ্য, যেমন—অব্যবস্থাপনা, অডিট ব্যর্থতা, সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বল নীতি এবং স্টেকহোল্ডারগণের অসন্তুষ্টি।

উপরন্তু, শরীয়া-সম্মতি হলো ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির মূলভিত্তি এবং এ কারণে শরীয়া গভর্নেন্সও কর্পোরেট গভর্নেন্সের চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) শরীয়া শাসনব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার একটি সেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যার মাধ্যমে IFIS নিশ্চিত করে যে, প্রাসঙ্গিক শরীয়া ঘোষণা ও তথ্যের প্রচার এবং একটি অভ্যন্তরীণ শরীয়া নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা টীম শরীয়া-সম্মতির কার্যকর স্বাধীন তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে পারে। 'কমপ্লায়েন্স রিভিউ' নামে এ সংজ্ঞাটি শরীয়া শাসনের জন্য তিনটি প্রধান বিষয় তুলে ধরে—স্বাধীনতা (Independent), জবাবদিহিতা (Accountability) ও স্বচ্ছতা (Transparency)।

প্রথম সমস্যাটিই হলো, স্বাধীন তদারকির উদ্‌বেগ। প্রতিটি IFI-এর অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় উপদেষ্টা থাকে, যারা IFI-এর অভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামোর অংশ হিসেবে IFI-কে পরামর্শ এবং তদারকি পরিষেবা প্রদান করে। নীতিগতভাবে শরীয়া বোর্ড একটি স্বাধীন সংস্থা, যা IFI-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান করে। যাহোক, শরীয়া বোর্ড এবং IFI-এর বোর্ড ও ম্যানেজমেন্টের মধ্যে স্বার্থের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে এই উদ্‌বেগটি তৈরি হয়।

দ্বিতীয় সমস্যাটি জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কিত, যা প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়। পরিচালনা পর্ষদ শরীয়া বোর্ড গৃহীত সকল সিদ্ধান্তের জন্য দায়বদ্ধ এবং এইভাবে বোর্ডকে নিশ্চিত করা উচিত যে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত এবং দীর্ঘমেয়াদে শেয়ারহোল্ডারদের সর্বোত্তম স্বার্থ পরিবেশন করার জন্য উপযুক্ত।

শেষ ইস্যুটি ইসলামিক ফাইন্যান্স অপারেশন-সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত। উন্নত স্বচ্ছতা এবং স্টেকহোল্ডারদের আস্থা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে জনসাধারণের উদ্‌বেগ দূর করার উপায় এটি। আদর্শিকভাবে একটি স্বচ্ছ আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া, তার শরীয়া বোর্ডের গঠন, সেইসঙ্গে শরীয়া বোর্ডের কমিটির দ্বারা জারি করা ফাতওয়া পাবলিকলি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবে। প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশের জন্য IFI-এর উন্মুক্ততা স্টেকহোল্ডার এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা জোরদার করবে এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবে। উল্লেখ্য, একটি ব্যাপক শরীয়া শাসনব্যবস্থা নিম্নলিখিত চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে :

ক. শরীয়া উপদেষ্টা বোর্ড;

খ. ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান;

গ. শরীয়া তদারকি ও পর্যালোচনা ও

ঘ. স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রকাশ।[৩১]

বর্তমান দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে যে শরীয়া গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, সেখানে রয়েছে শরীয়া বোর্ড এবং এর সহযোগিতার জন্য রয়েছে শরীয়া সেক্রেটারিয়েট। কিন্তু সব মিলে তাদের কার্যক্রম মোটের ওপর সন্তোষজনক নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য ব্যাংকের বাস্তব ব্যাবসায়িক কার্যক্রম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। শরীয়া বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য যে শরীয়া সেক্রেটারিয়েট বিভাগ রয়েছে, তার কর্মকর্তাদের মধ্যেও শরীয়া তদারকি ও পর্যালোচনা করার মতো যোগ্যতার নেহায়েত অভাব রয়েছে। তা ছাড়া তাদের কার্যক্রমের মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব এবং যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রকাশের দুর্বলতা প্রকট।

৬. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অদক্ষতা

শরীয়া লঙ্ঘনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অদক্ষতা। আমরা লক্ষ করি যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কর্মরত

৩১.শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে-৫ম পর্ব*,
https://www.facebook.com/share/p/tvCD5WRtcGTjgH5k/?mibextid=oFDknk

অনেক জনশক্তি শরীয়তের ব্যাপারে আন্তরিক; কিন্তু জীবনের একটি বড়ো অধ্যায় পুঁজিবাদী পদ্ধতির ওপর পড়াশোনা করে আসা অথবা সেই লাইনে কাজ করে আসা অনেকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্যাবলি ও বিশেষায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা বা দৈন্য পরিলক্ষিত হয়।

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, দেশে কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকে গত কয়েক বছরে বহু অদক্ষ ও অপেশাদার লোককে দেদারছে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, অন্যায়ভাবে অনেককে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। এমনকি এমন কথাও সংবাদমাধ্যমে এসেছে, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত জ্ঞান তো দূরের কথা; সাধারণ ব্যাংকিং বিষয়েও যার প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব—এরূপ লোককেও ব্যাংকের ডিএমডি পদে আসীন করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অদক্ষ, অপেশাদার ও অনভিজ্ঞ লোকদের দিয়ে ব্যাংক চালালে অনিয়ম হওয়াটাই তো স্বাভাবিক এবং এভাবে চলতে থাকলে ব্যাংকের কী হাল হবে, তা তো বোঝা-ই যায়।

চ. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসাধুতা

ইসলামী ব্যাংকের কোনো কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসাধুতাও শরীয়া লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ। যদি তাদের মধ্যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় ঘাটতি থাকে, তবে সুদি ব্যাংকে সিসি লোন যেভাবে নগদ উঠিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা সম্ভব, ঠিক একইভাবে ইসলামী ব্যাংকেও গ্রাহকরা নগদ টাকা গ্রহণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, একটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ও জালিয়াতির বহু সুগম রাস্তা রয়েছে। আবার এগুলো রোধেরও নানা নিয়ম ও অনুশীলন রয়েছে। প্রফেশানাল অভিজ্ঞতাও জাল-জালিয়াতি রোধের অনেক বড়ো মাধ্যম; তবে এগুলো কোনোটাই আশানুরূপ কাজ করবে না, যদি ব্যক্তি সৎ ও আল্লাহভীরু না হয়।

আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কর্মরত কোনো কোনো কর্মকর্তাদের মধ্যে ইসলামী শরীয়তের প্রতি কমিটমেন্টের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাদের কেউ কেউ ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধিবিধানের প্রতিও পূর্ণ

নানা কাজে শরীয়তের নীতিমালা ও আদর্শ যে পরিপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে রক্ষিত ও পরিপালিত হয় না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উদাহরণস্বরূপ, দেশে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি পরিদর্শনে উঠে এসেছে, একটি প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যাংকের ভুয়া ডিল সৃষ্টি করে শরীয়া বহির্ভূত সুদভিত্তিক লেনদেনের চিত্র। পরিদর্শন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মাত্র একটি শাখায় দুটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শরীয়া-বহির্ভূত ৯টি ভুয়া ডিল সৃষ্টি করেছে ব্যাংকের কর্মকর্তারা। বিস্ময়করভাবে গ্রাহকের অগোচরেই এসব ডিল সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রাহকদের ফাঁসানো হয়েছে, অপরদিকে শরীয়া লঙ্ঘন করেছে ব্যাংকটি।[৩২] এভাবে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকেও কমবেশি অসাধু কর্মকর্তারা যোগসাজশে নানা প্রতারণামূলক লেনদেন করে যাচ্ছে। মোটকথা, ব্যাংক পরিচালনার সাথে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা ও আন্তরিকতা যুক্ত না হলে এ ব্যবস্থার যথাযথ সাফল্য সম্ভব নয়।

ব্যাংকের বড়ো বড়ো কর্মকর্তাদের পর্যায়ে অসাধুতার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ হলো—কোনো বিনিয়োগ গ্রাহককে এককভাবে ব্যাংক কত টাকা পর্যন্ত লোন বা বিনিয়োগ দিতে পারবে তার সীমারেখা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত। সর্বশেষ ১ এপ্রিল ২০২৪ হতে সার্কুলারে বলা হয়েছে, যেকোনো সময়ে একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রুপকে দেওয়া ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণ-সুবিধা আসল অঙ্কের মোট পরিমাণ কোনোভাবেই সেই ব্যাংকের মূলধনের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না। আর একক কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে দেওয়া ফান্ডেড ঋণ-সুবিধা আসল অঙ্কের মোট পরিমাণ আগের মতোই ব্যাংকের মোট মূলধনের ১৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রয়েছে। পূর্বে এই সুবিধা সর্বোচ্চ ৩৫% পর্যন্ত সীমিত ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ব্যাংকগুলো গ্রাহককেই পরামর্শ দেয়, যেন সে ভিন্ন আরও সিস্টার কনসার্ন তৈরি করে, যাতে তার ঋণ-সুবিধা এই বিধানের আওতায় না পড়ে। এর ফলে যে গ্রাহক সর্বোচ্চ ৭০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ-সুবিধা পাওয়ার কথা, তাকেই ভিন্ন নামে ৭০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ দেয়। এর বাইরে নামে-বেনামে ট্রেড লাইসেন্স নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিনিয়োগ তো আছেই। এসব প্রাকটিস শরীয়া ব্যাংকগুলোতে ব্যাপকভাবে আছে। এসব কর্মকর্তাকে আপনি যতই দক্ষ ও প্রফেশানাল বলুন, আসলে এরা ধান্দাবাজ ও অসৎ শ্রেণির। এদের কারণেই ব্যাংকগুলো এখন সিরিয়াসলি ভুগছে।

---

৩২. https://www.amarsangbad.com/today-newspaper/news/274245

ছ. সুদনির্ভর পরিবেশ

আমাদের অর্থনীতি—বৈশ্বিক কি রাষ্ট্রীয়—প্রায় পুরোটাই বলতে গেলে সুদনির্ভর। ব্যাবসা-বাণিজ্যে যারা রত আছেন, তারাও নানাভাবে কমবেশি সুদের সাথে জড়িত এবং দেশের বেশির ভাগ ব্যাংকও সুদি কারবারে নিয়োজিত। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে শরীয়া নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে লেনদেন করা কঠিন। যেমন—বৈদেশিক বাণিজ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই সুদি কারবারের সাথে কমবেশি জড়িত হতে হয়।

জ. গ্রাহকদের অসাধুতা

ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের অসাধুতাও শরীয়া লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ। আমরা লক্ষ করি, অনেক অসাধু গ্রাহক মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রতারিত করে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং নগদ টাকা লাভের জন্য অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে শরীয়া লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটে থাকে।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় শরীয়া পরিপালনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রয়োজন, তেমনি গ্রাহকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের পাশাপাশি গ্রাহকগণও আন্তরিক না হলে শরীয়া পরিপালন পুরোপুরি সম্ভব নয়। এজন্য বর্তমান যুগের ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ব্যাংকিং খাতে Customer Engagement (CE))-কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন।

ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় গ্রাহকগণ অভিন্ন ঝুঁকি বহন করে। তাই পরস্পরের স্বার্থ রক্ষায় গ্রাহকদেরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একইভাবে ব্যাংক ও গ্রাহকদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরকালীন জবাবদিহিতার জায়গাটিও অভিন্ন। সুতরাং গ্রাহকগণও লেনদেন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সচেতন হবেন। এ ছাড়া গ্রাহক ব্যাংকের অন্যতম বিনিয়োগ খাত। গ্রাহকগণ যদি শরীয়া পরিপালনে আন্তরিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন না করেন, তবে তার প্রভাব সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ওপর পড়বে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিশেষ করে বিত্তশালীদের আর্থিক নৈতিকতা অত্যন্ত দুর্বল। সুযোগ পেলেই অন্যের হক

গ্রাসে আমরা তৎপর। আমাদের অনেকের আর্থিক সততা হলো—সুযোগের অভাবমাত্র। এখানে কাউকে, এমনকি নির্ভরযোগ্য ও প্রিয় বন্ধুকেও টাকা ঋণ দিয়ে বিশ্বাস করা কঠিন। ব্যাংকের টাকা যারা আত্মসাৎ করে, তাদেরকে তাদের আপনজনেরাও ঘৃণা করে না। তার সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপনে কেবল ঋণখেলাপির কারণে কেউ পরাঙ্মুখ হয় না। কাজেই যে দেশে ঋণ পরিশোধ না করাই দেশের বিত্তশালীদের সংস্কৃতি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, সেই দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো তো দূরের কথা, প্রচলিত ব্যাংকগুলোও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় ইপ্সিত ভূমিকা পালন করতে পারে না।

ঝ. গ্রাহকদের জ্ঞানের অভাব

বহু গ্রাহকই স্পষ্ট জানে না, ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় কী? কোনো ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক হওয়ার জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়? সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কী? ইসলামী পদ্ধতিতে কীভাবে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে হয় .. প্রভৃতি। গ্রাহকদের কাছে যদি এসব বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে গ্রাহকের বিনিয়োগ ও লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে ঝুঁকিমুক্ত হবে না, সংশয় থেকে যাবে; অনেক সময় তাদের সুদ বর্জনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পদ্ধতিগত জ্ঞানের অভাবে তা কার্যকর করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আলিমগণের মতে, ব্যাবসা-বাণিজ্য করে—এমন প্রত্যেক মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসায়-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন, যাতে সে কখনও নিজের অজ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ কোনো কারবারে বা সুদে জড়িয়ে না পড়ে। আমীরুল মুমিনীন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَا يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِيْ الدِّيْنِ .

> আমাদের বাজারে দ্বীন সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন লোক ব্যতীত কেউ যেন ব্যাবসা না করে।[৩৩]

উমর ফারুক রা. তাঁর খিলাফতকালে প্রায়ই বাজার তদারকি করতেন। এ সময় যদি তিনি দেখতে পেতেন, কোনো ব্যবসায়ী কীভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে হয়,

৩৩. তিরমিযী, *আস সুনান*, হা. নং : ৪৮৭; হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে 'হাসান'।

তা ভালোভাবে জানে না, তবে তাকে বেত্রাঘাত করতেন এবং বলতেন—'বেচাকেনা কীভাবে করতে হয়, তা আগে শিখো। কারণ, যে ব্যক্তির এ বিষয়ক জ্ঞান থাকবে না, সে সুদে পতিত হবে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়।[৩৪]

সাইয়িদুনা আলী রা. থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَنِ اتَّجَرَ قبلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِيْ الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ ، ثُمَّ ارْتَطَمَ .

> যে ব্যক্তি (ব্যবসায়-সংক্রান্ত) গভীর জ্ঞান লাভ করার আগেই ব্যাবসা করবে, সে সুদে লিপ্ত হবে, নিষিদ্ধ কারবারে জড়িয়ে পড়বে, অনন্তর সংশয়ে পতিত হবে।[৩৫]

সুতরাং বলা চলে, ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া লঙ্ঘনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ব্যাবসাবাণিজ্য-বিষয়ক ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে গ্রাহকদের জ্ঞানের স্বল্পতা বা অভাব।

ঞ. যেনতেনভাবে মুনাফা অর্জনের প্রবণতা

আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুনাফা অর্জন ব্যাংকের একটি প্রধান টার্গেট। কিন্তু হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে যেনতেনভাবে মুনাফা অর্জনের প্রবণতা অনেকের মধ্যে কাজ করে বলে শরীয়া লঙ্ঘিত হয়। উল্লেখ্য, এ প্রবণতা যেমন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মধ্যে কমবেশি দেখা যায়, তেমনি বিনিয়োগ গ্রহীতাদের মধ্যেও দেখা যায়।

ইসলামী শরীয়তে ব্যাবসার ক্ষেত্রে যেমন উৎসাহ ও সুসংবাদ দান করা হয়েছে, তেমনি অবৈধ পণ্যের ব্যবসায় বিনিয়োগ করা, ব্যবসায় খিয়ানত, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া এবং পণ্য গুদামজাত করার ব্যাপারেও কঠোর শাস্তি ও সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো—ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও বিনিয়োগ গ্রহীতাদের অনেকেই কখনও কখনও অধিক মুনাফা লাভের আশায় এ জাতীয় অসাধু কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন।

---

৩৪. গাযালী, *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ২, পৃ. ৬৪

৩৫. শারবীনী, মুহাম্মদ আল খতীব, ...

শরীয়া লঙ্ঘন দূর করার উপায়

ক. ইসলামী ব্যাংক আইন প্রণয়ন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য বিভিন্ন নীতিমালা আছে—এটা সত্য; কিন্তু যেটা দরকার সেটা হলো আইন। কারণ, প্রত্যেকটা আইনের একটা নিজস্ব স্বকীয়তা আছে, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে এবং এটি আইন-আদালতসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সব জায়গায় গ্রহণযোগ্য। আইন সব নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এর বিধানগুলো অমান্য বা মানতে অস্বীকার করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু গাইডলাইনের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক নয়। প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়া বোর্ড আছে বটে; কিন্তু তাদের অভিন্ন কার্যপরিধি নির্ধারণের জন্যও আইনি কাঠামো দরকার। তা ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন সেবার নামে ডিস্টরশন বা বিকৃতি ঘটছে বলে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে।

ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোনো ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ডিস্টরশন বা বিকৃতি ঘটায় তার শাস্তি কী, তা আইনি কাঠামো দ্বারা সংজ্ঞায়িত হওয়া দরকার। তা ছাড়া যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন কোন আইনের অধীনে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? যদি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের নির্দেশনা না থাকে, তাহলে সেখানে একটা সমস্যা হতে পারে। যারা গ্রাহক তারা একটা আস্থার ভিত্তিতে শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকে যাচ্ছে, প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে এই ব্যাংকে তারা আস্থা বেশি পাচ্ছে বলেই যাচ্ছে। কিন্তু আসলে যদি সেটার শক্ত আইনগত ভিত্তি না থাকে, তাহলে তো কোনো সমস্যা হলে গ্রাহকরাই সমস্যায় পড়ে যাবে। তখন বিশাল আস্থার সংকট তৈরি হবে এবং এর প্রভাব পুরো ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার ওপর পড়বে। বলা বাহুল্য, স্বাতন্ত্রিক আইন ও নীতিমালা না থাকলে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ, তারল্য সংকটের সম্ভাবনাসহ জনআমানতের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় স্বাতন্ত্রিক আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। একসময় দেখা যেত, ইসলামী ব্যাংকগুলো, বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে তারল্য উদ্বৃত্ত নিয়ে মধুর সংকটে পড়তে হতো। তাদের এত বেশি তারল্য উদ্‌বৃত্ত ছিল যে, শরীয়াভিত্তিক বিনিয়োগ খাত পাওয়া নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকতে হতো।

অথচ সামসময়িক পরিস্থিতি একেবারেই বিপরীতমুখী। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তারল্য সুবিধা নিয়ে ইসলামী ব্যাংককে গ্রাহক চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। যেটি পরোক্ষভাবে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি সাধারণ গ্রাহকের আস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করছে।

ইরান, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছে। তারা শুরুতেই আইন করেছে। অথচ পরিতাপের ব্যাপার হলো—একই সময়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করলেও আজও আইন তৈরি হয়নি।

এটা সত্য যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড এ ক্ষেত্রে অনেক কাজ করছে। কিন্তু দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্রমবর্ধমান মার্কেট শেয়ার বা বাজার হিস্যা বিবেচনায় পৃথক আইন ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা এখন জরুরি। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা অপ্রচলিত ঋণ হ্রাস করে, ফটকা ব্যাবসাকে নিরুৎসাহিত করে এবং সমাজের কল্যাণকে উৎসাহ দেয়, সম্পদ ও ইক্যুইটিভিত্তিক পরিষেবা সরবরাহ করে। এরপরও ইসলামী ব্যাংকিং দেশে ও বিদেশে আরও টেকসইভাবে পরিচালনার জন্য স্বল্পমেয়াদি অর্থ বাজারের সমর্থনের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট ইসলামী ব্যাংকিং আইন এখন সময়ের দাবি।[৩৬]

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য জারিকৃত ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনটি ২০১১ সালে সংশোধন করা হয়। ওই বছর সংসদের অর্থ-বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কাছে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি খসড়া আইন চূড়ান্ত করে জমা দিয়েছিল; কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে এখনও তা আলোর মুখ দেখেনি।

খ. দীর্ঘমেয়াদি কৌশল অবলম্বন

বাংলাদেশে বিদ্যমান অবস্থায় এখন শুধু ইসলামী ব্যাংক আইন করলেই হবে না; বরং একটা দীর্ঘমেয়াদি কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যদি আগেই আইন করা থাকত তাহলে কারা যোগ্য ও সঠিক তাদের যাচাই করা যেত। কারা ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের সদস্য হতে পারবে, তা স্পষ্ট থাকত; কারা

---

৩৬. জিল্লুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বতন্ত্র আইন কতটা প্রাসঙ্গিক*, https://sharebiz.net/ইসলামি-ব্যাংকিংয়ের-জন্য/

ইসলামী ব্যাংকের এমডি হতে পারবে, তাও স্পষ্ট থাকত; কারা ইসলামী ব্যাংকের মালিক ও শেয়ারহোল্ডার হতে পারবে, তাও স্পষ্ট থাকত। হঠাৎ করে প্রথাগত ব্যাংকব্যবস্থা থেকে একজন সফল ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যকর করা যাবে না। এখানে মানসিকতার বিষয়টাও জড়িত। যে ব্যক্তি পুরো পেশাগত জীবনে পুরোপুরি সুদভিত্তিক ব্যাংকিংব্যবস্থায় ছিলেন, তার পক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ।

গ. মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়া পরিপালন তথা ইসলামাইজেশন নিশ্চিত করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন মালিকপক্ষ তথা বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। এজন্য মালিকপক্ষেরও একদিকে ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন, অপরদিকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো—ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের বড়ো একটি অংশ ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখেন না। উপরন্তু, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মালিকপক্ষের অধিকাংশই ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও তারা খুব কমই ধর্ম অনুশীলন করেন। তারা সুদি ব্যাংকগুলোর সাথেও স্বাচ্ছন্দ্যে লেনদেন চালিয়ে যান। এর ফলে জনমনে এ সন্দেহ তৈরি হওয়া একান্তই স্বাভাবিক যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে পুঁজি বৃদ্ধি করার প্রবণতা ও গুরুত্বই তাদের কাছে অগ্রগণ্য। নিছক পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই ইসলামী ব্যাংকিংয়ে তাদের অনুপ্রবেশ। এভাবে গণহারে ইসলামী ব্যাংকিং খাতে পুঁজিপতিদের এসে পুঁজি বৃদ্ধি করা ইসলামী অর্থনীতির মূল চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, যেকোনো আদর্শভিত্তিক ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সেই ব্যবস্থার উদ্যোক্তাদের গুণ ও জ্ঞানগত মানের ওপর। তারা যদি সেই আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও একান্ত অনুগত হন এবং সেই সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন, তবেই সেই ব্যবস্থার ইপ্সিত সাফল্যের আশা করা যায়। কাজেই

মুসলিমদেরকেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় এবং পরিচালনায় নিয়োগ করে, তাহলে ইসলামী ব্যাংকের ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঘ. শক্তিশালী কর্পোরেট গভর্নেন্স ও শরীয়া গভর্নেন্স

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যেকোনো ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব নীতি ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে সুচারুরূপে পরিচালিত হতে হলে একটি শক্তিশালী কর্পোরেট গভর্নেন্স ও একটি দক্ষ শরীয়া গভর্নেন্স থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী ব্যাংকের একটি প্রধান চরিত্র হলো—কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, পেশাদারত্ব ও আর্থিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা। এতদুদ্দেশ্যে এমন একটি শক্তিশালী কর্পোরেট গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যা প্রশাসনিক দায়িত্ব ও তদারকির মধ্যে উপযুক্ত সীমারেখা, দায়িত্বের সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নীতিমালা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডার, স্টেকহোল্ডার ও গ্রাহকদের অধিকার সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করবে।

শক্তিশালী ও দক্ষ শরীয়া গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা ব্যাপারে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশগুলো তুলে ধরেছি।

ঙ. কর্মীদের প্রশিক্ষণ

বলার অপেক্ষা রাখে না, ব্যাংকসমূহে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করতে হলে ব্যাংকে কর্মরত লোকদের দিয়েই তো তা করতে হবে। তাই এ বিশেষায়িত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে ব্যাংকসমূহ শরীয়াসম্মতভাবে পরিচালনা করা মোটের ওপর সম্ভব নয়। আমরা জানি যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কর্মরত অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী শরীয়তের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। কিন্তু পুরো জীবন পুঁজিবাদী পদ্ধতির ওপর পড়াশোনা করে আসা অথবা সেই লাইনে কাজ করে আসা কাউকে ২-৪দিন বা সপ্তাহখানেক কয়েক ঘণ্টার কর্মশালার মাধ্যমে তো আর ইসলামী ব্যাংকিং শিখিয়ে ফেলা যায় না। সুতরাং কর্মীদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ একক বা যৌথভাবে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা

করতে পারে এবং কর্মীদের গ্রুপ গ্রুপ করে দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেবে। ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ অ্যাকাডেমি এবং ইসলামিক ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরো যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকের একজন কর্মীকে সবসময় সচেষ্ট থাকতে হবে, কী করে শরীয়াসম্মতভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নত সেবা দেওয়া যায়। এজন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা। যারা পরিচালনায় থাকবেন, তাদেরও লক্ষ রাখতে হবে, মানবসম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় এবং একইসাথে দায়িত্বশীল আচরণের বিষয়ও।

আশার কথা হলো, বর্তমানে বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠানই শরীয়াজ্ঞান অর্জনে ভূমিকা রাখছে। এর মধ্যে BIBM, CIBF, CSBIS অন্যতম। এর বাইরে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত AAOFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions) অন্যতম। তারা অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করে। তাদের বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্সও রয়েছে। বাংলাদেশে এখন তিন শতাধিক AAOFI Certified Shariah Expert রয়েছেন বলে জানা যায়। সুতরাং বলতে গেলে শরীয়া পরিপালনে প্রশিক্ষিত লোকবলের অভাব এখন কোথাও নেই। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-সংক্রান্ত বহু লিটারেচার এখন সহজলভ্য। যে কেউ অনায়াসে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা থাকলেই তা করতে পারেন।

চ. ইসলামী আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

শরীয়া লঙ্ঘন রোধ ও শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করতে হলে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইসলামী আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. এম কবীর হাসান বলেন—

> এখানে ব্যাংকিং দক্ষতার পাশাপাশি নৈতিক প্রশিক্ষণ ও ইসলামিক ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল ও বিশ্বাসীরা ছাড়া এর পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুবই দুরূহ। সেটি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ থেকে শুরু করে ব্যাংকের একজন প্রহরীর

পাশাপাশি ব্যক্তির মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ লালন ও নিজের মধ্যে প্রয়োগের মাধ্যমে পরকালীন প্রতিদান প্রাপ্তির বিষয়টিও ব্যাংকিং সফলতার পেছনে অন্যতম ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।[৩৭]

এ প্রসঙ্গে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এ. জেড. এম. শামসুল আলম বলেন—

> ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সফল করতে হলে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইসলামী জীবনবিধানের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকতে হবে এবং তাকওয়ার অধিকারী হতে হবে। ঈমান, ইয়াকীন এবং পেশাগত কাজের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলে পেশাগত কাজ ব্যাহত হয়।[৩৮]

সুতরাং ব্যাংকে বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ও অনুগত দ্বীনদার লোকদেরই বাছাই করতে হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এতদুদ্দেশ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে শরীয়া বোর্ডের সুপারিশের একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী নয় কিংবা ইসলামী জীবনাদর্শ মেনে চলে না—এরূপ কেউ ব্যাংকে অনুপ্রবেশের সুযোগ বন্ধ হবে; অন্তত অনেকখানি হ্রাস পাবে।

ছ. এক ব্যক্তি বা একটি গ্রুপের মালিকানায় একাধিক ব্যাংক না থাকা

ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন এক ব্যক্তি বা একটি গ্রুপের মালিকানায় একাধিক ব্যাংক না থাকা। যদি এক ব্যক্তি বা একটি গ্রুপের মালিকানায় একাধিক ব্যাংক থাকে এবং মালিকপক্ষ ব্যাংকগুলোতে তাদের ইচ্ছেমতো কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করে, তবে প্রবল আশঙ্কার ব্যাপার হলো, ব্যাংকগুলো ব্যক্তি বা গ্রুপবিশেষের হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে এবং এভাবে ইসলামিক ব্যাংকিং খাত—পুরোটাই বা অংশবিশেষ—নানা সংকটে পড়তে পারে, বিভিন্ন অনিয়ম ও ব্যত্যয় ঘটতে পারে; এ অবস্থায়

---

৩৭. https://bonikbarta.net/home/news_description/334595/বাংলাদেশে-ইসলামী-ব্যাংকিংয়ের-সংকট-ও-উত্তরণের-পথ

৩৮. শামসুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং এর ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র সমহিমায় ধরে রাখাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।[৩৯] বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণ পারিবারিক প্রভাবের বলয় থেকে ব্যক্তিখাতের ব্যাংকগুলো রক্ষা করতে পুরো ব্যাংক খাতে সংস্কার ও আইনে পরিবর্তনের কথা বলছেন। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি)-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আমিনের অভিযোগ হলো—"যারা ঋণ, অনিয়ম ও কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত তারা আদর্শগত কারণে নয়; শুধু মুনাফার জন্য ইসলামী ব্যাংক গঠন করেছেন। আদর্শই যদি চালিকাশক্তি হয়, তাহলে এক ব্যক্তি কীভাবে ছয় থেকে আটটি শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকের মালিক হন?"[৪০]

জ. গ্রাহকদের সচেতন করা

ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যের একটি পূর্বশর্ত হলো—ইসলামী ব্যাবসাপদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এতৎসংক্রান্ত ইলম বা জ্ঞানের প্রসার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা মুসলিম হলেও আমাদের অনেকেই ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাবসা পরিচালনা তো দূরের কথা; ইসলামী ব্যাবসাপদ্ধতিগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোনো ধারণাও রাখে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়ও এ ব্যাপারে শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা নেই।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করতে হলে গ্রাহকদেরও ইসলামিক ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ

---

৩৯. বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গত ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ গ্রুপের মালিকানায় থাকা কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক তারল্য ঘাটতিতে রয়েছে এবং ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময় নানা উদ্যোগ নেয়। এ সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাহিদামতো ব্যাংকগুলো নগদ জমা (সিআরআর) রাখতে পারেনি। এজন্য প্রতিনিয়ত ব্যাংকগুলোকে জরিমানা গুনতে হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ তারল্য সংকটের বড়ো কারণ হলো—ঋণ অনিয়ম, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে। ব্যাংকগুলোর ঋণ অনিয়ম নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পর ব্যাংকগুলো থেকে বড়ো অঙ্কের আমানত তুলে নেন গ্রাহকরা।

৪০. *ইসলামী ব্যাংকিং কোন পথে?* https://bangla.thedailystar.net/economy/bank/news-600671

ব্যাপারে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের নিয়ে শরীয়া-সচেতনতামূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এবং গ্রাহকগণও কেবল ব্যাংকের ওপর নির্ভর না করে নিজেরা ব্যাংকিং বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন, যাতে তারা নিজস্ব পরিধিতে শরীয়তের অনুসরণ করতে পারেন এবং ব্যাংককেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে পারেন।

ঝ. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সততা ও দক্ষতা বিচার

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের কেবল পরিচয়ই নয়; তার সততা ও দক্ষতাকে বিচার করতে হবে, তার ব্যাবসা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ চাইতে হবে। এ কারণে বিনিয়োগ দরখাস্ত প্রক্রিয়াকালে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উচিত—গ্রাহকের ব্যাবসার ক্ষেত্র, দোকান, ফ্যাক্টরি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি দেখা; তার সততা, ব্যাবসায়িক সুনাম ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা; গ্রাহক যেসব তথ্য সরবরাহ করে তা কতটা সত্য—তা প্রকাশ্য ও গোপনে খোঁজখবর নেওয়া; বিভিন্ন ব্যাংকের অন্যান্য শাখা এবং ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য ঋণপ্রদানকারী সংস্থা থেকেও তার ব্যাপারে লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা; বড়ো অঙ্কের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো থেকে তথ্য সংগ্রহ করা; গ্রাহক বিনিয়োগের বিপরীতে সহায়ক জামানত হিসেবে যা বন্ধক রাখে—তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা; গ্রাহক দেশি-বিদেশি যে বিক্রেতার মালপত্র ক্রয় করতে চায়—সেই বিক্রেতা ও তার মালপত্র-সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা[৪১]; বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট রেস্ট্রিকশন বা বিনিয়োগ সুবিধাদান-সংক্রান্ত যে বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো যথাযথ অনুসরণ করা, ... প্রভৃতি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিনিয়োগগ্রহীতা যদি সৎ ও দক্ষ হয়, তবেই বিনিয়োগের অর্থ মুনাফাসহ যথাসময়ে ফেরত পাওয়ার একটি নিশ্চয়তা থাকে।

---

৪১. যেমন—মালের অবস্থা কীরূপ, মূল্য যথাযথ কি না, বাজারে আদৌ ওই মালের চাহিদা আছে কি না, মালের মূল্য পাইকারি বাজারে কেমন ওঠানামা করে, ক্রয়কৃত মাল খারাপ ও পচনশীল কি না, যে মাল তিনি বিক্রয় করার জন্য ইনভয়েস বা দরপত্র দিয়েছেন, সেই মাল বিক্রয় করার অধিকার আদৌ তার আছে কি না, অথবা সেই মাল অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনো ঋণের বিপরীতে ... আছে কি না ...।

অন্যথায় মুনাফা তো দূরের কথা, অনেক সময় মূল পুঁজি ফিরে পাওয়াও আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান ব্যাংকগুলো অনেক সময়—স্বেচ্ছায় হোক কিংবা চাপে পড়ে হোক—এমন অনেক ব্যক্তির সাথে ব্যাবসা করে, তাদের বিনিয়োগ দেয়, যারা চরম নীতিবিরুদ্ধ ও অবৈধ কাজে লিপ্ত (যেমন—সন্ত্রাসী, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারী, ঋণখেলাপি ইত্যাদি), অধিকন্তু ব্যাবসাতেও একেবারে নতুন বা অনভিজ্ঞ।

ঞ. বিনিয়োগ ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা

ইসলামী ব্যাংকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যাংক ব্যাবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় এবং বিনিয়োগের ব্যবহার সম্পর্কে গ্রাহকের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখে। কারণ, ব্যাংককে কেবল মুনাফা পাওয়া নয়; লোকসানের বোঝাও বহন করতে হয়। তাই ব্যাংক কেবল বিনিয়োগ করে বসে থাকতে পারে না; বরং গ্রাহক কীভাবে বিনিয়োগ ব্যবহার করছে, সে সম্পর্কেও তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

শরীয়া লঙ্ঘনের ধরন

ইসলামী ব্যাংকে নানাভাবে শরীয়া লঙ্ঘিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে লেনদেন, বৈদেশিক বাণিজ্য, আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগব্যবস্থা পরিচালনা, মুনাফা বণ্টন, চার্জ ও ফি নির্ধারণ এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরে সামগ্রিকভাবে দ্বীনি পরিবেশ চর্চা ও রক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কমবেশি—ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়—শরীয়তের নানা নীতি ও সীমা লঙ্ঘন করে থাকে, অন্তত অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবহেলা বা শৈথিল্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

অধ্যায় : ৪

ডিপোজিট গ্রহণনীতি : পর্যালোচনা

সম্পদকে নিষ্ক্রিয়ভাবে সঞ্চিত করে রেখে আর্থসামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করে রাখা ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। তাই অলস সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সুগম করা এবং মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা অবশ্যই অন্যায় কিছু তো নয়; বরং পুঁজি অলস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। তাই আমানত সংগ্রহের যে কাজ ব্যাংকগুলো করছে তা দূষণীয় কিছু নয়; বরং এটা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কেননা, ব্যাংকের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান না হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিগুলো সংগ্রহ করে বৃহদায়তন উৎপাদনী কাজে খাটানোর সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া প্রত্যেক পুঁজির মালিকের এমন অভিজ্ঞতাও থাকে না যে, সে তার সঞ্চিত পুঁজিকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবে। ব্যাংক সেই পুঁজিকে সংগ্রহ করে বৃহদায়তন উৎপাদনে বিনিয়োগ করছে এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদের হাতে এই পুঁজি সরবরাহ করে লাভজনক খাতে বিনিয়োগকে নিশ্চিত করছে; সুতরাং এটি তার একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। কিন্তু যে শর্তে সাধারণ ব্যাংকগুলো এই পুঁজির সমাবেশ ঘটায়, সেই শর্তগুলো সুদি প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত বিধায় ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ বা অনুমোদিত নয়। ইসলাম বৃহৎ পুঁজি সমাবেশের জন্য মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে, যে পদ্ধতিদ্বয়ে পুঁজির ওপর শতকরা হারে সুদ দেওয়া হয় না; বরং পুঁজি খাটিয়ে যে লাভ হয়, সেই লাভ থেকে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে শতকরা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। প্রচলিত ব্যাংকগুলো যেখানে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়; বরং ব্যাংক হলো পুঁজির আদান-প্রদানকারী মধ্যস্বত্ত্বভোগী একটি প্রতিষ্ঠান, সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকা ও মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অবস্থানে নেমে আসে এবং সরাসরি ব্যাবসার উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ব্যাংকের তহবিল গঠনের খুবই গুরুত্বহ ও তাৎপর্যপূর্ণ পদ্ধতি হলো জনসাধারণের ডিপোজিট (আমানত)। আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে :

ক. ওয়াদীয়াহ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে যে আমানত রাখা হয়, তা সুদভিত্তিক সনাতন ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের অনুরূপ।

খ. মুদারাবা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে যে আমানত রাখা হয়, তা সনাতন ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টের অনুরূপ।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকার ভিত্তিতেও আমানত গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে এ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণের প্রচলন নেই বললেই চলে।

১. ওয়াদীয়াহ পদ্ধতি

পরিচয় ও প্রকারভেদ

ওয়াদীয়াহ (وديعة) শব্দটি ঈদা (إيداع) ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত ক্রিয়াবিশেষ্য। 'ঈদা' অর্থ গচ্ছিত রাখা, আমানত রাখা, আমানত গ্রহণ করা। ইসলামী শরীয়তে হেফাজতের উদ্দেশ্যে কারও কাছে গচ্ছিত রাখা বস্তুকে 'ওয়াদীয়াহ' বলা হয়।[৪২] কেউ কেউ ওয়াদীয়াহ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেই—

المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض أو هي المال الذى يودع عند شخص لأجل الحفظ.

ওয়াদীয়াহ হলো কোনো ব্যক্তির নিকট সমর্পিত সম্পদ, যা সে কোনো বিনিময় ছাড়া সংরক্ষণ করে; অথবা ওই সম্পদ, যা কোনো ব্যক্তির নিকট নিরাপত্তার জন্য গচ্ছিত রাখা হয়।[৪৩]

---

৪২. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৪৩, পৃ. ৫

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়াদীয়াহ হলো এমন একটি চুক্তি, যেখানে দুটি পক্ষ থাকে—জমাকারী ও ব্যাংক। যিনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন তাকে বলা হয় مستودِع ‘مودِع, আর ব্যাংককে বলা হয় مستودَع ‘مودَع। আর জমাকৃত টাকাকে বলা হয় وديعة বা مودع। এ চুক্তি অনুসারে ব্যাংক জমাকারীর অনুমতিক্রমে তার গচ্ছিত টাকা ব্যবহার করতে পারেন; তবে চাহিবামাত্রই ব্যাংক জমাকারীকে তার টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।[৪৪] এ ধরনের জমাকে ‘ডিমান্ড ডিপোজিট’ (الوديعة تحت الطلب)-ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে জমাকারীগণ ব্যাংক থেকে তার ব্যবহৃত টাকার জন্য কোনো মুনাফা পান না। আর ব্যাংক উক্ত টাকা ব্যবহার বা বিনিয়োগ করার ফলে কোনো লোকসান হলেও জমাকারীগণ তা বহন করেন না। ব্যাংক এ জমার বিপরীতে তার প্রদত্ত সুবিধাদির জন্য জমাকারীর কাছ থেকে সাধারণত নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। তা ছাড়া এ পদ্ধতিতে জমাকৃত টাকায় প্রযোজ্য হারে সরকারি শুল্ক আমানত-জমাকারীকেই বহন করতে হয়।

এ পদ্ধতিটি আমানত সংগ্রহের জন্য শরীয়া অনুমোদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এ অ্যাকাউন্টে জনগণ টাকা আমানত রাখে প্রধানত নিরাপত্তার জন্যই। উল্লেখ্য, আমানত হলো—ইসলামী শরীয়তের নীতি অনুযায়ী কারও কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি। ওয়াদীয়াহও একপ্রকার আমানত; তবে এ দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। যেমন—আমানাহ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণকারী তার কাছে গচ্ছিত আমানতকারীর অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করতে পারেন না; ওই সম্পদে কোনোরূপ পরিবর্তন বা যোগ-বিয়োগ করতে পারেন না। ইসলামী ব্যাংকের লকার সার্ভিস ‘আমানাহ’ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে ওয়াদীয়াহ চুক্তি অনুযায়ী জমা গ্রহণকারী জমাকারীর অনুমতি নিয়ে জমা অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করতে পারে। এ দিক বিচারে প্রত্যেক ওয়াদীয়াহ যদিও আমানতের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু প্রত্যেক আমানত ওয়াদীয়াহ নয়।

---

৪৪. আলী ইবন নায়িফ আশ শাহুদ, *আল মুফাসসাল ফি আহকামির রিবা*, বৈরুত : দারুল জীল, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৭২

من الودائع التى تكون الحساب الجارى، بحيث يتملك المصرف المبالغ المودعة، ويمكن لصاحبها سحبها فى اى وقت يشاء.

এ কারণে আধুনিক কালের অনেক গবেষক ওয়াদীয়াহকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন :

ক. আমানতধর্মী ওয়াদীয়াহ (الوديعة الأمانية) : সম্পদের মালিক চাহিবামাত্র হুবহু একই সম্পদ ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনো সম্পদ কারও কাছে নিরাপদ হেফাজতের জন্য গচ্ছিত রাখা।

খ. জামানতধর্মী ওয়াদীয়াহ (الوديعة الضمانية) : সম্পদের মালিক ব্যবহারের অনুমতি এবং চাহিবামাত্র অনুরূপ সম্পদ সমপরিমাণে ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনো অর্থ বা পণ্য কারও কাছে নিরাপদ হেফাজতের জন্য গচ্ছিত রাখা।

কাজেই বলা যায়, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব বা কারেন্ট অ্যাকাউন্টকে 'ওয়াদীয়াহ' নামকরণ যথাযথ হয়েছে। কারণ, তা 'জামানাতধর্মী ওয়াদীয়াহর পর্যায়ভুক্ত। তবে বিভিন্ন হাদীসে ওয়াদীয়াহ গ্রহণকারীর অবহেলা বা ত্রুটি ছাড়া ওয়াদীয়াহর সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে ওয়াদীয়াহ গ্রহণকারীর ওপর কোনোরূপ জামানত (ضمانة) বা দায় আরোপিত হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

ওয়াদীয়াহ চুক্তি : পর্যালোচনা

ব্যাংকের ওয়াদীয়াহ চুক্তিতে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে :

ক. ওয়াদীয়াহ ডিপোজিট কি আমানত নাকি ঋণ

ওয়াদীয়াহ চুক্তিতে যেহেতু জমাকারীর পক্ষ থেকে তার জমাকৃত টাকা ব্যবহারের অনুমতি থাকে এবং ব্যাংক তা জমাকারীকে চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে, তাই এ পদ্ধতিতে ব্যাংকে প্রদত্ত টাকা কার্যত একপ্রকারের ঋণ।

উল্লেখ্য, আমানত-জমাকারী যদি তার গচ্ছিত বস্তু আমানতগ্রহীতাকে ব্যবহারের অনুমতি দান করে, তাহলে জমাকারীর অনুমতি ও আমানতগ্রহীতার ব্যবহারের কারণে ওয়াদীয়াহ বস্তুতপক্ষে 'আরিয়াহ' (عارية)-এ পরিণত হয়।

ইসলামী শরীয়তে আরিয়াহ হলো—تمليك المنافع بغير عوض অর্থাৎ, কোনোরূপ বিনিময় ব্যতীত বস্তুর উপকার ভোগের অধিকার দান করা। আলিমগণের

মতে—টাকার আরিয়াহ প্রদান কর্জ (ঋণ)-রূপে বিবেচ্য হবে। কারণ, আরিয়াহর একটি শর্ত হলো—মূল বস্তু অক্ষত রেখে তা দ্বারা কেবল উপকার ভোগের বা ব্যবহারের অধিকার দান করা। এ শর্তটি 'টাকা' আরিয়াহ প্রদানের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না; অর্থাৎ, মূল টাকা যা জমা রাখা হয় তা বিদ্যমান থাকে না। তাই টাকা আরিয়াহ প্রদান কার্যত আরিয়াহ নয়; সন্দেহাতীতভাবে কর্জ (ঋণ)-রূপেই বিবেচিত হবে।

বিশিষ্ট ফকীহ মানছূর আল বুহূতী রাহ. বলেন—

فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها .. فقرض

যদি সে খরচ করার উদ্দেশ্যে দিরহাম ও দীনার আরিয়াহ নেয়.. তাহলে সেই দীনার-দিরহাম ঋণই হবে।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে আল ওয়াদীয়াহ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে ওআইসির ফিকহ অ্যাকাডেমির অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো—

الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.

ডিমান্ড ডিপোজিটগুলো (চলতি হিসাবসমূহ), চাই তা ইসলামী ব্যাংকে হোক বা সুদি ব্যাংকে হোক; যেখানেই হোক না কেন তা আসলে ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিতে কর্জই। কারণ, এ জাতীয় ডিপোজিট (ওয়াদীয়াহ)-গুলো গ্রহণকারী ব্যাংকের হাতে জামানত হিসেবেই থাকে। চাহিবামাত্র সে তা ফেরত দিতে শারয়ীভাবে বাধ্য থাকে।[৪৬]

ব্যাংক ও ওয়াদীয়াহ অ্যাকাউন্টধারীদের কর্মকাণ্ডের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, তাদের লেনদেনটি মূলত ঋণ বা কর্জের লেনদেন; আমানতের লেনদেন নয় এবং তা নিম্নোক্ত দুটি কারণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় :

---

৪৫. বুহূতী, *কাশশাফুল কি না*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি., খ. ৪, পৃ. ৬৩

৪৬. ড. ওয়াহহাবা আয যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দিমাশক : দারুল ফিকির, চতুর্থ সংস্করণ, খণ্ড, ৭, পৃ. ১৯৮

১. ব্যাংক ওয়াদীয়াহ অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত অর্থ তার কায়কারবারে ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু যখন অ্যাকাউন্টধারী ফেরত চায়, তখন তার অর্থের অনুরূপ অর্থ তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এটাই হলো ঋণের প্রকৃতি। ঋণ যাকে দেওয়া হয়, সে ঋণের টাকা তার কায়কারবারে খাটাতে পারে এবং খরচ করতে পারে, কিন্তু যখন কর্জদাতা ফেরত চায়, তখন সে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

২. ওয়াদীয়াহ কারেন্ট অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত টাকা আমানতকারী ফেরত চাইলে ব্যাংক অনুরূপ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। অ্যাকাউন্টের টাকা কোনো কারণে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে—তা ব্যাংকের ভুলের কারণে হোক বা অন্য যেকোনো কারণে হোক তখন—ব্যাংক তার জামিন হয়, ফলে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে আমানতের টাকা আমানতদারের কাছে থাকা অবস্থায় তার হেফাজতের ভুলক্রুটির কারণে হারিয়ে বা নষ্ট হলে তখন সে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে, আর ভুলক্রুটি ছাড়া অন্য কারণে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে, তখন সে তা ফেরত দিতে ইসলামী শরীয়ার বিধানমতে বাধ্য থাকে না।

এখানে উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবী যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. একজন বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সকলের কাছে বেশ বিশ্বস্তও ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক লোক তাদের অর্থকড়ি আমানত রাখার জন্য আসত। তিনি আমানতকারীদের অর্থগুলো তাঁর কাছে আমানত হিসেবে না রেখে তাকে ঋণ বা কর্জ দানের জন্য আবেদন জানাতেন, যাতে তিনি অর্থগুলো তাঁর নিজের ব্যবসায় ও কারবারে খাটাতে পারেন, আর কোনো কারণে অর্থগুলো নষ্ট হয়ে গেলে তারা তাদের অর্থ ফেরত পান। এতে ঋণদাতাদেরই ছিল লাভ। কারণ, আমানত রাখা হলে তাতে আমানতদারের বিনা অবহেলায় কোনো কারণে অর্থগুলো নষ্ট হয়ে গেলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তারা তাদের অর্থের ক্ষতিপূরণ পান না। এ কারণেই লোকেরাও তাঁর কাছে তাদের অর্থকড়ি আমানত হিসেবে না রেখে তাকে ঋণ ও কর্জ হিসেবে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এভাবে যুবাইর রা.-এর মৃত্যুকালে ঋণদাতাদের কাছে তাঁর দেনার পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল। এতে তাঁর দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২২ লক্ষ দিরহাম।[৪৭]

বস্তুতপক্ষে সেই সময় যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. যা করেছিলেন আজকে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের আল-ওয়াদীয়াহ হিসাবধারীদের সাথে একই রকমের আচরণ করছে। এসব ব্যাংকও ওয়াদীয়াহ হিসাবধারীদের টাকাপয়সা ওয়াদীয়াহ নামে গ্রহণ করলেও মূলত ঋণ বা কর্জ হিসেবেই জমা রাখছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, এ ধরনের অ্যাকাউন্টকে 'ওয়াদীয়াহ অ্যাকাউন্ট' না বলে 'কর্জ অ্যাকাউন্ট' বলা হলেই আসলে যথার্থ হতো। ইসলামী ব্যাংকগুলো তা না করে এসব অ্যাকাউন্টকে ওয়াদীয়াহ অ্যাকাউন্ট বলে যাচ্ছে। সম্ভবত তা এ কারণে যে, ইসলামী ব্যাংকের সূচনা থেকে যে নাম রাখা হয়েছে তা তারা পরিবর্তন করার ঝামেলায় যেতে চায় না। কারণ, নামে কী আসে যায়! কাজ যা হবে তার ওপর ভিত্তি করেই তো শরীয়তের হুকুম হবে। তা ছাড়া এ নাম রাখার কারণে শরীয়া লঙ্ঘন তো আর হচ্ছে না।[৪৮]

খ. ব্যাংক থেকে আমানতকারীকে কোনো লভ্যাংশ না দেওয়া

ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে ব্যাংক যদি জমাকারীর টাকা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনোরূপ ব্যবহার বা বিনিয়োগের সুযোগ না পায় এবং তা থেকে কোনোরূপ মুনাফাও অর্জিত না হয়, তাহলে এটা ন্যায়সংগত যে, ব্যাংক জমাকারীকে তার জমাকৃত টাকার জন্য কোনোরূপ মুনাফা দেবে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে—এ অবস্থায় জমাকারীকে তার জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত কিছু পরিশোধ করা বৈধ হবে না এবং জমাকারীর জন্যও অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা জায়িয হবে না। এরূপ অবস্থায় জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত কিছুর লেনদেন 'রিবা'-রূপে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে ব্যাংক জমাকারীর গচ্ছিত টাকা যদি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবহার বা বিনিয়োগ করে থাকে এবং তা থেকে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে এ মুনাফার হকদার কে হবে—তা নিয়ে মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা মতপার্থক্যের বিষয়টি দু-ভাগে আলোচনা করব।

---

৪৮. জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ, *আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা*, (পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, অপ্রকাশিত), পৃ. ১৮৩, ১৮৬

খ.১. মালিকের অনুমতি ছাড়া গচ্ছিত বস্তুর ব্যবহার/বিনিয়োগ ও মুনাফা লাভ

হানাফী ও মালিকী ফকীহগণের মতে—মালিকের অনুমতি ব্যতীত গচ্ছিত কোনো বস্তু ব্যবহার/বিনিয়োগ করে কোনো মুনাফা অর্জিত হলে তার মালিক হবে আমানতগ্রহীতা এবং লোকসান হলে এর দায়ও তার ওপর বর্তাবে।

এ অবস্থায় তাদের কারও মতে—জমাকারীর অনুমতি ব্যতীত গচ্ছিত বস্তু বা অর্থ ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়া যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়, তাই এ পদ্ধতিতে অর্জিত মুনাফাও পবিত্র মালের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ মুনাফা তাকে সদকা করে দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রাহ. প্রমুখ এরূপ মত পোষণ করেন।[৪৯] কারও মতে, মুদারাবার মুনাফা ভাগ করার মতো এ মুনাফাও দু-পক্ষই পরস্পর ভাগ করে নেবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহ.-এর মতে, এ মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন উমর রা.-এর কর্মনীতিও এরূপ ছিল।[৫০]

তবে হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহের মতে, কারও গচ্ছিত কোনো বস্তু বা অর্থ ব্যবহার/বিনিয়োগ করে কোনো মুনাফা অর্জিত হলে তার মালিক হবে আমানতদাতা। কারণ, এ মুনাফা তার গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করেই অর্জিত হয়েছে। আমানতগ্রহীতা এ মুনাফার মালিক হবে না। কারণ, যে সম্পদের ওপর ভিত্তি করে মুনাফা অর্জিত হয়েছে, সেটা তার সম্পদ নয়; আমানতদাতার সম্পদ। যেমন, কেউ যদি কারও সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নেয় এবং সে উক্ত সম্পদ ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে, তাহলে সে উক্ত ছিনতাইকৃত সম্পদ ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করবে তার হকদার হবে না। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ মুস্তাফা আর রুহাইবানী রাহ. বলেন—

لو اتَّجر مودَع في الوديعة؛ فالربح لمالك على الصحيح من المذهب.

> যদি আমানতগ্রহীতা গচ্ছিত বস্তুসামগ্রী নিয়ে ব্যাবসা করে, তবে মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুসারে মুনাফা বস্তুর মালিকের জন্য হবে।[৫১]

---

৪৯. সারাখসী, আবু বাকর মুহাম্মদ, *আল মাবসূত*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল আলামিয়্যাহ, ২০০১, খ. ২০, পৃ. ৫২

৫০. ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, খ. ৩০, পৃ. ১৩০

৫১. রুহাইবানী, *মাতালিবু উলিন নুহা*, বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৬১, খ. ৪, পৃ. ৬৪

ইমামগণের উপর্যুক্ত বিভিন্ন অভিমত থেকে জানা যায়—

প্রথমত, মালিকের অনুমতি ব্যতীত গচ্ছিত যেকোনো বস্তু বা অর্থ ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করা অবৈধ ও আমানতের খিয়ানত।

দ্বিতীয়ত, এভাবে গচ্ছিত বস্তু বা অর্থ ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার মালিক কে হবে—তা নিয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, আমানতগ্রহীতা এ মুনাফার অর্থের একচ্ছত্র অধিকারী হবে না; তার জন্য এ অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করা জায়িয নয়। এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে শাইখ ইবনু বায রাহ. বলেন—

> فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره،..
>
> যদি তুমি তার (জমাকারীর) অনুমতি ব্যতীত তার গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহার করো (এবং এতে কোনো মুনাফা অর্জিত হয়), তবে তোমার কর্তব্য হলো, তার কাছে দয়া প্রার্থনা করা। যদি সে দয়া করে তোমাকে ওই মুনাফা দিয়ে দেয় তো ভালো কথা। নচেৎ তুমি তার সম্পদের মুনাফা তাকে দিয়ে দেবে অথবা তার সাথে মুনাফার অর্ধেক কিংবা এরূপ কোনো অঙ্কের ওপর তার সাথে সমঝোতায় আসবে।[৫২]

খ.২. মালিকের অনুমতির ভিত্তিতে গচ্ছিত বস্তুর ব্যবহার/বিনিয়োগ ও মুনাফা ভোগ

ইসলামী শরীয়া আইনে জমাকারীর অনুমতির ভিত্তিতে তার গচ্ছিত বস্তু বা অর্থ আমানতগ্রহীতা ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করতে পারবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে আমানতের এ ব্যবহার বা বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার মালিক বা হকদার কে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো—এ মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে যেহেতু দু-পক্ষেরই অংশ রয়েছে—এক পক্ষের অর্থ ও অপর পক্ষের সার্ভিস, তাই বলা যায়, মুদারাবার মুনাফা ভাগ করার মতো এ মুনাফাও দু-পক্ষই পরস্পর ভাগ করে নেবে।

---

৫২. https://binbaz.org.sa/fatwas/19002/حكم-استثمار-الوديعة-دون-علم-صاحبها

অতএব, ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে ডিপোজিটরের গচ্ছিত টাকা যদি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবহার বা বিনিয়োগ করে থাকে এবং তা থেকে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে ব্যাংক ও ডিপোজিটর পরস্পর সম্মতিক্রমে উক্ত মুনাফা ভাগ করে নেবে। এটাই ইনসাফের দাবি ও মাকাসিদে শরীয়ার সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ।

এখানে কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে, ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে জমাকৃত টাকা যেহেতু একপ্রকার ঋণই (যেমন—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে), তাহলে এ ঋণের অতিরিক্ত কিছু লেনদেন করা জায়িয হবে কি না এবং এ লেনদেন রিবার পর্যায়ভুক্ত হবে কি না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো—

প্রথমত, ঋণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ শর্ত বা পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকলে সৌজন্যবশত মূল টাকার ওপর অতিরিক্ত কিছু লেনদেন করা অবৈধ তো নয়; বরং ইনসাফেরই দাবি, বিশেষ করে যখন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এরূপ ডিপোজিট ব্যবহার বা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা হয়।

জুমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ফকীহগণের মতে—ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে সন্তুষ্টচিত্তে ঋণ হিসেবে প্রদত্ত বস্তুর চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তু পরিশোধ করে কিংবা ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থসম্পদের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ পরিশোধ করে অথবা প্রদত্ত ঋণের সাথে অন্য কোনো বস্তু প্রদান করে, তা বৈধ হবে—যদি তা কোনোরূপ শর্ত কিংবা পারস্পরিক বোঝাপড়া ব্যতীত হয়।[৫৩] উপরন্তু, হানাফী ও শাফিয়ী ফকীহগণের মতে—ঋণগ্রহীতার জন্য মুস্তাহাব হলো, শর্ত ব্যতীত হলে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম বস্তু পরিশোধ করা, আর ঋণদাতার জন্যও তা গ্রহণ করা মাকরূহ নয়।[৫৪] এ প্রসঙ্গে আওফির শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে—

---

৫৩. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩৩, পৃ. ১২৫ (আল মুগনী, ৬/৪৩৮; রাওদাতুত তালিবীন, ৪/৩৪; আল মুবদি, ৪/২১০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, ২/২২৭; আল কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ২৯৪ প্রভৃতি সূত্রে বর্ণিত)

৫৪. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩৩, পৃ. ১২৫ (আল বাদাই, ৭/৩৯৫; আসনাল মাতালিব, ২/১৪৩; রাওদাতুত তালিবীন, ৪/৩৭; তুহফাতুল মুহতাজ, ৫/৪৭ প্রভৃতি সূত্রে বর্ণিত)

> ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় মূল বস্তুতে অথবা উপযোগ প্রদানের মাধ্যমে বস্তুর মানে কিংবা পরিমাণে বাড়তি দেওয়া জায়িয আছে, যদি এটা শর্ত করা না হয়ে থাকে এবং প্রচলিতও না হয়। চাই ঋণের বস্তুটি নগদ অর্থে দেওয়া হোক অথবা অন্য কোনো উপায়ে।[৫৫]

হাদীসে এসেছে, সাইয়িদুনা আবু রাফি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একবার রাসূলুল্লাহ সা. জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কমবয়সি উট ধার নিয়েছিলেন। পরে যখন তাঁর নিকট সদকার উট এলো, তখন তিনি আবু রাফি রা.-কে ওই লোকটির কমবয়সি উটটি পরিশোধ করে দিতে আদেশ দিলেন। আবু রাফি রা. তাঁর নিকট এসে বললেন—'(সেই সমবয়সি উট নেই; বরং তার থেকে উত্তম) সপ্তবর্ষীয় উৎকৃষ্ট জাতের উট ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না।' রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً-'ওইটিই ওকে দিয়ে দাও। কারণ, লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো সে, যে উত্তমভাবে (ঋণ) পরিশোধ করে।'[৫৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা অবৈধ নয়, যদি তা কোনোরূপ শর্ত কিংবা বোঝাপড়া ব্যতীত হয় অথবা সমাজে প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে না হয়। সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে যাকাত থেকে সহযোগিতা চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তার জন্য অর্ধ ওয়াসাক খাদ্য ধার করলেন এবং তাকে তা দিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত চাইতে এলো, রাসূল সা. তাকে এক ওয়াসাক দিলেন এবং বললেন—.نِصْفٌ لَكَ قَضَاءً وَنِصْفٌ لَكَ نَائِلٌ مِنْ عِنْدِي-'এর অর্ধেক হলো তোমার ঋণ পরিশোধ বাবদ; আর বাকি অর্ধেক হলো আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য হাদিয়া।'[৫৭]

---

৫৫. আওফি, শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড, নং ১৯

৫৬. মুসলিম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাকাত, হা. নং : ২২/৪১৯২; অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ *সহীহুল বুখারী*তেও এসেছে (দ্র. অধ্যায় : আল ইস্তিকরায.., ৬/২২৬২)

৫৭. বাইহাকী, *আস সুনানুল কুবরা*, খ. ৫, পৃ. ৩৫১, হা. নং : ১১২৫৯; বাযযার, *আল মুসনাদ*, হা. নং : ৮৯২২; শাইখ আলবানী রাহ.-এর গবেষণা মতে—হাদীসটি সহীহ। (দ্র. আলবানী, *আস সিলসিলাতুস সহীহাহ*, হা. নং : ৩৪১৩)

দ্বিতীয়ত, ড. আবদুল্লাহ আল ফকীহর কাছে ফাতওয়া জানতে চাওয়া হয়, একবার এক ব্যক্তি আমানত হিসেবে জনৈক ব্যক্তির কাছে কিছু অর্থ জমা রাখে। পরে লোকটি আমানতদাতার নিকট গচ্ছিত অর্থ ব্যবহারের অনুমতি কামনা করে, এ শর্তে যে, সে তার সম্পূর্ণ দায় বহন করবে এবং চাহিবামাত্র তা ফেরত দেবে। এ প্রেক্ষিতে আমানতদাতা তাকে তার গচ্ছিত অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। কিছুদিন পর আমানতগ্রহীতা লোকটিকে কিছু অর্থ দান করে বলে, তোমার গচ্ছিত অর্থ দ্বারা আমি ব্যাবসা করেছি এবং এতে কিছু মুনাফা অর্জিত হয়েছে। আমি এ মুনাফা আমাদের দুজনের মধ্যে দু-ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এখন জিজ্ঞাসা হলো—আমানতদাতার জন্য এ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ জায়িয হবে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—

> فإنه لا يجوز رد القرض بأكثر منه إن كان ذلك مشروطاً عند القرض أو حصل تواطؤ على الزيادة . أما إذا لم يكن شرط أو تواطؤ فلا مانع من رد القرض بأكثر منه وأحسن منه في العدد والصفة لعموم حديث أبي رافع.
>
> ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু দান করা বৈধ নয়, যদি তা ঋণ দেওয়ার সময় শর্ত করা হয় কিংবা অতিরিক্ত পরিশোধের ব্যাপারে কোনোরূপ বোঝাপড়া পাওয়া যায়। তবে যদি ঋণ দেওয়ার সময় শর্ত করা না হয় অথবা অতিরিক্ত পরিশোধের ব্যাপারে কোনোরূপ বোঝাপড়া পাওয়া না যায়, তাহলে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু বা অধিকতর উত্তম বস্তু আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। উপর্যুক্ত আবু রাফি রা.-এর হাদীস থেকে তা-ই বোঝা যায়।[৫৮]

অতএব, এ ফাতওয়া থেকে বোঝা যায়, ব্যাংক যদি জমাকারীর টাকা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার অনুমতিক্রমে ব্যবহার বা বিনিয়োগ করে এবং তা থেকে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে ব্যাংক জমাকারীকে তার জমাকৃত টাকা ফেরত দেওয়ার সময় মুনাফার কিছু অংশ দান করতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

তৃতীয়ত, ডিপোজিটের জমাকৃত টাকা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহার বা বিনিয়োগ করে যদি মুনাফা অর্জিত হয় এবং সেই মুনাফার টাকা যদি ব্যাংক

---

৫৮. আবদুল্লাহ আল ফকীহ, *মারকাযুল ফাতাওয়া*, ফাতওয়া নং : ৬৮২৭৬ (الربح المكتسب من استثمار الأمانة), ১৪ রামাদান, ১৪২৬

কেবল একাই ভোগ করে, ডিপোজিটরকে তার কোনো লভ্যাংশই না দেয়, তবে তা হবে একধরনের অন্যায়; ডিপোজিটরকে চুক্তির গ্যাঁড়াকলে ফেলে তার সম্পদ জোর করে ভোগ করার নামান্তর।

সুতরাং আমরা মনে করি, ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে জমাকৃত টাকা যদি ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত একটি যৌক্তিক সময় (যেমন—ন্যূনতম এক মাস) পর্যন্ত ব্যাংকে উত্তোলন না করে রেখে দেওয়া হয় এবং এ টাকা যদি ব্যাংক ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করে কোনো মুনাফা অর্জন করে, তাহলে ব্যাংক ও জমাকারীগণ পরস্পর সম্মতিক্রমে মুনাফার অর্ধ ভাগাভাগি করে নেবে। আমাদের মতে—এ নিয়মটিই মাকাসিদুশ শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সংগত।

ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়নবিশেষজ্ঞ সিরীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অধ্যাপক ড. মনজের কাহফ 'চলতি হিসাব' প্রসঙ্গে বলেন—

> ... চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তকে ব্যাংকের ওপর ঋণ হিসেবে দেখা হয়। যদিও আসল কথা হচ্ছে, এগুলোর একটি নির্দিষ্ট অংশ বিনিয়োগ করা হয় এবং এর মুনাফা ভোগ করেন ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা। (ব্যাংকারদের সহযোগী আলিমগণ কর্তৃক) এটা বৈধতা দানের যুক্তি হলো, চলতি হিসাব উদ্বৃত্তগুলো গ্যারান্টেড (Guaranted)। তাই এগুলো থেকে মুনাফা ভাগ করার কোনো অধিকার নেই।[৫৯]

---

৫৯. ব্যাংকের সহযোগী আলিমগণের বাইরের আলিমগণ চলতি হিসাবধারীদের পক্ষে সোচ্চার। যেমন, এর ফলাফল নিয়ে শাইখ হাসান আব্দুল্লাহ আল আমিন-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এ ধরনের হিসাব একটি মুনাফা প্রত্যাশা করলেও ব্যাংকের সহযোগী আলিমগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। আল আমিন যুক্তি দেখান যে, ডিমান্ড ডিপোজিট কখনও ঋণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, এতে ঋণ দেওয়ার কোনো মানসিকতা থাকে না এবং চুক্তিমূলক সম্পর্কে এগুলোকে আমানত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একইভাবে, ফিকহের পরিভাষাতেও ডিমান্ড ডিপোজিটকে অবশ্যই আমানত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ ওয়াদীয়াহ এবং এগুলোর ওপর ওয়াদীয়াহর বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে। তিনি আরও বলেন, এসব আমানত রাখা হয় সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ব্যাংক এগুলো তার বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে ফিকহের ওয়াদীয়াহ বিধান ভঙ্গ করে। এই লঙ্ঘনের ফলাফল দুটি : এটা ব্যবহারকারীর ওপর মূলের ব্যাপারে একটি গ্যারান্টি চাপিয়ে দেয় এবং এটা ওয়াদীয়াহ ব্যবহারের ফলে প্রাপ্ত সব মুনাফা তার মালিককে দেয়। (হাসান আবদুল্লাহ আল আমিন, *আল ওয়াদাই আল মাসরাফিয়্যাহ আশ শারীয়াহ আল ইসলামিয়াহ*, দার আল সুরুক, জেদ্দা ১৯৮০, পৃ. ১৪)

সাধারণত ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ হলো শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি। কিন্তু উপর্যুক্ত চর্চা তাদের মুনাফার পরিমাণ বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের দ্বারা আইনসিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সহজে খণ্ডন করা যায় এই যুক্তিতে যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদে শেয়ারহোল্ডারদের অংশ খুবই কম। খেলাপির বেলায় কোনো রকম দায়-এর গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে তা তেমন কাজে আসে না। তা ছাড়া চলতি হিসাবধারীদের পছন্দ থেকে বোঝা যায়, তাদের মধ্যে উদ্বৃত্তের ওপর মুনাফার চেয়ে মূল্য প্রত্যাহার সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা বেশি। ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি বিনিয়োগ তহবিল তুলে নেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করে, তাহলে চলতি হিসাবধারীরা মনোভাব বদলে তাদের সঞ্চয় মুদারাবায় নিয়ে যেতে পারেন।[৬০]

গ. আমানত-জমাকারী লোকসানের কোনো দায় বহন না করা

'ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে জমাকৃত টাকা ব্যাংক ব্যবহার বা বিনিয়োগ করার ফলে কোনো লোকসান হলে জমাকারীগণ তা বহন করেন না'—ইসলামী ব্যাংকের এরূপ নীতি ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

কারও কারও মনে এ সন্দেহ তৈরি হতে পারে যে, এ পদ্ধতিতে জমাকৃত অর্থ আমানত হিসেবেই গ্রহণ করা হয়। শরীয়া আইনে আমানতের সাধারণ বিধান হলো—আমানতদাতার অনুমতিক্রমে যদি তার গচ্ছিত বস্তু আমানতগ্রহীতা ব্যবহার করে এবং এর ফলে কোনো লোকসান হয়, তাহলে আমানতগ্রহীতার ওপর এর কোনো দায় আরোপিত হয় না; সম্পূর্ণ দায় আমানতদাতাকেই বহন করতে হয়, যদি এ ক্ষেত্রে আমানতগ্রহীতার কোনো অবহেলা বা দুর্নীতি প্রমাণিত না হয়। এ প্রসঙ্গে *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*-তে বলা হয়—

وَأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

> ওয়াদীয়াহ হলো আমানত। যদি এ আমানতগ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনোরূপ অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন ব্যতীত ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আমানতগ্রহীতার ওপর কোনোরূপ দায় আরোপ হবে না।[৬১]

---

৬০. মনজের কাহফ, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা*, (অনু. মাসুম বিল্লাহ), *ইসলামী ব্যাংকিং*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৩

৬১. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৭, পৃ. ৩২৬

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غير المغل ضَمَانٌ

আত্মসাৎকারী না হলে আমানতগ্রহীতার ওপর কোনোরূপ দায় বর্তাবে না।[৬২]

আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম রাহ. বলেন—

أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَ رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عُمَرُ.

এক ব্যক্তি তার একটি বস্তু অপর একজনের কাছে আমানত রাখল, পরে তা ধ্বংস হয়ে গেল। এজন্য উমর রা. আমানতগ্রহীতাকে কোনোরূপ দায়গ্রস্ত করেননি।[৬৩]

এ অর্থে আরও বহু রিওয়ায়ত রয়েছে।

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তগুলো থেকে স্পষ্টত এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যদি ডিপোজিটর ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে তার জমাকৃত অর্থ ব্যাংককে ব্যবহার বা বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয় এবং এর ফলে কোনো লোকসানও হয়, তাহলে এ অবস্থায় ব্যাংকের ওপর কোনো দায় আরোপ হবে না; বরং আমানতদাতাগণ লোকসান বহন করবেন, যদি ব্যাংক জমাকারীগণের অনুমতিক্রমে তাদের আমানত ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনোরূপ অবহেলা বা দুর্নীতি প্রমাণিত না হয়। তবে এ ক্ষেত্রে যদি ব্যাংকের কোনোরূপ অবহেলা বা দুর্নীতি প্রমাণিত হয়, তাহলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার অবশ্যই ব্যাংককে বহন করতে হবে।

বিশিষ্ট আলিমগণের মতে, ব্যাংকিং ওয়াদীয়াহ কার্যত একপ্রকারের ঋণ—যেমনটা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে এ পদ্ধতিতে জমাকৃত অর্থের ওপর ব্যাংক নিজের দখল লাভ করে এবং তা ব্যবহার করতে পারে।

---

৬২. দারাকুতনী, *আস সুনান*, হা. নং ১৬৮; হাদীসটি মারফূরূপে সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল। কোনো কোনো সূত্রে এ কথাটি সামান্য শব্দগত পার্থক্যসহ কাযী শুরাইহ রাহ. (দারাকুতনী, *আস সুনান*, হা. নং ১৭০) ও যুহরী রাহ. (ইবনু আবী শাইবাহ, *আল মুছান্নাফ*, হা. নং : ২১৮৮৫)-এর বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

৬৩. ইবনু *আবী শাইবাহ*, আল মুছান্নাফ, হা. নং : ২১৮৮৪

ঋণের ক্ষেত্রে শরীয়তের সাধারণ বিধান হলো—ঋণের অর্থ নষ্ট হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে বাধ্য থাকে। ব্যাংকও এ পদ্ধতিতে জমাকারীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে এই শর্তে যে, ব্যাংক তা ব্যবহার করতে পারবে আর ক্ষতি হলে ব্যাংক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

আমরা মনে করি, ব্যাংকিং ওয়াদীয়াহর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিই প্রযোজ্য। কেননা, উপর্যুক্ত রিওয়ায়তগুলোতে আমানতগ্রহীতার ওপর কোনোরূপ দায় আরোপ না হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন জমাকৃত বস্তু বা অর্থ আমানতগ্রহীতার কাছে একান্তই আমানত হিসেবে স্ব অবস্থায় গচ্ছিত থাকবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেহেতু আমানতগ্রহীতা জমাকারীর অনুমতিক্রমে আমানত ব্যবহারের অধিকার লাভ করে, তাই এর জন্য ঋণের হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং এর দায় আমানতগ্রহীতাকেই বহন করতে হবে।

ঘ. সরকারি শুল্ক ও আনুষঙ্গিক খরচ বহন

ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে জমাকৃত টাকায় প্রযোজ্য হারে সরকারি শুল্ক ও আনুষঙ্গিক খরচ আমানত-জমাকারীকেই বহন করতে হয়। এ নীতি শরীয়াসম্মত হবে, যদি ব্যাংক জমাকারীর আমানত ব্যবহার/বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ না পায়। এ অবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যাংক তার সার্ভিসের জন্য গ্রাহকের নিকট থেকে চার্জ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ গ্রহণ করতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে সার্ভিস চার্জ বাবদ At actual ব্যয়ের চেয়ে বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পক্ষান্তরে জমাকৃত টাকা যদি ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত ব্যাংকে উত্তোলন না করে রেখে দেওয়া হয় এবং এ টাকা যদি ব্যাংক ব্যবহার কিংবা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে, তাহলে এরূপ অবস্থায় এটা জমাকারীর প্রতি চরম অন্যায় হবে যে, একদিকে ব্যাংক তাকে তার জমাকৃত টাকা থেকে অর্জিত মুনাফার কোনো অংশও দেবে না, অপরদিকে উলটো তার জমাকৃত টাকার জন্য তাকে সরকারি শুল্ক ও আনুষঙ্গিক খরচ বহন করতে হবে। ইসলামী আইনের একটি প্রসিদ্ধ সূত্র হলো— الغرم بالغنم-"লাভের সাথে দায়ও বর্তায়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি লাভ বা উপকার ভোগ করে তাকে দায়ও নিতে হবে।"[৬৪] যেমন, কেউ যদি তার কোনো সম্পদ কারও কাছে বন্ধক রাখে এবং

৬৪. ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর*, খ. ২, পৃ. ২৬৯

সেই সম্পদ থেকে বন্ধকগ্রহীতা উপকার ভোগ করে, তাহলে তাকে এর আনুষঙ্গিক খরচও বহন করতে হবে।[৬৫] কাজেই ওয়াদীয়াহ পদ্ধতিতে জমাকৃত টাকা ব্যবহার বা বিনিয়োগ করে ব্যাংক যদি কোনো মুনাফা অর্জন করে, তবে তাকেই এর আনুষঙ্গিক সমুদয় খরচ বহন করতে হবে।

২. মুদারাবা

পরিচয় ও প্রকারভেদ

'মুদারাবা' (مضاربة) শব্দটি 'দার্‌ব' (ضرب) ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত। 'দারব' (ضرب) -এর মূল অর্থ (ব্যাবসা, যুদ্ধ, রিযক অন্বেষণ ইত্যাদি যেকোনো উদ্দেশ্যে) জমিনে বিচরণ করা, সফর করা।[৬৬] এ অর্থে কুরআনে এসেছে, وإذا ضَرَبْتُم فِي الأَرض -"আর যখন তোমরা জমিনে সফর করবে, ..।"[৬৭]

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'মুদারাবা' হলো একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যাবসা পরিচালনা করে। *আল-হিদায়া* গ্রন্থকার মুদারাবার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر

> মুদারাবা এমন এক অংশীদারি চুক্তি, যেখানে একপক্ষ অর্থের জোগান দেবে আর অপর পক্ষ শ্রম বিনিয়োগ করবে।[৬৮]

ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সংজ্ঞা মতে—

> Mudaraba is a form of partnarship where one party provides the fund while the other provides expertise and managemant.

---

৬৫. খলীফী, ড, রিয়াদ, *আল মিনহাজ ফী কাওয়ায়িদি ইলমিল ফিকহ*, পৃ. ১২

৬৬. ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১, পৃ. ৫৪৩

৬৭. আল কুরআন, ৪ (সূরা আন নিসা) : ১০১

৬৮. মারগীনানী, *আল হিদায়াহ*, ২০০০, পৃ. ৪১

> মুদারাবা একধরনের অংশীদারত্ব, যেখানে একপক্ষ (সাহিবুল মাল/ রব্বুল মাল) তহবিল বা পুঁজি সরবরাহ করেন এবং অন্যপক্ষ তার দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত করেন।

এরূপ কারবারে লাভ হলে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুসারে আনুপাতিক হারে উভয় পক্ষের মধ্যে লাভ বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা সম্পূর্ণ বহন করতে হয়।[৬৯] এরূপ ব্যবসায় মূলধন সরবরাহকারীকে 'সাহিবুল মাল' বা 'রব্বুল মাল' অর্থাৎ মূলধনের মালিক, আর ব্যাবসা পরিচালনাকারীকে 'মুদারিব' অর্থাৎ উদ্যোক্তা বলা হয়।

মুদারাবা দু-ধরনের হয়ে থাকে—মুদারাবা মুত্লকাহ (শর্তমুক্ত মুদারাবা Unrestricted Mudarabah) ও মুদারাবা মুকাইয়াদাহ (শর্তযুক্ত মুদারাবা Restricted Mudarabah)।

যে কারবারে মুদারিবের ওপর কোনোরূপ শর্তারোপ করা হয় না বা মুদারিব স্বাধীনভাবে কারবার পরিচালনা করতে পারে, তাকে 'মুদারাবা মুত্লকাহ' বলে।

পক্ষান্তরে যে কারবারে মুদারিবের ওপর কোনো শর্তারোপ করা হয় তাকে 'মুদারাবা মুকাইয়াদাহ' বলা হয়। এ ধরনের কারবারে সাহিবুল মাল কর্তৃক মুদারিবকে ব্যবসায়ের ধরন, মেয়াদ, স্থান, ব্যক্তি, কাজের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় শর্ত করে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। মুদারিব শর্ত ভঙ্গ করলে এবং এজন্য ব্যবসায় লোকসান হলে এ লোকসান তাকেই বহন করতে হবে।

ব্যাংকে মুদারাবার অনুশীলন

'মুদারাবা' আমানত সংগ্রহের শরীয়াসম্মত একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকে আমানতগ্রহণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে। বলতে গেলে ইসলামী ব্যাংকের অধিকাংশ পুঁজিই এ পদ্ধতিতেই সংগৃহীত হয়। মুদারাবা হিসাবের অপর নাম লাভ-লোকসানের অংশীদারত্বের হিসাব (Profit

---

৬৯. এ অর্থে পরিভাষাটি ইরাকীদের নিকট বহুল পরিচিত। হানাফী ও হাম্বলীগণ এ নাম ব্যবহার করেন। হিজাযীগণ একে 'কিরাদ' [مُقَارَضَة] বা 'মুকারাদাহ' [قِرَاض] নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। মালিকী ও শাফি'ঈগণও এ নাম ব্যবহার করেন। তবে বর্তমানে 'মুদারাবা' পরিভাষাটিই সর্বত্র বহুল প্রচলন লাভ করেছে।

and Loss Sharing Account, সংক্ষেপে PLS)। এ হিসাবে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে তাদের জমাকৃত অর্থের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে আমানত গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফা পূর্বনির্ধারিত একটা হারে ব্যাংক ও আমানতকারীদের মধ্যে ভাগ হয়।

মুদারাবা অ্যাকাউন্ট কয়েক ধরনের হয়ে থাকে—

ক. সাধারণ (MSA) : এ অ্যাকাউন্টে সেভিংস অ্যাকাউন্টের মতোই আমানতকারীরা যেকোনো পরিমাণ অঙ্কের অর্থ জমা দিতে পারে এবং এ জমাকৃত অর্থ কোনো নির্ধারিত মেয়াদের জন্য হয় না। তবে এ অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসে কতবার অর্থ উত্তোলন করা যাবে, তার সংখ্যা ব্যাংক সীমিত করতে পারে। সঞ্চয়কারী গ্রাহক ব্যাংকের নিয়মকানুন মেনে চললে ব্যাংক তাকে এ অ্যাকাউন্টের জমার ওপর মুনাফা দিয়ে থাকে।

খ. মেয়াদি (MTDA) : এ হিসাবে আমানত ছয় মাস থেকে এককালীন, সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, মেয়াদ যত দীর্ঘ হবে, মুনাফার প্রদত্ত হার তত বেশি হবে।

গ. বিশেষ : ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এ ধরনের বিশেষ কিছু সঞ্চয়ী হিসাবও চালু রয়েছে, যা মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা যায় এবং একই সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকের নানা ধরনের প্রয়োজনও পূরণ করা সম্ভব। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মধ্যবিত্ত ও চাকরিজীবী শ্রেণির লোকেরাই এসব সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ জমা করে। এসব দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলও বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘমেয়াদি ও বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হওয়ায় ব্যাংকগুলো মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে উঁচু ওয়েটেজ দিয়ে থাকে। এ জাতীয় বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—মুদারাবা হজ আমানত হিসাব, মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) আমানত হিসাব, মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক আমানত হিসাব, মুদারাবা মোহর-বিবাহ আমানত হিসাব, মুদারাবা মিলিওনিয়ার আমানত হিসাব, মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত হিসাব, মুদারাবা মাসিক আমানত হিসাব, মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ আমানত হিসাব প্রভৃতি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন নামে উপর্যুক্ত বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাবসমূহ পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব হিসাবে প্রদত্ত মুনাফার ওয়েটেজের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. স্পেশাল নোটিশ অ্যাকাউন্ট (MSNDA) : মুদারাবা পরিচালিত নীতিতে একটি বিশেষ হিসাব। স্বল্প সময়ের নোটিশে অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তরের সুবিধা রেখে এই হিসাব খোলা হয়। এ হিসাব থেকে গ্রাহক কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মতো সুবিধা পায়; তবে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে (কমপক্ষে) ৭দিন আগে নোটিশ করতে হয়। স্বল্প সময়ের জন্য লেনদেনের সুবিধা আছে বলে এ হিসাবে মুনাফার পরিমাণ কম হয়ে থাকে।

মুদারাবা কারবার-সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান

মুদারাবা কারবার যেহেতু অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই যেকোনো চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত রয়েছে (যেমন—উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির যোগ্যতা থাকা), তা মুদারাবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কাজেই এখানে এসব শর্ত বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। তবে মুদারাবা কারবার বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এমন কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে, যা কেবল মুদারাবা চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে সংক্ষেপে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো—

১. মুদারাবার মূলধন নগদ অর্থে হতে হবে। কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদও মুদারাবার মূলধন হতে পারে; তবে এরূপ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করে তা চুক্তিপত্রে মূলধন হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

২. চুক্তিপত্রে মূলধনের পরিমাণ ও ধরন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. ব্যাবসা শুরু করতে চুক্তি অনুসারে প্রয়োজনীয় মূলধন মুদারিবের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং তাকে মূলধন স্বাধীনভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে।

৪. চুক্তিপত্রে লভ্যাংশ বণ্টনের হার অর্থাৎ লাভের কত অংশ মুদারিব পাবে এবং কত অংশ রব্বুল মাল পাবে—তা উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা অংশীদারদের মধ্যে আনুপাতিক হারে (যেমন—অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) কিংবা শতকরা হারে (যেমন—৩০%, ৪০%, ৫০% ইত্যাদি) নির্ধারণ করতে হবে। কাজেই কোনো অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ (যেমন—লভ্যাংশের দশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে

বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিনিময়ে নির্ধারিত কোনো অংশ (যেমন—বিনিয়োগকৃত পুঁজির শতকরা বিশ ভাগ) ধার্য করা যাবে না।

৫. মুদারাবা কারবারে লোকসান হলে তা মূলধন থেকে বাদ দেওয়া হবে। এটা মূলধনের ক্ষয় হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং তা সম্পূর্ণই রব্বুল মালকে বহন করতে হবে। তবে এ লোকসান যদি মুদারিবের কোনো অবহেলা কিংবা অব্যবস্থাপনার জন্য হয়ে থাকে, তবে এর সম্পূর্ণ দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। উল্লেখ্য, মূলধন অক্ষত থাকা ব্যতীত মুদারাবার লাভ ধর্তব্য হবে না। এ ছাড়া পূর্বের ক্ষতিকে পরবর্তী লাভের সাথে সমন্বয় করা যাবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে প্রকৃত লাভ নির্ণয় করা হবে। কারবারে আয়-ব্যয় সমান হলে রব্বুল মাল তার মূলধন বুঝে নেবেন; এমতাবস্থায় মুদারিব কিছুই পাবে না।

৬. মুদারিব রব্বুল মালের অনুমতি ব্যতীত মূলধন পুনরায় অন্য কারও কাছে বিনিয়োগ করতে পারবেন না। তিনি এরূপ করলে তা সীমালঙ্ঘন (চুক্তির লঙ্ঘন) বলে বিবেচিত হবে।

৭. মুদারিব প্রচলিত রীতি মোতাবেক ব্যাবসার আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সব কাজ সম্পাদন করবেন। এটা সম্পাদন করা মুদারিব হিসেবে তারই একান্ত দায়িত্ব। তাই এ কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে তিনি চুক্তিতে উল্লিখিত মুনাফা বণ্টনের অনুপাতের অতিরিক্ত কোনো বেতন/পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না।

৮. মুদারাবা কারবারে রব্বুল মালের পক্ষ থেকে কোনো শর্তারোপ করা না হলেও মুদারিব ব্যবসায় কেবল সেসব কাজই করতে পারবে, যা সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু মুদারিব যদি এমন কোনো কাজ করতে চায়, যা সাধারণত ব্যবসায়ীরা করে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে রব্বুল মাল থেকে স্পষ্ট অনুমতি নিতে হবে; তার অনুমতি ব্যতীত এমন কিছু সে করতে পারবে না।

৯. শর্তহীন মুদারাবার ক্ষেত্রে যেকোনো সময় যেকোনো এক পক্ষ অপর পক্ষকে জানিয়ে, আর শর্তযুক্ত মুদারাবার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মুদারাবা চুক্তি বিলুপ্ত করা যায়। তা ছাড়া চুক্তিপত্রে যদি কারবারের নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করা থাকে, তবে সেই মেয়াদ শেষ হলে উভয়ের সম্মতিতে চুক্তি শেষ হয়ে যায়।

১০. মুদারাবা ব্যবসায় লাভ-লোকসান যা-ই হোক না কেন সর্বাবস্থায় মুদারিব সাহিবুল মালের মূলধন ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে—মুদারাবা বিনিয়োগে এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয়। তবে মূলধনের নিরাপত্তার জন্য মুদারিবের কাছ থেকে জামানত (মর্টগেজ/পার্সোনাল গ্যারান্টি) নেওয়া যাবে।

১১. মুদারিব চুক্তি লঙ্ঘন করলে অথবা মূলধন হেফাজত করতে অবহেলা প্রদর্শন করলে কিংবা এমন কোনো কাজ করলে যা চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, তবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মূলধন খোয়া গেলে মুদারিবকে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। এ অবস্থায় গৃহীত জামানতের মাধ্যমে সাহিবুল মালের পাওনা আদায় করার ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই।

ব্যাংকের মুদারাবা কারবার : পর্যালোচনা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুদারাবা পদ্ধতিটি আমানত সংগ্রহের জন্য ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক আমানত-জমাকারীর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং শর্ত থাকে যে, সেই আমানত ব্যবহারে ব্যাংকের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং এ আমানত ব্যবহার করে যে মুনাফা অর্জন করবে, তা ব্যাংক ও আমানত-জমাকারীর মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে বণ্টিত হবে, আর লোকসান হলে তা সম্পূর্ণ আমানত-জমাকারীই বহন করবে, যদি না ব্যাংকের কোনো অবহেলা বা দুর্নীতি প্রমাণিত হয়। ব্যাংকের মুদারাবা কারবারে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে :

ক. ব্যাংক মুদারিব নাকি রব্বুল মালের ওয়াকিল?

মুদারাবার উপরিউক্ত পরিচয় থেকে জানা যায়, শুরুতে রব্বুল মাল ব্যাংককে মুদারাবায় মূলধন সরবরাহ করে, অতঃপর ব্যাংক অনেক সময় এ মূলধন সরাসরি ব্যবহার না করে অন্য একটি পক্ষকে মুদারাবায় বিনিয়োগ করে থাকে। ব্যাংকিং পরিভাষায় একে ‘দ্বিস্তর বা দ্বিধাপ বিশিষ্ট মুদারাবা’ (Two tire Mudarabah) বলে। প্রথম ধাপে আমানত-জমাকারী রব্বুল মাল এবং ব্যাংক মুদারিব। দ্বিতীয় ধাপে ব্যাংক হলো রব্বুল মাল বা তার প্রতিনিধি (ওয়াকিল) এবং বিনিয়োগগ্রহীতা (তৃতীয় পক্ষ) হলো মুদারিব ।

এখন প্রশ্ন হলো, মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকৃত মূলধনকে মুদারিব আবার মুদারাবায় বিনিয়োগ করতে পারবে কি না? যদি বিনিয়োগ করতে পারে, তাহলে এ অবস্থায় বিনিয়োগকারী মুদারিব থাকবে নাকি রব্বুল মালের পক্ষ থেকে ওয়াকিল হবে? আর এ দ্বিবিধ অবস্থায় তার হুকুমের মধ্যে কোনো তারতম্য হবে কি না? তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে নানা অভিমত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে—সাধারণ নীতি হলো, কারও মুদারাবায় বিনিয়োগকৃত মূলধনকে মুদারিব পুনরায় অন্যজনের কাছে মুদারাবায় বিনিয়োগ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, যদি রব্বুল মাল তাকে স্পষ্ট ভাষায় পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগের অনুমতি দিয়ে থাকে, তবেই সে অন্যজনের কাছে পুনরায় মুদারাবায় বিনিয়োগ করতে পারবে। কারও কারও মতে—রব্বুল মাল যদি তাকে কোনোরূপ শর্তারোপ ছাড়া মূলধন সরবরাহ করে, তবে সেই অবস্থায়ও সে ওই মূলধন অন্যজনের কাছে পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগ করতে পারবে।[৭০]

প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রব্বুল মাল পুনঃমুদারাবায় স্পষ্ট অনুমতি দিলে মুনাফা কেবল রব্বুল মাল ও দ্বিতীয় মুদারিবের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ শর্তহীনভাবে মূলধন সরবরাহ করলে মুনাফা রব্বুল মাল, প্রথম মুদারিব ও দ্বিতীয় মুদারিবের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

সুতরাং মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকারী তার আমানত হয় ব্যাংককে অন্যজনের কাছে মুদারাবায় বিনিয়োগের স্পষ্ট অনুমতি দেবে অথবা কোনোরূপ শর্ত আরোপ ব্যতীত সরবরাহ করবে। প্রথম অবস্থায় ব্যাংক ওয়াকিল হবে; মুদারিব নয়। অর্থাৎ, ব্যাংক রব্বুল মালের পক্ষ থেকে প্রকৃত মুদারিবের কাছে মূলধন সরবরাহের জন্য ওয়াকিলরূপে বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় কোনো মুনাফা অর্জিত হলে তা কেবল রব্বুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে বণ্টিত হবে। ব্যাংক কোনো মুনাফা পাবে না। কারণ, এ কারবারের মধ্যে না পুঁজির ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো অংশ আছে, না শ্রমের ক্ষেত্রে কোনো অংশ আছে। তবে সে তার এ ওকালতি (মধ্যস্থতা)-এর জন্য ব্যবস্থাপনা ফি/সার্ভিস চার্জ নিতে পারবে।

---

৭০. দেখুন, আহমাদ শাহদাহ ও অন্যান্য, মুদারাবাতুল মুদারিব বি-মালিল মুরারাবাহ.., *আদ দিরাসাত*, জর্দান : কুল্লিয়াতুশ শরীয়া, খ. ৪০, ২০১৩, পৃ. ৮৮২-৮৮৬

দ্বিতীয় অবস্থায় রব্বুল মাল যেহেতু ব্যাংককে কোনোরূপ শর্তারোপ ছাড়াই সাধারণভাবে মূলধন সরবরাহ করে তাই কোনো কোনো ফকীহের মতে—ব্যাংক মুদারিবরূপে বিবেচিত হবে। কারণ, এ অবস্থায় ব্যাংক রব্বুল মালের পুঁজি কেবল মুদারাবার ভিত্তিতে হস্তগত করে থাকে; ওকালতির ভিত্তিতে নয়। এরূপ অবস্থায় রব্বুল মালের সাথে ব্যাংকের মুদারাবা চুক্তির পর ব্যাংকের কিছু শ্রম পাওয়া যায়। তা হলো—সেই পুঁজি ব্যাংক তার বিবেচনা মতো অন্যের কাছে মুদারাবায় সরবরাহ করে। সুতরাং এ অবস্থায় মুনাফা রব্বুল মাল, ব্যাংক ও মুদারিবের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বণ্টিত হবে, আর ব্যবস্থাপনা খরচ ব্যাংক ও মুদারিবকেই বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ব্যাংক সাধারণত এ পদ্ধতিতে জমাগ্রহণের সময় চুক্তিপত্রে এ শর্ত আরোপ করে থাকে যে, আমানত ব্যবহারে ব্যাংকের পূর্ণ অধিকার থাকবে। ব্যাংক ইচ্ছা করলে তা নিজেই ব্যবসায় বিনিয়োগও করতে পারে অথবা অন্যজনের কাছে মুদারাবা/মুশারাকায় বিনিয়োগও করতে পারে। কাজেই এরূপ চুক্তি অনুসারে ব্যাংক যদি মুদারাবায় জমাকৃত অর্থ পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগ করে, তাহলে ব্যাংক ‘ওয়াকিল’ নয়; ‘মুদারিব’-রূপেই বিবেচিত হবে।

খ. ব্যবস্থাপনা ফি গ্রহণ

সাধারণত ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাগ্রহণ ও বিনিয়োগের জন্য রব্বুল মালের নিকট থেকে ব্যবস্থাপনা ফি বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। এসআইবিল পিএলসির শরীয়াহ ম্যানুয়ালে উল্লেখ করা হয়—

> মুদারাবা কারবার সংশ্লিষ্ট কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ, যা মুদারিব ব্যবস্থাপক হিসেবে সম্পাদন করবেন। এর জন্য তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ। তবে মুদারাবা কারবারের মুদারিবের জন্য লাভের অংশ একত্র করা বৈধ নয়। অর্থাৎ, পুঁজি ব্যবহারকারী হিসেবে মুদারিব লাভের কত অংশ এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে কত পারিশ্রমিক পাবেন, তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাংক যদি রব্বুল মালের পক্ষ থেকে ওয়াকিল (ব্যবস্থাপক) হিসেবে তার জমাকৃত আমানত মুদারাবায় কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে, তবেই ব্যাংক তার ব্যবস্থাপনা বা সার্ভিসের জন্য ফি

নিতে পারবে। কিন্তু ব্যাংক যদি নিজে মুদারিব হয়, তাহলে তার ব্যবস্থাপনা বা সার্ভিসের জন্য রব্বুল মালের নিকট থেকে কোনো ফি বা চার্জ নেওয়া সমীচীন হবে না।

সুতরাং যেহেতু চুক্তি অনুসারে ব্যাংকের ভূমিকা মুদারিবের পর্যায়ভুক্ত, তাই মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকৃত আমানত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রব্বুল মালের নিকট থেকে ব্যাংক তার ব্যবস্থাপনা বা সার্ভিসের জন্য কোনো ফি বা চার্জ গ্রহণ করতে পারে না; বরং ব্যাংক যেহেতু তার সার্ভিস বা ব্যবস্থাপনার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে এ বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাবে, তাই তার সার্ভিস ও ব্যবস্থাপনার খরচ তাকেই বহন করতে হবে। ফকীহগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, মুদারিব পূর্ব-সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে মুনাফা ব্যতীত মুদারাবা কারবার পরিচালনা করার কারণে কোনো রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবি করতে পারবে না।[৭১]

উল্লেখ্য, রব্বুল মাল একদিকে মূলধন সরবরাহ করে, অপরদিকে তাকে যদি ব্যবস্থাপনা ফি-ও আদায় করতে হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো—এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের এমন কী ভূমিকা বা অংশ থাকল, যে কারণে সে লভ্যাংশ পাবে? এ অবস্থায় ব্যাংক যা মুনাফা অর্জন করবে—তা কোনোরূপ বিনিময় ছাড়াই হবে, না মূলধনের বিনিময়ে, না তার শ্রম ও মেধার বিনিময়ে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুদারাবা হলো একটি অংশীদারী কারবার, যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষে তার মেধা ও শ্রম ব্যয় করে।

গ. সম্ভাব্য মুনাফার হার অথবা মুনাফার সাময়িক হার ঘোষণা করা

মুদারাবা কারবার শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো—চুক্তি সম্পাদনের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের অনুপাত (যেমন—ব্যাংক : গ্রাহক :: ৬০ : ৪০) নির্ধারণ করা; মুনাফার নির্দিষ্ট হার (যেমন—সরবরাহকৃত মূলধনের ৮% বা ৯% অথবা ১০%) বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘোষণা না করা। কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখতে পাই, ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের বিভিন্ন মুদারাবা হিসাবের জন্য মুনাফার সম্ভাব্য হার বা সাময়িক হার ঘোষণা করে থাকে। নিচের ছবিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের জন্য প্রযোজ্য Provisional Profit Rate অর্থাৎ অস্থায়ী লভ্যাংশ হারের বিবরণ রয়েছে—

---

৭১. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ৫১

Islami Bank Bangladesh PLC.
Provisional Profit Rates on Mudaraba Deposits w.e.f 01.07.2025 & 16.07.2025

Sl. No.	Particulars of Deposits	Revised Provisional Rates	Remarks
1	2	3	4
1	Mudaraba Hajj Savings		
a)	From 11 years to 25 years Term	8.00%	Unchanged
b)	From 1 year to 10 years Term	7.50%	Unchanged
2	Mudaraba Waqf Cash Deposit Account (MWCDA)	10.25%	w.e.f. 16.07.2025
3	Mudaraba Special Savings (Pension) including RDS MSS		
a)	10 Years Term	7.75%	w.e.f. 16.07.2025
b)	5 Years Term	7.25%	w.e.f. 16.07.2025
c)	3 Years Term	6.75%	w.e.f. 16.07.2025
4	Mudaraba Education Savings Scheme(MESS)		
a)	15 Years Term	7.70%	Unchanged
b)	10 Years Term	7.50%	Unchanged
c)	5 Years Term	7.20%	Unchanged
d)	3 Years Term	6.80%	Unchanged
5	Mudaraba Expatriate Housing Deposit Scheme (MEHDS)		
a)	15 Years Term	8.00%	Unchanged
b)	10 Years Term	7.50%	Unchanged
c)	5 Years Term	7.00%	Unchanged
d)	3 Years Term	6.80%	Unchanged
6	Mudaraba Bibaho Saving Account		
a)	5 years Term	7.00%	Unchanged
b)	3 Years Term	6.80%	Unchanged
7	Mudaraba Muhor Savings Account		
a)	10 Years Term	7.50%	Unchanged
b)	5 Years Term	7.00%	Unchanged
8	Mudaraba Savings Bond (MSB)		
a)	8 Years Term	7.50%	Unchanged
b)	5 Years Term	7.10%	Unchanged
9	Mudaraba NRB Savings Bond		
a)	10 Years Term	8.00%	Unchanged
b)	5 Years Term	7.15%	Unchanged
10	Mudaraba Monthly Profit Deposit Scheme (MMPDS)		
a)	5 years Term	11.75%	w.e.f. 16.07.2025
b)	3 Years Term	10.75%	w.e.f. 16.07.2025
11	Mudaraba Senior Citizen Monthly Deposit Scheme (MSCMDS)		
a)	5 years Term	11.95%	w.e.f. 16.07.2025
b)	3 Years Term	10.85%	w.e.f. 16.07.2025
c)	1 Years Term	9.75%	w.e.f. 16.07.2025

Islami Bank Bangladesh PLC. Provisional Profit Rates on Mudaraba Deposits w.e.f 01.07.2025 & 16.07.2025			
Sl. No.	Particulars of Deposits	Revised Provisional Rates	Remarks
1	2	3	4
12	Mudaraba Term Deposits		
a)	01 Month	5.50%	w.e.f. 16.07.2025
b)	03 Months	9.75%	w.e.f. 16.07.2025
c)	100 days	9.85%	w.e.f. 16.07.2025
d)	06 Months	10.05%	w.e.f. 16.07.2025
e)	200 days	10.15%	w.e.f. 16.07.2025
f)	300 days	10.20%	w.e.f. 16.07.2025
g)	12 Months	10.25%	w.e.f. 16.07.2025
h)	24 Months	10.45%	w.e.f. 16.07.2025
I)	36 Months	10.75%	w.e.f. 16.07.2025
13	Mudaraba Priority Saving Account	4.60%	Unchanged
14	Mudaraba Savings Account including RDS Saving Account	3.25%	w.e.f. 01.07.2025
15	Mudaraba Upohar Deposit Account	3.50%	Unchanged
16	Student Mudaraba Saving Account	3.50%	Unchanged
17	Mudaraba Farmers Saving	3.80%	Unchanged
18	Mudaraba Special Notice Deposit	3.00%	Unchanged
19	mCash Deposit Scheme	3.00%	Unchanged
20	Mudaraba Industrial Employee	3.50%	Unchanged
21	Mudaraba Payroll Saving	3.50%	Unchanged
22	Mudaraba Umrah Saving Scheme(MUSS)		
a)	1 years	7.00%	Unchanged
b)	2 years	7.20%	Unchanged
c)	3 years	7.30%	Unchanged
d)	4 years	7.40%	Unchanged
e)	5 years	7.50%	Unchanged
f)	6 years	7.55%	Unchanged
g)	7 years	7.60%	Unchanged
h)	8 years	7.70%	Unchanged
I)	9 years	7.80%	Unchanged
j)	10 years	7.90%	Unchanged
K)	12 years	8.00%	Unchanged

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে চুক্তির সময় এভাবে মুনাফার সম্ভাব্য বা সাময়িক হার ঘোষণা করা মোটের ওপর সমীচীন নয়।[৭২] কারণ,

প্রথমত, এরূপ ঘোষণায় মূলধন সরবরাহকারী আত্মপ্রবঞ্চিত হতে পারেন। খুব সম্ভব, তিনি হয়তো ওই পরিমাণ মুনাফার আশায় কারবারে জড়িত হলেন; কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ব্যাংক সেই পরিমাণে মুনাফা অর্জন করতে পারল না বা কারবারে লোকসান হলো। এর ফলে উভয় পক্ষের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে—লেনদেনের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো আশ্বাস দেওয়া উচিত নয়, যাতে কোনো পক্ষের প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা যাতে কোনো ধরনের অজ্ঞতা বা সংশয় রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, চুক্তির সময় এভাবে মুনাফার হার ঘোষণা করে সম্পন্ন কারবার প্রায় সুদি কারবারের সাথে মিলে যায়। পার্থক্য হলো—সুদি কারবারে চুক্তির সময় লাভের নির্দিষ্ট হার উল্লেখ করা হয় আর বক্ষ্যমাণ কারবারে সম্ভাব্য বা সাময়িক হার উল্লেখ করা হয়। এ কারণে অনেকেই এ দু-ধরনের কারবারের মধ্যে পার্থক্য করতে না পেরে বক্ষ্যমাণ কারবারকেও সুদি কারবারের একটি প্রকরণ কিংবা সুদ গ্রহণের একটি কৌশলী প্রক্রিয়া হিসেবে ধারণা করেন।

তৃতীয়ত, সংজ্ঞা অনুযায়ী মুদারাবা ব্যাবসা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাগাভাগি করা হবে। ফলে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ সর্বাবস্থায় ব্যাবসায়িক হিসাবের আউটপুট হওয়ার কথা। অথচ সাময়িক হার মুদারাবা গ্রাহককে মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে একধরনের ইনপুট হিসেবে কাজ করে, যা মুদারাবার মূল চেতনাকে ধ্বংস করে ফেলে। উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংক সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, যে অ্যাকাউন্টের বিপরীতে লভ্যাংশের যে হার ঘোষণা করা হয়ে থাকে—তা-ই গ্রাহকদের প্রদান করার। এরূপ কর্মনীতি একদিকে মুদারাবার মূল চরিত্র নষ্ট করে, অপরদিকে জনমনে বিভ্রান্তি জন্ম দেয়।

অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংকগুলো যেভাবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মুদারাবা প্রোডাক্টের জন্য সাময়িকভাবে এক একটা হার ঘোষণা করে থাকে এবং সেই অনুযায়ী—সামান্য কম বা বেশি করে—মুনাফা প্রদান করে থাকে, প্রকৃত মুনাফা নিরূপণের সময় এ পার্থক্য কীভাবে নিরূপণ করে এবং বণ্টন করে—তা মোটের ওপর

৭২. https://binbaz.org.sa/fatwas/18710/لا-يجوز-تعيين-الربح-بمبلغ-معلوم-في-المضاربة-او-غيرها

সংশয়পূর্ণ। গ্রাহকরা জানে না, কোন পদ্ধতিতে এ মুনাফা ভাগ করা হয় এবং মুনাফার প্রকৃত পরিমাণ কত? এ কারণে জনমনে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এএমডি মুহাম্মাদ শামসুজ্জামান বলেন—

> ...সুতরাং ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতে পূর্বেই কোনো মুনাফা হার অফার করতে পারে না। Its not predetermined, ব্যাংকগুলো এ মূলনীতির ওপর আছে কি? দ্বিতীয়ত, একই প্রোডাক্টে ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি করতে পারে কি? করলে তাতে ইনসাফের ব্যত্যয় হওয়ার ঝুঁকি থাকে কি?
>
> প্রশ্নগুলো আর্থিক বাজারে প্রচলিত আছে এবং পরখ করে সত্যতাও পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরে ডিপোজিট মাঠ যখন গ্রীষ্মের মতো শুষ্ক ও চরম প্রতিযোগিতামূলক তখন কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক মুদারাবাকেও বাজারভিত্তিক করে নিয়েছে। এমনও ইসলামী ব্যাংক আছে, যেখানে আপনার সাথে রীতিমতো মুনাফার হার নিয়ে অফার সাজিয়ে রেখেছে। এখনও ব্যাবসা শুরুই হলো না, মুনাফার আলাপ হয় কী করে? এখানে ক্ষান্ত হলেও হতো, মুনাফা নিশ্চিত করতে তা লিখেও দেওয়া হয়। এখানে শরীয়া বোর্ড কি যথাযথ ভূমিকা রাখছে?[৭৩]

ঘ. অন্তর্বর্তী সময়ে সাময়িক হারে মুনাফা বণ্টন ও ব্যাংকসমূহের অনুশীলন

শরীয়তের সাধারণ নীতি হলো—الربح وقاية لرأس المال—‘মুনাফা হলো মূলধনের সুরক্ষাবিশেষ’। তাই পুঁজি পুরোটাই তার মালিকের কাছে সঁপে দেওয়ার আগে মুদারিবের কোনোরূপ মুনাফা গ্রহণের অধিকার নেই।[৭৪] এ ব্যাপারে সকল ইমামই একমত। কারণ—ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—‘মুদারাবা কারবার নিষ্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেকোনো ক্ষতি ও ধ্বংসের সমন্বয় আগে মুনাফা থেকেই করা হবে এবং এর পরেই দু-পক্ষের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করা হবে।’

---

৭৩. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে, ৬ষ্ঠ পর্ব*, https://www.facebook.com/share/p/1fc7 LGiMx DmjnDaP/?mibextid=oFDknk

৭৪. وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال (ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ৫, পৃ. ১৬৯)

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন—

> الربح في المضاربة يقسم بعد التصفية وتنضيد المال، حقيقة أو حكما، أي تحويل جميع البضاعة إلى نقود، أو تقويم ما بقي منها، ومعرفة الربح، وهو ما زاد على رأس المال، بعد خصم المصروفات.
>
> মুদারাবা কারবারে লিকুইডেশন ও সম্পদ নিরূপণের পরেই মুনাফা বণ্টন করা হবে। সম্পদের নিরূপণটা চাই প্রকৃতভাবে হোক কিংবা বিধিগতভাবে হোক। সম্পদ নিরূপণের অর্থ হলো—মুনাফা বণ্টনের জন্য সকল পণ্যকে অর্থে রূপান্তরিত করা কিংবা অবশিষ্ট সকল সম্পদের মূল্যমান নির্ধারণ করা এবং (কী পরিমাণ) মুনাফা (হয়েছে তা) জানা। আর মুনাফা হলো ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট খরচাদি বাদ দেওয়ার পরে মূলধনের ওপর যা বৃদ্ধি পায়।[৭৫]

তবে মুদারাবা কারবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে অর্থাৎ চুক্তি চলাকালীন প্রাথমিকভাবে মুনাফার অংশবিশেষ বণ্টন করা যাবে কি না—এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে :

শাফিয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের মতে, তা জায়িয, তবে সে ক্ষেত্রে 'মুনাফা মূলধনের জন্য সুরক্ষাবিশেষ' নীতির প্রতি সবিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। পরবর্তী সময়ে মূলধনে কোনোরূপ ক্ষতি সাধিত হলে তা বণ্টিত মুনাফা থেকে সুসমন্বয় করতে হবে। তাদের কথার যুক্তি হলো—মুনাফা দেখা যাওয়ার সাথে সাথেই আমিল (উদ্যোক্তা) তার নির্দিষ্ট অংশের মালিক হয়ে যায়। তবে তার এ মালিকানা স্থায়ী নয়। এ কারণে মুদারাবা কারবারেও যে পরিমাণ মুনাফা দেখা যাবে তা (সাময়িকভাবে) বণ্টন করা জায়িয হবে।[৭৬]

কিন্তু অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগে মুনাফা বণ্টন করা জায়িয নয়। কারণ, মুনাফা বলতেই বোঝানো হয় মূলধনের ওপর

---

৭৫. https://islamqa.info/ar/answers/319978/متى-يقسم-الربح-في-المضاربة-وحكم-اشتراط-المشاركة-في-الخسارة-على-عامل-المضاربة

৭৬. https://islamqa.info/ar/answers/319978/متى-يقسم-الربح-في-المضاربة-وحكم-اشتراط-المشاركة-في-الخسارة-على-عامل-المضاربة

বৃদ্ধিসাধনকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, যেকোনো বস্তুর বৃদ্ধিসাধন তখনই স্পষ্ট নিরূপণ করা যায়, যখন মূলবস্তু বহাল তবিয়তে থাকে। সুতরাং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগ পর্যন্ত মূল বস্তু যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবে—তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে *শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডস*-এ বলা হয়েছে—

- মুদারাবায় (চুক্তির নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত) মূলধনের বিদ্যমানতা নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনো মুনাফা নেই। মুদারাবা কার্যক্রমে যখনই কোনো ক্ষতি দেখা দেবে, তখন তা অপরাপর কার্যক্রমের মুনাফাগুলো থেকে এডজাস্ট করা হবে; পরবর্তী মুনাফা দ্বারা পূর্ববর্তী ক্ষতির সমন্বয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় ব্যাবসার সামগ্রিক কার্যক্রমের ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ সময় যদি দেখা যায় যে, মুনাফার চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়েছে, তবে মূলধন থেকে ক্ষতির পরিমাণ কেটে নেওয়া হবে এবং মুদারিব যেহেতু একজন ট্রাস্টি, তাই সে এই ক্ষতির কোনো দায় বহন করবে না, যদি না তার কোনো সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা প্রমাণিত হয়। আর যদি দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট খরচাদি অর্জিত আয়ের সমপরিমাণ, তবে রব্বুল মাল তার মূলধন ফিরে পাবে এবং মুদারিব কিছু পাবে না। যদি দেখা যায় যে, মুনাফা হয়েছে, তবেই দু-পক্ষের মধ্যে তাদের চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করা হবে।

- মুদারাবা কার্যক্রমে মুনাফা দেখা যাওয়ার সাথে সাথেই মুদারিব তার মুনাফার অংশের অধিকারী হবে; তবে তার এ অধিকার একান্তই সাময়িক; স্থায়ী নয়। কেননা, এরূপ কারবারে মুনাফা মূলধনের রক্ষাকবচ হিসেবে বরাদ্দ থাকে। কাজেই চুক্তিশেষে সম্পদ নিরূপণের সময়—চাই এ নিরূপণ প্রকৃতভাবে হোক বা বিধিগতভাবে হোক—বণ্টন ব্যতীত এ অধিকারের নিশ্চায়ন হবে না। তবে যে পরিমাণ মুনাফা দেখা যাবে তা অ্যাকাউন্টের অধীনে আপাতত বণ্টন করা জায়িয হবে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় যা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে তা সমন্বয় করা হবে।

- চুক্তি শেষে সম্পদ নিরূপণ করে মুনাফা চূড়ান্তভাবে বণ্টন করা হবে। সম্পদ নিরূপণ দু-ভাবে হতে পারে—

ক. সম্পদগুলো আগে যে মূল্যে বেচাকেনা করা হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ বিক্রয় মূল্যে সম্পদের) মূল্য নির্ধারণ করা। একে সম্পদের প্রকৃত নিরূপণ (التنضيض الحقيقي) বলা হয়।

খ. সম্পদগুলোর একটা ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা। একে সম্পদের বিধিগত নিরূপণ (التنضيض الحكمي) বলা হয়। মূল্য নির্ধারণের ওপর ভিত্তি করেও মুনাফা বণ্টন করা যাবে।[৭৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, শরীয়তের সাধারণ নীতি হলো—মুদারাবা কারবারে লিকুইডেশন ও সম্পদ নিরূপণের পরেই মুনাফা বণ্টন করা। তবে একদল ফকীহের মতে—চুক্তি চলাকালীন উভয়ের সম্মতিতে প্রাথমিকভাবে মুনাফার অংশবিশেষ বণ্টন করা জায়িয; কিন্তু শর্ত হলো—পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত হিসাবায়নের সময় তা সঠিকভাবে সমন্বয় করে নিতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবাকেন্দ্রিক ডিপোজিট গ্রাহকদেরকে মুনাফা প্রদানের জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এ পদ্ধতিতে যেহেতু বছর সমাপ্তির পর হিসাবায়ন চূড়ান্ত করা হয়ে থাকে, তাই অন্তর্বর্তী সময়ে সাধারণত ব্যাংকগুলো থেকে গ্রাহকদেরকে প্রথমে জমাকৃত আসলের ওপর শতকরা হারে একটি সাময়িক বা প্রভিশনাল মুনাফা দিয়ে দেওয়া হয় এবং সে ক্ষেত্রে হিসাবায়ন চূড়ান্ত হলে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার সঙ্গে সাময়িক হারের সমন্বয় করতে হয়। অর্থাৎ, প্রদত্ত সাময়িক হার কম হলে বাকিটা দিয়ে দিতে হয়, আর সাময়িক হার বেশি হলে অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা ফেরত নিয়ে সমন্বয় করতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনুশীলনের সময় ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে, যার অধিকাংশই শরীয়া পরিপালনের দৃষ্টিতে প্রশ্নবোধক হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি সমস্যা হলো নিম্নরূপ :

১. হিসাব খোলার ফরমের চুক্তিপত্রে কেবল সব মুদারাবা গ্রাহকের জন্য একটি একক প্রফিট শেয়ারিং রেশিও বা পিএসআর উল্লেখ করা থাকে। অ্যাকাউন্টের প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রাহক পর্যায়ে কী হারে বা কীভাবে মুনাফা বণ্টন করা হবে—তা উল্লেখ করা থাকে না। ফলে গ্রাহকের কাছে মুনাফা ভাগাভাগির প্রকৃত পদ্ধতি ও পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে।

---

৭৭. আওফি, *আল মাআয়ির আশ শরঈয়্যাহ (শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডস)*, পৃ. ১৮৫

২. গ্রাহকের কাছে একটি সাময়িক বা সম্ভাব্য মুনাফার হার ঘোষণা করা হয়ে থাকে। ফলে গ্রাহকরা সুদের হারের সঙ্গে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। কেননা সাময়িক হার জমাকৃত মূল টাকার ওপর শতকরা হারে হয়ে থাকে।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক হার পরবর্তী সময়ে বা মেয়াদ শেষে ফাইনালই হয়ে যায়, অর্থাৎ প্রভিশনাল বলা হলেও সেটাই ফিক্সড রেট হয়ে যায়, অর্থাৎ, পরবর্তী সময়ে আর সমন্বয় করা হয় না। বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং ধারার পথিকৃৎ হিসেবে সমধিক পরিচিত এম আযীযুল হক তাঁর লিখিত বই *ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুনাফা বণ্টন*-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন—"অনেক সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কোনো কোনো ব্যাংক ওয়েটেজ পদ্ধতিতে অস্থায়ী মুনাফা প্রদান করার পর পরবর্তী সময়ে মুনাফা সমন্বয় না করেই চূড়ান্ত হিসাব সম্পন্ন করেছে।"

৪. অনেক সময় দেখা যায়, যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের চাহিদা যত বেশি, তার সাময়িক মুনাফার হার তত বেশি থাকে, যার সাথে তার ব্যাবসা ও প্রকৃত আয়ের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না।

৫. একই ডিপোজিট প্রোডাক্টের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহককে ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক হার অফার করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক হার বাড়ানোর জন্য নেগোসিয়েশনের সুযোগ থাকে। ফলে একই ধরনের হিসাব খুলে দুজন গ্রাহক দুই ধরনের নির্ধারিত অঙ্কের মুনাফা অর্জন করেন।

৬. বছর শেষে অর্জনকৃত প্রকৃত মুনাফা সাময়িক হারের চেয়ে বেশি হলে গ্রাহককে পুনঃপ্রফিট প্রদান করা হয় না। যেহেতু সেটাই ফাইনাল হিসেবে উল্লেখ করে গ্রাহককে বিদায় করা হয়ে থাকে।

৭. বছর শেষে অর্জিত প্রকৃত হার পরিশোধিত সাময়িক হারের চেয়ে কম হলে তা ফেরত না নিয়ে হিবা (দান) করা হয় বা ইহসান (অনুগ্রহ) করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। উচ্চমাত্রায় ধার্যকৃত সাময়িক হারের কারণে নিয়মিত প্রতি বছর হিবা বা ইহসান করা হয়, অথচ পরবর্তী বছরে সাময়িক হার কমিয়ে পুনর্নির্ধারণ করা হয় না।

৮. যেহেতু পূর্ববর্তী বছরের অর্জিত প্রকৃত হার ও হিবাকৃত অংশের সমন্বয়ে সাময়িক হার নির্ধারণ করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে সাময়িক হার চূড়ান্ত হারে পরিণত হয়, সেহেতু প্রদত্ত মুনাফাটি সুদের সংজ্ঞার আওতায় চলে আসে।

৯. বছর শেষে প্রকৃত আয়ের হার কত হয়েছে—তা গ্রাহকের কাছে প্রকাশ করা হয় না। ব্যাংকের অর্জিত প্রকৃত মুনাফা এবং গ্রাহকের প্রাপ্য চূড়ান্ত হার কত হয়েছিল—তা অজ্ঞাত থাকে। ব্যাংকগুলোর ওয়েবসাইট তল্লাশি করলে মুদারাবা ডিপোজিটের বিপরীতে পূর্ববর্তী বছরগুলোর প্রকৃত মুনাফার হারের কোনো হিস্ট্রিক্যাল ডাটা পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, চলমান সাময়িক হার পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর প্রত্যেকটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে নয়; বরং একেক প্রতিষ্ঠানে একেক ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। মোটাদাগে এ অভিযোগগুলো দুই ধরনের। এক হলো অনুশীলনের ত্রুটি; দুই হলো শরীয়া পরিপালনের ত্রুটি। অনুশীলনের ক্ষেত্রে উত্থাপিত অভিযোগগুলোও একেক ব্যাংকের পরিপ্রেক্ষিতে একেক ধরনের। প্রধান অভিযোগ হলো, কোনো কোনো ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার সাময়িক হারের অপপ্রয়োগ করা, যার ফলে সুদি সিস্টেমের সাথে ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের মৌলিক পার্থক্য ফুটে ওঠে না। এগুলো সংশোধনের লক্ষ্যে সব ব্যাংকের জন্য অনুসরণীয় একটি অভিন্ন গাইডলাইন থাকা দরকার। শরীয়া-সংক্রান্ত ত্রুটিগুলোর ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সমাধানে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। অসমাধানযোগ্য ত্রুটির ক্ষেত্রে তা পরিহার করে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও একটি অভিন্ন গাইডলাইন তৈরি হতে পারে।

মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে সাময়িক হার পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একই রকমের নয়। এতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন বহির্বিশ্বের অনেক দেশের ইসলামিক ব্যাংকে 'এক্সপেক্টেড প্রফিট রেট' থাকলেও প্রত্যেক মাসে মুনাফার হার চূড়ান্ত করা হয় এবং নির্ধারিত ওয়েটের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রকৃত হারের সঙ্গে মাসিকভাবে সমন্বয় করা হয়। অনেক দেশে মুদারাবার মুনাফা বিতরণে সাময়িক হার প্রয়োগ করার সুযোগই রাখা হয়নি। আর এ দেশের অনেক ইসলামিক ব্যাংকে সাময়িক হারই বিপণনের প্রধান অস্ত্র। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান ইসলামিক ব্যাংকিং নীতিমালা (২০০৯) অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন পদ্ধতির বিবরণে কোনো ধরনের সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত অথবা সাময়িক হার ঘোষণা করার নির্দেশনা নেই।

প্রকৃতপক্ষে, মুনাফা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে এ সাময়িক হারের কোনো দূরতম সংযোগও নেই। সংযোগ হয় সব হিসাবায়ন শেষ হওয়ার পর মুনাফা সমন্বয় করার ক্ষেত্রে। তাই ডিপোজিট প্রোডাক্ট অনুযায়ী ব্যাংকগুলো সাময়িক বা

প্রভিশনাল হার কীভাবে নির্ধারণ করবে—সেই সম্পর্কে নির্দেশনা তৈরি করা দরকার। পরবর্তী সময়ে কীভাবে আসল হারের সঙ্গে সাময়িক হারের সমন্বয় সাধন করা হবে—সেই বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। যে ব্যাংক নিয়মিত প্রতি বছর হিবা বা ইহসান করে প্রকারান্তরে সেই ব্যাংক সাময়িক হারটিকে গ্রাহকের জন্য গ্যারান্টেড লাভ হিসেবে নিশ্চিত করে, ফলশ্রুতিতে সাময়িক হারটি প্রকারান্তরে সুদের হারে পরিণত হয়। তাই একটি ব্যাংক অতিরিক্ত পরিশোধিত মুনাফা একাধারে কত বছর হিবা করতে থাকবে, অর্থাৎ প্রভিশনাল হার কমিয়ে পুনঃনির্ধারণ করবে না—সেই বিষয়েও নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

ইসলামিক ব্যাংকগুলোয় আরও এক বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে আন্তঃব্যাংক প্লেসমেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে। নিজেদের তারল্য উদ্‌বৃত্ত ও ঘাটতি সমস্যার সমাধানের জন্য দ্বিপক্ষীয় এ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণটাই কথিত প্রভিশনাল হারের ভিত্তিতে বছরের পর বছর ধরে চলমান রয়েছে, যাতে পরবর্তী সময়ে আর কোনো ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হয় না। এ মুনাফার সঙ্গে ব্যাংকের প্রকৃত ব্যবসায়ের কোনো সংযোগ নেই। সুদের মতো পূর্বনির্ধারিত প্রভিশনাল হারই মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে!

এত অভিযোগের মধ্যেও অতীতের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ তার গ্রাহকের জন্য নির্ধারিত সাময়িক হার প্রতি বছরই প্রকৃত হারের চেয়ে কম করে ধার্য করে থাকে এবং প্রতি বছরের হিসাবায়ন চূড়ান্ত হলে মুনাফা সমন্বয় করার জন্য অতিরিক্ত প্রাপ্য অংশ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে থাকে। আশাব্যঞ্জক খবর হলো, সময়ের ব্যবধানে বর্তমানে আরও কিছু ব্যাংক এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে রেট অ্যাডজাস্টমেন্ট শুরু করেছে।

আগেকার দিনগুলোয় বা অতীতকালে হিসাব-নিকাশ করা অনেক জটিল বিষয় ছিল। সবকিছু ম্যানুয়ালি করতে হতো। তখন ব্যাংকগুলো বছরে দু-বার ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে হিসাবায়ন করত। আর বছরের শেষে লাভ-ক্ষতির হিসাব চূড়ান্ত করত। যুগের পরিবর্তনের ফলে কম্পিউটারায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের সুফল ভোগ করে এখন দেশের সব কনভেনশনাল ও ইসলামিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য লাভ-লোকসানের হিসাব মাসিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করছে। রেগুলেটরি বাধ্যবাধকতার জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তা প্রকাশও করছে। এমনকি চাইলে এ হিসাব দৈনিক ভিত্তিতেও করা সম্ভব। কিন্তু এখনও

কিছু কিছু ইসলামিক ব্যাংক মুদারাবা গ্রাহককে চূড়ান্ত মুনাফা প্রদানের জন্য হিসাব বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরও কয়েক মাস অপেক্ষমাণ রাখবে—এটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এজন্য সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মাসিক ভিত্তিতে মুদারাবা গ্রাহকের মুনাফার হিসাবায়ন চূড়ান্ত করতে বাধ্য করা যেতে পারে।[৭৮] এ প্রসঙ্গে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

ঘ.১. বন্ধ জমা হিসাবের সাময়িক মুনাফা ও চূড়ান্ত মুনাফার সমন্বয়

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে ব্যাংকের লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্তকরণের আগ পর্যন্ত মুদারাবা জমা হিসাবে সাময়িক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়, অতঃপর বছর শেষে লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করার পর চূড়ান্ত মুনাফা ও সাময়িক হারে প্রদত্ত মুনাফার সমন্বয় করা হয়। অর্থাৎ, প্রদত্ত সাময়িক হার কম হলে বাকিটা দিয়ে দিতে হয়, আর সাময়িক হার বেশি হলে অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা ফেরত নিয়ে সমন্বয় করতে হয়। এটা অবশ্যই যাদের হিসাব চলমান রয়েছে তাদের বেলায় প্রযোজ্য; কিন্তু কেউ হিসাব বন্ধ করে চলে গেলে বেশি মুনাফার ক্ষেত্রে তার পাওনা টাকা তাকে প্রদান করা কিংবা কম মুনাফার ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে ব্যাংকের পাওনা আদায় করা কঠিন। এমতাবস্থায় মুদারাবা গ্রাহকদের বন্ধ হিসাবসমূহে প্রদেয় মুনাফা বণ্টনে যেন সমস্যা না হয় সেজন্য গ্রাহক যখনই কোনো মুদারাবা হিসাব বন্ধ করতে আসবেন, তখনই তার সাথে ভবিষ্যতে যোগাযোগের ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি লিখে রাখতে হবে এবং ব্যাংকের eIBS-এ পোস্টিং দিতে হবে।

ঘ.২. মেয়াদি হিসাবে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন ও মুনাফা প্রদান

টিডিআর ও অন্যান্য মেয়াদি জমা হিসাবের ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়নকালে বিশেষ কিছু অবস্থায় কোনো মুনাফা প্রদান করা হয় না। যেমন—২ বছর, ৩ বছর, ৪ বছর বা ৫ বছর মেয়াদি হিসাব ৩ মাস পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করা হলে অনেক ব্যাংকই ওই হিসাবের বিপরীতে কোনো মুনাফা প্রদান করে না। অনুরূপ মুদারাবা ডিপোজিট পেনশন স্কিম, মুদারাবা

---

৭৮. https://bonikbarta.net/home/news_description/357430/মুদারাবা-গ্রাহককে-সাময়িক-হারে-মুনাফা-প্রদানের-সমস্যা-ও-কিছু-কথা

ডিপোজিট হজ স্কিম প্রভৃতি হিসাবে ১ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়ন করা হলে অনেক ব্যাংকই কোনো মুনাফা প্রদান করে না।

আমরা মনে করি, এ ক্ষেত্রে মুনাফা কর্তন না করে ওইসব হিসাবের বিপরীতে অন্তত ন্যূনতম মুনাফা দেওয়া উচিত। ব্যাংকগুলো আন্তরিক হলে বর্তমানে ডিজিটালাইজেশনের এ যুগে মাসিক ভিত্তিতে হিসাব সম্পন্ন করেও ওই হিসাবগুলোর বিপরীতে ন্যায্য মুনাফা প্রদান করা যেতে পারে, এমনকি দৈনিক ভিত্তিতে হিসাব করেও ওইরূপ হিসাবের বিপরীতে ন্যায্য মুনাফা প্রদান করা অসম্ভব নয়।

ঙ. অগ্রিম মুনাফা বণ্টন

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, চুক্তি চলাকালীন উভয়ের সম্মতিতে প্রাথমিকভাবে মুনাফার অংশবিশেষ বণ্টন করা জায়িয। তবে এর জন্য কয়েকটি শর্ত হলো—

ক. চুক্তি মোতাবেক মূলধনের ওপর মুদারিবের কবজ সাব্যস্ত হতে হবে। অর্থাৎ, মূলধন তার হাতে চলে আসতে হবে।

খ. সরবরাহকৃত মূলধন বিনিয়োগে খাটাতে হবে।

গ. বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর বণ্টনযোগ্য মাত্রায় মুনাফা দেখা যেতে হবে।

সুতরাং মূলধন মুদারিবের হাতে আসা এবং তা বিনিয়োগ করে মুনাফা দেখা যাওয়ার আগে মুনাফা বণ্টন করা জায়িয হবে না। শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন—

> وشرط جواز القسمة : قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال؛ حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم ، مضاربة بالنصف، فربح ألفا ، فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب ، لم يقبضه رب المال ، فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإن القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال.

(মুনাফা) বণ্টনের শর্ত হলো মূলধন করায়ত্ত হওয়া। তাই মূলধন করায়ত্ত হওয়ার আগে মুনাফা বণ্টন করা বৈধ নয়। এমনকি যদি একজন লোককে মুদারাবায় অর্ধেক হারে মুনাফা বণ্টনের শর্তে এক হাজার দিরহাম দেওয়া হয়, অতঃপর সে এক হাজার দিরহাম মুনাফা অর্জন করে, এর পর দুজনেই মুনাফা ভাগ করে নেয়, কিন্তু মূলধন মুদারিবের হাতে থাকে; রব্বুল মাল তা কবজ করেনি, এ অবস্থায় দুজনের মুনাফা বণ্টনের পর মুদারিবের হাতে থাকা মূলধন এক হাজার দিরহাম যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে প্রথম বণ্টনটি বিশুদ্ধ হবে না। এ অবস্থায় মুনাফা হিসেবে গৃহীত রব্বুল মালের অংশটি মূলধনের অংশরূপে বিবেচ্য হবে এবং মুদারিবের গৃহীত অংশটি তার ওপর রব্বুল মালের পাওনা হিসেবে বিবেচ্য হবে, যে যাবৎ না রব্বুল মাল তার মূলধন পুরোটাই গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং রব্বুল মাল মূলধন পুরোটা গ্রহণ করে না নেওয়া পর্যন্ত মুনাফা বণ্টন করা বিশুদ্ধ হবে না।[৭৯]

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক তাদের কোনো কোনো প্রোডাক্টে ডিপোজিটরদেরকে তাদের মূলধন জমাদানের সাথে সাথে কিংবা অব্যবহিত পর সাময়িক হারে মুনাফার নির্দিষ্ট একটা অংশ অগ্রিম দিয়ে থাকে। এভাবে অগ্রিম মুনাফা প্রদান করা জায়িয হবে না, যে যাবৎ না সরবরাহকৃত মূলধন বিনিয়োগে খাটানো হবে এবং বণ্টনযোগ্য মাত্রায় মুনাফা দেখা দেবে।

ব্যাংকের বক্তব্য থাকে—মুদারাবায় নীতিমালায় গৃহীত সকল ধরনের ডিপোজিট তাৎক্ষণিকভাবে ইনভেস্টমেন্ট পুলে চলে যায় অতঃপর সে ফান্ড বিনিয়োগ করা হয়। আর অগ্রিম প্রদত্ত এই মুনাফা হলো নিরেট সাময়িক বা প্রভিশনাল মুনাফা; হিসাবায়ন চূড়ান্ত হলে প্রকৃত মুনাফার সঙ্গে তা সমন্বয় করা হবে। তাদের এ কথা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিযোগ্য। কারণ, এভাবে অগ্রিম মুনাফা প্রদান প্রকারান্তরে রব্বুল মালকে তার মূলধন ও মুনাফার গ্যারান্টি দেওয়ার নামান্তর; এ অবস্থায় রব্বুল মাল ধারণা করে নিতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে তার কোনো ঝুঁকি নেই, যা মুদারাবা নীতিমালার সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয় এবং সুদিব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এটা ঠিক যে, মুদারাবায় নীতিমালায় গৃহীত সকল ধরনের ডিপোজিট তাৎক্ষণিকভাবে

৭৯. আওফি, *আল মাআয়ির আশ শরঈয়্যাহ (শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডস)*, পৃ. ১৮৫

ইনভেস্টমেন্ট পুলে চলে যায়, অতঃপর সে ফান্ড বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু অনেক সময় ব্যাংকে যদি অধিক তারল্য থাকে, সে ক্ষেত্রে ফান্ড তাৎক্ষণিকভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। কাজেই এ অবস্থায় সরবরাহকৃত মূলধন বিনিয়োগে খাটানো, অতঃপর মুনাফা দেখা যাওয়ার আগে অগ্রিম মুনাফা বণ্টন করা জায়িয হবে না।

চ. মূলধন সরবরাহকারীর লোকসান বহন প্রসঙ্গ

মুদারাবা কারবারে লোকসান হলে সেই লোকসান কীভাবে পোষানো যায়—এ প্রসঙ্গে একটি সাধারণ মূলনীতি হলো—كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح- "মুদারাবা কারবারে প্রত্যেক লোকসানের সমন্বয় মুনাফা থেকেই করা হবে।"[৮০] অর্থাৎ, মুদারাবা কারবারে যদি পুঁজি নষ্ট হয় কিংবা আর্থিক কোনো ক্ষতি সাধিত হয়, তবে তা আগে মুনাফা থেকেই সমন্বয় করা হবে। সাইয়িদ ইয়াযদী বলেন, كل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح-"মুদারাবা কারবার নিষ্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেকোনো ক্ষতি ও ধ্বংসের সমন্বয় আগে মুনাফা থেকেই করা হবে।"[৮১]

উপর্যুক্ত সূত্রের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, মুদারাবা কারবারে সাধারণত মুনাফা দু-পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হবে; আর কোনোরূপ ক্ষতি সাধিত হলে তা সম্পদের ওপরে যাবে। উল্লেখ্য, এখানে সম্পদ বলতে মূলধন ও মুনাফা দুটিই উদ্দেশ্য।

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ ম্যানুয়ালে উল্লিখিত বক্তব্য—'মুদারাবা কারবারে লোকসান হলে তা সম্পূর্ণ আমানত-জমাকারীই বহন করবে'—ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কারবারে স্বাভাবিকভাবে লোকসান হয়ে পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা আগে মুনাফা থেকেই সমন্বয় করা হবে। মেয়াদ শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার পর কারবারে লোকসান দেখা গেলে এবং তা আগে মুনাফা থেকে সমন্বয় করা না গেলে তা আমানত-জমাকারীই বহন করবে, যদি

---

৮০. কাযিম আল মুস্তাফাভী, *মিয়াতু কায়িদাতিন ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ১৯৭-১৯৯ [availabled at: https://mail.almerja.com/reading.php?idm=61623]

৮১. কাযিম আল ইয়াযদী, *আল উরওয়াতুল উছকা*, পৃ. ৫৩২

ব্যাংকের কোনো অবহেলা বা দুর্নীতি প্রমাণিত না হয়। যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ অবহেলা, নিয়ম লঙ্ঘন বা দুর্নীতি প্রমাণিত হয়, তবে লোকসানের দায় ব্যাংককেই নিতে হবে। ইমাম ইবনু আবদিল বার রাহ. বলেন—

ولا خلاف بين العلماء أن المقارض (أي : عامل المضاربة) مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال، من غير جناية منه (فيه) ولا استهلاك له ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء.

আলিমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, মুদারিব হলো আমানতদার (সদৃশ)। কাজেই তার কাছে সংরক্ষিত অর্থসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে তাতে তার ওপর কোনো দায় বর্তাবে না, যদি না তার কোনো অপরাধ এবং স্বেচ্ছায় নষ্ট ও ধ্বংসকরণ প্রমাণিত না হয়। এটাই হলো আমানত ও আমানতদারদের ব্যাপারে অনুসৃত রীতি।[৮২]

চ.১. মুদারাবা লস ক্যারি ফরওয়ার্ড

মুদারাবা পদ্ধতিতে প্রকল্পে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী মুদারিব ও সাহিবুল মালের মধ্যে তা বণ্টিত হয়, আর ক্ষতি হলে সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংককে তা বহন করতে হয়। এ অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট ডিলে ক্ষতি হলে তা পরবর্তী লাভজনক ডিলের সাথে সমন্বয় করা হলে তাকে 'লস ক্যারি ফরওয়ার্ড' বলা হয়।

মুদারাবা কারবারে যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কোনো ডিলে লোকসান হয়, তবে তা পরবর্তী লাভজনক ডিলের মুনাফা থেকেই সমন্বয় করা হবে। অর্থাৎ, একই চুক্তির অধীনে চলমান মুদারাবার ক্ষেত্রে লস ক্যারি ফরওয়ার্ড করা বৈধ—যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মুদারাবা বিনিয়োগটি চলমান মুদারাবা না হলে এবং উক্ত মুদারাবায় লোকসান হলে উক্ত লোকসান একই গ্রাহকের অনুকূলে আলাদা বা পরবর্তী মুদারাবায় ক্যারি ফরওয়ার্ড করা বৈধ নয়। অর্থাৎ, এ অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট ডিলে লোকসান হলে তা পরবর্তী লাভজনক ডিলের সাথে সমন্বয় বা লস ক্যারি ফরওয়ার্ড করা বৈধ হবে না।[৮৩]

---

৮২. ইবনু আবদিল বার, *আল ইস্তিযকার*, খ. ২১, পৃ. ১২৪

ছ. প্রকৃত মুনাফা বণ্টন না করা

মুদারাবা কারবারের একটি প্রধান শর্ত হলো—কারবারে মুনাফা হলে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুসারে আনুপাতিক হারে উভয় পক্ষের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করতে হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ করি, অনেক সময় প্রকৃত মুনাফা দু-পক্ষের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয় না; বরং মুনাফা—বেশি হলেও—একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকেই তা বণ্টন করা হয়। এমনকি যদি ক্ষতিও হয় তবুও একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকেই গ্রাহকদের মুনাফা দেওয়া হয়। যেমন—ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহকদেরকে সাধারণত ৫ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা দিয়ে থাকে। মুনাফা বেশি হলেও এ হারের চেয়ে বেশি মুনাফা তারা সাধারণত দেয় না। এটা স্পষ্টতই শরীয়া লঙ্ঘন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইবরাহীম খালেদ বলেন—

> ইসলামী ব্যাংকিং হচ্ছে গ্রাহকরা লাভের অংশ পাবেন, আবার লসেরও ভাগীদার হবেন। কিন্তু এখন তারা (গ্রাহকরা) লাভের অংশ পাচ্ছেন না। লাভ হচ্ছে ৫০ পার্সেন্ট; আপনি দিচ্ছেন অর্ধেক বা কিছু একটা হচ্ছে।[৮৪]

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, অনেক সময় দেখা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানতকারীদেরকে যে হারে মুনাফা দেয়, সেটা প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে আমানতকারীদেরকে দেওয়া সুদের হারের প্রায় সমতুল্য বা কাছাকাছি। এমনকি উভয় ধরনের ব্যাংকের মুনাফার হার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পলিসি রেটের সাথে একত্রে ওঠানামা করে। কিন্তু কেন অন্য সকল ব্যবসায়ীর মতো ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফার হার তারতম্য করে না? কিংবা বড়ো বড়ো প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে কেন ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের ২০%-৩০% মুনাফা দিতে পারে না? এগুলো রীতিমতো প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যায়।

শরীয়তের একটি সাধারণ নীতি হলো—রব্বুল মালের অনুমতি ব্যতীত মুদারিব তার মুনাফার অংশ নেবে না। কারণ, রব্বুল মাল ও মুদারিব একে অপরের অংশীদার, কাজেই মুদারিবের মুনাফা গ্রহণের ক্ষেত্রে তার শরীক রব্বুল মালের অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। অধিকন্তু, শরীয়তের দৃষ্টিতে, মুদারাবায় লাভ-লোকসানের বিস্তারিত হিসাব রব্বুল মালকে জানাতে হয় এবং তার

৮৪. https://bangla.bdnews24.com/economy/article1300586.bdnews

উপস্থিতিতেই মুনাফা বিতরণ করতে হয়। কোনো অবস্থাতেই মুদারিব তার লাভের অংশ নিজে নিজেই রব্বুল মালের অনুপস্থিতিতে বা অজান্তে গ্রহণ করতে পারে না।

ব্যাংকের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা লক্ষ করি, ব্যাংক এ ধরনের কারবারে নিজে নিজেই তার লাভের অংশ গ্রহণ করে এবং রব্বুল মালকে কারবারের প্রকৃত লাভ-লোকসানের হিসাব জানায় না; বরং তাকে একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে লাভের একটি অংশ দেয়, যা অনেক সময় প্রকৃত লাভের চেয়ে কম হয়। ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে *দৈনিক প্রথম আলো* 'মুনাফা বাড়লেও লভ্যাংশ অপরিবর্তিত রেখেছে ইসলামী ব্যাংক' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়—

> সর্বশেষ হিসাব বছরে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের সমন্বিত শেয়ারপ্রতি আয় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মুনাফা বাড়লেও লভ্যাংশ অপরিবর্তিত রেখেছে ব্যাংকটি। গত ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হওয়া সর্বশেষ হিসাব বছরের জন্য বিনিয়োগকারীদের ১০ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইসলামী ব্যাংক। ২০২২ সালেও ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল ব্যাংকটি।...উল্লেখ্য, ২০১৬ থেকে প্রতি বছর বিনিয়োগকারীদের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে ইসলামী ব্যাংক।[৮৫]

এখানে আরও একটি দুঃখজনক ব্যাপার হলো, রব্বুল মালদেরকে মোট লাভের অংশ দেওয়া হয় না। কেবল যেই পরিমাণ অর্থ ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগে খাটানো হয় সেখান থেকে অংশবিশেষ দেওয়া হয়। অথচ বিনিয়োগই কোনো ব্যাংকের আয়ের একমাত্র উৎস নয়। বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস চার্জ ও কমিশন থেকে ব্যাংক মোটা অঙ্কের টাকা লাভ করে, যার কিছুই মুদারাবা-ডিপোজিটররা পায় না, অথচ বলতে গেলে প্রায়ই তাদের টাকায় ব্যাংক চলে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ব্যাংকের কোনো লোকসান হলে তখন ব্যাংক তার কোনো ভাগ নেয় না; বরং পুরোটাই ডিপোজিরটিরদের ওপর চাপায়। অর্থাৎ, লাভের ক্ষেত্রে যদিও ব্যাংক তার মোট লাভের অংশ গ্রাহকদের দেয় না; কিন্তু লোকসানের ক্ষেত্রে পুরোটাই গ্রাহকদের ওপর ন্যস্ত করে।

---

৮৫. মুনাফা বাড়লেও লভ্যাংশ অপরিবর্তিত রেখেছে ইসলামী ব্যাংক, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ এপ্রিল ২০২৪

উপরন্তু, ব্যাংক রব্বুল মাল থেকে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করলেও নিজে প্রায়ই বিনিয়োগ করে মুরাবাহা ও ইজারা পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, ব্যাংক এভাবে বিনিয়োগ করে, যাতে তাকে সাধারণত লাভ-লোকসানের কোনো ভাগ বহন করতে হয় না; কিন্তু ব্যাংকে যারা মুদারাবায় টাকা রাখছে তারা লোকসানের ভাগ পুরোটাই বহন করছে। এ অবস্থায় একটি বিরাট নৈতিক স্খলনের সুযোগ আছে। কোনো ইসলামী ব্যাংক যদি লাভ কম করে দেখাতে পারে, তাহলে সে বেশি লাভ করতে পারবে অথবা কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ অবহেলা কিংবা দুর্নীতির কারণে যদি ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এর দায়ভার কর্তৃপক্ষ নিজেদের ওপর না চাপিয়ে গ্রাহকদের ওপর চাপাতে পারে। কোনো কোনো ব্যাংকের বিরুদ্ধে এও অভিযোগ রয়েছে যে, সে নিজের অনুকূলে লাভ বেশি নিতে এবং গ্রাহকদের বঞ্চিত করতে অডিটর দিয়ে সরাসরি হিসাবে গরমিল করে রিপোর্ট তৈরি করে থাকে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ব্যাংকের প্রায়ই বিনিয়োগ যেহেতু মুরাবাহা ও ইজারা পদ্ধতিতে, যেখানে তাকে সাধারণত লাভ-লোকসানের কোনো ভাগ বহন করতে হয় না, সে ক্ষেত্রে আমরা বাস্তবে কী দেখছি! লক্ষ করা যায়, দেশের প্রতিটা ব্যাংকে প্রতি ২-৪ মাস পরপর লভ্যাংশের হার কমতে থাকে। অর্থাৎ, আমরা এখন ব্যাংক থেকে যে লভ্যাংশ পাই হয়তো ২-৪ মাস পর এই লভ্যাংশও পাব না, তখন আরও কম পেতে পারি। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহককে আমানতের লভ্যাংশের হার কখনোই মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে কম দিতে পারবে না। সুতরাং, এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অবহেলা ও দুর্নীতির কারণে গ্রাহকরা প্রকৃতপক্ষে লভ্যাংশের যে হার পাওয়ার কথা এবং যা বছরের পর বছর বৃদ্ধির পাওয়ার কথা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ ব্যাংক টিকিয়ে রাখার স্বার্থে গ্রাহকদেরকে প্রকৃত লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করে সবসময় একটা নির্দিষ্ট/কাছাকাছি পরিমাণ লভ্যাংশ দিয়ে থাকে।

জ. রব্বুল মালের লোকসান : বাস্তবতা

সুদীর্ঘ বাস্তবতা থেকে জানা যায় না, কোনো ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে রব্বুল মাল তথা ডিপোজিটর লোকসানের শরীক হয়েছে (যদি না ব্যাংক নিজেই দেউলিয়া হয়ে যায়)। তবে এটা ঠিক যে, ইসলামী ব্যাংক—যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—সাধারণত এমনসব পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে, যাতে

তাকে সাধারণত লাভ-লোকসানের কোনো ভাগ বহন করতে হয় না; কেবল লাভেই বিনিয়োগ করে থাকে। কাজেই ব্যাংকে রব্বুল মালের লোকসানের সম্ভাবনা মোটের ওপর নেই বললেই চলে, যদি না তাতে বড়ো ধরনের কোনো দুর্নীতি বা অঘটন ঘটে থাকে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ডিপোজিটরদের লভ্যাংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে—লাভ কম হোক বা বেশি—প্রায় সবসময় একটি হার সামান্য কম-বেশিসহ অনুসরণ করা হয়। সাধারণত দেখা যায় , ডিপোজিটরের লাভের হার সুদের বাজার দরের সাথে প্রায় মিল রেখেই পাশাপাশি চলে। এতে জনমনে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

ঝ. ক্যাপিটাল গেইন (মূলধনি লাভ)

ক্যাপিটাল গেইন (الأرباح الرأسمالية) হলো সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি কারণে যে লাভ হয়ে থাকে। এই লাভটি ঘটে যখন একটি সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রয়মূল্য অতিক্রম করে। অর্থাৎ, আপনি একটি ক্যাপিটাল অ্যাসেট কেনার সময় যে মূল্য দিয়েছিলেন, বিক্রির সময় তার থেকে বেশি মুনাফা হলে তাকে বলা হয় ক্যাপিটাল গেইন। যেমন—রিয়েল এস্টেট প্রোডাক্ট।

এককথায় বছর বছর যে পুঁজি বাড়ে তাকে বলে 'ক্যাপিটাল গেইন'; আর বছর বছর যে আয় হয় তাকে বলে 'রেভেনিউ গেইন'। অর্থাৎ, ব্যাবসা করলে দু-প্রকার লাভ পাওয়া যায়—একটা হচ্ছে চলতি আয় (ডিভিডেন্ড) এবং আরেক হচ্ছে পুঁজি আয় (ক্যাপিটাল গেইন)। যেমন—ধরুন, আপনি ১ কোটি টাকার পুঁজিতে একটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান চালু করলেন। দিন যত যেতে লাগল আপনার প্রতিষ্ঠান তত বড়ো হতে লাগল। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি ও চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সব পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে গেল। এভাবে বছর কয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ আপনার থেকে যদি ১ কোটি টাকায় এই ব্যাবসা কিনতে চায়, আপনি কি রাজি হবেন? নিশ্চয় না। কারণ, ইতোমধ্যে মোট সম্পত্তি বা পুঁজির পরিমাণ ও মূল্য অনেকে বেড়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ করে কেন গ্রাহকরা কেবল চলতি লাভের কিয়দংশ পাবে? ক্যাপিট্যাল গেইনের অংশ কেন পাবে না? ব্যাংক তো এখানে ওয়াকিল কিংবা ব্যবস্থাপক মাত্র। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি গ্রাহকদের টাকা দশ বছরে দশ গুণ করে ফেলার পর গ্রাহকদের ভাগ না দেয়, তা তো এক ধরনের জুলুম বৈ নয়।

আমরা যদি ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ারের দাম দেখি, লক্ষ করি যে, শেয়ারহোল্ডাররা একই সাথে ডিভিডেন্ড (চলতি আয়) পাচ্ছে এবং শেয়ারের দাম (ক্যাপিটাল গেইন)-ও দিনদিন বাড়ছে । কিন্তু শেয়ার বাজারে শেয়ারের দামের সাথে মুদারাবা সঞ্চয়ীদের দরদামের কোনো মিল নেই, যদিও উভয় পক্ষ ব্যাবসার মালিক।

আপনার এফডি করা এক কোটি টাকাকে ম্যানেজম্যান্ট দশ বছরে দশ কোটি টাকা বানিয়ে ফেলল। ঝুঁকিও আপনার; কিন্তু আপনাকে বুঝিয়ে দিলো আপনার দশ বছর আগে আমানত রাখা এক কোটি টাকার হিসাব ও মুনাফা; বাকি নয় কোটির টাকার কোনো হিসাব বা মুনাফা আপনাকে দিলো না। এটা কেমন বিনিয়োগ? এটা কার্যত না বিনিয়োগ, না ব্যাবসা; বরং এটা একধরনের ঋণে পরিণত হলো। কারণ,

ক. ঋণের হিসাব হয় টাকাতে। তাই যা ধার দেওয়া হয়, তা-ই মেয়াদ শেষে টাকার হিসাবে ফেরত আসে। কিন্তু বিনিয়োগের হিসাব হয়ে সম্পদে; তাই সম্পদের দাম অংশীদারত্ব অনুযায়ী ফেরত আসে।

খ. ঋণদাতা কোনো ঝুঁকি নেয় না। তাই আপনি কাউকে ১০% সুদে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দিলে দু-বছর পরে সুদসহ ৫০ লক্ষ টাকাই ফেরত পাবেন। টাকার বিনিময়ে টাকা। কিন্তু বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি বহন করে এবং টাকা দিয়ে মালিকানা কিনে। তাই সে মালিকানার অংশ পায়। অংশীদারত্বের বিনিময়ে অংশীদারত্বের হিসাব।[৮৬]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুদারাবা কারবারে ব্যাংক হয়তো রব্বুল মালের পক্ষে ওয়াকিলরূপে কিংবা মুদারিবরূপে বিবেচিত হয়। প্রথম অবস্থায় সম্পূর্ণ মুনাফা রব্বুল মাল ও বিনিয়োগগ্রহীতা মুদারিবের মধ্যে বণ্টিত হবে; ব্যাংক ওয়াকিলরূপে তার ব্যবস্থাপনা খরচ পাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মুনাফা রব্বুল মাল, ব্যাংক ও বিনিয়োগগ্রহীতা মুদারিবের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বণ্টিত হবে, আর ব্যবস্থাপনা খরচ ব্যাংক ও মুদারিবকেই বহন করতে হবে। উভয় অবস্থায় ডিপোজিটরদের আমানতে অর্জিত ক্যাপিটাল গেইন ব্যাংকের একচেটিয়া ভোগের কোনো অধিকার নেই।

---

৮৬. মোহাইমিন পাটোয়ারী, *ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি*, পৃ. ৪৫-৪৮

ঞ. বোর্ড অব ডিরেক্টরসে ডিপোজিটরদের অংশগ্রহণ

কনভেনশন্যাল ব্যাংকগুলোতে ডিপোজিটররা কেবল ঋণপ্রদানকারী। তাই বোর্ড অব ডিরেক্টরসে তাদেরকে রাখার কিংবা এজিএম-এ ডাকার প্রশ্ন ওঠে না। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ডিপোজিটররা বিনিয়োগকারী। একটি ইসলামী ব্যাংক যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন গ্রাহকরাই সব লোকসান বহন করে। বলতে গেলে সেসময় বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের কোনো সহায়তা করে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের যুক্তি থাকে, যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের ডিপোজিটররা মুদারাবা-বিনিয়োগকারী, তারাই সব লোকসান বহন করবে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত কাউকে ক্ষতিপূরণ দেয় না। এভাবে ডিপোজিটররা তাদের সব টাকাই খুইয়ে ফেলে।

কাজেই মুদারাবা ডিপোজিটররা বিনিয়োগকারী হিসেবে তাদের এটা জানার অধিকার আছে যে, ব্যাংক কোন খাতে এবং কীভাবে তাদের ডিপোজিটগুলো বিনিয়োগ করছে এবং সেখান থেকে কী পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হচ্ছে আর তা কীভাবে বণ্টন করা হচ্ছে; যদি মুনাফা কম হয় কিংবা লোকসান হয় তার কারণই-বা কী? প্রভৃতি। অধিকন্তু, এসব ব্যাপারে তাদের পরামর্শ ও মতামত প্রদানেরও ন্যায্য অধিকার রয়েছে। সুতরাং বিনিয়োগকারী হিসেবে ডিপোজিটরদের মনোনীত অন্তত কয়েকজন প্রতিনিধি ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরসে থাকাটাই যৌক্তিক। ইসলামী শরীয়তের কথাও হলো তা-ই।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ইসলামী ব্যাংকে কেবল মালিকপক্ষ এবং তাদের একান্ত মনোনীত ব্যক্তিবর্গই বোর্ডের সদস্য নিয়োজিত হন। এখানে ডিপোজিটদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। এমনকি বার্ষিক সভাতে (এজিএম-এ) পর্যন্ত ডিপোজিটরদের ডাকা হয় না।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্যাংকের মূলধনের সিংহভাগ আসে ডিপোজিটরদের থেকে। অর্থাৎ, বলতে গেলে তাদের টাকাতেই ব্যাংক চলে; কিন্তু তাদের অধিকার একেবারেই নগণ্য। না তারা ব্যাংকের কোনো কার্যকর ফোরামে নিজেদের কোনোরূপ পরামর্শ ও মতামত জানাতে পারে, না ব্যাংকের কোনো ভুল বা ন্যায়ভ্রষ্ট কার্যক্রমের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করতে পারে।

মুদারাবা হিসাবে মুনাফা বণ্টনপদ্ধতি : পর্যালোচনা

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো—ওয়েটেজ পদ্ধতি ও আইএসএর পদ্ধতি। শুরুতে ইসলামী ব্যাংকিং নির্দেশিকা তৈরি করার সময় ওয়েটেজ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি উপলব্ধ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই ১৫ বছর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচারিত নির্দেশিকাতে ওয়েটেজ পদ্ধতির একমাত্র নমুনা ছিল। পরবর্তী সময়ে আইএসআর পদ্ধতিটি বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে দুটি পদ্ধতিই কমবেশি অনুসৃত হচ্ছে। নিম্নে এ পদ্ধতি দুটির পরিচয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো—

ক. ওয়েটেজ (Weightage) পদ্ধতি

ওয়েটেজ অর্থ ভর, গুরুত্ব। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক অর্জিত মুনাফা থেকে প্রথমে নিজের অংশ আলাদা করে নেয়; এরপর বাকি মুনাফা বিভিন্ন হিসাবের বিভিন্ন ওয়েটেজের ভিত্তিতে গ্রাহকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ মনে করি, হিসাব খোলার সময় জমাকারীদের সাথে ব্যাংকের চুক্তি ছিল জমার অর্থ ব্যবহার করে ব্যাংক যে লাভ করবে তা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ৪০:৬০ অনুপাতে বণ্টিত হবে। ধরি, কোনো ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা মোট জমার পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা এবং এ অর্থ থেকে ব্যাংকের আয় ১০,০০০ টাকা। মুনাফা বণ্টনের চুক্তি মোতাবেক ১০,০০০ টাকা মোট মুনাফার ৪০ ভাগ বা ৪০০০টাকা পাবে ব্যাংক এবং অবশিষ্ট ৬০ ভাগ বা ৬০০০ টাকা পাবে জমাকারীগণ। এখন উক্ত ৬০০০ টাকা মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে সকল ধরনের জমাকারীকে একইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কেননা, মুদারাবা মূলনীতির জমা হিসাবগুলো বিভিন্ন ধরনের ও মেয়াদের হয়ে থাকে। যেমন—স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি প্রভৃতি ধরনের হতে পারে।

জমাকারীদের সকল হিসাবের অর্থের গুরুত্ব ব্যাংকের কাছে সমান নয়। হিসাবের মেয়াদ যত বেশি হয়, সাধারণত সেই অর্থ ব্যাংক ততই সুবিধাজনকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়। তা ছাড়া জমাকারী বেশি মেয়াদে অর্থ জমা করে ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশি ঝুঁকি নেন। এ কারণে ব্যাংক প্রধানত মেয়াদকাল বিবেচনা করে বিভিন্ন হিসাবের ভিন্ন ভিন্ন

ওয়েটেজ বা গুরুত্বের ভিত্তিতে লাভ নির্ধারণ করে। এ ছাড়া কোনো সমাজিক কল্যাণমূলক জমাকে ব্যাংক বাড়তি ওয়েটেজ দিতে পারে। যেমন—নির্ধারিত আয়ের লোকদের পবিত্র হজ পালন উৎসাহিত করতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি হজ অ্যাকাউন্টের জমাকে সর্বোচ্চ ওয়েটেজ দেয়। এভাবে প্রত্যেক ধরনের জমার ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব রয়েছে। এই গুরুত্ব বিবেচনা করে মুনাফা বণ্টনের পদ্ধতিই মূলত 'ওয়েটেজ পদ্ধতি'।[৮৭] কখনও ওয়েটেজ আরোপের বেলায় প্রতিযোগিতামূলক বিচারে অন্যান্য ব্যাংকের প্রদত্ত হারও বিবেচনায় আনা হয় এবং এতে মুনাফার হার কম-বেশি হয়।

এ পদ্ধতিতে বার্ষিক ভিত্তিতে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়। হিসাব সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে সাধারণত বছরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রভিশনাল বা সম্ভাব্য একটি নির্ধারিত হারে মুনাফা দিয়ে দেওয়া হয় এবং বছর শেষে হিসাবান্তে চূড়ান্ত মুনাফা হারের সাথে সমন্বয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে দু-ধাপে আয় বণ্টনের হিসাব করা হয়—

প্রথম ধাপে অর্জিত মুনাফা থেকে ব্যাংক তার নিজের অংশ হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন ২৫%) সরাসরি পৃথক/আদায় করে নেয় এবং অবশিষ্ট অংশ (যেমন ৭৫%) সকল মুদারাবা আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য হয়।

দ্বিতীয় ধাপে আমানতকারীদের মধ্যে সর্বমোট বণ্টনযোগ্য আয় পূর্বনির্ধারিত ওয়েটেজ ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হয়।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, ওয়েটেজ পদ্ধতি একটি জটিল ও দ্বিস্তরীয় হিসাবায়ন ব্যবস্থা। প্রথম স্তরে এটি সম্মিলিতভাবে ব্যাংক ও সকল মুদারাবা আমানতকারীদের মধ্যে একটি শেয়ারিং অনুপাত প্রদান করে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে আমানতকারীদের প্রতিটি গ্রুপ ওয়েটেজের ভিত্তিতে আলাদা শেয়ারিং অনুপাত পায়।

উল্লেখ্য, এসআইবিএল-এর শরীয়া ম্যানুয়ালে ওয়েটেজ পদ্ধতির পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়—'..প্রথম ধাপে মুদারিবের অংশ তথা ব্যবস্থাপনা ফি হিসাবে তহবিল আয়ের নির্দিষ্ট অংশ সরাসরি পৃথক/আদায় করা হয়..।'

---

৮৭. রহমতুল্লাহ খন্দকার, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা*, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ২০২০, পৃ. ৯৯

এখানে 'ব্যবস্থাপনা ফি..' কথাটি শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু চুক্তি অনুসারে ব্যাংকের ভূমিকা মুদারিবের পর্যায়ভুক্ত, তাই মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকৃত আমানত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রব্বুল মালের নিকট থেকে ব্যাংক তার ব্যবস্থাপনা বা সার্ভিসের জন্য কোনো ফি বা চার্জ গ্রহণ করতে পারে না; বরং ব্যাংক যেহেতু তার সার্ভিস বা ব্যবস্থাপনার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে এ বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাবে, তাই তার সার্ভিস ও ব্যবস্থাপনার খরচ তাকেই বহন করতে হবে। কাজেই ব্যাংক—প্রথম ধাপে হোক বা দ্বিতীয় ধাপে হোক—ব্যবস্থাপনা ফি হিসেবে কিছু গ্রহণ করতে পারে না। তবে ব্যাংক যদি তার নিজের লাভের অংশ হিসেবে প্রথম ধাপেও একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়েটেজ পদ্ধতিতে কয়েকটি বিষয় প্রশ্নসাপেক্ষ। যেমন—

১. এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন মুদারাবা হিসাবের জন্য ব্যাংকগুলো মুনাফার সম্ভাব্য হার বা সাময়িক হার ঘোষণা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২. এ পদ্ধতিতে বছর শেষে সমন্বয়ের একটি বিষয় আছে। যদি সঠিকভাবে সমন্বয় করা না হয়, তবে তা শরীয়াসম্মত হবে না। এ পদ্ধতি কার্যত অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো যেরূপ কর্মকাণ্ড অবলম্বন করে, তার অধিকাংশই শরীয়া পরিপালনের দৃষ্টিতে প্রশ্নবোধক হয়ে থাকে। ইতঃপূর্বে আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

খ. আয় বণ্টনের হার (ISR - Income Sharing Ratio) পদ্ধতি

আইএসআর পদ্ধতিতে ইসলামিক ব্যাংক প্রত্যেক ধরনের হিসাবের জন্য আলাদা আলাদা শেয়ারিং রেশিও নির্ধারণ করে। এরপর অর্জিত মুনাফা নিজের এবং গ্রাহকের মধ্যে রেশিও অনুযায়ী ভাগ করে নেয়।

আইএসআর মডিউল অনুসারে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় আমানতদাতার সাথে ব্যাংকের চুক্তি হয় সাধারণত শেয়ারিং রেশিও নিয়ে। যেমন—কোনো আমানাতদাতার ক্ষেত্রে শেয়ারিং রেশিও ৮০:২০। এর অর্থ হলো বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ থেকে আমানতদাতা পাবে ৮০ শতাংশ আর ব্যাংক পাবে ২০

শতাংশ। সাময়িক কিংবা চূড়ান্ত কোনো প্রকার মুনাফার হারের পূর্বঘোষণা এতে থাকে না। বলা চলে, আমানতদাতা ব্যাংকে রাখা আমানতের আয় সম্পর্কে অনিশ্চিত থেকেই অ্যাকাউন্ট খুলে থাকে।

এ পদ্ধতিতে মাসিক ভিত্তিতে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়। ফলে প্রভিশনাল বা সম্ভাব্য হারে মুনাফা দেওয়া বা পরবর্তী সময়ে হিসাব সমন্বয় করার প্রয়োজন হয় না; প্রকৃত মুনাফাই প্রদান করা সম্ভব হয়।

আমানতদাতার কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করার পর ব্যাংক তা শরীয়াসম্মত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে তা থেকে আয় অর্জন করে থাকে। এ আয় থেকে একটি অংশ (ধরা যাক ৫ শতাংশ) প্রফিট ইক্যুয়ালাইজেশন রিজার্ভ হিসেবে রেখে বাকি অংশ বিতরণযোগ্য আয় হিসেবে ধরা হয়। এ বিতরণযোগ্য আয়কে সংশ্লিষ্ট পিরিয়ডের সম্পূর্ণ আমানতের বিপরীতে আয় ধরে প্রত্যেক আমানতদাতার আমানতের বিপরীতে আয়ের পরিমাণ বের করা হয়। সেখান থেকে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় সম্মত হওয়া শেয়ারিং রেশিও অনুযায়ী একটি অংশ আমানতদাতার অ্যাকাউন্টে এবং বাকি অংশ ব্যাংক তার আয় খাতে স্থানান্তর করে।

গ্রাহকের হিসাবে প্রাক্কলিত আয়কে প্রত্যেক মাসেই একটি রেটে রূপান্তরিত করা যায়। সুতরং আইএসআর সিস্টেমে আমানতের বিপরীতে মুনাফার বা আয়ের হার একটি 'আউটপুট', যা ওয়েটেজ সিস্টেম ব্যবহারকারী ব্যাংকগুলোর জন্য 'ইনপুট'।

বিভিন্ন প্রকার মুদারাবা আমানতের জন্য মুনাফা বা আয় বণ্টনের ভিন্ন ভিন্ন শেয়ারিং রেশিও রয়েছে। সাধারণত আমানতের মেয়াদ যত বেশি হবে শেয়ারিং রেশিওতে গ্রাহকের অংশ তত বেশি হবে। বছরের প্রথমে বা হিসাব খোলার সময়ে আয় বণ্টনের এই হার (রেশিও) ঘোষণা করা হয়। গ্রাহক এই শেয়ারিং রেশিওতে সম্মত হয়েই তার অ্যাকাউন্ট খুলে থাকেন।

বাংলাদেশে প্রথম ২০০৮ সালে ব্যাংক এশিয়া 'আইএসআর' (ISR) পদ্ধতির প্রচলন করে। এটি অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত সহজবোধ্য ও আধুনিক; শরীয়া পরিপালনের ক্ষেত্রেও ওয়েটেজ পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর সহায়ক।

প্রথমত, এ পদ্ধতিতে সাময়িক কিংবা সম্ভাব্য কোনো প্রকার মুনাফার হারের অগ্রিম ঘোষণা দিতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, উভয় পদ্ধতিই শেয়ারিং অনুপাত ব্যবহার করে। তবে ওয়েটেজ পদ্ধতিতে প্রথম ধাপে সমষ্টিগত শেয়ারিং রেশিও প্রয়োগ করে, শেষধাপে ওয়েটেজের ভিত্তিতে আলাদা শেয়ারিং রেশিও প্রয়োগ করে এবং চূড়ান্তভাবে মুনাফা বণ্টন করে। পক্ষান্তরে আইএসআর পদ্ধতিতে সরাসরিই ঘোষিত শেয়ারিং রেশিও প্রযোজ্য এবং আর কোনো হিসাবের প্রয়োজন পড়ে না।

তৃতীয়ত, আইএসআর পদ্ধতিতে যেহেতু আমানতের বিপরীতে মুনাফার হার একটি 'আউটপুট', যা ওয়েটেজ সিস্টেম ব্যবহারকারী ব্যাংকগুলোর জন্য 'ইনপুট', তাই আইএসআর পদ্ধতি মুদারাবা কারবারের সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য, সেইসঙ্গে ইসলামী ব্যাংকিংয়েরও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য অধিকতর সহায়ক।

চতুর্থত, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কোনো কোনো ব্যাংক ওয়েটেজ পদ্ধতিতে অস্থায়ী মুনাফা প্রদান করার পর পরবর্তী সময়ে মুনাফা সমন্বয় না করেই চূড়ান্ত হিসাব সম্পন্ন করেছে। পক্ষান্তরে আইএসআর পদ্ধতিতে একবারেই মুনাফা প্রদান করা হয় বিধায় মুনাফা সমন্বয় করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শরীয়া লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থাকে না।

পঞ্চমত, গ্রাহকগণ সহজে ওয়েটেজের ব্যাবহারিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন না, যদিও ব্যাংকারগণ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ওয়াকিবহাল থাকেন। আইএসআর পদ্ধতিতে গ্রাহক মুনাফা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে থাকেন, কারণ মাস শেষে চূড়ান্ত মুনাফা পেয়ে যাচ্ছেন।

মুনাফা বণ্টন : গড় ব্যালেন্স পদ্ধতি ও ডেইলি প্রোডাক্ট বেইসড মেথড

প্রচলিত ব্যাংকিংয়ে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এখানে অগণিত ডিপোজিটর/সঞ্চয়কারী প্রতিনিয়ত প্রবেশ করে, কখনও বেরও হয়। তা ছাড়া দৈনিক বহু মানুষ টাকা যেমন জমা করে, তেমনি টাকা উত্তোলনও করে। অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত প্রবেশ (অ্যাকাউন্ট ওপেন করা বা টাকা জমা করা) এবং বের হওয়া (অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করা বা টাকা তুলে নেওয়া) প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তদুপরি এখানে যারা টাকা জমা করছেন, তাদের মাঝে বহু স্তর আছে—কেউ দীর্ঘ মেয়াদে জমা করেন, কেউ স্বল্প মেয়াদে। কেউ যখন-তখন নগদ তুলে নিতে চান।

প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার উক্ত সঞ্চয়নীতিকে বহাল রেখে ইসলামী ব্যাংকিং করতে হলে উক্ত সঞ্চয়নীতিকে কীভাবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রয়োগ করা হবে—তা নিয়ে যেমন চিন্তা করতে হয়, তেমনি মুদারাবা মুনাফা বণ্টননীতি কীভাবে প্রণীত হবে—তা নিয়েও ভাবতে হয়। বস্তুত মুনাফা বণ্টননীতি কীরূপ হবে—তা একটি জটিল প্রশ্ন। কারণ, প্রচলিত ব্যাংকিং সঞ্চয়নীতিতে যখন-তখন টাকা তুলে নেওয়া হয়, আবার জমা করা হয়। এমনকি মুনাফা বণ্টনের এক-দুদিন আগেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয় অথবা টাকা জমা করা হয়।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমদিকে এমন চিন্তা করা হয়েছিল, মাসের প্রথম দিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট তারিখে আমানতকারীরা ব্যাংকে টাকা জমা দেবেন এবং যাদের প্রয়োজন তারা উঠিয়ে নেবেন। এতে হিসাব সহজ হবে; কিন্তু এ পন্থা অবলম্বন করলে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন :

ক. একদিনে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গেলে যথেষ্ট ভিড় হবে; ফলে ব্যাংকের কর্মচারীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে।

খ. এই ঝামেলার জন্য অনেকেই হয়তো ব্যাংকেই যাবে না; ফলে বেশ কিছু পুঁজি অলস হয়ে পড়ে থাকবে, যা কোনো কাজেই ব্যবহার হবে না।

পরবর্তীকালে এ প্রশ্নের সমাধান নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা চিন্তা করা হয়েছে, বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এখানে দুটি মডেল নিয়ে আলোচনা করা হলো—

ক. গড় ব্যালেন্স পদ্ধতি (Average Balance Method)

এ পদ্ধতির মূলকথা হলো, মুনাফা বণ্টনের সময় প্রতি মাসের গড় হিসাব দেখা হবে; পুরো সময়ব্যাপী গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমার গড় স্থিতি কত ছিল, সেটির ওপর ভিত্তি করে মুনাফা বণ্টন হবে। এটি তিনভাবে হতে পারে। যথা—

ক. মাসের সর্বনিম্ন গড় স্থিতি (Monthly Minimum Balance)

খ. মাসের সর্বোচ্চ গড় স্থিতি (Monthly Maximum Balance)

গ. মাসের সার্বিক গড় স্থিতি (Monthly Average Balance)

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, যায়েদ ইসলামী ব্যাংকে একটি মুদারাবা অ্যাকাউন্ট খুলেছে। মাসব্যাপী সে ওই অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করছে, বেরও করছে। তার প্রতিদিনের একটি সম্ভাব্য ব্যালেন্সশিট হবে এরকম :

তারিখ	ব্যালেন্স	তারিখ	ব্যালেন্স
১ জানুয়ারি	১২০০০	১৭ জানুয়ারি	৩০০০
২ জানুয়ারি	১২০০০	১৮ জানুয়ারি	৩০০০
৩ জানুয়ারি	১২০০০	১৯ জানুয়ারি	৩০০০
৪ জানুয়ারি	১২০০০	২০ জানুয়ারি	৩০০০
৫ জানুয়ারি	১২০০০	২১ জানুয়ারি	৩০০০
৬ জানুয়ারি	১২০০০	২২ জানুয়ারি	৩০০০
৭ জানুয়ারি	১২০০০	২৩ জানুয়ারি	৩০০০
৮ জানুয়ারি	১২০০০	২৪ জানুয়ারি	২০০,০০০
৯ জানুয়ারি	১২০০০	২৫ জানুয়ারি	২০০,০০০
১০ জানুয়ারি	১২০০০	২৬ জানুয়ারি	২০০,০০০
১১ জানুয়ারি	১২০০০	২৭ জানুয়ারি	২০০,০০০
১২ জানুয়ারি	১২০০০	২৮ জানুয়ারি	২০০,০০০
১৩ জানুয়ারি	১২০০০	২৯ জানুয়ারি	২০০,০০০
১৪ জানুয়ার	১২০০০	৩০ জানুয়ারি	২০০,০০০
১৫ জানুয়ারি	১২০০০	৩১ জানুয়ারি	২০০,০০০
১৬ জানুয়ারি	৩০০০	সর্বমোট	১,৮০,৪০০০/-

রেখাচিত্র : ০১, Source: Usmānī 2014, Report Bela Sood Bankari. 2002. P82.

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ১৫ দিন পুঁজি ছিল ১২ হাজার টাকা। এরপর ১৬-২৩ পর্যন্ত ছিল ৩ হাজার টাকা। এরপর ২৪-৩১ পর্যন্ত পুঁজি বৃদ্ধি হয়ে ২ লক্ষ টাকা ছিল। এখন ব্যাংক যখন জানুয়ারি শেষে হিসাব করবে, তখন তার সামনে তিনটি সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে। যথা—

ক. উক্ত মাসে যায়েদের সর্বোচ্চ যে পুঁজি ছিল, সেটিকে মূল ধরে হিসাব করা হবে। অর্থাৎ, ২ লক্ষ টাকার ওপর মুনাফা প্রদান করা হবে। একে Monthly Maximum Balance বলা হয়। কিন্তু এতে সমস্যা হলো, এ পদ্ধতিতে মাত্র ৮দিন তার দু-লক্ষ টাকা ছিল। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে মুনাফা প্রদান করা হলে তা অন্যদের প্রতি জুলুম করা হবে।

খ. উক্ত মাসে যায়েদের সর্বনিম্ন যে পুঁজি ছিল, সেটিকে মূল ধরে হিসাব করা হবে। অর্থাৎ, ৩ হাজার টাকার ওপর মুনাফা প্রদান করা হবে। একে Monthly Minimum Balance বলা হয়। কিন্তু এতে সমস্যা হলো, এ পদ্ধতিতে মাত্র ৮দিন তার তিন হাজার টাকা ছিল। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে মুনাফা প্রদান করা হলেও তার প্রতি জুলুম করা হবে।

গ. উক্ত মাসে যায়েদের গড় পুঁজি বের করা হবে। এর পদ্ধতি হলো, পুরো ৩১ দিনে যে পরিমাণ টাকা ছিল, তা ৩১ দিনে ভাগ করা হবে। এতে যে ভাগফল আসবে সেটিই তার গড় পুঁজি বলে বিবেচিত হবে। যেমন, সর্বমোট পুঁজি ১,৮০,৪০০০ ÷ ৩১ = ৫৮,১৯৪ টাকা। সুতরাং তার গড় পুঁজি আটান্ন হাজার একশত চুরানব্বই টাকা। এর ওপর মুনাফা প্রদান করা হবে।

শরীয়া-বিশেষজ্ঞগণের মতে, এ পদ্ধতিটি অধিক ভারসাম্যপূর্ণ। এতে কারও প্রতি জুলুম করা হয় না। পাকিস্তানের জামিয়াতুর রশীদের আলিমগণের প্রস্তাবনা হলো, উক্ত গড় ব্যালেন্স পদ্ধতিতে মুনাফা হিসাব করা।[৮৮]

তবে কারও কারও আপত্তি হলো, এ পদ্ধতিতে পুঁজির আনুপাতিক হারের অধিক মুনাফা প্রদান অনিবার্য হয়। অথচ তারা 'কর্মহীন অংশীদার' (Sleeping partner)। তাদের মুনাফার হার পুঁজির অনুপাতে হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যে দিনগুলোতে ১২ হাজার টাকা পুঁজি ছিল, সে দিনসমূহে ১২ হাজারের ভিত্তিতে মুনাফা পাওয়ার কথা। কিন্তু তাকে তখনও আটান্ন হাজার টাকার ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হয়েছে।

তা ছাড়া যে দিনসমূহে তার পুঁজি ১২ হাজার ছিল, সেই দিনসমূহে লোকসান হলে ১২ হাজার অনুযায়ী লোকসান বহন করার কথা। কিন্তু তাকে লোকসান বহন করতে হবে ৫৮ হাজার টাকার অনুপাতে। এটি ইসলামের স্বীকৃত নীতি—الوضيعة على قدر رأس المال-'লোকসান হবে পুঁজি অনুপাতে'-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থি।[৮৯]

---

৮৮. উসমানী, মুহাম্মদ তকী, *গায়রে সুদি ব্যাংকারি*, করাচি : মাকতাবাহ মাআরিফুল কুরআন, ২০১৪, পৃ. ১৩১; মুমতাজ, আহমাদ, *চার মাসাঈল : ব্যাংকারি, তাকাফুল, ডিজিটাল তাসভীর, কারেন্সি*, করাচি : তামীরে মুশাআরা, পৃ. ৮৬

৮৯. যুহাইলী, ওয়াহবাহ মুস্তাফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতহু*, দিমাশক, দারুল ফিকর, খ. ৫, পৃ. ৩৯৭২; মুমতাজ, আহমাদ, *চার মাসাঈল : ব্যাংকারি, তাকাফুল, ডিজিটাল তাসভীর, কারেন্সি*, করাচি : তামীরে.., পৃ. ৮৬

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ এ ধরনের আপত্তির জবাব যেভাবে দিয়েছেন, এর সারকথা হলো—ইসলামী ব্যাংকিং মুদারাবা মূলত একটি নতুন ধরনের মুদারাবা বা অংশীদারি চুক্তি। হুবহু এ ধরনের অংশীদারি কারবারের প্রচলন ও পদ্ধতি পূর্ববর্তী যুগের ফকীহগণের সময়ে ছিল না। সুতরাং আমাদেরকে এই আধুনিক অংশীদারি কারবারকে হুবহু সনাতন অংশীদারি কারবার দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত হবে না। দেখতে হবে, অংশীদারি কারবারে শরীয়তের যে মৌলিক মূলনীতি রয়েছে, এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকলে বৈধ বলা যাবে, যদিও বাহ্যিক কৌশল ও পদ্ধতির বিচারে সনাতন পদ্ধতির সাথে নাও মিলে।

বস্তুত ব্যাংকিং মুদারাবায় সকল মুদারাবা ডিপোজিটর একে অপরের শরীক বা অংশীদার। তাদের মাঝে প্রথা ও প্রচলনভিত্তিক কৌশলে একধরনের 'শিরকাতুল আকদ'[৯০] (Partnership Contract) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর সময়ে সময়ে প্রত্যেকে ব্যাংকের সাথে মুদারাবা চুক্তি করে। তাদের এই কাজটি অংশীদারি কারবারের একধরনের 'আমল' বলে ধরা যেতে পারে। তাই মুনাফার প্রাপ্তিতে কম-বেশি হতে পারে। এখানে 'কর্মহীন অংশীদার' অনিবার্য হয় না।[৯১] আর লোকসান গড় পুঁজির অনুপাতে বহন করা হবে। এতে পুঁজির অধিক লোকসান বহন করা হচ্ছে না।

আমাদের পর্যবেক্ষণ মতে, মৌলিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক। কারণ, অংশীদারি কারবারের বিশেষ কোনো পদ্ধতি ইসলাম বলে দেয়নি। এ সংক্রান্ত ইসলামের মৌলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে যেকোনো পদ্ধতিই বৈধ হতে পারে। তবে ইসলাম ও মানবিক অর্থনীতির সাথে আরও অধিক সংগতিপূর্ণ কোনো পদ্ধতি হতে পারে কি না, অন্তত চলমান চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময়ে তা চিন্তা করা উচিত। কারণ, এভাবে 'শিরকাতুল আকদ'

---

৯০. 'শিরকাতুল আকদ' মূলত চুক্তিভিত্তিক অংশীদারি কারবারের নাম। ইসলামী মুআমালাতে সকল অংশীদারি কারবারের মূল হলো—এই শিরকাতুল আকদ। এর প্রকার হিসেবে শিরকাতুল আমওয়াল (সম্পদভিত্তিক অংশীদারি), শিরকাতুল আমল (শ্রমভিত্তিক অংশীদারি) ইত্যাদি বিবেচিত হয়।

৯১. উসমানী, মুহাম্মদ তকী, বুহূছ *ফী কাদায়া ফিকহিয়্যাহ মুয়াসসারাহ*, দিমাশক : দারুল কলম, ২০১১, খ. ২, পৃ. ৮০

প্রতিষ্ঠা করা, এরপর অংশীদারদের 'আসল' প্রমাণ করার কৌশলটি যে দূরদর্শী কৌশল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৪০-৫০ বছর আগে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনাকালে এমন পদ্ধতির যৌক্তিকতা থাকলেও এখন এর চেয়েও ভালো পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।

খ. ডেইলি প্রোডাক্ট বেইসড মেথড (Daily Product Based Method)

প্রচলিত সঞ্চয়পদ্ধতিকে বহাল রেখে মুনাফা বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মডেল 'ডেইলি প্রোডাক্ট বেইসড মেথড' (DPBM)। এটি হিসাববিদ্যার একটি বিশেষ পদ্ধতি। একে Scoring Method-ও বলা হয়।

এ পদ্ধতির মূলকথা হলো দুটি : ক. যথাসময় (Appropriate time) খ. অর্থ পরিমাণ (Amount)। এ দুটিকে ভিত্তি করে হিসাব করা। মুদারাবা মেয়াদ শেষে দেখা হবে, যে পরিমাণ মুনাফা অর্জন হয়েছে, সেটি গড়ে প্রতিদিন প্রতি টাকার বিপরীতে কত মুনাফা হয়েছে। এ কাজটি সহজে করতে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হয়—

ক. মোট মূলধনের পরিমাণ জানা, মুনাফা জানা;

খ. মোট দিনগুলো জানা;

গ. মোট মূলধনের ওপর মোট মুনাফা থেকে প্রতিদিন কত অর্জন হলো;

ঘ. মোট মূলধন থেকে প্রতি এক টাকার ওপর প্রতিদিন টোটাল মুনাফা থেকে কত টাকা মুনাফা হলো তা বের করা;

ঙ. এক টাকার মুনাফাকে দিন ও প্রত্যেকের টাকার পরিমাণের সাথে গুণ দেওয়া।

যেমন—৩০ দিনে ৩০০ টাকার ওপর ৩০ টাকা মুনাফা অর্জন হলে এর সরল অর্থ দাঁড়ায় ৩০০ টাকার ওপর প্রতিদিন ১ টাকা মুনাফা হয়েছে। তাহলে প্রতি এক টাকার ওপর প্রতিদিন মুনাফা হয়েছে ১÷৩০০ = ০.০০৩৩৩। অর্থাৎ প্রতি এক টাকার বিপরীতে প্রতিদিন মুনাফার পরিমাণ : ০.০০৩৩৩ টাকা।

এখন দেখতে হবে, কারও এক টাকা যদি মুদারাবা অ্যাকাউন্টে ১৫ দিন থাকে, তাহলে ০.০০৩৩৩ কে ১৫ দিয়ে গুণ দেওয়া হবে। এতে ১ টাকার ওপর ১৫

দিনের মুনাফা বের হয়ে আসবে। যেমন—০.০০৩৩৩×১৫ = ০.০৪৯৯। অর্থাৎ, এক টাকার ওপর ১৫ দিনের মুনাফা হয় ০.০৪৯৯ টাকা। এভাবে ১ টাকার ওপর ১০ দিনের মুনাফা, ২০ দিনের মুনাফা সবই বের করা সম্ভব হবে। এরপর কারও যদি মুদারাবা অ্যাকাউন্টে ১৫ দিন ২০ টাকা থাকে, তাহলে ওই ০.০৪৯৯ পরিমাণকে ২০ দিয়ে গুণ দেওয়া হবে (০.০৪৯৯×২০ = ০.৯৯৮)। কারও ২০ টাকা যদি ১০ দিন থাকে, তারও মুনাফা উক্ত পন্থায় বের করা যাবে। তা এভাবে যে, প্রথমে ১ টাকার বিপরীতে ১০ দিনের মুনাফা বের করা হবে (০.০০৩৩৩×১০ = ০.০৩৩৩), এরপর বিশ দিয়ে গুণ দিলে দশ দিনে বিশ টাকার মুনাফা বের হয়ে যাবে (০.০৩৩৩×২০ = ০.৬৬৬)। এ পদ্ধতি অনুযায়ী, মুদারাবা মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন আগেও যদি টাকা জমা হয়, তাহলে এর ওপরও আনুপাতিক হারে মুনাফা যুক্ত হবে। কেউ বের হয়ে গেলে, যে কয়দিন তার টাকা ছিল, কেবল সেই কয়দিনের মুনাফা সে পাবে।

আরেকটি উদাহরণ এভাবে পেশ করা যেতে পারে—

আবদুর রহীম ও আবদুর রহমান যৌথভাবে ব্যাবসা শুরু করেছে। উভয়ের মূলধন ২০ লক্ষ টাকা করে। উভয়ে লাভ-লোকসানের হিসাব করে ১লা রমযান। পহেলা রমযানের ৬ মাস পূর্বে আবদুল্লাহ তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাকে বলা হয়েছে, যে পরিমাণ মূলধন তারা বিনিয়োগ করেছে, সে পরিমাণ মূলধন প্রদান করতে হবে। যেন মুনাফাও তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সে হিসাবে আবদুল্লাহও ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে।

এখন ১লা রমযানে যখন লাভ-লোকসানের হিসাব হবে, তখন দেখা হবে, আবদুল্লাহর অংশ যেহেতু কেবল ৬ মাস ছিল, তাই তাকে এক-তৃতীয়াংশ মুনাফার অর্ধেক তথা ৬ ভাগের ১ ভাগ মুনাফা দেওয়া হবে। সুতরাং ৬০ লক্ষ টাকার ওপর যদি ৬ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়ে থাকে, তাহলে আবদুল্লাহ শুধু ১ লক্ষ টাকা মুনাফা পাবে।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষায় এ পদ্ধতিকে ‘হিসাবুন নিমার’ (حساب النمر) ও ‘হিসাবুন নিকাত’ (حساب النقاط) বলে। ‘নিযামুল আদাদ’ (نظام الأعداد)ও বলে। অথবা ‘তাওযীউর রিব্‌হ বি-তরিকাতিন নিমার’ (توزيع الربح بطريقة النمر) বলে। এটি حساب الإنتاج اليومي নামেও পরিচিত।

এ পদ্ধতির সুবিধা হলো, এতে যে-কেউ যখন-তখন মুদারাবায় প্রবেশ করতে পারবে, বেরও হতে পারবে। টাকা জমা করতে পারবে, উত্তোলনও করতে পারবে। মুনাফা অর্জিত হবে টাকার অংশ ও সময়ের ওপর ভিত্তি করে। যে কয়দিন, যে পরিমাণ টাকা ছিল, এর ওপর মুনাফা প্রদান করা হবে।

এ পদ্ধতির ওপরও কিছু আলিম আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, এখানে মুনাফা বণ্টনের যে হিসাব করা হয়েছে, এতে সম্পদ ও শ্রম ছাড়া মুনাফাপ্রাপ্তি অনিবার্য হয়। অন্যের মুনাফা নিজের ভাগে চলে আসে। কারণ, এমন হতে পারে যে, ব্যাংকিং 'ক্লোজিং ডে'র মাত্র দু-তিন দিন আগে টাকা জমা হয়েছে; তাকেও মুনাফা দেওয়া হয়; অথচ তার টাকা কোথাও বিনিয়োগে যায়নি।

ধরা যাক, পূর্বোক্ত উদাহরণে আবদুর রহীম ও আবদুর রাহমানের ৪০ লক্ষ টাকার ওপর প্রথম ৬ মাসে মুনাফা হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা। পরবর্তী ৬ মাসে আবদুল্লাহর অংশ যুক্ত হওয়ার পর টোটাল ৬০ লক্ষ টাকার ওপর মুনাফা হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। তাহলে এখন টোটাল ১৮ লক্ষ টাকা মুনাফা থেকে আবদুল্লাহ পাবে ৩ লক্ষ মুনাফা। (পাওয়ার কথা ছিল ৬ লক্ষ। তবে সময় যেহেতু অর্ধেক, তাই ৩ লক্ষ।) অথচ তার পাওয়ার কথা ছিল শুধু শেষ ৬ মাসের মুনাফা থেকে এক-তৃতীয়াংশ তথা ২ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে পেল ৩ লক্ষ টাকা। এতে সে প্রথম ৬ মাসের মুনাফা থেকেও এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়েছে। অথচ তখন সে ব্যবসায় ছিল না। তখন তার মূলধন বা শ্রম কিছুই ছিল না।

ইসলামী ফিকহে অংশীদারিমূলক ব্যবসায় একটি স্বীকৃত নীতি—'মুনাফা প্রাপ্তির পেছনে অংশীদারের সম্পদ বা ব্যাবসায়িক শ্রম বা ব্যাবসায়িক দায়—এ তিনটির কোনো একটি থাকতে হবে; নতুবা মুনাফা গ্রহণ বৈধ হয় না।' অন্যভাবে বলা যায়, মুনাফার সাথে পুঁজির (বিশেষত এ ক্ষেত্রে) সম্পর্ক থাকতে হবে। কিন্তু পূর্বোক্ত উদাহরণে আবদুল্লাহর ক্ষেত্রে প্রথম ছয় মাসের মুনাফার সাথে পুঁজির সম্পর্ক নেই। ইমাম সারাখসী রহ. মুদারাবা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

ربح مال صاحبه من غير أن يكون له فيه رأس مال أو عمل...شرط باطل

> মুদারাবায় কোনো অংশীদারের জন্য এভাবে মুনাফা শর্ত করা যে, যার বিপরীতে না মূলধন আছে, না আমল/কাজ আছে, তা বাতিল শর্ত।[৯২]

---

৯২. সারাখসী, আবু বাকর মুহাম্মদ, *আল মাবসূত*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল

আল্লামা আতাসী রহ. লিখেছেন—

إن الربح لا يستحق إلا بأحد ثلاث، وهي العمل كالمضارب في المضاربة، أو المال كرب المال فيها، أو بالضمان .

> অংশীদারি ব্যবসায় তিনটি বিষয়ের কোনো একটি ছাড়া মুনাফা অর্জন করা যায় না। তা হলো—ব্যাবসায়িক কাজ, যেমন—মুদারাবা ব্যবসায় মুদারিব ব্যাবসার কাজ করে; অথবা ব্যাবসার মূলধন, যেমন—মুদারাবা ব্যবসায় রব্বুল মাল মূলধন জোগান দিয়ে থাকে; অথবা দায়/যিম্মাহ।[৯৩]

উল্লেখ্য, এখানে যদিও ব্যাংকিং মুদারাবা নিয়ে বলা হয়নি। ক্লাসিক্যাল মুদারাবা নিয়ে বলা হয়েছে; তবে মূলনীতি আগে যেমন ছিল, এখনও বহাল আছে। 'শ্রম বা পুঁজিহীন মুনাফা'—এই মূলনীতি একটি স্বীকৃত মূলনীতি। উক্ত নীতির পেছনে শরীয়া মাকাসিদ হলো—ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত মুনাফা প্রতিহত করা। হাদীসে এসেছে— لا ربح ما لم يضمن 'ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত মুনাফা বৈধ নয়'।[৯৪] কেউ যখন তার মূলধন বা শ্রম ছাড়া মুনাফা প্রাপ্ত হয়, তখন সেটি প্রকারান্তরে 'ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত মুনাফা' নিশ্চিত করে। মোটকথা, উক্ত নীতিটি ক্লাসিক্যাল মুদারাবায় আলোচনা হলেও ব্যাংকিং মুদারাবায়ও প্রযোজ্য হবে। এতে কারও দ্বিমত আছে বলে জানা নেই।

কিন্তু বর্তমান সময়ের অধিকাংশ শরীয়া-বিশেষজ্ঞ এ পদ্ধতিকে অনুমোদন করছেন। তাদের কথার সারমর্ম হলো, এটি একটি নতুন অংশীদারি কারবার। একে ইসলামের অংশীদারি কারবার সংশ্লিষ্ট মূলনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত। হুবহু সনাতন অংশীদারি কারবারের আলোকে নয়। যেমন, একটি মূলনীতি হলো—মুনাফায় সকল অংশীদারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকা। এ মূলনীতি এখানে অক্ষুণ্ন আছে। সুতরাং এ পদ্ধতিতে মুনাফা বণ্টনে সমস্যা নেই।[৯৫]

---

৯৩. আতাসী, মুহাম্মদ খালিদ, *শারহ আল মাজাল্লাহ*, কুয়েটা : মাকতাবা রশিদিয়্যাহ, খ. ৪, পৃ. ২৭১

৯৪. আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হা. নং : ৬৬৭১

৯৫. উসমানী, *বুহুছ ফী কাদায়া ফিকহিয়্যাহ মুয়াসসারাহ*, দিমাশক : দারুল কলম, ২০১১, খ. ১, পৃ. ৩৬৪-৩৬৬

তা ছাড়া যেমনটা পূর্বেও বলা হয়েছে, এখানে সকল মুদারাবা ডিপোজিটর পরস্পরের অংশীদার; তাদের মাঝে শিরকাতুল আকদ (Partnership Contract) আছে; প্রত্যেকের কাজও আছে। সুতরাং মুনাফায় কম-বেশি হতে পারে।

তারা আরও বলেছেন, এ পদ্ধতিতে মুনাফার বণ্টন যে প্রত্যেকের প্রকৃত মূলধনের ওপর অর্জিত প্রকৃত মুনাফার ওপর ভিত্তি করে হয় না—তা সঠিক; বরং গড় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। তবে এতে সকল অংশীদারদের সম্মতি আছে। বস্তুত এখানে 'সম্মতি' ও 'ছাড়নীতি (রুখসাত)' প্রয়োগ হয়েছে। তাই এ দৃষ্টিতেও শরীয়া সমস্যা নেই।[৯৬] ইসলামী ব্যাংকিংয়ে 'ডিপিবিএম' পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফিকহ ফোরামে শরীয়া সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছে। প্রায় সকলেই এর পক্ষে শরীয়া অনুমোদন প্রদান করেছেন।[৯৭]

বস্তুতপক্ষে এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আধুনিককালের ফকীহগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যৌথ কারবারে একান্ত প্রয়োজনে আনুমানিক হিসাবের ওপর ভিত্তি করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এ ধরনের আনুমানিক হিসাবের ওপর ভিত্তি করে লভ্যাংশ বিভাজনের নজির বা উপমা প্রাচীন ফিকহশাস্ত্রেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ৫ জনের মূলধন একত্রিত করে শরীকানা ব্যাবসা করা হলে এমন সম্ভাবনা থাকে যে, একজনের মূলধন যে খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল সেখানে কোনোই লাভ হলো না। এমতাবস্থায় লভ্যাংশ বিভাজন সমহারে করা হয়ে থাকে। কার মূলধন থেকে কত লাভ এলো—তা কিন্তু হিসাব করা হয় না। এ থেকে বোঝা যায় যে, যৌথ কারবারে যেখানে প্রকৃত হিসাব নির্ণয় করা সম্ভব নয়, সেখানে অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করাই শরীয়তের বিধান। অতএব, ব্যাংকে আমানতকারীদের লভ্যাংশের হিসাব একান্ত প্রয়োজনে অনুমানের ভিত্তিতে করা হলে তা বৈধ হবে।

মোটকথা, বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ডিপিবিএম পদ্ধতিকে শারয়ীভাবে অনুমোদিত বলা যায়। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে আরও অধিক ভালো ও যথার্থ অনুশীলনকে সামনে নিয়ে আসার জন্য নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

---

৯৬. তদেক

৯৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, ইসলামী ব্যাংকিং-এ সঞ্চয়নীতি ও মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি : সমস্যা ও উত্তরণ উপায়, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪-৭৫, এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)।

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব

'ওয়াকফ' ইসলামী অর্থনীতির সৌন্দর্যের অন্যতম নিদর্শন। এর ধর্মীয় গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি এর আর্থসামাজিক গুরুত্বও কম নয়। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কল্যাণসাধনের পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের নানা কল্যাণেও এর প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। যুগে যুগে বহু মুসলিম, বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ ধনাঢ্য মুসলিমগণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের অজস্র অর্থসম্পদ ও ভূমি ওয়াকফ করেন। তবে এ দেশের মুসলিমগণ ঐতিহাসিকভাবে ভূ-সম্পদ ওয়াকফের সাথেই বেশি পরিচিত; ক্যাশ ওয়াকফের প্রচলন বলতে গেলে এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সম্প্রতি ক্যাশ ওয়াকফ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক 'ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব' চালু করেছে।

ভূ-সম্পদের ওয়াকফ ইসলামের একটি বহুল প্রচলিত ব্যবস্থা হওয়ার কারণে তা নিয়ে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন নেই এবং এতৎসংশ্লিষ্ট নানা বিধানও কমবেশি সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু ক্যাশ ওয়াকফ যেহেতু সাম্প্রতিককালে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সেক্টরে নতুন সংযোজন এবং এর প্রচার-প্রসারও এখনও সীমিত, তাই যেমন এর শারয়ী হুকুম নিয়ে অনেকের মধ্যে সন্দেহ বা প্রশ্ন আছে, তেমনি এর নানা সম্ভাবনা নিয়েও নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে।

ক্যাশ ওয়াকফ সাধারণত ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে চিরস্থায়ী দান হিসেবে ক্যাশ অর্থ জমা করেন। জমাকারী এ অর্থ স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে নিজের মালিকানা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের একান্ত উদ্দেশ্যে জনকল্যাণে সমর্পণ করে, যা সাধারণত কখনোই উত্তোলনযোগ্য নয়। এটি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় জমা হিসেবে থেকে যায়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ওই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ওয়াকিফের পছন্দ বা নির্দেশনা মোতাবেক শরীয়াসম্মত খাতে ব্যয়-বণ্টন করে।

ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব পরিচালনার নীতিমালা

ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা হলো—

ক. 'মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব' খোলা-সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াকফ তহবিল যেহেতু মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়, সেহেতু লাভ-লোকসানের হিসাবও এ নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে ওয়াকফ তহবিল বা মূলধন অক্ষত না-ও থাকতে পারে। কারণ, লোকসান হলে তা মূলধন থেকেই কর্তন করা হবে।

খ. ওয়াকিফের পক্ষ থেকে ব্যাংক ওয়াকফ-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু ওয়াকিফ কর্তৃক ব্যাংকের অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উত্থাপিত হলে কিংবা অন্য যেকোনো যৌক্তিক কারণে ওয়াকফ তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর করতে হলে ওয়াকিফ অথবা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সেই সুযোগ থাকবে। তবে ওয়াকিফ কর্তৃক ব্যাংকের অব্যবস্থাপনার দাবি যৌক্তিক কি না—তা নির্ধারণের জন্য বিষয়টি শরীয়া বোর্ডে প্রেরণ করা যেতে পারে।

গ. ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যে কমিটি ব্যাংকের ওয়াকফ ক্যাশ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক নিযুক্ত ইসলামী শরীয়া এবং দেশের প্রচলিত আইনে পারদর্শী সর্বজনশ্রদ্ধেয় কোনো ব্যক্তি হবেন এ কমিটির চেয়ারম্যান। এ ছাড়া ইসলামী শরীয়া ও দেশের প্রচলিত আইনে পারদর্শী আরও দুজন, ওয়াকিফদের থেকে মনোনীত একজন ও ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে একজনসহ কমপক্ষে চারজন সদস্য এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবেন। কমিটির দায়িত্ব থাকবে—

- ওয়াকফ হিসাব খোলা, পরিচালনা, হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয়-ব্যয়, হিসাব বন্ধ, স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান।
- ওয়াকিফের সুস্পষ্ট নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে ওয়াকফ হিসাবের যেকোনো সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান।
- ওয়াকিফ ও ব্যাংকের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।
- ক্যাশ ওয়াকফ হিসাবের বিষয়ে এ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ. সাধারণভাবে ক্যাশ ওয়াকফের মূল জমা একটি শাশ্বত ও চিরন্তন দানরূপে গ্রহণ করা হবে। তবে ওই হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয় বা লাভ ব্যবহার বা ব্যয়ের ক্ষেত্র পরিবর্তন/স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে উল্লিখিত কমিটি ওই বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে।

ঙ. যে উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করা হবে—তা সম্পন্ন বা বাস্তবায়নের পর ওয়াকফের অর্থ কোথায় ব্যয় হবে সে সম্বন্ধে 'ওয়াকফ হিসাব' খোলার সময় বিশেষ নির্দেশনা হিসাব খোলার পত্রে উল্লেখ থাকবে। এতৎসংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ না থাকলে বা বিতর্ক দেখা দিলে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চ. কোনো কারণে ওয়াকফ হিসাব বন্ধ করা জরুরি হলে সংশ্লিষ্ট হিসাব বন্ধ করার পর ওয়াকফ তহবিলের ব্যবহার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে থাকতে হবে। এরপরও কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে প্রস্তাবিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।[৯৮]

ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব বন্ধ বা স্থানান্তর

ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব বন্ধ বা স্থানান্তর করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই। খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে ওয়াকফ সম্পদ স্থানান্তরের নজীর রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. লিখেছেন—

> সাইয়্যিদুনা উমর রা. ইবনু মাসউদ রা.-কে কূফার জামে মসজিদকে খেজুর ব্যবসায়ীদের বাজারের স্থানে এবং বাজারকে উক্ত জামে মসজিদের স্থানে স্থানান্তরের জন্য নির্দেশ দেন এবং ইবনু মাসউদ রা. তা কার্যকর করেন।[৯৯]

এ ছাড়া ব্যাংকের ক্যাশ ওয়াকফ অ্যাকাউন্ট মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় তা মুআমলাতের অন্তর্ভুক্ত। আর মুআমলা বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, 'লেনদেনটি অবৈধ হওয়ার পক্ষে কোনো শারয়ী দলিল বা নাস পাওয়া না গেলে তা বৈধ।' সুতরাং ক্যাশ ওয়াকফ এ কাউন্ট

---

৯৮. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল, পৃ. ৬২-৬৪

৯৯. ইবনু তাইমিয়া, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, অধ্যায় : আল ওয়াকফ, খ. ৩১, পৃ. ১২৭

বন্ধ এবং স্থানান্তর করা যাবে না—এ মর্মে যেহেতু বিশুদ্ধ ও দ্ব্যর্থহীন কোনো দলিল নেই, তাই ক্যাশ ওয়াকফ অ্যাকাউন্ট বন্ধ এবং স্থানান্তর বৈধ। এ ব্যাপারে ব্যাংকের মুদারাবা মোহর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে তার টাকা নিয়ে তার স্ত্রীর মোহর আদায় করল কি না কিংবা হজ অ্যাকাউন্টের টাকা দিয়ে হজ করল কি না তা দেখা যেমন ব্যাংকের দায়িত্ব নয়, তেমনি ওয়াকিফ (সাহিবুল মাল) লাভজনক মনে করে তার ওয়াকফ অ্যাকাউন্ট বন্ধ বা স্থানান্তর করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে ওয়াকফ সম্পদের পরবর্তী পরিণতি চিন্তা করে উক্ত ফান্ড আটকে রাখা মুদারিব হিসেবে ব্যাংকের জন্য বৈধ হবে না।[১০০]

কতিপয় প্রশ্ন

ক্যাশ ওয়াকফের পরিধি ক্রমশ বিকাশ লাভের পাশাপাশি যেমন নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে, তেমনি নতুন কিছু প্রশ্ন বা সন্দেহও দেখা দিচ্ছে। যেমন—ক্যাশ ওয়াকফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরাবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকা (principal amount)-এর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়নের সুযোগ প্রদান করা শরীয়াসম্মত হবে কি না? ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে—এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকানির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াকফকৃত টাকার প্রফিটের সম্পূর্ণ/একটি অংশ ভোগ করা শরীয়াসম্মত হবে কি না প্রভৃতি। নিম্নে সংক্ষেপে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।[১০১]

ক. মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকরের শর্তারোপ ও জীবদ্দশায় লভ্যাংশ ভোগ

ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে—এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকানির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াকফকৃত টাকার প্রফিটের সম্পূর্ণ/একটি অংশ ভোগ করা শরীয়াসম্মত হবে কি না?

---

১০০. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল, পৃ. ৬৪-৬৫

১০১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, ক্যাশ ওয়াকফকারীর লভ্যাংশ ভোগ ও মূল টাকা উত্তোলন : একটি ফিকহী বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪-৭৫,এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)।

উপর্যুক্ত প্রশ্নে দুটি বিষয়ে আলোচনার দাবি রাখে :

এক. ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকরের শর্তারোপ।

দুই. উপর্যুক্ত শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকানির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াকফকৃত টাকার প্রফিটের সম্পূর্ণ/একটি অংশ ভোগ করা।

এক. ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকরের শর্তারোপ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে—ওয়াকফের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ শর্ত হলো, এর কার্যকারিতা তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হবে। এর কার্যকারিতা ভবিষ্যতের কোনো সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করা সমীচীন নয়। তবে মালিকী ফকীহগণের মতে—ওয়াকফের বিধান দেরিতেও কার্যকর হতে পারে এবং ভবিষ্যতের যেকোনো সময়ের সাথে, এমনকি যেকোনো বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করেও ওয়াকফ করা যাবে। হাম্বলীগণ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষয়টি বিধানগত দিক থেকে অন্যান্য বিষয় থেকে আলাদা। অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করে ওয়াকফ করা যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এরূপ মতই প্রকাশ করেছেন। কাজেই ওয়াকিফ যদি নিজের মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করে বলে যে, আমি আমার অমুক ভূমিটি আমার মৃত্যুর পর দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করলাম, তবে তার ওয়াকফ শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার অমুক ভূমিটি অমুক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াকফ করে দিয়ো, তবে তাও বিশুদ্ধ হবে। কারণ, এ ধরনের ওয়াকফ প্রকারান্তরে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত সদকাস্বরূপ। একে ওয়াকফের অসিয়্যাতরূপে গণ্য করা হয়। এ ধরনের ওয়াকফের ক্ষেত্রে ওয়াকিফের মৃত্যুর পর অন্যান্য অসিয়্যাতের মতো তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে এই ওয়াকফ কার্যকর করতে হবে। এভাবে ওয়াকফ করা এবং একে অসিয়্যাতরূপে বিবেচনা করার দলিল হলো, সাইয়িদুনা উমর রা. তাঁর অসিয়্যাতের মধ্যে উল্লেখ করেন—

هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثَمْغاً ..
تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لاَ يُبَاعَ وَلاَ يُشْتَرَى
يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذِى الْقُرْبَى وَلاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ
أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ

> এটি আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমরের অসিয়্যাত যে, যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় (অর্থাৎ, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি), তাহলে ছাম্‌গ[১০২].. ওয়াকফ হবে। হাফসা রা. এর তত্ত্বাবধান করবেন, যতদিন তিনি জীবিত থাকেন। তাঁর পরে তাঁর পরিবারের বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন কোনো লোক এর তত্ত্বাবধান করবেন। এ ওয়াকফকৃত বাগান বেচাকেনা করা যাবে না। এর তত্ত্বাবধায়ক তার বিবেচনা অনুসারে ভিক্ষুক, বঞ্চিত ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য তা ব্যয় করবে। অধিকন্তু, এর তত্ত্বাবধায়কের জন্য এতে কোনো অসুবিধা নেই যে, তিনি নিজে তা থেকে খেতে পারবেন অথবা অন্য (অসচ্ছল) ব্যক্তিকেও খাওয়াতে পারবেন অথবা এর ফল বিক্রি করে এর পরিচর্যার জন্য কোনো গোলাম ক্রয় করতে পারবেন।..[১০৩]

উল্লেখ্য, তাঁর এ ওয়াকফটি সাহাবীগণের জ্ঞাতাসারে সংঘটিত হয়েছিল এবং কেউ তাঁর এভাবে ওয়াকফ করার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। কাজেই একে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করে ওয়াকফ করার পক্ষে সাহাবীগণের ইজমা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ফকীহদের মতামতের সারসংক্ষেপ :

মালিকীগণের মতে, ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর করার শর্তে ওয়াকফ করা যাবে। এতে নীতিগতভাবে কোনো অসুবিধা নেই।

সংখ্যাগরিষ্ঠ (জুমহুর) ফকীহগণের মতেও, ব্যতিক্রমী মাসআলা হিসেবে ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর করার শর্তে ওয়াকফ করা যাবে। এটিই হানাফী ফকীহগণের বিশুদ্ধতর অভিমত। তবে এ অবস্থায় তা অসিয়্যাতের মতো মৃত্যুর পর ওয়াকিফের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে। তবে ওয়ারিছরা সকলেই সম্মত থাকলে এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদ থেকেও ওয়াকফ কার্যকর করা যাবে। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতে—'এ অবস্থায় সে যতদিন জীবিত থাকবে, তার এ

---

১০২. ছাম্‌গ : মদীনার একটি প্রসিদ্ধ খেজুর বাগান। এটি সাইয়িদুনা উমার রা.-এর মালিকানাধীন ছিল।

১০৩. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-অসায়া, পরিচ্ছেদ : مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ, হা. নং : ১৩/২৮৮১। হাদীসটি সহীহ।

ওয়াকফ সদকার মানতরূপে গণ্য হবে এবং এ কারণে তার ওপর তার এ কথা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে; তবে সে চাইলে তার এ ওয়াকফ থেকে রুজুও করতে পারে। আর যদি রুজু না করে এবং এ অবস্থায় সে মারা যায়, তাহলে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তা কার্যকর করা হবে।'[১০৪]

ফকীহদের উপর্যুক্ত মতামত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে—এ শর্তে ওয়াকফ করা যাবে। তবে এ অবস্থায় ওয়াকফটি 'ওয়াকফের অসিয়্যাত'-রূপে গণ্য করা হবে এবং ওয়াকিফের মৃত্যুর পর অন্যান্য অসিয়্যাতের মতো তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে এই ওয়াকফ বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করতে হবে। তবে ওয়ারিছরা সকলেই সম্মত থাকলে সম্পূর্ণ ওয়াকফও কার্যকর করা যাবে, যদি এর পরিমাণ তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে অতিরিক্ত হয়।

দুই. উপর্যুক্ত শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকানির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াকফকৃত টাকার লভ্যাংশের সম্পূর্ণ বা একটি অংশ ভোগ করা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিমতে পৌঁছার জন্য ফকীহদের নিম্নোক্ত মতামতগুলো বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে :

সাধারণত ওয়াকফকৃত বস্তুর ওপর ওয়াকফ করার সাথে সাথে ওয়াকিফের কোনোরূপ মালিকানা ও ভোগাধিকার আর বহাল থাকে না। ওয়াকফকৃত বস্তুর উপকারিতা ও ভোগাধিকার কেবল ওয়াকফ করা হয়েছে—এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কিংবা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজেই সাধারণত ওয়াকিফের জন্য ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে কোনো উপকার হাসিল করা বৈধ নয়। তবে কয়েকটি অবস্থায় ওয়াকিফ ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে উপকার হাসিল করতে পারেন। তন্মধ্যে নিম্নে দুটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হলো :

১. ওয়াকিফ যদি সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য কোনো বস্তু ওয়াকফ করে, তাহলে সেও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেমন—কেউ কোনো কবরস্থান ওয়াকফ করল, তাহলে তাকে তার ওয়াকফকৃত সেই কবরস্থানে দাফন করা যাবে। অনুরূপভাবে কেউ কোনো কূপ ওয়াকফ করল, তাহলে সেও কূপের পানি থেকে উপকৃত হতে পারবে। এ প্রসঙ্গে কারও কোনো

১০৪. ইবনু আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২১ হি., খ. ১৭, পৃ. ১৯৪

দ্বিমত নেই। বর্ণিত আছে যে, সাইয়িদুনা উসমান রা. বিরে রূমা ওয়াকফ করেছিলেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি ওই কূপ থেকে অন্য লোকদের মতো নিজেও বালতি দিয়ে পানি তুলতেন।[১০৫]

২. ওয়াকিফ যদি ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, সে ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে আমৃত্যু নিজের ব্যয়নির্বাহ করবে, তবে এরূপ শর্তারোপ বৈধ কি না—এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে :

ইমাম মালিক ও শাফিয়ী এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর মতে, ওয়াকিফের জন্য এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয়। তাদের মতে, ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে উপকার ভোগ করা জায়িয হবে না। কারণ, প্রথমত, ওয়াকফের কারণে মালিকানা স্বত্ব বাকি থাকে না। কাজেই ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে নিজের উপকার ভোগের শর্তারোপ করা জায়িয নয়। দ্বিতীয়ত, ওয়াকিফ কী পরিমাণ নিজের জন্য খরচ করবে তা অজ্ঞাত। অতএব, এরূপ অজ্ঞাত কিছুর শর্তারোপ করাও বৈধ হবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ইমাম আহমাদ রাহ. ও হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতে, এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ হবে এবং ওয়াকফকারী শর্তানুসারে ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে। ইবনু আবী লাইলা, ইবনু শুবরুমা, যুবাইর ও ইবনু শুরাইহ রাহ. প্রমুখ ফকীহগণও এরূপ মত পোষণ করেন।[১০৬] তাদের এ কথার দলিল হলো—

- হুজর আলমদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْها أَهْلُها بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ.

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সদকা থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ন্যায়ানুগভাবে ভক্ষণ করতেন।[১০৭]

---

১০৫. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি., খ. ৬, পৃ. ২১৫

১০৬. আবুল মুযাফফর ইয়াহয়া আশ-শায়বানী, *ইখতিলাফুল আয়িম্মাতিল উলামা*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি., খ. ২, পৃ. ৪৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ২১৫

১০৭. ইবনু আবী শাইবাহ, আল মুছান্নাফ, অধ্যায় : আল-বুয়ূ ওয়াল আকদিয়াহ, পরিচ্ছেদ :.مَنْ كَانَ يرى أن يوقِف الدّار والمسكن , হা. নং : ১১৫/২১৩৩৫

- বর্ণিত আছে, উমর রা. খাইবারের ভূমিটি ওয়াকফ করার সময় বলেন—

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়কের জন্য কোনো দোষ নেই যে, সে নিজে তা থেকে খেতে পারবে অথবা তার যেকোনো অসচ্ছল বন্ধুকেও খাওয়াতে পারবে। উপরন্তু, ওয়াকফকৃত বস্তু আমৃত্যু তাঁর হাতেই ছিল।[১০৮]

যেহেতু সর্বজনীন ওয়াকফের ক্ষেত্রে (যেমন—মসজিদ, সরাইখানা, কূপ, কবরস্থান প্রভৃতি) ওয়াকিফের জন্য ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ, তাই শর্তারোপ করেও ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে ওয়াকিফ উপকৃত হতে পারবে।

উল্লেখ্য, ওয়াকিফ চাই নিজের উপকার ভোগের ক্ষেত্রে শর্তরূপে তার পুরো জীবনকালের কথা উল্লেখ করুক কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদের কথা উল্লেখ করুক—হুকুমের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য হবে না। অনুরূপভাবে ওয়াকিফ কীরূপ পরিমাণ উপকার ভোগ করবে, চাই তার নির্ধারণ করুক বা না করুক—তাতেও হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে না। কারণ, উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতার কথা জানা যায় না; বরং প্রথম রিওয়ায়তে কেবল ন্যায়ানুগভাবে উপকার ভোগের কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রিওয়ায়তে উমর রা. অভিভাবক কী পরিমাণ নিজে খেতে পারবে কিংবা বন্ধুদের খাওয়াতে পারবে—তাও নির্ধারণ করে দেননি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহগণের কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো—

- বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. বলেন—

يجوز أن يستثني الواقف الغلة لنفسه مادام حيًّا.

যতদিন ওয়াকিফ জীবিত থাকবে, ততদিন ভূমির ফসল নিজের জন্য শর্তারোপ করা জায়িয।[১০৯]

---

১০৮. বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায় : আলওসায়া, পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াকফ কাইফা ইয়ুকতাবু, হা. নং : ২৯/২৬৩০; মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায় : আল-ওয়াকফ, [illegible] হা. নং : ৫/৪৩১১

- হানাফী ফকীহ ইবুন আবিদীন রাহ. বলেন—

(قَوْلُهُ : وَجَازَ جَعْلُ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا .

ভূমির সম্পূর্ণ ফসল কিংবা অংশবিশেষে নিজের জন্য শর্তারোপ করা জায়িয।[১১০]

- বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনু কুদামা রাহ. বলেন—

إن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط. نص عليه أحمد .

যদি ওয়াকিফ ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করে যে, সে তা থেকে নিজের ব্যয়নির্বাহ করবে, তাহলে ওয়াকফও শুদ্ধ হবে এবং শর্তও শুদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রাহ.-এর স্পষ্ট বক্তব্য আছে।[১১১]

- বিশিষ্ট শাফিয়ী ফকীহ বুহূতী রাহ. বলেন—

إن وقف شيئاً على غيره، واستثنى غلته كلها أو بعضها له مدة معينة، أو استثنى الانتفاع لنفسه أو لأهله مدة حياته أو مدة معينة، وصح الوقف والشرط .

যদি কেউ অপরের জন্য কিছু ভূমি ওয়াকফ করে, কিন্তু সে ওয়াকফ থেকে নিজের জন্য ভূমির সম্পূর্ণ ফসল কিংবা অংশবিশেষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাস করে নেয় অথবা জীবনভর কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়াকফ থেকে নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের উপকৃত হওয়ার শর্তারোপ করে, তাহলে ওয়াকফও শুদ্ধ হবে এবং শর্তও শুদ্ধ হবে।[১১২]

---

১০৯. সারাখসী, শামসুদ্দীন আবূ বকর, *আল মাবসূত*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২১ হি., খ. ১২, পৃ. ৭৩

১১০. ইবনু আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৭, পৃ. ৩২৬

১১১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ২১৫

১১২. বুহুতী, মানছূর, *শারহু মুনতাহাল ইরাদাত*, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৯৯৬, খ. ২, পৃ. ৪৯৪

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ওয়াকিফের জন্য ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে তার জীবদ্দশায় উপকার ভোগ করার শর্তারোপ করার প্রসঙ্গটি নিয়ে তর্ক আছে। ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও মুহাম্মাদ রাহ. প্রমুখের মতে, ওয়াকিফের জন্য এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয়; তবে ইমাম আহমাদ ও আবু ইউসুফ রাহ.-সহ আরও অনেকের মতে, তা জায়িয।

আমরা মনে করি, এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ও আবু ইউসুফ রাহ. প্রমুখের মতটি বর্তমান যুগে জনকল্যাণসাধন ও ওয়াকফের বিস্তৃতির জন্য অধিকতর সহায়ক বিধায় এর আলোকে আমরা উত্থাপিত প্রশ্নের ব্যাপারে এ মত পোষণ করতে পারি যে, ওয়াকিফের মৃত্যুর পর ওয়াকফ কার্যকর হবে—এ শর্তে জীবিত থাকাকালীন ওয়াকিফের জীবিকানির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াকফকৃত টাকার প্রফিটের সম্পূর্ণ বা একটি অংশ ভোগ করা শরীয়াসম্মত।

খ. মূল টাকা উত্তোলন

ওয়াকফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকা (Principal Amount)-এর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়নের সুযোগ প্রদান করা শরীয়াসম্মত হবে কি না?

উপর্যুক্ত প্রশ্নে নির্দিষ্ট অভিমত পেশ করার পূর্বে ফকীহদের নিম্নোক্ত মতামতসমূহ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে :

❖ সাধারণত ওয়াকফ স্থায়ীভাবেই করতে হয়; নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (যেমন—পাঁচ বছর, দশ বছর) ওয়াকফ করা বিধেয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এরূপ মত পোষণ করেন। এ কারণে হানাফীগণ ওয়াকফকৃত বস্তু স্থাবর হওয়ার শর্তারোপ করেন, যা থেকে স্থায়ীভাবে উপকারিতা লাভ করা যায়। তবে মালিকীগণের মতে, ওয়াকফ স্থায়ী হওয়া শর্ত নয়; বরং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও ওয়াকফ করা যায়। মেয়াদান্তে ওয়াকফকৃত বস্তুর ওপর ওয়াকিফ কিংবা তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।[১১৩]

---

১১৩. মুহাম্মাদ উলাইশ, *মিনহুল জলীল শারহু মুখতাসিরি খলীল*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি., খ. ৮, পৃ. ১৪৫

❖ হাম্বলীগণ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে। বিশিষ্ট শাফিয়ী মতাবলম্বী ফকীহ আবুল আব্বাস ইবনু সুরাইজ (২৪৯-৩০৪ হি.) রাহ.ও এরূপ মত পোষণ করেন।[১১৪]

❖ ওয়াকফ করার পর রুজু করার প্রসঙ্গটি বিতর্কিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, ওয়াকফ করার পর তা রক্ষা করা বাধ্যতামূলক; রুজু করা বৈধ নয়। তবে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতে, ওয়াকফ রক্ষা করা বাধ্যতামূলক নয়। ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় ওয়াকফ থেকে রুজু করতে পারে। তবে এমনটি করা অনুচিত। ইমাম আহমাদ রাহ. থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়ত বর্ণিত রয়েছে যে, ওয়াকফকৃত বস্তু যে যাবৎ না এর দায়িত্বভার অপরকে হস্তান্তর করবে বা সর্বসাধারণের জন্য তা মুক্ত করে দেবে, ততক্ষণ ওয়াকফ রক্ষা করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

তবে কেউ যদি ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করে যে, সে চাইলে রুজু করতে পারবে, তবে এরূপ অবস্থায় ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হাম্বলী ও শাফিয়ীগণের বিশুদ্ধ মতানুসারে এরূপ অবস্থায় শর্তও শুদ্ধ হবে না এবং ওয়াকফও শুদ্ধ হবে না। তাদের কারও কারও মতে, ওয়াকফ শুদ্ধ হবে; কিন্তু শর্ত বাতিল হবে। তবে মালিকী ফকীহগণের মতে, প্রয়োজনে ওয়াকফ থেকে রুজু করা যাবে। বিশিষ্ট শাফিয়ী ফকীহ আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) রাহ. বলেন—

أجاز مالك أن يقف على أنه إن احتاج إليه باعه أو رجع فيه أو أخذ غلته.

لقول الرسول ﷺ : المسلمون عند شروطهم، ولما روي عن علي رضي الله عنه في وقفه.

কেউ যদি এ শর্তে কিছু ওয়াকফ করে যে, যদি তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সে তা বিক্রি করে দেবে কিংবা ওয়াকফ থেকে রুজু করবে অথবা তার ফসল নিজে নিয়ে নেবে, তাহলে ইমাম মালিক রাহ.-এর মতে তা জায়িয হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, “মুসলিমগণ তাদের শর্তাবলি প্রতিপালন করবে।” দ্বিতীয়ত, সাইয়িদুনা আলী রা. থেকেও তাঁর ওয়াকফের ক্ষেত্রে এরূপ নীতির কথা জানা যায়।[১১৫]

---

১১৪. মাওয়ারদী, আবুল হাসান, *আলহাভী*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৭, পৃ. ৫২১

১১৫. মাওয়ারদী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ৩৯৬

মালিকী মাযহাবের ফকীহ আহমাদ আদ-দারদীর রাহ. বলেন, ওয়াকিফ যদি প্রয়োজনে নিজের জন্য ওয়াকফ থেকে রুজু কিংবা ওয়াকফকৃত বস্তু বিক্রয় করার শর্তারোপ করে, তাহলে তার এ অধিকার থাকবে।[১১৬]

❖ মালিকীগণের মতে যেসব কারণে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যায় তন্মধ্যে অন্যতম হলো—ওয়াকফ কার্যকর করতে কোনো বাধা থাকা। যেমন—ওয়াকফকৃত বস্তু কবজ অর্থাৎ ওয়াকিফের দায়িত্ব থেকে বের করে দেওয়ার আগেই যদি সে মারা যায় কিংবা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাহলে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ওয়াকফকৃত বস্তুটি ওয়ারিছদের মালিকানায় ফিরে যাবে, যদি ওয়াকিফ মারা যায় এবং ঋণদানকারী ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে হবে, যদি ওয়াকিফ নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হয়। তবে তারা যদি ওয়াকফ কার্যকর করতে চায়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যথায় ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এবং ইমাম আহমাদ রাহ.-এর এক মতানুসারেও, ওয়াকফ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের জিম্মায় সঁপে দেওয়া ছাড়া ওয়াকফ পরিপূর্ণ হবে না।

অনুরূপভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণের কথা ভুলে গিয়ে তার সম্পদ ওয়াকফ করে এবং তা সে এমন কোনো ব্যক্তির জিম্মায় দান করে, যে ওই বস্তুটি তার পক্ষ থেকে দেখাশোনা করে। এ অবস্থায় যদি তার ঋণ পরিশোধের অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ওই ওয়াকফকৃত বস্তু দ্বারা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে। কারণ, ওয়াকফ হলো ঐচ্ছিক দান আর ঋণ পরিশোধ হলো ওয়াজিব। উল্লেখ্য, ঐচ্ছিক বিষয়ের ওপর ফরযকে অগ্রাধিকার দেওয়া শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় :

- ওয়াকফ করার পর—ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার কারণে হোক—রুজু করার প্রসঙ্গটি মতভেদপূর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, ওয়াকফ থেকে রুজু করা জায়িয নয়। তবে ইমাম আবু হানীফা

---

১১৬. দারদীর, আবুল বারাকাত, *আশ-শারহুল কাবীর* বৈরুত : ইহয়াউল কুতুবিল আরবিয়্যাহ, খ. ৪, পৃ. ৮২

রাহ.-এর মতে, সাধারণভাবে ওয়াকফ থেকে রুজু করা বৈধ আর মালিকীগণের মতে শর্তসাপেক্ষে একান্ত প্রয়োজনের সময় রুজু করা বৈধ।

- মালিকীগণের মতে, মেয়াদি ওয়াকফ করা বৈধ। হাম্বলী মাযহাবেও এরূপ একটি মত রয়েছে। শাফিয়ী ফকীহগণের মধ্যে ইবনু সুরাইজ রাহ.-ও এ মত পোষণ করেন।

- মালিকীগণের মতে, ওয়াকফ করার পরও বিশেষ কিছু অবস্থায় ওয়াকফ বাতিল হয়ে যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ওয়াকফকৃত বস্তু কবজ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাওয়ার আগে কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার আগে ওয়াকিফের মৃত্যুবরণ করা কিংবা নিঃস্ব হয়ে যাওয়া।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ওয়াকফ থেকে রুজু করার কিংবা উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকলে বর্তমানে সমাজে ওয়াকফের বহুল বিস্তৃতি ঘটবে এবং তা অধিকতর জনকল্যাণকর। এ কারণে উত্থাপিত জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আমরা এ অভিমত দিতে পারি যে, ওয়াকফ করার পর ওয়াকিফ নিজেই যদি অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার শিকার হন, তবে প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকা (Principal Amount)-এর সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ নগদায়ন করতে পারবে; তবে এর জন্য শর্ত হলো, চুক্তিপত্রে এ মর্মে একটি উপধারা সংযোজন করতে হবে।

অধ্যায় : ৫

বিনিয়োগনীতি : পর্যালোচনা

ইসলামী ব্যাংকগুলো পুঁজি সংগ্রহের পর তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ[১১৭] করে থাকে। পুঁজি সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্যই হলো তা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করা। সুদি ব্যাংকসমূহ তাদের সংগৃহীত পুঁজি সরাসরি নগদ ঋণ হিসেবে প্রদান করে তার ওপর সুদ চার্জ করে আয় অর্জন করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দিয়ে তার ওপর কোনো সুদ চার্জ করে উপার্জন করতে পারে না। তাকে ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতিতে হালাল ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করতে হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যবসায় যদি কোনো কারণে লোকসান হয়ে যায়, তবে তাকে উক্ত লোকসানেরও দায় বহন করতে হয়।

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থায়ন ও বিনিয়োগের মূল ও আদর্শ পদ্ধতি হলো—মুদারাবা ও মুশারাকা। এ পদ্ধতি দুটিতে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করা হয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে কোনোভাবেই মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য সামসময়িক আলিমগণ নানা শর্তসাপেক্ষে কিছু পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমতি দান করেছেন। যেমন—মুরাবাহা, ইজারা, সালাম, ইসতিসনা প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকগুলোতে শুরু থেকেই অর্থায়নের উপর্যুক্ত ইসলামী পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এসব পদ্ধতি সুদি অর্থায়নের বিকল্প নয়। আবার এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, ইসলামী

---

১১৭. আরবীতে বিনিয়োগকে 'ইস্তিসমার' (استثمار) বলা হয়। পরিভাষায় এর অর্থ হলো—মুনাফা অর্জনের আশায় পুঁজিকে কোনো অর্থনৈতিক কারবারে প্রবেশ করানো।

অর্থায়ন-পদ্ধতিসমূহ হুবহু সুদি অর্থায়ন-পদ্ধতির মতো ব্যবহার করা যায়। বরং ইসলামী অর্থায়ন-পদ্ধতিগুলোর রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, চরিত্র ও শর্তাবলি, যা ছাড়া সেই পদ্ধতিগুলোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। সুতরাং এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসলামী অর্থায়নকে সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থায়নের সাথে মিলিয়ে ফেলার কারণ হয়ে যেতে পারে।

অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংকসমূহ যদি বাস্তবে এ সকল পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় শর্ত ও নিয়মাবলি যথাযথ অনুসরণ না করে, তবে শরীয়া লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন ঘটবে, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে সুদের ছোঁয়াও লাগতে পারে। ফলে শরীয়া ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাংকগুলো কার্যত অন্যায় ও সুদি কারবারেই নিয়োজিত হয়ে পড়বে। বাস্তবিকপক্ষেও আমরা লক্ষ করি যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো অনেক সময় বিনিয়োগব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে ছোটো-বড়ো বহু ত্রুটি করে থাকে। এর ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়া লঙ্ঘনের অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর ম্যানুয়ালসমূহে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্বভিত্তিক মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের কথা কাগজে-কলমে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে ঠিকই; কিন্তু বাস্তবে এ পদ্ধতি দুটির উল্লেখযোগ্য কোনো প্রয়োগ নেই। সিরীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অধ্যাপক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মনজের কাহফ বলেন—

> বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংককে তার নির্ধারিত মডেলের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে দূরে সরে যেতে দেখা যায়। তারা অর্থায়নের মূল যে ধরনটি অনুসরণ করে তা মুরাবাহা; মুদারাবা নয়।[১১৮]

বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মৌলিক দর্শনকে কার্যত ততক্ষণ রূপ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতি দুটি ব্যবহারের পরিধিকে বিস্তৃতি দান করবে। পক্ষান্তরে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতি দুটি বরাবরই এড়িয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাংকগুলো প্রধানত মুরাবাহা ও ইজারা প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর বাধ্য হয়ে যাচ্ছে এবং এ

---

১১৮. মনজের কাহফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, *ইসলামী ব্যাংকিং ডিসেম্বর ২০১৪*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., পৃ. ১৪

ব্যবহারও আধুনিক মানদণ্ড যেমন LIBOR[১১৯] ইত্যাদির স্ট্রাকচার অনুযায়ী হচ্ছে, যার ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর লেনদেন চূড়ান্ত পর্যায়ে দৃশ্যগতভাবে সুদি লেনদেনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তবে এটা ঠিক যে, যদি পদ্ধতি দুটির সকল শর্ত কঠোরভাবে মেনে চলা হয়, তবে পদ্ধতি দুটিতে এমন অনেক অনুষঙ্গ বিদ্যমান থাকে, যা ওদেরকে সুদি লেনদেন থেকে স্পষ্ট পার্থক্য করে দেয়। কিন্তু সকলেই এ কথা স্বীকার করে যে, পদ্ধতি দুটি শরীয়তে অর্থায়নের আদর্শ পদ্ধতি নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ফকীহগণ সেই পদ্ধতি দুটিকে অর্থায়নের জন্য কেবল ওইসব ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, যেখানে মুশারাকা ও মুদারাবা কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং সেই অনুমতিও বিশেষ শর্তসাপেক্ষে দিয়েছেন। কাজেই এ অনুমতিকে স্থায়ী ও দৃঢ় নিয়মনীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর এমন হওয়াও উচিত নয় যে, ব্যাংকের সকল লেনদেন-কার্যক্রম মুরাবাহা ও ইজারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

নিম্নে বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ শরীয়া পরিপালন ও লঙ্ঘনের নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. মুশারাকা

পরিচয়

'মুশারাকা' হলো ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দুটি প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতির একটি[১২০] এবং সুদভিত্তিক অর্থায়নের একটি বিকল্প আদর্শিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ের সাথে অংশীদারগণ জড়িত থাকে। এটি সুদনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী মূলনীতিনির্ভর অর্থব্যবস্থায় সময়ের দাবি পূরণে বড়ো ধরনের ভূমিকা পালনে সক্ষম। এটি এমন যুগান্তকারী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। ইসলামী অর্থনীতি ও বাজারব্যবস্থার সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং কল্যাণকামিতার প্রমাণ কেবল এর মাধ্যমেই করা সম্ভব।

---

১১৯. LIBOR (London Interbank Offer Rate) : এটি আন্তঃব্যাংক বাজারে অনিরাপদ স্বল্পমেয়াদি ঋণের রেফারেন্স রেট। এটি স্বল্পমেয়াদি সুদের হারের জন্য একটি বেঞ্চমার্ক হিসেবেও কাজ করে।

'মুশারাকা' (مشاركة) শব্দটি আরবী شركة শব্দ থেকে গৃহীত। شركة-এর আভিধানিক অর্থ হলো—একাধিক বস্তুর মিশ্রণ; অর্থাৎ, দুই বা ততোধিক অংশ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া যে, এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না।[১২১] অতএব, শাব্দিক দিক থেকে মুশারাকার অর্থ একে অপরের সাথে অংশগ্রহণ, অংশীদারত্ব (Partnership)। ফকীহগণের পরিভাষায় মুশারাকা হলো—দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার পারস্পরিক ব্যাবসা ও মুনাফা-সংক্রান্ত চুক্তি।[১২২]

আধুনিক ব্যবহার অনুসারে 'মুশারাকা' মূলত একটি অংশীদারি ব্যাবসা। বর্তমান সময়ে মুশারাকাকে সরাসরি অর্থায়ন (Financing) পদ্ধতিও বলা হয়। আধুনিককালে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে মুশারাকার নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। অর্থনীতিবিদ হাবীবুর রহমান বলেন—

> মুশারাকা বলতে এমন একটি অংশীদারি কারবারকে বোঝায়, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্বনির্ধারিত হারে ভাগ করে নেয় এবং ক্ষতি হলে নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা গ্রহণ করে।[১২৩]

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instituitons (AAOIFI) মুশারাকা বিনিয়োগের সংজ্ঞায় বলেছে—

> .. a form of partnership between the Islamic bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or varying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits.

---

১২১. ফাইয়ুমী, আহমাদ, *আল মিসবাহুল মুনীর ফী গরীবিশ শারহিল কাবীর*, বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, পৃ. ৩১১; কুনুভী, কাসিম ইবনু আবদিল্লাহ, *আনীসুল ফুকাহা ফী তারীফাতিল আলফাযিল মুতাদাওয়ালাহ বাইনাল ফুকাহা*, জেদ্দা : দারুল ওয়াফা, ১৪০১ হি., ১৯৩

১২২. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২৬, পৃ. ৩৩

> মুশারাকা হলো—ইসলামী ব্যাংক এবং এর গ্রাহকদের মধ্যে এমন এক অংশীদার কারবার, যেখানে প্রত্যেক অংশীদার নতুন কোনো প্রকল্প প্রতিষ্ঠা কিংবা বিদ্যমান কোনো প্রকল্পে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মূলধনে সমান কিংবা বিভিন্ন মাত্রায় অংশ নেয়, যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা হ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনের মালিক হয় এবং মুনাফার প্রাপ্য অংশ লাভ করে।[১২৪]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো মতে, 'মুশারাকা' একটি যৌথ মূলধনি কারবার, যেখানে ব্যাংক ও বিনিয়োগগ্রহীতা উভয়েই চুক্তি অনুসারে মূলধন সরবরাহ করে এবং উভয় পক্ষ কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এরূপ মুশারাকা যেহেতু পারস্পরিক চুক্তি ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়, তাই একে 'শিরকাতুল আকদ'[১২৫] (চুক্তিভিত্তিক অংশীদারত্ব)-ও বলা হয়। ইংরেজিতে একে 'Joint Commercial Enterprise' বলা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকসহ সকল গ্রাহকই পরস্পর সম্মত অংশ অনুসারে মূলধন সরবরাহ করে এবং স্বীকৃত অনুপাত অনুসারে অর্জিত মুনাফা ভাগ করে নেয়। লোকসান হলে অবশ্যই প্রত্যেকেই মূলধন অনুপাতেই তার ভাগ বহন করে।

মুশারাকা কারবার-সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান

মুশারাকা কারবার যেহেতু অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই যেকোনো চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত রয়েছে (যেমন—উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির যোগ্যতা থাকা), তা মুশারাকার

---

১২৪. AAOIFI, *Shariah Standards*, Manama, 2008, 1/30

১২৫. এর বিপরীত হলো—'শিরকাতুল মিলক' অর্থাৎ মালিকানায় অংশীদারত্ব। কোনো বস্তুতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে 'শিরকাতুল মিলক' বলে। এটা দু-ভাবে হতে পারে—

এক. কখনও তা অংশীদারদের স্বেচ্ছায় কার্যকর হয় । যেমন—কোনো পূর্বচুক্তি ছাড়াই দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে কোনো সম্পদ ক্রয় করল। ক্রয়সূত্রে ওই সম্পদে তাদের যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হয়। অনুরূপ হিবা বা অসিয়তসূত্রেও যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

দুই. কখনও তা অংশীদারদের অনিচ্ছায় কার্যকর হয়, যেমন—কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা লাভ করে।

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কাজেই এখানে এসব শর্ত বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। তবে মুশারাকা কারবার বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এমন কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে, যা কেবল মুশারাকা চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে সংক্ষেপে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো—

১. মুশারাকার মূলধন নগদ অর্থে হতে হবে। এটাই অধিকাংশ ফকীহের অভিমত। তবে কারও কারও মতে, মূলধন কতিপয় শর্তসাপেক্ষে দ্রব্যের আকারেও (যেমন—ব্যাবসায়িক পণ্যসামগ্রী, স্থাবর সম্পত্তি, মেশিনারিজ ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি) হতে পারে। শর্তগুলো হলো—

ক. ব্যাবসার শুরুতেই দ্রব্যের বাজারদর অনুযায়ী মূলধনে অংশীদারের অংশ নির্ধারণ করা হবে।

খ. উক্ত দ্রব্য সব ধরনের দায়মুক্ত হতে হবে।

গ. সংশ্লিষ্ট দ্রব্য মুশারাকা কারবারটিতে সরাসরি ব্যবহৃত হতে হবে।

ঘ. পূর্ববর্তী অনাদায়ী/খেলাপি গ্রাহকের দেনা বর্তমান মুশারাকার ইকুইটি হতে পারবে না।

ঙ. সিকিউরিটি/মর্টগেজ করা সম্পত্তি ইকুইটি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

২. মুশারাকায় প্রত্যেকের মূলধনের পরিমাণ ও ধরন নির্দিষ্ট হতে হবে; 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা'-এর ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে সমঅংশীদারত্বের কথা স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. মুশারাকায় প্রত্যেক অংশীদার যৌথভাবে কারবারের ব্যবস্থাপনার কাজ (যেমন—পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি) সম্পাদন করতে পারেন। আবার কোনো একজন অংশীদারও তা সম্পাদন করতে পারেন এবং এজন্য তিনি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেতন-ভাতা গ্রহণ করতে পারেন। তাদের মধ্যে কেউ একজন কারবার-সংশ্লিষ্ট বিশেষ কোনো দায়িত্ব পালন করলে তাকে ওই কাজের বিপরীতে আলাদা পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে।

৪. মুশারাকায় যদি সকল অংশীদার ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে কাজ করতে একমত হয়, তবে ব্যাবসার সকল বিষয়ে তাদের প্রত্যেকেই একে অন্যের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্যাবসার সাধারণ অবস্থায় অংশীদারদের

যে-কেউ যেকোনো কাজ করবে, তার ব্যাপারে এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, অন্য অংশীদাররাও তাতে অনুমতি দিয়েছে।

৫. মুশারাকা কারবারে অংশীদারদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টনের হার চুক্তিপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা অংশীদারদের মধ্যে আনুপাতিক হারে (যেমন—অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) কিংবা শতকরা হারে (যেমন—৩০%, ৪০% ইত্যাদি) নির্ধারণ করতে হবে। কাজেই কোনো অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ (যেমন—লভ্যাংশের দশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিনিময়ে নির্ধারিত কোনো অংশ (যেমন—বিনিয়োগকৃত পুঁজির শতকরা বিশ ভাগ) ধার্য করা যাবে না।

৬. মুশারাকা কারবারে মুনাফা বণ্টনের হার সাধারণ অবস্থায় বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কমবেশি হতে পারবে। কিন্তু কোনো অংশীদার যদি চুক্তিপত্রে এ মর্মে স্পষ্ট শর্তারোপ করে যে, সে কখনও সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করবে না; বরং মুশারাকার পুরো মেয়াদেই নিষ্ক্রিয় অংশীদার (স্লিপিং পার্টনার) হিসেবে থাকবে, এরূপ অবস্থায় তার লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজি অপেক্ষা বেশি হতে পারবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর অভিমত।[১২৬]

৭. মুশারাকা ব্যবসায় লোকসান হলে অংশীদারগণ প্রত্যেকেই নিজের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে তা বহন করবেন। সুতরাং (উদাহরণস্বরূপ) যে অংশীদার শতকরা ২৫ ভাগ মূলধন বিনিয়োগ করবে, সে লোকসানেরও শতকরা ২৫ ভাগ বহন করবে; কমবেশি বহন করবে না।

তবে এ লোকসান যদি ব্যাবসা পরিচালনাকারী অংশীদারদের কোনো অবহেলা কিংবা অব্যবস্থাপনার জন্য হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এর দায় বহন করবেন। এ ক্ষেত্রে তাদের অবহেলা ও অব্যবস্থাপনার কারণে যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, কেবল সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণই তাদের নিকট থেকে আদায় করা যাবে।

---

১২৬. কাসানী, *বদাইয়ুস সানাই*, খ. ৬, পৃ. ১৬২
তবে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ী রাহ. প্রমুখের মতে—প্রত্যেক অংশীদারকে তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লাভ প্রদান করা 'মুশারাকা' সহীহ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত।

চুক্তিবলে লোকসান থেকে কোনো অব্যাহতি প্রদান বৈধ নয়। যেমন—এ মর্মে কোনো পক্ষের মুশারাকা চুক্তি করা যে, তিনি ব্যবসায় নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করবেন আর মাসে মাসে কিংবা বছরে ব্যাবসার আয় থেকে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা দেওয়া হবে; কিন্তু তার মূলধন অক্ষত থাকবে। এরূপ চুক্তি করা শরীয়া-পরিপন্থি।

৮. কোনো অংশীদার একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। যদি নেয় এবং তাতে ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে অন্য অংশীদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন—সকল অংশীদারের সম্মতি ছাড়া কোনো একজন অংশীদার ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং ব্যবসায়ের তহবিল থেকে তৃতীয় কাউকে ঋণ ও দান-অনুদান প্রদান করতে পারবে না।

৯. মুশারাকা চুক্তির শর্তানুযায়ী এক পক্ষ অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে কারবার সমাপ্ত করতে পারবে। তা ছাড়া দুজনের যেকোনো একজন মারা গেলে কিংবা কেউ একজন কার্যকরভাবে ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়লে অংশীদারি কারবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কারবারে যদি দুইয়ের অধিক লোক থাকে তাহলে কারবার বিলুপ্ত হবে না। অংশীদারের মৃত্যুর ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের জন্য এ সুযোগ রয়েছে যে, তারা চাইলে তার অংশ উঠিয়ে না নিয়ে চুক্তি অব্যাহতও রাখতে পারবে।

১০. কারবার সমাপ্তকরণের সময় সম্পদ নগদ অর্থের আকারে থাকলে অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী ভাগ করে নেবেন। আর যদি তা নগদ অর্থের আকারে না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যগত সম্পদকে নগদ অর্থে রূপান্তর করতে হবে। তবে দ্রব্যগত সম্পদ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেও অংশীদাররা চাইলে ভাগ করে নিতে পারে।

১১. মুশারাকায় এক পক্ষ কারবারের সমাপ্তি চাইলে আর অপর পক্ষ কারবার চালু রাখতে চাইলে উভয়ের সম্মতিক্রমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের অংশ ক্রয় করে নিয়ে কারবার চালু রাখতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে অংশীদারত্ব বিলুপ্তিকারীর অংশের মূল্য পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতেই নির্ধারণ করতে হবে।

১২. মুশারাকা কারবার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বিনিয়োগ গ্রাহকের

সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে—অনেক ফকীহের মতে—গ্রাহকের ওপর ক্ষতিপূরণ (কম্পেনসেশন) আরোপ করা যাবে, তবে উক্ত ক্ষতিপূরণ বৈধ আয় হিসেবে গণ্য হবে না; তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে।

মুশারাকা ও মুদারাবা : পার্থক্য

মুশারাকা ও মুদারাবা দুটি পদ্ধতিই লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদারত্বমূলক কারবার হলেও বিনিয়োগের ধরন, ব্যাবসা পরিচালনা, লাভ-লোকসান বণ্টন প্রভৃতি দিক থেকে দুটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

১. মুশারাকা কারবারে সকল অংশীদার মূলধন সরবরাহ করে। পক্ষান্তরে মুদারাবা কারবারে মূলধন সরবরাহের দায়িত্ব কেবল রব্বুল মালের ওপর।

২. মুশারাকায় সকল অংশীদার কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার অধিকার রাখে। পক্ষান্তরে মুদারাবায় রব্বুল মাল কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের কোনো অধিকার রাখে না; বরং তা কেবল মুদারিব কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৩. মুশারাকায় সকল অংশীদার নিজের পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে লোকসানে অংশীদার হয়। পক্ষান্তরে যদি মুদারাবায় লোকসান হয়, তাহলে তা সাধারণত কেবল রব্বুল মালকেই বহন করতে হয়, যদি না মুদারিবের কোনো গাফলতি বা অসততা প্রমাণিত হয়।

৪. মুশারাকায় সাধারণত অংশীদারদের দায়িত্ব কেবল নিজের অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কাজেই ব্যাবসার দায় বা ঋণ যদি তার সম্পদের তুলনায় বেশি হয়ে যায় এবং পর্যায়ক্রমে ব্যাবসার পণ্যসামগ্রী তারল্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে সম্পদ অপেক্ষা অতিরিক্ত দায় সকল অংশীদারকে নিজ নিজ অংশ অনুপাতে বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে মুদারাবায় রব্বুল মালের দায়িত্ব তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে রব্বুল মাল যদি মুদারিবকে তার পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন ব্যাপার।

৫. মুশারাকায় যখনই অংশীদাররা নিজেদের পুঁজিগুলো মিশ্রণ করে নেয়, তখন মুশারাকার সমুদয় সম্পদে অংশীদারদের অংশ অনুপাতে তাদের যৌথ মালিকানা হয়ে যাবে। ফলে অংশীদারদের প্রত্যেকেই উক্ত সম্পদের মূল্য

বৃদ্ধির সাথে লাভবান হতে থাকবে, যদিও তা বিক্রি করে লাভবান হয়নি। পক্ষান্তরে মুদারাবায় ক্রয়কৃত সম্পদের মালিক হয় কেবল রব্বুল মাল। মুদারিব কেবল উক্ত সম্পদ লাভে বিক্রি করার ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে স্বীয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং মুদারিব সম্পদের বৃদ্ধি হলেও তাতে নিজের অংশে দাবি করার অধিকার রাখে না।[১২৭]

শিরকাতুল আকদ-এর প্রকারভেদ

ফকীহগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিরকাতুল আকদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকার আলোচনা করা হলো :

ক. ক্ষেত্র বিবেচনায় শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ

ক্ষেত্র বিবেচনায় শিরকাতুল আকদ তিন প্রকার। যথা—

১. **শিরকাতুল আমওয়াল** (সম্পদভিত্তিক যৌথ কারবার) : দুই বা ততোধিক শরীক এই শর্তে চুক্তি করা যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুঁজিতে যৌথভাবে ব্যাবসা করবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুপাতে লাভ তাদের মাঝে বণ্টিত হবে। এ ক্ষেত্রে চুক্তির সময় পুঁজির পরিমাণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হলেও কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, এ প্রকরণটিই আধুনিক অর্থায়ন-পদ্ধতির সাথে প্রায়ই মিলসম্পন্ন এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অনুসৃত হয়।

২. **শিরকাতুল আমাল** (শ্রম ও দক্ষতাভিত্তিক যৌথ কারবার) : দুই বা ততোধিক ব্যক্তির এ মর্মে চুক্তি করা, তারা নিজেদের শ্রম ও দক্ষতাকে পুঁজি করে যৌথভাবে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং গ্রাহকদের থেকে অর্জিত পারিশ্রমিক নির্ধারিত হারে তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। এরূপ কারবারে অংশীদাররা পুঁজি বিনিয়োগ করে না; বরং তাদের শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে কারবারে অংশ নেয়। এর নমুনা হলো : দুই বা ততোধিক লোক মিলে সেলাই করা, কাপড়ে রং লাগানো, ভবন নির্মাণ, চিকিৎসাসামগ্রী তৈরি ইত্যাদি যেকোনো কাজ। এর আরও কয়েকটি নাম রয়েছে, যেমন—শিরকাতুস সানায়ে (নির্মাণ-শিল্পভিত্তিক অংশীদারত্ব), শিরকাতুল আবদান, শিরকাতুত তাকাব্বুল ইত্যাদি। অবশ্য অনেকে এগুলোর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন। যেমন—

১২৭. তকী উসমানী, [illegible]

ক. শ্রমভিত্তিক অংশীদারি কারবার হলো—শিরকাতুল আমাল;

খ. শারীরিক অংশগ্রহণমূলক কারবার হলো—শিরকাতুল আবদান;

গ. কাজ সংগ্রহভিত্তিক অংশীদারি কারবার হলো—শিরকাতুত তাকাব্বুল।

৩. শিরকাতুল ওজুহ (সুনামভিত্তিক যৌথ কারবার) : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এ এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, তারা পুঁজি ছাড়া কেবল নিজেদের সুনাম, পরিচিতি, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে বাকিতে পণ্যসামগ্রী কিনবে, আর তা নগদ মূল্যে বিক্রি করবে এবং এতে যে লাভ-লোকসান হবে তা প্রত্যেকে পূর্বনির্ধারিত হারে ভাগ করে করে নেবে।[১২৮] এ ধরনের অংশীদারি কারবারে মুনাফা চুক্তিপত্র অনুযায়ী সমান সমান বা কমবেশি করা যাবে; আর লোকসান হলে তার দায়দায়িত্বও অংশ অনুপাতে প্রত্যেকেই বহন করবে। আধুনিককালে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডেফার্ড বা বিলম্বিত পেমেন্ট শর্তে এলসির মাধ্যমে পণ্যের বেচাকেনা হয়ে থাকে। ব্যাংক তার সুনাম ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে অংশীদারির ভিত্তিতে ব্যাবসা পরিচালনা করতে পারে।

উল্লেখ্য, অংশীদারত্বের এ তিনটি পদ্ধতিকে ফিকহের পরিভাষায় সাধারণত 'শিরকাত' বলা হয়। সরাসরি 'মুশারাকা' পরিভাষাটি ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। এ পরিভাষাটি বর্তমান যুগের ইসলামী অর্থায়ন-পদ্ধতির ওপর গ্রন্থরচনাকারীদের মাধ্যমেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ পরিভাষাটি সাধারণত শিরকাতের ওই বিশেষ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যাকে 'শিরকাতুল আমওয়াল' বলা হয়, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে নিজ নিজ মূলধন সরবরাহ করে। তবে কখনও এ পরিভাষাটি 'শিরকাতুল আমাল' বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, 'শিরকাত' পরিভাষাটি 'মুশারাকা'-এর তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক। 'মুশারাকা'

---

১২৮. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০০, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮-৩৬১; কাসানী, *বদায়িউস সানাই*, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুল মাআরিফ, ২০০০, খ. ৬, পৃ. ৫৮; ইবনুল হুমাম, *শারহু ফাতহিল কাদীর*, রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৫, পৃ. ২৪-৩০; শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬, খ. ২, পৃ. ২১২; বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, *ইসলামের ব্যবসায়-বাণিজ্য-২*, ঢাকা, ২০১৬, খ. ৪, পৃ. ৪৮-৫১

দ্বারা সাধারণত কেবল 'শিরকাতুল আমওয়াল'-কে বোঝানো হয়। পক্ষান্তরে 'শিরকাত' শব্দে মালিকানায় অংশীদারত্ব এবং অন্যান্য সকল প্রকারের অংশীদারত্বই অন্তর্ভুক্ত।

খ. অংশ সমান বা কমবেশির বিবেচনায় শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ

যৌথ কারবারের পুঁজি (نُقُودٌ), ব্যাবসায়িক কার্য সম্পাদন, লাভ, ব্যাবসায়িক ঋণের বিপরীতে কফালত বা দায়িত্বগ্রহণ এবং কার্য পরিচালনার যোগ্যতা—এ পাঁচটি সূচকে অংশীদারগণের অংশ সমান হওয়া না হওয়ার বিচারে যৌথ চুক্তি দু-ভাগে বিভক্ত :

১. **শিরকাতুল মুফাওয়াদা (সম-অংশীদারি কারবার) :** মুফাওয়াদা শব্দের আভিধানিক অর্থ আলাপ-আলোচনা (negotiation)। পরিভাষায় যৌথ কারবারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল শরীকের মধ্যে উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় তথা মূলধন, শ্রম, লাভ, ঝুঁকি, ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণ সমতা বিদ্যমান থাকলে তাকে 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' বলা হয়। তাই এ শারিকায় সমতা বিধান শর্ত করা হয়েছে।[১২৯] অর্থাৎ, এরূপ অংশীদারির ক্ষেত্রে উভয় অংশীদার সমানভাবে মূলধন সরবরাহ করে; কারবার পরিচালনায় সমান অধিকার পায়; লাভ-লোকসানও সমানভাবে বণ্টিত হয়; দায়ও উভয়েই সমানভাবে বহন করে। এ প্রক্রিয়ায় উভয়ের প্রত্যেকে অংশীদারির বিষয়টি অপরের হাতে নিঃশর্তভাবে ন্যস্ত করে। একজন অপরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে।

২. **শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারি কারবার) :** ওই যৌথ কারবার, যার মধ্যে উল্লিখিত সমতা নেই। অর্থাৎ, এমন কারবার, যেখানে অংশীদারদের মূলধন, লাভ, ব্যবসায়ে সময়দান ও দায়িত্ব-কর্তব্য সমান নয়। এই সমতা মৌলিকভাবে অনুপস্থিত হতে পারে, আবার চুক্তির সময় বর্তমান থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা দূর হয়ে যেতে পারে। যেমন চুক্তির সময় উভয় শরীকের সম্পদ ছিল সমান। কিন্তু কারবারের পণ্য কেনার পূর্বে একজনের

---

১২৯. বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, *ইসলামের ব্যাবসায়-বাণিজ্য-২*, ঢাকা, ২০১৬, খ. ৪, পৃ. ৫২

সম্পদের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেল। তখন এই মূল্যবৃদ্ধির কারণেই চুক্তিটি শিরকাতুল ইনানে রূপান্তরিত হবে।[১৩০]

এরূপ কারবারে একজনের চেয়ে অন্যজনের মূলধন বেশি বা কম হতে পারে; নিজেদের মধ্যে একজন অংশীদারকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়াও বৈধ। এ ক্ষেত্রে কারবারে লাভ হলে অংশীদাররা সমান লাভ নেয় না; বরং চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে লাভ নেয় এবং লোকসান হলে মূলধনের অনুপাতে তা বহন করে।

মুশারাকা ও মুদারাবার সমন্বয়

সাধারণত মনে করা হয় যে, মুদারাবা কারবারে মুদারিব কোনোরূপ পুঁজি বিনিয়োগ করে না। সে কেবল ব্যবস্থাপনার জিম্মাদার; সমুদয় পুঁজি রব্বুল মাল বিনিয়োগ করে। কিন্তু এমন অবস্থাও হতে পারে যে, মুদারিব তার কিছু পুঁজি কারবারে বিনিয়োগ করতে চায়। এ অবস্থায় মুদারাবা ও মুশারাকা চুক্তি দুটি একত্র হয়ে যাবে। ধরুন, আবদুল্লাহ আবদুর রহমানকে মুদারাবার ভিত্তিতে এক লক্ষ টাকা প্রদান করল। অতঃপর আবদুর রহমান আবদুল্লাহর সম্পদে নিজের পক্ষ থেকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করল। এ জাতীয় অংশীদারত্বের ক্ষেত্রে মুদারাবা ও মুশারাকার সমন্বিত মুআমালা করা হবে। এরূপ কারবারে মুদারিব নিজের জন্য অংশীদার হিসেবে মুনাফার একটি বিশেষ অংশ ধার্য করতে পারবে। উপর্যুক্ত উদাহরণে মুনাফা এ ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে যে, আবদুর রহমান প্রকৃত মুনাফার এক-তৃতীয়াংশ স্বীয় পুঁজির কারণে পাবে, অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ মুনাফা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টিত হবে অথবা উভয় পক্ষ অন্য কোনো আনুপাতিক হারের ওপরও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে এতটুকু শর্ত যে, নিষ্ক্রিয় অংশীদার (স্লিপিং পার্টনার) স্বীয় পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণে আবদুল্লাহ নিজের জন্য সমুদয় মুনাফার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ধার্য করতে পারবে না। কেননা, তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি সমুদয় পুঁজির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি নয়।[১৩১]

---

১৩০. তদেক

১৩১. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি :..*, পৃ. ৫৩

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুশারাকার প্রয়োগ

বলার অপেক্ষা রাখে না, 'শিরকাতুল মুফাওয়াদা' একটি সুন্দর ও ন্যায়সংগত ব্যাবসা পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক ও অপর কোনো উদ্যোক্তা সমান মূলধন সরবরাহ করে এ প্রকৃতির ব্যাবসা শুরু ও পরিচালনা করতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে শুরু করে যেকোনো পণ্যের ব্যাবসা এ পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। অবশ্য এ পদ্ধতিতে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে, ব্যাবসা ক্লোজ করতে চাইলে তা উভয়ের মধ্যে সমবণ্টন সম্ভব কি না? বর্তমান যুগে শিল্পপ্রতিষ্ঠানও বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদায়ন করা এবং উভয়ের মধ্যে সমবণ্টন সম্ভব। সুতরাং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে ব্যাবসা শুরু করার ক্ষেত্রে ব্যাংককে কতিপয় বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিটি খুবই ঝুঁকিবহুল, অথচ ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ডিপোজিটরদের টাকা যথাযথভাবে পূর্ণ নিরাপত্তাসহ ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সজাগ থাকা একটি নৈতিক দায়িত্ব। তাই এই পদ্ধতির অনুসরণের পূর্বে ব্যাংককে প্রথমেই খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যে ব্যাবসাটি শুরু করা হচ্ছে তার বাজার কেমন, ভবিষ্যৎ চাহিদা কেমন থাকবে, বিভিন্ন পদ্ধতির ঝুঁকির মাত্রা কতটুকু। অতঃপর উদ্যোক্তা অংশীদারের অভিজ্ঞতা, সততা, আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও পরিশ্রম করার মানসিকতা ইত্যাদি নিবিড় ও সূক্ষ্মভাবে যাচাই করতে হবে। এ সকল বিষয়ের কোনো একটির অনুপস্থিতির কারণে ব্যবসায় বিশাল ক্ষতির বোঝা নেমে আসতে পারে। অংশীদার কর্তৃক যাতে কোনোরূপ অনৈতিক কাজ হতে না পারে তার জন্য ব্যাংকের পক্ষেও এক বা একাধিক দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ ও আমানতদার কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে। সব থেকে ভালো হয় যদি অর্থ ও হিসাব পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন কাউকে অর্থ ও হিসাব দেখার কাজে নিয়োগ করা যায়। ব্যাবসার গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ শাখা ব্যবস্থাপক মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখবেন।

মুশারাকার অন্যান্য প্রকারের তুলনায় 'শিরকাতুল ইনান'-এর প্রয়োগ অধিকতর সহজ। এরূপ কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের পুঁজি, ঝুঁকি, মুনাফা, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা-যোগ্যতা সমান হওয়া শর্ত নয়। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এর প্রচলন বেশি।

এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে গ্রাহক এবং অবশিষ্ট অংশ প্রদান করে ব্যাংক। একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুশারাকা হলে অন্যান্য অংশীদারের মতো ব্যাংকও পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে। ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত গ্রাহকের ওপর থাকে। তবে ব্যাংক ইচ্ছা করলে ব্যবস্থাপনায়ও অংশ নিতে পারে। ব্যবসায় লাভ হলে তা চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাতে ব্যাংক ও অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় আর লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে ব্যাংক ও অন্যান্য অংশীদার তা বহন করে।[১৩২]

এ পদ্ধতিতে মুফাওয়াদা পদ্ধতির কতিপয় সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়। যেমন, মুফাওয়াদা পদ্ধতিতে উভয়েরই মূলধন সমান হওয়া আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। কারণ, কখনও উদ্যোক্তার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা আবার কখনও ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঝুঁকি গ্রহণের সুযোগ কম থাকা। কেননা, কখনও কখনও ব্যাংক মুদারিবকে অর্থ দিয়ে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক ঝুঁকি গ্রহণকে যথার্থ মনে করে না। শিরকাতুল ইনানের ক্ষেত্রে ব্যাংক উদ্যোক্তাকে ব্যাবসার ৩০% বা ২০% বা ১০% বিনিয়োগ করে ব্যাবসার গতি-প্রকৃতি, লাভের অবস্থা, ব্যবসায়ীর সততা ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণের পর পর্যায়ক্রমে ব্যাবসা প্রসার করে ব্যাংকের পুঁজির অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। অপরদিকে এমন উদ্যোক্তা আছে, যারা পরীক্ষিত অথচ ৫০% মূলধনের জোগান দিয়ে ব্যাবসা করা সম্ভব নয়। এরূপ উদ্যোক্তাগণ অধিকাংশ ব্যাংকের মূলধনে ব্যাবসা করার সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যিনি মূলত ব্যাবসা পরিচালনা করেন তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শ্রম ও সময়দান অনেক বেশি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মুনাফা মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হলে ব্যাংক অধিক মূলধন দেওয়ার কারণে অধিকাংশ মুনাফারই মালিক হয়ে যাবে আর মূল উদ্যোক্তা মুনাফার কিয়দংশ পাবে। ফলে উদ্যোক্তাগণ আগ্রহসহ এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে না। যেহেতু এ পদ্ধতিতে মুনাফার হার চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেহেতু উভয় পক্ষ নিজেদের সুবিধানুসারে মুনাফার হার নির্ধারণ করতে পারে। লোকসান বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি এরূপ হয় যে সমুদয় পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায় আর ব্যাংকের মূলধন বেশি থাকে এবং মুনাফার

১৩২. হুদা, মুহাম্মদ শামসুল ও দুহা, মুহাম্মদ শামসুদ, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি: শরীয়ার নীতিমালা*, ঢাকা : আইবিবিএল, ২০১১, পৃ. ১১৪

অনুপাত কম থাকে আর মুনাফার হার অনুপাতে লোকসান বণ্টন করা হয়, তবে উদ্যোক্তা অংশীদারকে ব্যাবসার মূলধনের বাইরে থেকে অর্থ জোগান দিয়ে লোকসান বহন করতে হবে। উদ্যোক্তার এরূপ সামর্থ্য নাও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে মূলধন অনুপাতে লোকসান বণ্টনই অধিকতর সুবিধাজনক ও ন্যায়সংগত।

বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুশারাকাভিত্তিক বিভিন্ন অর্থায়ন-পদ্ধতি ও প্রোডাক্ট উদ্ভাবিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় মুশারাকাভিত্তিক প্রসিদ্ধ অর্থায়ন-পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

ক. চলমান মুশারাকা (মুশারাকা মুস্তামিররাহ)

কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট না করে মুশারাকার চুক্তি করা হলে তাকে মুশারাকা মুসতামিররা বা চলমান মুশারাকা বলা হয়। এ পদ্ধতিকে 'মুশারাকা তাম্মা' (পূর্ণাঙ্গ মুশারাকা) ও 'মুশারাকা দাইমা' (স্থায়ী মুশারাকা)-ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো ব্যবসায়ী বা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে। হিসাব শেষে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে এবং লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা বহন করে। এ ধরনের মুশারাকা চুক্তিতে কোনো মেয়াদ উল্লেখ থাকে না।[১৩৩] তবে ইসলামী ব্যাংক ইচ্ছে করলে কোম্পানিতে বিনিয়োগকৃত তার মূলধন অথবা শেয়ার অন্যের কাছে বিক্রি করে ব্যাবসা থেকে বেরিয়েও আসতে পারে।

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তার মাধ্যমে কোনো প্রকল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান করার জন্য অর্থায়ন করতে পারে। মূলধনের শেয়ার অর্জন করার মাধ্যমেও ব্যাংক কোনো চলতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেওয়ার অধিকার রাখে। এ জাতীয় স্থায়ী মুশারাকা সাধারণত বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে করা হয়, যদিও ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রাহকদেরকে অর্থায়নের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।[১৩৪]

---

১৩৩. হাইতি, আবদুর রাযযাক, *আল মাসারিফুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান নাযরিয়্যাতি ওয়াত তাতবীক*, আম্মান : দারুল উসামাহ, ১৯৯৮, পৃ. ৪৯৬

১৩৪. হুদা ও দুহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

খ. ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা (মুশারাকা মুতানাকিছাহ)

এটি একটি নতুন ধরনের কারবার। এ পদ্ধতিতে কোনো আয়বর্ধক বা উৎপাদনশীল প্রকল্পে দু-পক্ষ অংশীদার হয়। অংশীদারদ্বয়ের কোনো একপক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অংশ ক্রমান্বয়ে ক্রয়ের অঙ্গীকার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার অংশের আয় থেকে তা ক্রয় করা কিংবা অন্য কোনো উৎসের অর্থ থেকে তা ক্রয় করা—উভয় সমান।

'মুশারাকা মুতানাকিছা' 'মুশারাকা মুস্তামিররা' (চলমান মুশারাকা) থেকে একটু ভিন্ন। মুশারাকা মুস্তামিররাতে ব্যাংকের মূলধন বা মালিকানার শেয়ার হ্রাস পাওয়ার কোনো বিধান থাকে না। অর্থাৎ, কোনো অংশীদার চলমান প্রকল্প থেকে মূলধন বা তার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করেন না। প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা নিজের শেয়ার কারও কাছে বিক্রির পূর্বপর্যন্ত মূলধনের শেয়ার বা ইক্যুইটি একই রকম থাকে। তারা শুধু বার্ষিক হিসাব সমাপনান্তে লাভ গ্রহণ বা লোকসান বহন করতে থাকেন।

পক্ষান্তরে মুশারাকা মুতানাকিছা বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকায় এক অংশীদার অপর অংশীদারের শেয়ার ক্রমান্বয়ে ক্রয় করতে থাকেন। এরূপ কারবারে ব্যাংক তার মূলধনের অংশ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে থাকে। নির্দিষ্ট কিস্তিতে গ্রাহক ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করেন এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পায় এবং গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পায়। ফলে একপর্যায়ে গ্রাহক প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যান।[১৩৫] আর গ্রাহক কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জনের পূর্বপর্যন্ত তাতে কোনো লাভ হলে তা চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টিত হবে এবং লোকসান হলে মূলধনের অনুপাতে তা উভয়ে বহন করবে। এ ধরনের মুশারাকায় সাধারণত ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার অনুপাতে মুনাফায় তার অংশও হ্রাস পেতে থাকে।

উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিতে কারবার শুরুর সময়ে মুশারাকার কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের অংশ অনুরূপ মূল্যে ক্রয় করার অঙ্গীকার করবে না। এতে এক অংশীদার কর্তৃক অপর অংশীদারের অংশের জামানত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের দিনে বাজারমূল্যে কিংবা ক্রয়-বিক্রয়কালে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রিতব্য অংশের মূল্য নির্ধারণ হওয়া উচিত।

এ পদ্ধতিকে বিভিন্ন কারবারে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন—হাউজ ফিন্যান্সিং (গৃহ নির্মাণ)-এর জন্য এ পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরুন, গ্রাহক একটি বাড়ি ক্রয় করতে ইচ্ছুক; কিন্তু তার নিকট বাড়ি ক্রয় করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা নেই। এমতাবস্থায় গ্রাহক অর্থায়নকারীর শরণাপন্ন হয়। ফলে অর্থায়নকারী বাড়ি ক্রয়ে গ্রাহকের সাথে অংশীদারত্বের জন্য উৎসাহী হয়। বাড়ির মূল্য বিশ পার্সেন্ট গ্রাহক পরিশোধ করে এবং আশি পার্সেন্ট পরিশোধ করে অর্থায়নকারী। সুতরাং বাড়িটির আশি পার্সেন্টের মালিক অর্থায়নকারী এবং বিশ পার্সেন্টের মালিক গ্রাহক। বাড়ি যৌথভাবে ক্রয়ের পর গ্রাহক বাড়িকে তার বসবাসের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং অর্থায়নকারীকে তার অংশ ব্যবহারের কারণে ভাড়া প্রদান করে। এর সাথে সাথে অর্থায়নকারীর অংশ সমান আটটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিট বাড়ির দশ পার্সেন্ট মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। (কারণ, তার পূর্ণ মালিকানা ছিল আশি পার্সেন্ট।) গ্রাহক অর্থায়নকারীরর সাথে এ অঙ্গীকার করে যে, প্রত্যেক তিন মাস পরপর একটি ইউনিট ক্রয় করবে। সুতরাং তিন মাসের প্রথম মেয়াদ পূর্ণ হলে সে বাড়ির মূল্যের দশ পার্সেন্ট পরিশোধ করে একটি ইউনিট ক্রয় করে নেয়। এর দ্বারা অর্থায়নকারীর অংশ আশি পার্সেন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে সত্তর পার্সেন্ট হয়ে যাবে। এই অনুপাতে অর্থায়নকারীকে পরিশোধ্য ভাড়ার পরিমাণও কম হতে থাকবে। দ্বিতীয় মেয়াদ পূর্ণ হলে গ্রাহক আরও একটি ইউনিট ক্রয় করে নেবে। এর ফলে বাড়িতে তার অংশ বেড়ে চল্লিশ পার্সেন্ট এবং অর্থায়নকারীর অংশ হ্রাস পেয়ে ষাট পার্সেন্ট হয়ে যাবে। এভাবে এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে, এমনকি দু-বছর সমাপ্তির পর গ্রাহক অর্থায়নকারীর সমুদয় অংশ ক্রয় করে নেবে, যার ফলে তার অংশ শেষ হয়ে যাবে এবং গ্রাহকের অংশ একশত পার্সেন্ট হয়ে যাবে।

উপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন লেনদেনের সমষ্টি, যা বিভিন্ন পর্যায়ে নানা দায়িত্ব আদায় করে। যেমন—উদাহরণটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রয়েছে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো পর্যালোচনা দাবি রাখে :

ক. বাড়িতে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা (শিরকাতুল মিলক);

খ. অর্থায়নকারীর অংশ গ্রাহককে ভাড়ায় প্রদান করা;

গ. অর্থায়নকারী গ্রাহক থেকে তার অংশ ক্রয়ের অঙ্গীকার নেওয়া;

ঘ. বিভিন্ন ধাপে বাস্তবে তার ইউনিটসমূহ ক্রয় করা;

ঙ. বাড়িতে অর্থায়নকারীর অবশিষ্টাংশ অনুপাতে ভাড়া নির্ধারণ।

প্রথমত, 'বাড়িতে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা'র বিষয়টি 'শিরকাতুল মিলক'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যৌথভাবে ক্রয়ের মাধ্যমেও যৌথ মালিকানা তৈরি হয়। এ বিষয়ে সকল ফকীহের ঐকমত্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থায়নকারী তার নিজের অংশ গ্রাহককে ভাড়ায় প্রদান করে এবং এর বিনিময়ে তার থেকে ভাড়া উসুল করে। এ বিষয়টিও সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা, কোনো ব্যক্তির যৌথ সম্পত্তিতে স্বীয় অবণ্টিত অংশ অপর অংশীদারকে ভাড়ায় প্রদান করার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

তৃতীয়ত, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অবণ্টিত অংশে বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ক্রয় করতে থাকে। এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। যদি অবণ্টিত অংশ জমিন ও বিল্ডিং উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে উভয়টির বিক্রি সকল ফকীহের মতে বৈধ। অনুরূপভাবে বিল্ডিংয়ের অবণ্টিত অংশ নিজের অপর অংশীদারের নিকট বিক্রি করে, তাও সকলের মতে বৈধ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, তিনটি বিষয়ই নিজস্বতার বিচারে বৈধ। কিন্তু এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এ তিনটি বিষয়কে একই ব্যবস্থাপনায় একত্রীকরণ বৈধ কি না? এর জবাব হলো—যদি তিনটি বিষয়কে এই হিসেবে একত্র করা হয় যে, তাদের প্রত্যেকটি অপরটির জন্য শর্তস্বরূপ হয়ে যায়, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। কেননা, ইসলামের আইনগত পদ্ধতিতে এ মূলনীতি অবধারিত যে, একটি লেনদেনকে অপরটির জন্য পূর্বশর্ত বানানো যায় না। কিন্তু উপর্যুক্ত উদাহরণটিতে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, দুটি লেনদেনের একটিকে অপরটির জন্য শর্তস্বরূপ বানানোর পরিবর্তে কেবল গ্রাহকের পক্ষ থেকে একতরফা অঙ্গীকার হতে হবে। প্রথম অঙ্গীকার এ কথার যে, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশকে ভাড়ায় গ্রহণ করে এর ভাড়া পরিশোধ করবে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার হলো, সে বাড়িতে অর্থায়নকারীর অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে ক্রমান্বয়ে ক্রয় করে নিতে থাকবে।

চতুর্থত, অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আবশ্যকতার মাসআলা। সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে, কোনো কাজের অঙ্গীকার গ্রহণের দ্বারা অঙ্গীকারকারীর ওপর

কেবল নৈতিক দায় আরোপিত হয়; সেই অঙ্গীকার কার্যত আদালতের মাধ্যমে পূরণ করানো যায় না। কিন্তু কতিপয় ফকীহের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ যে, অঙ্গীকার বিচারের দৃষ্টিতেও আবশ্যক হয়ে যায় এবং আদালত অঙ্গীকারকারীকে তার কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্য বাধ্য করতে পারে, বিশেষত ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ডে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে 'ক্রমহ্রাসমান অংশীদারত্ব'-কে হাউজ ফিন্যান্সিংয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে—

- যৌথভাবে ক্রয়, ভাড়া এবং অর্থায়নকারীর ইউনিটসমূহের ক্রয়-বিক্রয়—এসব লেনদেনকে একই চুক্তিতে পরস্পর মিলানো উচিত নয়। তবে যৌথ ক্রয় এবং ভাড়ার চুক্তিকে একই কাগজে লেখা যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থায়নকারী এ ব্যাপারে একমত পোষণ করবে যে, যৌথ ক্রয়ের পর সে তার অংশ গ্রাহককে ভাড়ার ভিত্তিতে প্রদান করবে। এরূপ করা এজন্য বৈধ যে, ভাড়া ভবিষ্যতের যেকোনো তারিখ থেকেও সংঘটিত হতে পারে। এর সাথে গ্রাহক একতরফা অঙ্গীকারের ওপর স্বাক্ষর করতে পারে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে অর্থায়নকারীর অংশের ইউনিটসমূহ নির্দিষ্ট বিরতির পর ক্রয় করে নেবে এবং অর্থায়নকারী এ কথা স্বীকার করতে পারে যে, গ্রাহক যখন তার অংশের একটি ইউনিট ক্রয় করে নেবে, তখন সে অনুপাতে ভাড়াও কমে যাবে।

- প্রত্যেক ইউনিট ক্রয় করার সময় নতুন করে ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট তারিখে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে।

- এটা সর্বোত্তম যে, গ্রাহকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ইউনিটের ক্রয়মূল্য ওই দিনের বাজারমূল্য অনুযায়ী হওয়া, যা ওই ইউনিট ক্রয় করার দিন বাজারে প্রচলিত থাকে। তবে এটাও জায়িয আছে, ক্রয়ের অঙ্গীকারনামায়ও একটি মূল্য ধার্য করে নিতে পারে।

গ. পরিবর্তনশীল মুশারাকা (মুশারাকা মুতাগাইয়িরাহ)

এ পদ্ধতিটি মূলত তারল্য সংকট মোকাবিলার জন্য চলতি হিসাবে ঋণ গ্রহণের বিকল্প হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। চলমান কোনো প্রকল্প বা কোম্পানির তারল্য

প্রদান করে, অতঃপর মেয়াদ শেষে মুনাফা হিসাব করা হয়। এ পদ্ধতির কর্মকৌশল নিম্নরূপ :

- গ্রাহক তার চলমান কোম্পানি/প্রকল্পের তারল্য সংকট দূর করতে অর্থায়ন করার জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করেন। এ আবেদনে অর্থের পরিমাণ ও মেয়াদ উল্লেখ করেন এবং তার সাথে কোম্পানি/প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (feasibility study) ফাইল সংযুক্ত করেন;
- ব্যাংক উক্ত সম্ভাব্যতা যাচাই ফাইল মূল্যায়ন করে অর্থায়ন করতে সম্মত হলে আবেদনে উল্লিখিত পদ্ধতি ও পরিমাণে নগদ অর্থ প্রদান করে। ফলে কোম্পানি/প্রজেক্টের অবস্থা সম্পূর্ণ পালটে যায়। এ কারণেই মূলত এ পদ্ধতিকে উক্ত নামে নামকরণ করা হয়েছে;
- গ্রাহক তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানি/প্রজেক্ট পরিচালনা করতে থাকেন;
- চুক্তিকৃত মেয়াদ শেষে নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব আকলন করা হয় এবং ব্যাংক চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা/ক্ষতি বহন করে।[১৩৬]

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুশারাকার প্রয়োগিক অবস্থা ও অস্তিত্ব সংকট

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মুশারাকা' হলো ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দুটি বিনিয়োগ পদ্ধতির একটি। একে ইসলামী অর্থনীতির প্রাণ বলা হয়। এটা সত্য যে, মুশারাকা বা অংশীদার কারবারকে ব্যাপক অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে অনেক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। কখনও কখনও এ ধারণা করা হয় যে, এটি একটি প্রাচীন অর্থায়ন-পদ্ধতি, যা গতিশীল লেনদেনের নিত্য-নতুন প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। এ ধারণা অমূলক, যা মুশারাকার শারয়ী মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকার ফলে তৈরি হয়েছে। মূলত ইসলাম মুশারাকা কারবারের ধরাবাঁধা রূপ বা সুনির্দিষ্ট কোনো প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়নি; বরং এমন কিছু মৌলিক নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে।

---

১৩৬. বেলতাজী, মুহাম্মদ, *নাহভা বিনায়ি নামূজাযিন মুহাসিবিয়িন লি-তাকভীমি ওয়াসায়িলিল ইস্তিসমারি ফিল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ*, দুবাই : ইসলামিক ব্যাংকিং সেমিনার, ২৯ রজব-শাবান, ১৪২৬/ ৩-৫, ডিসেম্বর ২০০৫, ৫৫৪

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি অনুশীলনের কথা অতি গুরুত্বের সাথে ভাবা হয়েছিল। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন—

- এ পদ্ধতিতে গ্রাহককে ব্যাবসার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা যায়।
- লাভ আনুপাতিক হারে বণ্টিত হওয়ার কারণে এ পদ্ধতিতে ব্যাংক মুরাবাহা পদ্ধতির চেয়ে বেশি লাভ অর্জন করার সুযোগ পায়।
- সকল অংশীদার লোকসান বহন করে বলে বড়ো ধরনের প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঝুঁকি কম হয়।
- কারবারে সকল অংশীদারের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় সবাই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পুঁজি, মেধা ও দক্ষতা কারবারে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হন।
- বহুসংখ্যক অংশীদার মিলে পুঁজি গঠনপূর্বক মুশারাকা কারবার পরিচালনা করেন বলে বড়ো ধরনের প্রকল্পের জন্য পুঁজি গঠন এ পদ্ধতিতেই সম্ভব। এ পদ্ধতিতে শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমেও পুঁজি গঠন করা যায়।

অথচ ইসলামী ব্যাংকগুলোতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকে শুরুর দিকে এ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য অনুশীলন ছিল; কিন্তু 'মুদারাবা'-এর মতো দিনের পর দিন এর প্রয়োগও সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বর্তমানে বলতে গেলে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াটাই কঠিন। এখন ব্যাংক অথবা বিনিয়োগগ্রহীতা কেউ-ই সহজেই মুশারাকার দিকে যেতে চায় না। তারা এর পরিবর্তে 'মুরাবাহা'-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে বেশি। অবশ্যই মুদারাবার মতো এ ক্ষেত্রেও ব্যাংকারদের কাছে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তারা এর জন্য সমাজে সততা ও নৈতিকতার প্রকট অভাবকে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী করে থাকেন। যদি অংশীদার সৎ ও দক্ষ না হন, তাহলে তিনি লাভ-লোকসানের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ব্যাংককে ঠকাতে পারেন। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ক্ষতি ব্যাংককে বহন করতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাংককে পুরো মূলধনই খোয়াতে হয়। ব্যাংকের এ ক্ষতিটা মূলত জমাকারীর ওপরই বর্তায়। এ কারণে ব্যাংক সাধারণত মুশারাকা কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে না। অপরদিকে ভালো গ্রাহকগণও

হন না। কেননা, এতে মুরাবাহা পদ্ধতির তুলনায় ব্যাংককে বেশি লাভ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি এরূপ কারবারের যেহেতু যাবতীয় হিসাব-নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ রাখতে হয়, তাই গ্রাহকগণ অনেক সময় বিব্রত হন।

সাধারণত প্রচার করা হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় মুশারাকা বা অংশীদার কারবারে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব থাকে। তাই এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যাবসার সব দায়দায়িত্ব ও লোকসানের বোঝা বিনিয়োগগ্রহীতার ওপর ছেড়ে দেয় না; বিধান অনুযায়ী লোকসানের বোঝাও বহন করে। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন, ইসলামী ব্যাংকগুলো কি এখন পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর লোকসানের ভাগ নিয়েছে? এ প্রসঙ্গে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর আলম বলেন, 'মুশারাকা একটি কল্যাণমুখী বিনিয়োগ পদ্ধতি। এর জন্য প্রয়োজন গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ের সদিচ্ছা। ইসলামী ব্যাংকগুলো শুরুতে বেশ কিছু প্রজেক্টে মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করেছিল; লোকসানও বহন করেছে।'

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুনিরুল মওলা বলেন, 'মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ নেওয়া যেসব গ্রাহক লোকসান করে থাকেন, আমাদের ব্যাংক ওই গ্রাহকের লোকসানের ভাগ নেয়। এমন উদাহরণ অনেক আছে।' তিনি উল্লেখ করেন, 'সচেতন ব্যবসায়ীরা সবসময় লাভ করার পরিকল্পনাই করেন। আমরাও দেখে-শুনে বিনিয়োগ দিই। দেখা যায়, ৯৫ থেকে ৯৬ শতাংশ প্রকল্পই লাভে থাকে। ৩-৪ শতাংশ হয়তো লোকসানে পড়ে। অর্থাৎ, গড় হিসেবে ব্যাংকের লাভই বেশি। যে কারণে লোকসানের ভাগ নেওয়ার পরও ব্যালেন্সশিটে সেটার প্রভাব পড়ে না।' তিনি আরও বলেন, 'ইসলামী ব্যাংকের অনেকগুলো বিনিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে মুশারাকাও আছে। এই পদ্ধতির চেয়ে বাই মুরাবাহা বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি এখন জনপ্রিয়। কারণ, মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যাংক লাভবান হয় বেশি। বাই মুরাবাহায় উদ্যোক্তারা লাভবান হন বেশি। তবে এখনও মুশারাকা পদ্ধতিতে কোল্ড স্টোরেজ, রপ্তানিমুখী গার্মেন্ট খাতসহ বেশ কয়েকটি প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ আছে।'

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবীব বলেন, 'ইসলামী ব্যাংক প্রফিট-লস শেয়ারিং বা মুশারাকা পদ্ধতি বলে যে ব্যাংকিংয়ের কথা বলে, বাস্তবে তেমনটি দেখা যায় না। ইসলামী ব্যাংক কখনও লসের ভাগ নিয়েছে বলে এখন পর্যন্ত শুনিনি।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়; বিশ্বের কোনো ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেমেই প্রফিট-লস শেয়ারিং দেখা যায় না।'[১৩৭] এ কারণে অনেকেই এখন প্রচলিত ইসলামিক ব্যাংকিংব্যবস্থা নিয়েই আপত্তি তুলছেন। যেমন—বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহীম খালেদ বলেন, 'ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং করার দাবি করলেও আসলে তারা তা করেন না। তারা যে বলেন, মুশারাকা বা মুদারাবা—এটা কিছু হচ্ছে না। ইটস নট এ ইসলামিক ব্যাংকিং। তারা আসলে অল্টারনেটিভ ব্যাংকিং করছেন। ইসলামী ব্যাংকিং তারা করছেন না।'[১৩৮]

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি'-এ ২০১৬ ও ২০১৭ সালের মোট বিনিয়োগের মাত্র ০.২৯% ও ০.২৭% মুশারাকা বিনিয়োগ; ২০২৩ সালে মুশারাকার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্মিলিত বিনিয়োগ মাত্র ০.৩২% (অর্থাৎ, এক পার্সেন্টও নয়)। আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যাংক আইবিবিএলের মোট ৩২৮টি শাখার মধ্যে মাত্র ৬টি শাখায় মুশারাকা বিনিয়োগ আছে।[১৩৯]

মুশারাকা পদ্ধতির প্রয়োগে শরীয়া লঙ্ঘন

ইসলামী ব্যাংকগুলোর ম্যানুয়ালগুলোতে মুশারাকা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যেসব নীতির কথা উল্লিখিত রয়েছে, সেগুলো তাত্ত্বিকগত দিক থেকে সঠিক। এগুলোর সাথে শরীয়তের নীতিমালার কোনো বিরোধ নেই। এমনকি নীতিমালার ধারা-উপধারায় যেসব শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা এসেছে তাতেও সর্বজনগ্রাহ্য বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহের মতামতকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে মুশারাকা পদ্ধতি প্রয়োগে সাধারণত শরীয়া-লঙ্ঘনের কিছু ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন—

---

১৩৭. https://www.teachers.gov.bd/blog/details/634786?page=4073&islami-bzangk-ki-loksaner-vag-ney

১৩৮. https://bangla.bdnews24.com/economy/article1300586.bdnews

১৩৯. মিসবাহ উদ্দীন, ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত মুশারাকা বিনিয়োগ : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৩, সংখ্যা: ৫১-৫২,এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক. ক্রমহ্রাসমান মুশারাকায় এক চুক্তিতে একাধিক বিষয় একত্রিকরণ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রমহ্রাসমান মুশারাকায় যৌথভাবে ক্রয়, ভাড়া এবং অর্থায়নকারীর ইউনিটসমূহের ক্রয়-বিক্রয়—এসব লেনদেনকে একই চুক্তিতে পরস্পর মিলানো হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে একই চুক্তিতে এ বিষয়গুলোকে একত্র করা বিধিসম্মত নয়। কারণ, এ অবস্থায় এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি অপরটির জন্য শর্তস্বরূপ হয়ে যায়। শরীয়তের সাধারণ বিধানানুসারে, একটি লেনদেনকে অপরটির জন্য পূর্বশর্ত বানানো যায় না।

খ. যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ না করা

মুশারাকা পদ্ধতিতে যেহেতু কারবার সমাপ্তির পর চূড়ান্তভাবে লাভ-লোকসান নির্ণয় করে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাই কারবারের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। কিন্তু বিনিয়োগগ্রহীতা একান্ত সৎ ও আল্লাহভীরু না হলে হিসাবে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং মিথ্যা হিসাব তৈরি করে ব্যাংককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গ. মুশারাকার ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত হারে মুনাফা নেওয়া

মুশারাকা ব্যবসায় ব্যাবসাটি শেষ হওয়ার পর হিসাব চূড়ান্ত করা হয় এবং হিসাব অনুযায়ী লাভ হলে চুক্তিতে নির্ধারিত অনুপাতে লাভ বণ্টন করা হয় এবং ক্ষতি হলে পুঁজির অনুপাতে গ্রাহক ও ব্যাংক ক্ষতি বহন করে। কিন্তু ব্যাংক অনেক সময় তার বিনিয়োগের অর্থের ওপর প্রাক্কলিত নির্ধারিত হারে মুনাফা নিতে চেষ্টা করে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবের তোয়াক্কা করতে চায় না।

ঘ. এক পক্ষের প্রভাব বিস্তার

চুক্তিতে উভয় পক্ষ ব্যাবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার কথা উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী সময়ে এককভাবে কোনো এক পক্ষ ব্যাবসা পরিচালনা করা আর অন্য পক্ষকে তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দেওয়া।

ঙ. বিবিধ

অংশীদারগণ—ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জেনে হোক বা না জেনে হোক—আরও নানাভাবে শরীয়তের বিভিন্ন নিয়মনীতি ভঙ্গ করে থাকেন। যেমন—

১. মূলধনের পরিমাণ, মুনাফা ও ক্ষতির হার চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা, চুক্তিপত্র অপূরণকৃত রাখা এবং তারিখ উল্লেখ না থাকা।

২. চুক্তিবদ্ধ খাতে মূলধন ব্যবহার না করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে মুশারাকার মূলধন ব্যবহার করা।

৩. উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে একতরফাভাবে চুক্তির কোনো শর্ত পরিবর্তন করা।

৪. উভয় পক্ষ ব্যবসায়ের ক্ষতি মূলধন অনুপাতে বহন না করা।

৫. উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যবসায়ের মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত না হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হওয়া।

৬. কোনো অংশীদার তার অংশটিকে পণ্যে রূপান্তরিত না করে লাভসহ অন্য কোনো অংশীদারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া।

৭. কোনো অংশীদার তার অংশের শারয়ী দখলদার না হয়ে তা অন্য কারও কাছে বিক্রি করা।

৮. ব্যাবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী পক্ষ মুনাফা হারের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক ভোগ করা।

৯. মুশারাকা ব্যাবসা সম্পাদনের শুরুতে উভয় পক্ষের মূলধন উপস্থিত না থাকা।

১০. মূলধন অথবা শ্রম বিনিয়োগ অথবা দায়িত্ব বহন কোনোটাই না করে মুনাফায় অংশগ্রহণ করা।

কেস স্টাডি

একজন গ্রাহক ব্যাংকে এসে বিনিয়োগ কর্মকর্তার কাছে বললেন, আমি একটি কাগজ উৎপাদনকারী প্রকল্প তৈরির জন্য আপনাদের ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে চাই। বিনিয়োগ কর্মকর্তা তাকে ঋণ ও বিনিয়োগের প্রকৃতি ও নিয়মপদ্ধতি বিশ্লেষণপূর্বক বললেন, আমরা আপনাকে মেশিন ক্রয় বাবদ বিনিয়োগ দিতে পারি। আর আপনি জমি ও বিল্ডিং নিজে সরবরাহ করবেন। বছর শেষে কারবারের লাভ অথবা ক্ষতি ৫০:৫০ অনুপাতে আপনার ও আমাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। কথামতো চুক্তি ও কাজ সম্পাদিত হলো। বছর শেষে ২০,০০,০০০/- টাকা লাভ হলো। কিন্তু পরবর্তী বছর শেষে ২,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি হলো এবং উভয়ে লাভ-ক্ষতি ৫০:৫০ অনুপাতে

এ বিনিয়োগে নিম্নোক্তভাবে শরীয়া নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে :

চুক্তির প্রথমেই উভয় পক্ষের মালিকানা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। ওপরের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট মূল্য এবং তাতে গ্রাহক ও ব্যাংকের মালিকানার অংশ পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তা করা হয়নি। কারবারের কোনো সম্পত্তি কোনো পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার, ভোগদখল বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যবহার করতে পারবে না। কারবার পরিচালনা পদ্ধতি, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি এবং কোনো পক্ষ কারবার পরিচালনা করলে তার বেতন চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী লাভ-ক্ষতি সবই ৫০:৫০ অনুপাতে বণ্টিত হয়েছে, যা শরীয়াসম্মত হয়নি। ইসলামী শরীয়ার বিধান মতে, লাভ চুক্তিতে নির্ধারিত অনুপাতে এবং ক্ষতি মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হতে হবে।[১৪০]

২. মুদারাবা

ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবার অনুশীলন

মুদারাবাও ইসলামের একটি মৌলিক বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটিও মুশারাকার মতো এমন যুগান্তকারী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে এবং ইসলামী অর্থনীতি ও বাজারব্যবস্থার সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠতে পারে। তবে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ডিপোজিট গ্রহণের ক্ষেত্রে মুদারাবা পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হলেও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এর অনুশীলন অত্যন্ত সীমিত। বলতে গেলে বাংলাদেশে কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগে এর কোনো কার্যকারিতা খুঁজেই পাওয়া যায় না। অথচ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুশীলনের কথা গুরুত্বের সাথে ভাবা হয়েছিল তন্মধ্যে ‘মুদারাবা’ ছিল অন্যতম। বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকে শুরুর দিকে এ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য অনুশীলন ছিল; কিন্তু দিনের পর দিন এর প্রয়োগ সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

---

১৪০. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/hafizrahman/30190955

উল্লেখ্য, ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) সময়কালে কার্যরত ৮টি পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগে মুদারাবার অংশ ছিল ০.৩২% (যা এক পার্সেন্টও নয়)। ২০২৩ অন্তে বিনিয়োগ পোর্টফলিওতে ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রির ১৭৪৯১.৯৫ বিলিয়নের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্মিলিত বিনিয়োগ ৪৪৪৯.৭৪ বিলিয়ন টাকা, যা ২৮.৮৯%। পূর্বের বছর এটি ছিল ২৯.২০%। এর মধ্যে মুরাবাহা বা চুক্তিভিত্তিক বিক্রয় পদ্ধতি ৪৭.৫৭%, বাই মুয়াজ্জাল বা বাকিতে বিক্রয় পদ্ধতি ২২.৫০%, হায়ার পারচেজ বা ভাড়াক্রয় পদ্ধতি ১৭.৮৮%, ইজারা ৪.০৮%, বাই সালাম বা অগ্রিম ক্রয় পদ্ধতি ১.৭০%।[১৪১] সবচেয়ে মজার বিষয় হলো—লাভ-লোকসান অংশীদারত্বের মুদারাবার অবদান সর্বমোট ৫-৬%-ও অতিক্রম করেনি। কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকে এর অবদান খুঁজে পাওয়াই কঠিন। অবশ্যই ব্যাংকারদের কাছে এর অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তারা এর জন্য সমাজে সততা ও নৈতিকতার প্রকট অভাবকে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী করে থাকেন। যদি মুদারিব সৎ ও দক্ষ না হন, তাহলে তিনি লাভ-লোকসানের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ব্যাংককে ঠকাতে পারেন। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ক্ষতি ব্যাংককে বহন করতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাংককে পুরো মূলধনই খোয়াতে হয়। ব্যাংকের এ ক্ষতিটা মূলত জমাকারীর ওপরই বর্তায়। এ কারণে ব্যাংক সাধারণত মুদারাবা কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, গত চার দশকেও ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের মন-মানসিকতায় দৃশ্যমান নৈতিক কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো বর্তমানে বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে নিম্নলিখিত সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে মুদারাবা ব্যবস্থার অনুশীলন করছে :

ক. যেসব ইসলামী ব্যাংকে অতিরিক্ত পুঁজি রয়েছে, তারা সেসব ইসলামী ব্যাংক—যাদের আমানতের চাহিদা রয়েছে তাদেরকে মুদারাবা পদ্ধতিতে ফান্ড প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ফান্ডদাতা ইসলামী ব্যাংক সাহিবুল মাল ও ফান্ডগ্রহীতা ইসলামী ব্যাংক মুদারিব হিসেবে কাজ করে। ফান্ডগ্রহীতা ব্যাংক ফান্ডদাতা ব্যাংককে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে মুনাফা দিয়ে থাকে।

---

১৪১. Quarterly Report on Islami Banking, Islamic Banking Wing, Research Department, Bangladesh Bank

খ. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ‘মুদারাবা বন্ড’ ক্রয় করে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী পুনঃমুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা বন্ড-ক্রেতা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বণ্টন করে থাকে।[১৪২]

উপর্যুক্ত মুদারাবা পদ্ধতির দুটিই ‘মুদারাবা আলাল মুদারাবা’ তথা পুনঃমুদারাবা পদ্ধতির অন্তর্গত। প্রথম পদ্ধতিটিতে দ্বি-মুদারাবা আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটিতে তো ত্রি-মুদারাবার সমন্বয় ঘটেছে।

প্রথম পদ্ধতিটিতে প্রথমত ব্যাংক মুদারাবার পদ্ধতিতে ডিপোজিটর তথা পুঁজিদাতাদের নিকট থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পুঁজিদাতা হয় রব্বুল মাল আর ব্যাংক হয় মুদারিব। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অন্য ইসলামী ব্যাংককে মুদারাবা পদ্ধতিতে ফান্ড প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ফান্ডদাতা ব্যাংক হয় রব্বুল মাল এবং ফান্ডগ্রহীতা ব্যাংক হয় মুদারিব।

দ্বিতীয় পদ্ধটিতে প্রথমত ব্যাংক মুদারাবার পদ্ধতিতে ডিপোজিটর তথা পুঁজিদাতাদের নিকট থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পুঁজিদাতা হয় রব্বুল মাল আর ব্যাংক হয় মুদারিব। দ্বিতীয়ত, ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে মুদারাবা বন্ড ক্রয় করে সেই অর্থটা বিনিয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হলো রব্বুল মাল আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো মুদারিব। তৃতীয় ধাপে এসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেই অর্থটা অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো রব্বুল মাল আর অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক হলো মুদারিব।

উল্লেখ্য, মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যাংক সরাসরি কোনো কারবারে বা ব্যবসায় অংশ নেয় না; বরং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মুদারাবা চুক্তিতে ফান্ড সরবরাহ করে থাকে। এ অবস্থায় ফান্ড সরবরাহকারী ব্যাংক ‘মুদারিব’ হবে নাকি রব্বুল মালের ওয়াকিল হবে? ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ব্যাংক যদি রব্বুল মালের স্পষ্ট অনুমতিক্রমে মূলধন

পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগ করে, তাহলে ব্যাংক রব্বুল মালের ওয়াকিলরূপে বিবেচিত হবে। আর যদি রব্বুল মাল ব্যাংককে তার মাল কোনোরূপ শর্ত ব্যতীত সরবরাহ করে এবং ব্যাংক সেই মাল পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগ করে, তবে সে 'মুদারিব'-রূপে গণ্য হবে। প্রথম অবস্থায় কোনো মুনাফা অর্জিত হলে তা কেবল রব্বুল মাল ও প্রকৃত মুদারিবের মধ্যে বণ্টিত হবে। ব্যাংক কোনো মুনাফা পাবে না; তবে সে তার এ ওকালতি (মধ্যস্থতা)-এর জন্য ব্যবস্থাপনা ফি/সার্ভিস চার্জ নিতে পারবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মুনাফা রব্বুল মাল, প্রথম মুদারিব (ব্যাংক) ও দ্বিতীয় মুদারিবের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে এবং এ অবস্থায় ব্যাংক রব্বুল মালের নিকট থেকে ব্যাংক তার ব্যবস্থাপনা বা সার্ভিসের জন্য কোনো ফি বা চার্জ গ্রহণ করতে পারে না; বরং ব্যাংক যেহেতু তার সার্ভিস বা ব্যবস্থাপনার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে এ বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাবে, তাই তার সার্ভিস ও ব্যবস্থাপনার খরচ তাকেই বহন করতে হবে।

ব্যাংকের পুনঃমুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগে শরীয়া লঙ্ঘন

ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত পুনঃমুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিভিন্ন নিয়ম লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। নিম্নে এরূপ কী কী নীতি কীভাবে লঙ্ঘিত হয়—তা তুলে ধরা হলো :

১. যদি মূল রব্বুল মালের পক্ষ থেকে প্রথম মুদারিব অর্থাৎ ব্যাংককে তার জমাকৃত পুঁজি দ্বারা একচেটিয়া ও উন্মুক্ত ব্যাবসা পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়ে থাকে এবং চুক্তিপত্রে এতৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয় লিখিত ও স্পষ্ট থাকে, তবেই ব্যাংক কর্তৃক পুনঃমুদারাবা চুক্তিতে বিনিয়োগ বৈধ হবে। কিন্তু ব্যাংকের চুক্তির পত্রে এতৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয় স্পষ্ট লিখিত থাকে না। আবার অনেক সময় ব্যাংক কর্তৃক পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগের জন্য রব্বুল মাল থেকে স্পষ্ট অনুমতিও গ্রহণ করা হয় না।

২. শরীয়তের বিধান হলো—মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত অর্থ পুনঃমুদারাবায় শরীয়াসম্মত যেকোনো কারবারে যথার্থ নিয়ম ও আইন মেনে বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু কখনও কার্যত দেখা যায়, ব্যাংক এমন কোনো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও মুদারাবায় বিনিয়োগ করে থাকে, যা যথার্থরূপে শরীয়া আইন মেনে চলে না বা সংশ্লিষ্ট কারবারটি শরীয়াসম্মত নয়।

৩. মুদারাবায় সাধারণত রব্বুল মালের জমাকৃত মূলধন পৃথকভাবে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। এর সাথে মুদারিবের নিজস্ব সম্পদ যুক্ত করা হয় না। কিন্তু ব্যাংক অনেক সময় রব্বুল মালের সম্পদের সাথে নিজের সম্পদ যুক্ত করে পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগ করে, অথচ পৃথক কোনো হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না। উল্লেখ্য, ব্যাংক যদি রব্বুল মালের সম্পদের সাথে নিজের সম্পদ যুক্ত করে পুনঃমুদারাবায় বিনিয়োগ করে, তাহলে এ অবস্থায় ব্যাংক নিজের সম্পদ দ্বারা ব্যাবসার ক্ষেত্রে যৌথ কারবারি এবং অন্যের (রব্বুল মালের) সম্পদ দ্বারা 'মুদারিব' বা তার প্রতিনিধি বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে দু-পক্ষের সম্পদ ও লাভ-লোকসানের হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পুনঃমুদারাবায় ব্যাংক হয়তো রব্বুল মালের ওয়াকিল অথবা প্রথম মুদারিব। যদি ওয়াকিল হয় তবে সে তার মধ্যস্থতার জন্য ব্যবস্থাপনা ফি/সার্ভিস চার্জ নিতে পারবে এবং মুনাফা রব্বুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে বণ্টিত হবে। যদি ব্যাংক প্রথম মুদারিব হয়, তাহলে ব্যাংক তার সার্ভিসের জন্য রব্বুল মালের নিকট থেকে কোনো ফি বা চার্জ নিতে পারবে না; বরং বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাবে। কিন্তু আমরা লক্ষ করি, উভয় অবস্থায় ব্যাংক মূলধন সরবরাহকারী রব্বুল মাল থেকে তার ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট চার্জ বা ফি গ্রহণ করে, আবার বিনিয়োগ থেকেও নির্দিষ্ট লভ্যাংশ গ্রহণ করে।

৫. মুদারাবা কারবারে রব্বুল মাল ও মুদারিবের লভ্যাংশ বণ্টিত হওয়ার আগে মুদারাবা ফান্ডের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু অনেক সময় ব্যাংক তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মুদারাবা ফান্ডের অবণ্টিত অর্থ থেকে প্রদান করে থাকে।

৬. মুদারাবা কারবারে প্রকৃত লাভ-লোকসান নির্ণয়ের জন্য মুদারিবকে কারবারের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেক মুদারিব গাফলতি করে থাকে। আবার তাদের কেউ কেউ তার ব্যাবসায়িক লেনদেনকে গোপনীয় বিবেচনা করে তা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করতে আগ্রহী হয় না। আবার কেউ কেউ আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কিংবা লাভ কম দেখানোর জন্য দুটি হিসাবের খাতা সংরক্ষণ করে। এরূপ অবস্থায় ব্যাংক বা মূলধন সরবরাহকারী তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

মুদারাবা ও মুশারাকায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা

মুদারাবায় ও মুশারাকায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

ক. মুদারাবা-মুশারাকার প্রতি গ্রাহকদেরকে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য এ সংক্রান্ত ছোটো ছোটো পুস্তিকা রচনা করা। পুস্তিকায় মুদারাবা-মুশারাকার পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এ সংক্রান্ত হাদীস ও আছার পেশ করে উৎসাহিত করা হবে।

খ. গ্রাহকদের নিয়ে নির্বাচিত ব্রাঞ্চে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা। সেখানে মুদারাবা-মুশারাকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। গ্রাহকদের উদ্‌বুদ্ধ করা, এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও পেশ করা ।

গ. অধিকতর সততা ও স্বচ্ছতার সাথে বিনিয়োগ গ্রাহক যাতে মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়, সেজন্য বিনিয়োগ পরিশোধের/পারফরমেন্সের ভিত্তিতে সাবসিডি/প্রণোদনা দেওয়া যায় কি না—সে বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা।

ঘ. বিনিয়োগ গ্রহণকারী গ্রাহকদের একটি বিশেষ ডাটাবেজ তৈরি করা। ব্যাংকের সাথে তাদের লেনদেনের ওপর একটি রেটিং প্রদান করা হবে। ‘এ’ ক্যাটাগরি, ‘বি’ ক্যাটাগরি—এভাবে গ্রাহকদেরকে শ্রেণিবিন্যাস করা হবে। এসব করা হবে গ্রাহকদের লেনদেনের স্বচ্ছতা, ব্যাবসায়িক অবস্থান, ব্যাংকের ঋণ আদায় ইত্যাদি মাধ্যমে। যারা ‘এ’ ক্যাটাগরির গ্রাহক হবে তাদেরকে ব্যাংক মুদারবা-মুশারাকার প্রস্তাব দেবে। এতে ব্যাংকের ঝুঁকি অনেক হ্রাস হবে ইনশাআল্লাহ।

ঙ. প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের অন্তত একটি ব্রাঞ্চে বিশেষ মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগ-ডেস্কের ব্যবস্থা করা। যেমন—বিশেষ ব্রাঞ্চে লকারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে আগ্রহীরা সহজে যোগাযোগ করতে পারবে।

চ. সৎ ও নীতিবান গ্রাহক নির্বাচন করে তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নার্সিং করে বেশি বেশি মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগে অভ্যস্ত করলে সামগ্রিকভাবে অধিকতর জাতিগত কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ছ. ব্যাংকগুলোতে মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগের বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা যথাযথ তদারকি করা।

জ. দেশীয় আইনি অবকাঠামোয় মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগ গ্রাহকদের বিশেষ রেয়াত/ছাড়ের ব্যবস্থা করা। যেমন-ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি তুলনামূলক কম আরোপ করা।

ঝ. মুশারাকা/এমডিবি বিনিয়োগে বন্ডেড ওয়ার হাউজ ফ্যাসিলিটির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ প্রদান; যেমন- জাহাজ/বিমান/ট্রেন/ ট্রাক ভাড়ায় বিশেষ রেয়াত প্রদান।

ঞ. ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ামে বিশেষ ছাড় দেওয়া।

ট. শাখা/জোনভিত্তিক মুশারাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মুশারাকা বিনিয়োগের পরিধি বর্ধিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঠ. সর্বোপরি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/জাতীয়ভাবে এসব বিনিয়োগ গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ট্রফি/এওয়ার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা এ জাতীয় বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে।

উপর্যুক্ত কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করা হলে অন্তত কিছুটা হলেও মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগ কার্যকর হবে। উক্ত কর্মকৌশলের সফলতার জন্য প্রথম যেসব উদ্যোগ নিতে হবে, তা হলো—

ক. ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকদেরকে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে; তাদের সদিচ্ছার বিকল্প নেই।

খ. দেশীয় আইনি অবকাঠামো মুদারাবা-মুশারাকার পক্ষে সহনীয় করা। যেমন, মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগধারীদের সরকারি টেক্স সহনীয় পর্যায়ে রাখা ইত্যাদি আইনি অবকাঠামো সহজ করা।

গ. আধুনিক ব্যাংকিং ও শরীয়া জ্ঞানে পারদর্শী ইসলামিক ম্যানপাওয়ার উন্নত করা। প্রতিটি ব্রাঞ্চে একটি বিশেষ শরীয়া ডেস্ক চালু রাখা, যাতে সার্বক্ষণিক শরীয়া প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

মুদারাবা ও মুশারাকার ব্যাপারে কয়েকটি আপত্তি : পর্যালোচনা

মুদারাবা ও মুশারাকাকে অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অভিযোগ করা হয়ে থাকে। নিম্নে এসব অভিযোগের যথার্থতা বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।[১৪৩]

ক. লোকসানের ঝুঁকি

মুদারাবা ও মুশারাকার ব্যাপারে একটি প্রধান অভিযোগ হলো, এ পদ্ধতিগুলোতে ব্যাবসার লোকসান অর্থায়নকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দিকে রুজু হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। অবশেষে এ লোকসানের ভার আমানত-জমাকারীদের ওপর বর্তাবে। এ দুটি পদ্ধতিতে যেহেতু আমানত-জমাকারীদেরকে স্থায়ীভাবে লোকসানের আশঙ্কায় পতিত করা হয়, তাই তারা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অর্থ জমা রাখতে স্বাভাবিকভাবে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এর ফলে তাদের এ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ হয়তো নিষ্ক্রিয় ও অলস অবস্থায় রেখে দেওয়া হবে অথবা ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্যত্র অন্য কোনো পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ অর্থসমূহের কোনো ভূমিকাই থাকবে না।

বস্তুতপক্ষে এ অভিযোগটি যথার্থ নয়। এটি একান্তই ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কারণ, মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করার পূর্বে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তাবিত ব্যাবসাগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেবে। এমনকি বর্তমান সুদি ব্যাংকিং পদ্ধতিতেও সাধারণত ব্যাংকগুলো প্রত্যেক আবেদনকারীর ঋণ মঞ্জুর করে না; বরং তারাও ব্যাবসাগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেয়। যদি তাদের আশঙ্কা হয় যে, কোনো ব্যাবসা লাভজনক নয়, তাহলে তারা ওই ব্যবসায় ঋণ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। মুদারাবা ও মুশারাকার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সম্ভাব্যতা অত্যন্ত গভীরভাবে এবং সতর্কতার সাথে যাচাই করে নেবে।

---

১৪৩. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন :..*, পৃ. ৭২-৭৮; সানাউল্লাহ, ইক্যুইটি ভিত্তিক অর্থায়ন : গুরুত্ব ও বর্তমান প্রেক্ষিত, *ইসলামী আইন ও বিচার*, খণ্ড : ১৬, সংখ্যা : ৬৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

অধিকন্তু, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেকে কেবল একটি মুদারাবা বা মুশারাকা কারবারে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না; বরং তার বিভিন্ন ধরনের মুদারাবা ও মুশারাকা কারবার থাকবে। যদি কোনো ব্যাংক তার গ্রাহকদের থেকে একশত গ্রাহকের সাথে মুদারাবা বা মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে এবং এ অর্থায়নও তাদের প্রত্যেকের প্রস্তাবিত ব্যাবসার সম্ভাব্যতা যাচাই করে, তাহলে এরূপ ধারণা করা দুষ্কর যে, তাদের প্রত্যেকেই কিংবা অধিকাংশ গ্রাহক লোকসানে পতিত হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পর বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু হতে পারে যে, তাদের কারও কারও ব্যবসায় লোকসান হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে লাভজনক মুদারাবা ও মুশারাকা কারবারগুলোতে সুদি ঋণের তুলনায় অধিক মুনাফার আশা করা যায়। কেননা, প্রকৃত মুনাফা যেহেতু গ্রাহক ও ব্যাংকের মাঝেই বণ্টন করা হবে, তাই মুদারাবা ও মুশারাকার সকল সেক্টরে লোকসান হবে—এমনটা খুব বেশি আশঙ্কা করা যায় না। কাজেই সামগ্রিকভাবে লোকসানের যে আশঙ্কা তা কেবল একটা কাল্পনিক বিষয়, যা আমানত-জমাকারীদের মধ্যে মোটের ওপর অনাগ্রহ তৈরি করবে না। কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের কাল্পনিক সম্ভাব্যতা কোনো জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে লোকসানের সম্ভাব্যতা থেকে অনেক কম, যার ব্যাবসা কেবল একটি সীমিত সেক্টরেই সীমাবদ্ধ থাকে। এতৎসত্ত্বেও মানুষ ওই কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে এবং লোকসানের এ সম্ভাব্যতা তাদেরকে ওই শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগ করা থেকে বিরত রাখে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাবসা-ব্যবস্থাপনা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির তুলনায় যথেষ্ট সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত। কেননা, তাদের মুদারাবা-মুশারাকা কারবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে; কোনো কারবারে কোনোরূপ লোকসানের সম্ভাবনা থাকলেও অন্যান্য কারবারে অর্জিত মুনাফা দ্বারা সেই লোকসানের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

তদুপরি ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমানত-জমাকারীদের মধ্যে এমন মন-মানসিকতা তৈরি করা উচিত, যা দ্বারা এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বারা অর্জিত যেকোনো মুনাফা ব্যাবসার ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রতিদান। অভিজ্ঞতা ও ব্যাবসার পরিধি বিস্তৃতি করে এ ঝুঁকি এত হ্রাস করা যায় যে, তা একেবারে কাল্পনিক হিসেবেই থেকে যাবে। তবে এ ঝুঁকি একেবারেই দূর করার কোনো উপায় নেই। যে-কেউ মুনাফা অর্জন করতে চায়, তাকে এ ধরনের সাধারণ ঝুঁকি অবশ্যই বহন করতে হবে। সাধারণ

জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতেও এ ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, অথচ কখনও কেউ এ ধরনের অভিযোগ করেনি যে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারের অর্থ লোকসানে ফেলে দিয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ সমস্যা প্রচলিত সুদি ব্যাংকিং ও অর্থায়ন-পদ্ধতিরই সৃষ্টি, যা ব্যাংকিং এবং অর্থায়নের কর্মতৎপরতাকে সাধারণ ব্যাবসায়িক কর্মতৎপরতা থেকে আলাদা করে দিয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতি মানুষদেরকে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে যে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেবল মুদ্রা এবং মুদ্রার দলিল-দস্তাবেজের ব্যাবসা করতে পারে; শিল্প ও ব্যাবসার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে তারা সর্বাবস্থায় মুনাফা পাওয়ার দাবি করে। অর্থায়ন খাত এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের মাঝে এ ভিন্নতা সামষ্টিক অর্থনীতিতে ক্ষতিসাধন করছে।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এটা নয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যাংকের অনুসরণ করবে। ইসলামের নিজস্ব রূপ ও নীতিমালা রয়েছে, যা অর্থায়নকে শিল্প ও ব্যাবসা-বাণিজ্য থেকে ভিন্ন মনে করে না। যখন এই ইসলামিক ব্যাংকিংব্যবস্থা বুঝে আসবে, তখন লোকসানের কাল্পনিক আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মানুষ লাভজনক কোম্পানিতে যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে পুঁজি বিনিয়োগ করে, এর চেয়ে অধিক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামী অর্থায়ন সেক্টরে পুঁজি বিনিয়োগ করবে।

খ. সততার অভাব

মুদারাবা ও মুশারাকার ব্যাপারে আরেকটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, অসৎ গ্রাহকরা মুদারাবা ও মুশারাকার এই পদ্ধতিগুলোকে অবৈধভাবে ব্যবহার করবে এবং অর্থায়নকারীদের কোনো মুনাফা প্রদান করবে না। সে সর্বদা এটাই দেখাবে যে, ব্যবসায় কোনো মুনাফা অর্জিত হয়নি। উপরন্তু, বাস্তবতা হলো, সে এ দাবিও করতে পারে যে, ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। এর ফলে লাভ তো দূরের কথা; আসল পুঁজি ফিরে পাওয়াও আশঙ্কাজনক হয়ে পড়বে।

এ আশঙ্কাটি নিঃসন্দেহে যথার্থ, বিশেষ করে যে সমাজে দুর্নীতি, মিথ্যাচার, আত্মসাৎ, ঋণখেলাপি ও চুরি-ডাকাতি নিত্য-নৈমত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে এ সমস্যার সমাধান এতটা জটিল নয় যে, যা সাধারণত প্রচার করা হয় কিংবা বাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়।

যদি কোনো দেশের সকল তফসিলি ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রের পূর্ণ সহায়তায় চালানো যায়, তাহলে অসততার সমস্যার সমাধান জটিল হবে না। প্রথম কথা এই যে, গ্রাহকদের হিসাব-নিকাশ রাখার জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ডিজাইনকৃত অডিট সিস্টেম চালু করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে কন্টোল করতে হবে। এতে আশা করা যায়, মিথ্যাচারিতা ও দুর্নীতি অনেকটা হ্রাস পাবে। এরপরও যদি গ্রাহকের পক্ষ থেকে কোনোরূপ অনিয়ম বা উদাসীনতা পাওয়া যায়, তাহলে তাকে সতর্কতামূলক শাস্তির সম্মুখীন করা হবে এবং তাকে দেশের যেকোনো ব্যাংক থেকে যেকোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার ব্যাপারে কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বঞ্চিতও করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপ প্রকৃত মুনাফা গোপন এবং অন্য যেকোনো অসততা ও অনিয়ম অবলম্বনের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রমাণিত হবে। অধিকন্তু, ব্যাংকের গ্রাহকগণ স্বাধীনভাবে লোকসান দেখানোর সাহসও পাবে না। কেননা, লোকসান দেখানো নানাভাবে তাদের স্বার্থের পরিপন্থি হবে।

এ কথা সত্য, উপর্যুক্ত কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও এমন পরিস্থিতির সম্ভাবনাও রয়েছে, যে পরিস্থিতিতে কোনো কোনো গ্রাহক তার অসৎ উদ্দেশ্যে সফল হয়ে যেতে পারে। তবে শাস্তির পদক্ষেপ এবং ব্যাবসার সাধারণ পরিবেশ এ ধরনের সুযোগ হ্রাস করে দেবে। (স্বয়ং সুদি অর্থনীতিতেও ঋণখেলাপি ব্যক্তি ঋণকে উসূলের অযোগ্য করে জটিলতা সৃষ্টি করতে থাকে।) কাজেই কোনো কোনো গ্রাহকের অসৎ উদ্দেশ্য সফল হওয়া মুদারাবা ও মুশারাকার পূর্ণ সিস্টেমকে অস্বীকার করার যুক্তিসংগত কারণ ও ওজর হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে অসততার এ আশঙ্কা ওইসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বেশি রয়েছে, যারা আধুনিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রম থেকে পৃথক হয়ে কাজ পরিচালনা করে। তাদের প্রতি দেশীয় প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তেমন কোনো সহযোগিতা থাকে না। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সিস্টেমও পরিবর্তন করতে পারে না এবং বিধিবিধানও অমান্য করতে পারে না। কিন্তু তাদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা কেবল ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানই নয়; বরং তারা এমন একটি সিস্টেমকে পরিচিত করানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যার নিজস্ব একটি দর্শন রয়েছে। তাদের দায়িত্ব হলো—এ পদ্ধতিকে অগ্রসর করানো, যদিও এর কারণে কোনো একপর্যায়ে তাদের মুনাফার হার স্বল্প হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য তাদের কমপক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে মুদারাবা ও

মুশারাকার ব্যবহার শুরু করা এবং ক্রমশ বৃদ্ধি করা উচিত। প্রত্যেক ব্যাংকেরই এমন কিছু গ্রাহক থাকে, যাদের আমানতদারি সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে থাকে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর কমপক্ষে ওইসব গ্রাহকের সাথে অর্থায়ন সহীহ মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে করা উচিত। এর দ্বারা সমাজে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনে সহায়ক হবে এবং অন্যরা তাদের অনুসরণের ব্যাপারে উৎসাহী হবে। অধিকন্তু এমন কিছু সেক্টরও রয়েছে, যেখানে মুদারাবা-মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন অতীব সহজভাবে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এক্সপোর্ট ফিন্যান্সিং (রপ্তানির অর্থায়ন)-এ মুদারাবা-মুশারাকাকে ব্যবহার করা হলে অসততার তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। কারণ, রপ্তানিকারকের নিকট বিদেশের গ্রাহকে একটি নির্দিষ্ট অর্ডার বিদ্যমান থাকে, মূল্য নির্ধারিত থাকে, ব্যয়ের আন্দাজ করতেও কোনো জটিলতা নেই। মূল্য পরিশোধে সাধারণত এলসির কারণে কোনো অনিয়ম হয় না। মূল্য পরিশোধ স্বয়ং ব্যাংকের মাধ্যমেই হয়। এমতাবস্থায় মুদারাবা-মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করাতে কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কিছু সতর্কতার সাথে ইমপোর্ট ফিন্যান্সিং (আমদানির অর্থায়ন) মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে হতে পারে।

গ. ব্যাবসার গোপনীয়তা

মুদারাবা ও মুশারাকার ব্যাপারে আরেকটি অভিযোগ হলো—অর্থায়নকারীকে গ্রাহকের ব্যবসায় অংশীদার বানানোতে ব্যাবসার গোপনীয়তা অর্থায়নকারীর নিকট এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য ব্যবসায়ীর কাছে ফাঁস হয়ে যাবে।

এ সমস্যার সমাধান অতি সহজ। মুদারাবা ও মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময় গ্রাহক এ শর্তারোপ করতে পারে যে, অর্থসংস্থানকারী ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং সে ব্যাবসার কোনো ধরনের তথ্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রাহকের অনুমতি ছাড়া পরিবেশন করবে না। গোপনীয়তা ঠিক রাখার এ ধরনের চুক্তিকে মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মান করে; বিশেষত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যাদের সমুদয় ব্যাবসাই গোপনীয়তার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

ঘ. মুনাফায় অংশীদারত্বের ব্যাপারে গ্রাহকের উৎসাহী না হওয়া

কখনও কখনও এ কথা বলা হয় যে, গ্রাহক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রকৃত মুনাফায় অংশীদার হতে চায় না। এই নিরুৎসাহিতার ভিত্তি দুটি জিনিসের ওপর—

১. গ্রাহক মনে করে—প্রকৃত মুনাফা, যা প্রচুর পরিমাণেও হতে পারে, তাতে ব্যাংক অংশীদারত্বের কোনো অধিকার রাখে না। কেননা, ব্যাবসার ব্যবস্থাপনা এবং তা পরিচালনায় ব্যাংকের ভূমিকা থাকে না। তাহলে গ্রাহক তার পরিশ্রমের উপার্জিত মুনাফায় ব্যাংকসমূহকে কেন অংশীদার করবে, যারা কেবল ফান্ড সরবরাহ করে? গ্রাহক এ যুক্তিও প্রদান করে যে, আধুনিক ব্যাংক কিঞ্চিৎ সুদের হারে ঋণ প্রদান করতে রাজি হয়ে যায়, ইসলামী ব্যাংকসমূহেরও এরূপ করা উচিত।

২. এ ছাড়া গ্রাহক এ ব্যাপারেও ভয়ের মধ্যে থাকে যে, তার প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাংক অবগত হয়ে যাবে এবং তাদের মাধ্যমে এ তথ্য ইনকাম ট্যাক্সের কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছে যাবে, যার ফলে ইনকাম ট্যাক্সের হার অনেক বেড়ে যাবে।

প্রথম সমস্যার সমাধান যদিও সহজ নয়; তবে খুব জটিল ও অসম্ভবও নয়। এ ধরনের গ্রাহকদের এ কথা বোঝানোর চেষ্টা উচিত যে, কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা ব্যতীত সুদি ঋণ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুনাহের কাজ। কেবল ব্যাবসাকে বৃহদায়তন ও প্রশস্ততা করা কোনোক্রমেই মারাত্মক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুদারাবা ও মুশারাকার মাধ্যমে স্বীয় ব্যাবসার জন্য বৈধ ফান্ডের সরবরাহের ব্যবস্থা করে সে কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই অর্জন করবে না; বরং নিজের জন্য এবং ইসলামী ব্যাংকের জন্য মুনাফাকেও হালাল করবে।

দ্বিতীয় সমস্যার ব্যাপারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কোনো কোনো মুসলিম দেশে ইনকাম ট্যাক্সের হার ন্যায়সংগত নয়; বরং অবৈধ পর্যায়ের। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং তাদের সকল গ্রাহকের উচিত, প্রশাসনকে বোঝানোর চেষ্টা করা এবং ওইসব নীতিমালা পরিবর্তনের ব্যাপার প্রচেষ্টা করা, যা ইসলামী ব্যাংকের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। প্রশাসনেরও এ বিষয়টি বোঝা উচিত যে, ইনকাম ট্যাক্সের হার যদি যুক্তি ও ন্যায়সংগত হয় তাহলে রাজস্ব আয় কমবে না; বরং বৃদ্ধি হবে এবং ট্যাক্স উসুলকারীদেরও বুঝতে হবে যে, সততার সাথে ট্যাক্স আদায়ে তাদেরও লাভ রয়েছে।

ভবিষ্যৎ নীতিকৌশল ও সুপারিশ

ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতির আর্থিক ব্যবস্থা অনুশীলন; কিন্তু মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতির অর্থায়নব্যবস্থায় মূলধন পুঁজির নিশ্চয়তা প্রদান বা গ্রহণ ইসলামী শরীয়া

অনুযায়ী বৈধ নয়। এমতাবস্থায় শরীয়াভিত্তিক অর্থায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠত্ব (Empirical Superiority) প্রমাণ করা ইসলামী ব্যাংকগুলোর পক্ষে এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। উক্ত পরিস্থিতিতে ইসলামী অর্থায়ন-পদ্ধতি, শরীয়া আইন ও ইসলামী শরীয়া আইনের ফিকহুল মুআমলাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিম এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ ও গবেষকবৃন্দ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আসতে পারেন :

প্রথমত : ঘোষিত মূলনীতিতে কিছুটা ছাড় (রুখসত) দেওয়া। বর্তমান পৃথিবীর মানুষের চারিত্রিক ও সততার মান বিবেচনায় নিয়ে সাদ্দুয যারাঈ হিসেবে মুশারাকা ও মুদারাবাভিত্তিক অর্থায়নে পুঁজির কোনোরূপ বিকল্প গ্যারান্টির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যায় কি না তা বিবেচনা করা;

দ্বিতীয়ত : পুঁজি এবং ঘোষিত সম্ভাব্য প্রফিটের ক্ষেত্রে একটি সার্কিট ব্রেকার প্রদান করা, যাতে উল্লেখ থাকবে, পূর্বঘোষিত সম্ভাব্য প্রফিট যদি ১০% কম হয় তাহলে ওই পরিমাণ প্রফিট কম গ্রহণ করতে ব্যাংকের কোনো আপত্তি থাকবে না, আর যদি প্রফিট ১০% বেশি হয় তাহলে তা বিনিয়োগগ্রহীতা ওই পরিমাণ অতিরিক্ত প্রফিট ব্যাংককে প্রদান করতে তার কোনো আপত্তি থাকবে না;

তৃতীয়ত : পরিবর্তিত ও আধুনিক বিশ্বে কারবারে ঝুঁকি কমিয়ে আনার বহু রকম পদ্ধতি বিরাজমান আছে। সে ক্ষেত্রে মুশারাকা ও মুদারাবা অর্থায়নে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি কমিয়ে আনার নিমিত্তে কোন ধরনের পদ্ধতি প্রযোজ্য ও কোন ধরনের পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ, তা বিবেচনা করে দেখা এবং যথাস্থানে তা প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা। অধিকন্তু, কোনটি মুশারাকা ও মুদারাবাভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধনকে কিছুটা ঝুঁকি মুক্ত করতে সক্ষম এবং তা ইসলামী শরীয়ার নীতিমালারও বিরোধী হবে না—তা নির্ধারণ করা;

চতুর্থত : মুশারাকা ও মুদারাবাভিত্তিক অর্থায়ন থেকে সাধারণ অর্থায়ন অপেক্ষা কিছুটা বেশি লাভ পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞগণ একমত। এমতাবস্থায় মুশারাকা ও মুদারাবাভিত্তিক অর্থায়ন থেকে প্রাপ্ত লাভের একটি অংশ দ্বারা রিস্ক ফান্ড গঠন করা, যাতে অপ্রত্যাশিত ও প্রাকৃতিক কোনো লস বা ক্ষতি সংগঠিত হলে তা উক্ত ফান্ড দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে।[১৪৪]

---

১৪৪. সানাউল্লাহ, ইক্যুইটিভিত্তিক অর্থায়ন : গুরুত্ব ও বর্তমান প্রেক্ষিত, *ইসলামী আইন ও বিচার*, খণ্ড : ১৬, সংখ্যা : ৬৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

কমিশনভিত্তিক মুদারাবা

এটি একটি নতুন মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতি। এখানে কারবার থেকে অর্জিত মুনাফা নয়; বরং অর্জিত কমিশনই পুঁজিদাতা ও উদ্যোক্তার মধ্যে বণ্টিত হয়। যেসব ব্যবসায় তেমন কোনো ঝুঁকি থাকে না এবং পুরোপুরি স্বচ্ছতা বিদ্যমান থাকে, সেসব ব্যবসায় কমিশনভিত্তিক মুদারাবা পদ্ধতি অনুশীলন করা যায়। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে কর্পোরেট এজেন্টদেরকে এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় পুঁজিদাতা আর মোবাইল এজেন্টগণ হয় মুদারিব। বিনিয়োগের অর্থ কেবল মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাক্সি লোড, ইজি লোড, ই-ফিল, আই-টপ-আপ প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, এসব টকটাইম রিচার্জ করার আধুনিক পদ্ধতিতে পণ্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত মোট কমিশনকে মুদারাবা কারবারের বণ্টনযোগ্য মুনাফা হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৪৫]

সমিতিতে অনুশীলিত মুদারাবায় শরীয়া লঙ্ঘন

ইসলামী নামে গড়ে ওঠা সোসাইটি-সমিতিতে অনুশীলিত মুদারাবা পদ্ধতিতে শরীয়া নীতি লঙ্ঘনের ধরন :

১. অলাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে অর্থলগ্নিকারী ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এটা সুস্পষ্ট গারার (প্রতারণা) এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নামান্তর।

২. সদস্য সংগ্রহের নামে বিমা পলিসির মতো ব্রোকারেজ নীতি গ্রহণ করে কমিশন বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা। মুদারাবা তহবিল থেকে মাঠকর্মীদের এভাবে কমিশন প্রদান করা আদৌ বৈধ নয়।

৩. সিকিউরিটি মানি বা ব্রোকারেজ ফি নামে কর্মীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসায় খাটানো। শ্রমিকদের থেকে ফি গ্রহণ করা ঘুসের নামান্তর, যা কোনোভাবেই বৈধতার পর্যায়ে পড়ে না।

---

১৪৫. রহমতুল্লাহ, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা*, পৃ. ১৫৬; *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল. পৃ. ২৮

৪. মূলধন ফেরত ও লাভ প্রদানে শর্তারোপ করা। যথা জমাকারী এক বছরের পূর্বে তার মূলধন ফেরত নিতে পারবে না এবং দুই বছর পূর্বে টাকা ফেরত নিলে কোনো লভ্যাংশ পাবে না। এতে করে জমাকারীকে (রব্বুল মাল) পূর্ণ বা আংশিক মুনাফা থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা সুস্পষ্ট শরীয়া নীতির লঙ্ঘন।

৫. সদস্য (রব্বুল মাল) থেকে ভর্তি ফি, পুনঃভর্তি ফি গ্রহণ করা। রব্বুল মাল থেকে এ ধরনের ফি গ্রহণের বৈধতা ইসলামী শরীয়তে নেই। কারণ, এগুলো হয় ঘুস না হয় আর্থিক দণ্ড, যার কোনোটি ইসলামী শরীয়ামতে বৈধ নয়।

৬. ব্যাবসার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন মুদারাবা ব্যাবসার অবণ্টিত অর্থ থেকে প্রদান করা।

৭. ফরম বিক্রির নামে টাকা ধার দিয়ে সুদ গ্রহণ করা।

৮. রিসিডিউল (পুনঃবিনিয়োগ)-এর নামে কিস্তি আদায়ের মধ্য মেয়াদে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণের রূপরেখা নির্মাণ করা।

মোটকথা, ইসলামী নামে গড়ে ওঠা এসব সোসাইটি-সমিতিতে গসব, খিয়ানত, রিশওয়াত, গারার, গাশ জাতীয় শরীয়ত পরিপন্থি বিষয়ের উপস্থিতির কারণে এবং তাদের কর্মপদ্ধতি ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তাদের কারবার বৈধ নয়। আমাদের দেশে এ জাতীয় আরও বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোতে উপর্যুক্ত শরীয়ত পরিপন্থি বিষয়গুলোর সবগুলো কিংবা কোনো কোনোটি বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের সংস্থা বা সোসাইটি গঠন করা, এগুলোর সদস্য, কর্মী ও মধ্যস্থতাকারী হওয়া এবং মুদারাবার ভিত্তিতে মানুষের টাকা জমা করে তা নিজ ইচ্ছামতো বিলিবণ্টন করা সম্পূর্ণ অবৈধ।[১৪৬]

---

১৪৬. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/hafizrahman/30190955

৩. মুরাবাহা

পরিচয়

‘মুরাবাহা’ (المرابحة) শব্দটি ربح থেকে উদ্ভূত। ربح -এর অর্থ মুনাফা, লাভ। আর ‘মুরাবাহা’-এর অর্থ : মুনাফা সাব্যস্ত করা, লাভ নির্ণয় করা (تَحْقِيقُ الرِّبْحِ)। বলা হয়, بِعْتُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً -পণ্যটি আমি মুনাফা ধরে বিক্রি করলাম।[১৪৭]

পরিভাষায় ‘মুরাবাহা’ ইসলামী ফিকহের একটি বিশেষ ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির নাম, স্বাভাবিক ব্যবসায় পদ্ধতি। ব্যাবসার সাধারণ রীতি হলো—যে দামে পণ্য ক্রয় করা হবে এর চেয়ে কিছুটা লাভে বিক্রয় করা। লাভে বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়বাবদ মূল্য বা খরচ ও মুনাফার পরিমাণ আলাদা করে স্পষ্ট করে বলে বিক্রয় করে, আর ক্রেতা তাতে সম্মত হয় তবেই সেটা মুরাবাহা চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্য কথায়—কোনো পণ্যের ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট লাভের পরিমাণ উল্লেখ করে নগদে বা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়া অনুমোদিত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়কে ‘মুরাবাহা’ বলা হয়।[১৪৮]

বর্তমান ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপর্যুক্ত স্বাভাবিক ব্যবসায় পদ্ধতি ‘মুরাবাহা’য় প্রচলিত নিয়মনীতির সাথে আরও কিছু নিয়মনীতি বৃদ্ধি করে একে অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি সুদবিহীন ব্যাংকিং ও অর্থায়নের জগতে অনুশীলিত একটি আধুনিক পরিভাষা। আরবীতে ব্যাংকিং মুরাবাহার বিভিন্ন নাম রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো—المرابحة للآمر بالشراء (আল মুরাবাহা লিল আমির বিশ-শিরা)।[১৪৯]

---

১৪৭. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩৬, পৃ. ৩১৮

১৪৮. *তদেক*

১৪৯. অন্য নামগুলো হলো—

১. المرابحة المركبة (আল মুরাবাহা আল মুরাক্কাবা) অর্থাৎ যৌগিক মুরাবাহা;

২. بيع المواعدة على المرابحة (বাইউল মুওয়াআদা আলাল মুরাবাহা) অর্থাৎ মুরাবাহার ওপর অঙ্গীকারমূলক ক্রয়-বিক্রয়;

৩. المرابحة المصرفية (আল মুরাবাহা আল-মাসরাফিয়্যা) অর্থাৎ, ব্যাংকিং মুরাবাহা। সংক্ষেপে এ নামটিই অধিক ব্যবহৃত হয়।

যতটুকু জানা যায়, এ পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন সামী হাসান আহমাদ হাম্মূদ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে উপস্থাপিত তার পিএইচডি থিসিসে।[১৫০]

'ব্যাংকিং মুরাবাহা' মূলত সুদি বিনিয়োগের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মূলকথা হলো—কারও কোনো পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন; কিন্তু তার পর্যাপ্ত অর্থ নেই। লোকটি যদি সুদি ব্যাংকে অর্থের জন্য গমন করে তাহলে ব্যাংক তাকে সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করবে। এরপর লোকটি সেই লোন দিয়ে উদ্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে তার প্রয়োজন নির্বাহ করবে। অপরদিকে কোনো সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকে গিয়ে লোকটি নিজের উক্ত প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে, তাহলে ইসলামী ব্যাংক তাকে সরাসরি ফান্ড সরবরাহের পরিবর্তে তার কাঙ্ক্ষিত পণ্য প্রথমে নিজে ক্রয় করবে। সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকে গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে। এরপর তা মুরাবাহার ভিত্তিতে বাকিতে অধিক মূল্যে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে।

মুরাবাহা একটি শরীয়াসিদ্ধ পদ্ধতি হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুরাবাহা পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক মুরাবাহার ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের পূর্বে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রাহকের কাছ থেকে নগদ জামানত (মর্টগেজ, হাইপোথেকেশন, লিয়েন বা চার্জ আকারে) নিতে পারে এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা পক্ষের গ্যারান্টিও নিতে পারে। ব্যাংক পণ্য ক্রয়পূর্বক নিজস্ব দখলে নেওয়ার পর মালিকানা-স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে। তবে পণ্যমূল্য আদায় নিশ্চিত করার স্বার্থে জামানতস্বরূপ পণ্যের দখলিস্বত্ব ব্যাংক ধরে রাখতে পারে এবং মূল্য আদায়সাপেক্ষে আনুপাতিক হারে বা সম্পূর্ণ পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে থাকে।

যেহেতু এখানে গ্রাহক ব্যাংকে এসে পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যাংককে প্রস্তাব করে, এরপর তার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যাংক আদেশদাতা গ্রাহকের পক্ষে পণ্য ক্রয় করে মুরাবাহা বিনিয়োগ করে, তাই একে আরবীতে বলে— المرابحة للآمر بالشراء

---

১৫০. তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية, যা পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। (দ্রষ্টব্য : সামী হাসান হাম্মূদ, *তাতভীরুল আমাল আল-মাসরাফিয়্যাহ বিসা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, আম্মান : মাতবাআতুশ শরক ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হি.)

(পণ্য ক্রয়ের জন্য যিনি আদেশ করেছেন তার স্বার্থে মুরাবাহা লেনদেন করা) আর ইংরেজিতে বলে—Murabaha to the Perchase Orderer (কোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য আদেশদাতার পক্ষে মুরাবাহা করা)।

'আল মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ-শিরা' যেহেতু একটি আধুনিক পরিভাষা, তাই এ পদ্ধতির ব্যাপারে পূর্বসূরি আলিমগণের সরাসরি কোনো মন্তব্য বা সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না—তাই স্বাভাবিক। তবে সামসময়িক অনেক আলিম এর সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন আহমাদ সালিম মুলহিম বলেন—

> طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى مصرف، يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين الأول بالشراء والثاني بالبيع، بثمن وربح يتفق عليهما مسبقا.

> গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংক বরাবর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসংবলিত পণ্য ক্রয় করে দেওয়ার আবেদন, যা ব্যাংকের মঞ্জুরি এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত মূল্য ও লাভের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ পণ্য ক্রয়ের এবং দ্বিতীয় পক্ষ বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতির মুখোমুখি হয়।[১৫১]

ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'গাইডলাইনস'-এ 'ইসলামিক ব্যাংকিং মুরাবাহা'-এর পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে—

> Bai-Murabaha: Contractual buying and selling at a mark-up profit is called Murabaha. In this case, the client requests the Bank to purchase certain goods for him. The Bank purchases the goods as per specification and requriement of the client. The client receives the goods on payment of the price which includes mark-up profit as per contract. Under this mode of investment the purchase/cost price and profit are to be disclosed separately.

> বাইয়ে মুরাবাহা হলো—একটি বিশেষ ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি, যাতে মূল খরচের ওপর অতিরিক্ত মুনাফার শর্ত করা হয়, যাকে মুরাবাহা বলা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংক বরাবর আবেদন করে যে, ব্যাংক তার

---

১৫১. আহমাদ সালেম মুলহিম, *বাই আল-মুরাবাহা ওয়া তাতবীকাতুহু ফীল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাহ*, আম্মান : দারুছ ছাকাফাহ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৭৫

জন্য নির্দিষ্ট পণ্য যেন ক্রয় করে। এরপর ব্যাংক গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে। সবশেষে গ্রাহক সেই ক্রয়কৃত পণ্য অতিরিক্ত মুনাফা প্রদানের শর্তে গ্রহণ করে। মুনাফার হার লেনদেন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এতে পণ্য ক্রয়বাবদ মূল খরচ ও মুনাফা সুস্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক করে উল্লেখ করা হয়।[১৫২]

সাধারণ মুরাবাহা ও ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ফিকহে বর্ণিত সাধারণ মুরাবাহা (المرابحة العادية) এবং ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা—দুটি পুরোপুরি এক নয়। তত্ত্ব ও প্রায়োগিক—দুদিক থেকেই এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে :

তত্ত্বগত পার্থক্য এই যে, ইসলামী ফিকহে বর্ণিত সাধারণ মুরাবাহার সাথে 'ফাইন্যান্স' বা অর্থায়নের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এটি একটি সাধারণ লেনদেন। ইসলামী ফাইন্যান্সের মূল সম্পর্ক হলো মুদারাবা ও মুশারাকার সাথে। অপরদিকে আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার সাথে রয়েছে ফাইন্যান্সের পুরোপুরি সম্পর্ক। ইসলামী ব্যাংকসমূহের অধিকাংশ Financial Operations (অর্থায়ন কর্মকাণ্ড) পরিচালিত হয় মুরাবাহার মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে এ দুয়ের মধ্যে প্রায়োগিক পার্থক্য অনেক। তন্মধ্যে অন্যতম হলো—ফিকহের গ্রন্থে বর্ণিত সাধারণ মুরাবাহা একটি স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়। বিক্রেতা নিজ উদ্যোগে ও নিজের প্রয়োজনে মুরাবাহা-ভিত্তিতে পণ্য বিক্রি করে থাকে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহে ব্যাংক গ্রাহকের প্রয়োজনে ও গ্রাহকের উদ্যোগে পণ্য সংগ্রহ করে মুরাবাহা করে। বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI বাই মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে—

> بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقت من دون وعد سابق وهى المرابحة العادية، أو وقت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المئوسسة المرابحة المصرفية.

---

১৫২. Bangladesh Bank, *Guidelines for conducting Islamic Banking*. Dhaka: Bangladesh Bank. 2009, p. 12

> ক্রয়মূল্যের ওপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকে বাই মুরাবাহা বলা হয়। এ লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা 'থোক'-ও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে 'সাধারণ মুরাবাহা' বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো পণ্য ক্রয় করাকে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' বলা হয়।[১৫৩]

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো—সাধারণ মুরাবাহায় পণ্য একটা সময় ধরে ব্যবসায়ীর কবজায় থাকে এবং এ সময় সে পূর্ণ ঝুঁকি বহন করে। একজন গাড়ি ব্যবসায়ীর কথা ধরুন, তিনি ফ্যাক্টরি থেকে গাড়ি কিনে শোরুমে সাজিয়ে রাখেন, ক্রেতার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করেন, পণ্য চুরি বা ছিনতাই হওয়ার আশঙ্কা করেন, আগুন লাগার ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকেন, .. আরও কত কী? পক্ষান্তরে ব্যাংকিং মুরাবাহায় ব্যাংকের কবজা ও ঝুঁকি বহনের বিষয়টি প্রচণ্ডভাবে প্রশ্নসাপেক্ষ ও সন্দেহপূর্ণ। বলতে গেলে ব্যাংক বিক্রি নিশ্চিত করেই মাল অর্ডার করে এবং মালিকানা আসার সাথে সাথেই ত্বরিত গতিতে মালিকানা পরিবর্তন করে ফেলে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাংক গ্রাহককেই বায়িং এজেন্ট নিযুক্ত করে এবং এ অবস্থায় গ্রাহক নিজে মাল ক্রয় করে অনেক সময় তা নিজের কবজায় নিয়ে যায়। সুতরাং ব্যাংক বিক্রিত পণ্যটি তার কবজায় নেয় এবং খুব একটা ঝুঁকি বহন করে—তা কার্যত উপলব্ধি করা যায় না।

এ ছাড়া নামের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার পূর্ণ নাম بيع المرابحة للآمر بالشراء-ক্রয়ের আদেশদাতা গ্রাহকের পক্ষে মুরাবাহা বিক্রয় করা। অপরদিকে সাধারণ মুরাবাহার নাম কেবল 'মুরাবাহা'।

ব্যাংকিং মুরাবাহা বাস্তবায়নের পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মুরাবাহার চর্চা করতে হলে তাকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবে—

১. ওয়াদা-চুক্তি : প্রথমে উভয় পক্ষ একটি ওয়াদাপত্রে এ মর্মে স্বাক্ষর করবে যে, বিনিয়োগকারী প্রার্থিত পণ্য নির্ধারিত সময়ে বিক্রি করবেন। গ্রাহক তা

---

১৫৩. আওফি, *শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড*, স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩২

যথাসময়ে নির্ধারিত মুনাফা অনুপাতে ক্রয় করবেন। ওয়াদা-চুক্তিনামায় উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাস্তবায়নের সর্বশেষ সময়ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. পণ্য সরবরাহ : পূর্ব ওয়াদা-চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সময়ে বিনিয়োগকারী ব্যাংক নিজ দায়িত্বে পণ্য সরবরাহ করবে।

৩. মালিকানা প্রতিষ্ঠা : ব্যাংকের পক্ষ থেকে তার কোনো কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি ব্যাংকের পক্ষে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে আসবে। এরপর ব্যাংক গ্রাহককে পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অবহিত করবে।

৪. ব্যাংক কর্তৃক পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গ্রাহক অবহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য গ্রাহক সরাসরি ব্যাংককে স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব (ঈজাব) করবে। এটি লিখিতও হতে পারে, মৌখিকও হতে পারে।

৫. ব্যাংক গ্রাহকের উক্ত ঈজাব বা ক্রয়ের প্রস্তাব কবুল করবে। এভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে। তখন পণ্যের মালিকানা ও ঝুঁকি উভয়টি গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সঠিক মুরাবাহার জন্য উক্ত পাঁচটি ধাপ পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে আরও ধাপ তৈরি হতে পারে। যেমন, প্রথমে গ্রাহক ব্যাংক বরাবর মুরাবাহার জন্য দরখাস্ত করবে। তাতে পণ্য-সংক্রান্ত তথ্য থাকবে, গ্রাহকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য থাকবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই আবেদনপত্র ব্যাংক যাচাই-বাছাই করবে। এরপর ওয়াদাপত্র প্রস্তুত হবে, .. ইত্যাদি। আমরা এখানে এরকম ব্যবস্থাপনাগত কোনো ধাপ উল্লেখ করিনি। কারণ, এসব ধাপ দেশ ও ব্যাংকভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই কেবল ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো উল্লেখ করেছি, যা সকল দেশ ও সকল ব্যাংকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু ব্যাংক-ই নয়; যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান *ফাইন্যান্স* হিসেবে মুরাবাহা করতে হলে উক্ত ৫টি ধাপ অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

উল্লিখিত ধাপগুলোর মধ্যে তৃতীয় ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, যে বস্তুর মধ্যে মুরাবাহা হবে সেটা ব্যাংকের মালিকানা ও ঝুঁকিতে আসা। এটিই অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা মুরাবাহাকে সুদি ঋণের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

এর ব্যত্যয় ঘটলে বিবেচ্য হবে যে, ইসলামী ব্যাংক সুদি ব্যাংকের মতোই কোনো ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই টাকা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করল। অতএব, যেকোনো মূল্যে এ ধাপটি যথাযথভাবে নিশ্চিত করা জরুরি।

উল্লেখ্য, ঝুঁকি গ্রহণের অর্থ হলো, ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পর তা বিনিয়োগ-গ্রাহকের মালিকানায় যাওয়ার পূর্বে মধ্যবর্তী সময়টুকুর মধ্যে তা ব্যাংকের কবজায় চলে আসা—প্রত্যক্ষভাবে[১৫৪] হোক কিংবা পরোক্ষভাবে[১৫৫] হোক—, পণ্যের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ব্যাংকের হওয়া। সুতরাং এ সময়ে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটা ব্যাংকের হবে; গ্রাহকের নয়। ঝুঁকি গ্রহণের এই মধ্যবর্তী সময়টুকু অল্প হলেও তা নিশ্চিত করতে হবে। এটিই মূলত সুদ ও মুরাবাহার মধ্যে সীমান্ত রেখা।

ব্যাংকিং মুরাবাহা একটি জটিল লেনদেন

ব্যাংকিং মুরাবাহা প্রকৃতপক্ষে একটি জটিল লেনদেন। এখানে গ্রাহক ও ব্যাংক উভয় পক্ষ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যেমন—প্রথম ধাপে ব্যাংক ও গ্রাহক ভবিষ্যতে কোনোকিছু ক্রয়-বিক্রয়ের ওয়াদা করে। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে ওয়াদা প্রদানকারী (Promisor) ও ওয়াদা গ্রহণকারী (Promisee)-এর সম্পর্ক তৈরি হয়। এটি ভবিষ্যতের কোনো তারিখের ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি (Forward Sale) নয়।

দ্বিতীয় ধাপে ব্যাংক ও তৃতীয় পক্ষের মাঝে ওয়াকিল ও মুওয়াক্কিলের সম্পর্ক তৈরি হয়। তৃতীয় পক্ষকে ব্যাংক পণ্য সরবরাহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে থাকে। (এটিই মৌলিক শরীয়া নির্দেশনা। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহককেই প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হয়।) সে হিসেবে গ্রাহক প্রতিনিধি (ওয়াকিল) ও ব্যাংক-প্রতিনিধি নিয়োগকারী (মুওয়াক্কিল)।

---

১৫৪. 'প্রত্যক্ষ কবজা' (قبض حقيقي) দ্বারা বোঝায়, এমন একধরনের দখল লাভ, যেখানে কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই কোনো সম্পদের ওপর দখল লাভ করে এবং তার ওপর সে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫৫. 'পরোক্ষ কবজা' (قبض حكمي) দ্বারা বোঝায়, যে অবস্থায় কবজাকারী উক্ত পণ্য বাহ্যিকভাবে তার অধীনে নেয়নি; কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ এসে গিয়েছে এবং পণ্যের যাবতীয় দায়দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সেসব দায়িত্বের মধ্যে উক্ত পণ্যের ধ্বংসের আশঙ্কা ও ঝুঁকিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় ধাপে ব্যাংক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (Supplier) মাঝে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক তৈরি হয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম ধাপে ব্যাংক ও বিনিয়োগ-গ্রাহকের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হয়।

সবশেষে যেহেতু মূল্য বাকি থাকে, তাই উভয়ের মধ্যে দায়িন (ঋণদাতা) ও মদীনের (ঋণগ্রস্ত) সম্পর্কও তৈরি হয়।

উপর্যুক্ত একাধিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের দাবি যথাস্থানে পূর্ণরূপে আদায় করা মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। একটির সাথে অপরটির কোনো রকম মিশ্রণ করা যাবে না।[১৫৬]

এতগুলো চুক্তি ও ধাপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা মুরাবাহার চর্চাকে সত্যিই জটিল করে তুলে। এর জন্য গ্রাহক ও ব্যাংকার উভয়ের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা আবশ্যক।

ব্যাংকিং মুরাবাহা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের শর্তাবলি

শরীয়া-বিশেষজ্ঞগণ মুরাবাহাকে অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে বেশ কিছু শর্তের সাথে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই মুরাবাহা যেন কোনোরূপ সুদি বা ফাসিদ (অসিদ্ধ) কারবারে পরিণত না হয়, তাই সেসব শর্ত যথাযথভাবে পালন করে যেতে হবে। যদি সেসব শর্ত পালন করা না হয়, তাহলে এ কারবার শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না; নানাভাবে শরীয়া লঙ্ঘন হতে পারে এবং অবস্থাভেদে সুদি কারবারেও রূপ নিতে পারে। নিম্নে মুরাবাহার সঠিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো[১৫৭] উল্লেখ করা হলো—

১. প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া। অর্থাৎ, মুরাবাহাকে অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে কেবল তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন বাস্তবিকপক্ষে গ্রাহকের কোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য ফান্ডের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যেখানে

১৫৬. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ১০৩-১০৪

১৫৭. *বিস্তারিতের জন্য দেখুন*, AAOIFI. *Shariah Standards*. 2008, 1/112

অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ফান্ডের প্রয়োজন হয়, যেমন—বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য বিল পরিশোধ অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা আদায়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন মুরাবাহা প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা, মুরাবাহায় কেবল ঋণ প্রদান করা, অর্থায়ন করা যথেষ্ট হয় না; বরং প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য।

২. মুরাবাহা চুক্তিতে পণ্যবাবদ খরচের পরিমাণ স্পষ্ট উল্লেখ করা; পণ্যবাবদ খরচের বিষয় বিক্রেতা (ব্যাংক) কর্তৃক ঘোষণা করা; গ্রাহক বিক্রেতার (ব্যাংক) পক্ষ থেকে পণ্যবাবদ খরচ জানা।

৩. মূল চুক্তিতেই মূল খরচের ওপর লাভের পরিমাণ স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ, চুক্তিতে ব্যাংক কী দামে পণ্যটি ক্রয় করল এবং কত অতিরিক্ত লাভে বিক্রয় করছে—তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ব্যাংক কম দামে পণ্য ক্রয় করে বাজার ভালো দেখে বেশি দামে বিক্রয় করলে মুনাফাখোরীর পর্যায়ে পড়বে।

৪. পণ্য সরবরাহকারীর (Supplier) সাথে গ্রাহকের লেনদেন-সংক্রান্ত পূর্ব যাবতীয় সম্পর্ক (Contractual Relationship) ছিন্ন করতে হবে (যদি থাকে)। এমন যেন না হয় যে, মুরাবাহার পণ্যটি গ্রাহক আগেই সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করে নিয়েছে। এখন এর মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যাংকের সাথে মুরাবাহা করা হচ্ছে। এমন হলে সেটা স্রেফ সুদি লেনদেন বলে বিবেচিত হবে।

৫. ব্যাংককে এটি নিশ্চিত হতে হবে, যে প্রতিষ্ঠান তাদেরকে মুরাবাহার পণ্য সরবরাহ করবে, সেই প্রতিষ্ঠান বা সরবরাহকারী গ্রাহক বা গ্রাহকের প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কেউ হতে হবে। সুতরাং এমন হওয়া বৈধ নয় যে, গ্রাহক বা তার প্রতিনিধি আগে থেকেই মুরাবাহা পণ্যের মূল মালিক। অথবা যে কোম্পানি থেকে ব্যাংক পণ্য সংগ্রহ করবে সেটা গ্রাহকেরই কোম্পানি। মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন করার সময় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ডেস্কের কর্মকর্তার উচিত, বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৬. যে পণ্যে একবার মুরাবাহা সম্পন্ন হয়েছে, সেটার ওপর একই গ্রাহকের সাথে পুনরায় মুরাবাহা করা যাবে না।

৭. মুরাবাহা চুক্তির জন্য ব্যাংক গ্রাহক থেকে কোনো ধরনের ফি (Commitment Fee) নিতে পারবে না; 'মুরাবাহা লিমিট' মঞ্জুরের ওপরও কোনো ফি নেওয়া যাবে না।

৮. মুরাবাহার পণ্য গোডাউনে থাকাকালীন বা গ্রাহকের মালিকানায় আসার আগে এর কোনো ক্ষতি বা ত্রুটি হলে সে দায়ভার গ্রাহকের ওপর চাপানো যাবে না। একইভাবে পণ্য পরিবহনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটাও গ্রাহকের ওপর বর্তাবে না। অবশ্য বায়িং এজেন্টের (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ক্ষেত্রে গ্রাহকের পক্ষে কোনো ত্রুটি প্রমাণিত হলে, সে ক্ষেত্রে বাস্তব ক্ষতি পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ গ্রাহক বহন করবেন।

৯. গ্রাহক থেকে গ্যারান্টি মানি (নিরাপত্তা প্রদানমূলক অর্থ) নেওয়া হলে, মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রাহক মুরাবাহা থেকে সরে আসতে চাইলে, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি মানি (নিরাপত্তা প্রদানমূলক অর্থ) পুরোপুরি জব্দ করবে না। বরং বাস্তব ক্ষতি পরিমাণ খরচ নিতে পারবে; সম্ভাব্য খরচ (Opportunity Cost) নেওয়া বৈধ হবে না।

১০. গ্রাহক যথাযথভাবে মুরাবাহা সম্পন্ন করলে গ্যারান্টি বাবদ প্রদত্ত টাকা বা স্থাবর সম্পত্তি যথাযথভাবে গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি।

১১. ব্যাংক পণ্য ক্রয় বা মালিক হওয়ার আগেই তা গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে না। অথবা গ্রাহক থেকে বিক্রয় বাবদ খালি পৃষ্ঠায় দস্তখতও সংগ্রহ করবে না। এমনটি করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

১২. ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকারী/মূল বিক্রেতা থেকে পণ্য ক্রয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ও ডকুমেন্টস ব্যাংকের নামে হবে; গ্রাহকের নামে নয়, যদিও গ্রাহক ব্যাংকের ওয়াকিল (এজেন্ট) হয়।

১৩. ব্যাংক পণ্য সংগ্রহ বা মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকের সাথে মুরাবাহা সম্পন্ন হয়ে গেছে—এমনটি ভাবা যাবে না। বিশেষত বায়িং এজেন্টের (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ক্ষেত্রে মুরাবাহা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য অবশ্যই গ্রাহককে স্বতন্ত্র ঈজাব করতে হবে। অতঃপর ব্যাংক ঈজাবটি গ্রহণ করলেই কেবল মুরাবাহা সম্পন্ন হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুরাবাহা সম্পন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৪. পণ্য ক্রয়ের পর সরবরাহকারী যদি ব্যাংককে মূল্য ছাড় দেয়, তাহলে সেই ছাড় ব্যাংক গ্রাহককেও দিতে হবে।

১৫. মুরাবাহা চুক্তির সময়ই মুনাফা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ভবিষ্যতে ঘটবে বা হবে এমন অস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে না।

১৬. গ্রাহক মুরাবাহা মূল্য আদায়ে বিলম্ব করলে চুক্তির সময় নির্ধারিত মূল্যের ওপর অতিরিক্ত কিছু নেওয়া যাবে না। এটা দেনার ওপর সুদ (রিবাদ দাইন[১৫৮])-রূপে গণ্য হবে। জাহিলী যুগে প্রচলিত রিবার একটি প্রকরণ এই ছিল যে, কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকিতে পণ্য বিক্রি করত। এরপর মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে ক্রেতা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা সময় বাড়িয়ে দিয়ে পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিত।[১৫৯]

১৭. অতিরিক্ত আদায়ের শর্তে মূল্য পরিশোধের কিস্তি বৃদ্ধি করা যাবে না।

১৮. যদি কোনো গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ে তার অগ্রিম চুক্তিতে ক্রয়কৃত পণ্যের নির্ধারিত সময়ে মূল্য (মুনাফাসহ) পরিশোধ না করে, ব্যাংক ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি বাতিল করতে পারে এবং পণ্য বাজারে বিক্রয় করে বিনিয়োগের টাকা আদায় করে নিতে পারে।

মুরাবাহা চর্চার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত শর্তগুলো পালন করা অত্যাবশ্যক। তবেই তা শরীয়াসম্মত মুরাবাহা বলে বিবেচিত হবে।

---

১৫৮. দাইন বা দায়ের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত মোতাবেক আসলের অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে 'রিবাদ দাইন' বলা হয়। যেমন—কোনো বিক্রেতা বাকিতে পণ্য বিক্রি করল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলো। এ সময় বিক্রেতা নির্ধারিত পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে মূল্য পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিলো। দায় পরিশোধের সময় বৃদ্ধির বিপরীতে যেকোনো অতিরিক্তই 'রিবাদ দাইন'। মুফতী তকী উসমানী বলেন, إن زيادة الدين في مقابلة التاجيل ربا صراح.–“ মেয়াদের বিপরীতে দেনা বা দায় বৃদ্ধি করা স্পষ্ট রিবা।” (তকী উসমানী, *বুহূছুন ফী কাদায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ*, দামেস্ক : দারুল কলম, খ. ১, পৃ. ২৬)

১৫৯. তাবারী, *জামিউল বয়ান..* (তাফসীরে তাবারী), খ, ৩, পৃ. ১০১

ব্যাংকিং মুরাবাহা কারবারের বৈধ ও অবৈধ রূপ

আসলে ব্যাংকিং মুরাবাহা কারবার কোন কোন কাজের দ্বারা বৈধ লেনদেন বলে গণ্য হয় আর কোন কোন কাজের দ্বারা অবৈধ বলে বিবেচিত হয়—নিম্নের ছকে তা উল্লেখ করা হলো :

বৈধ	অবৈধ
১. সরবরাহকারী হতে পণ্য ব্যাংক বুঝে নিয়ে দখলে এনে তারপর তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা।	পণ্য বুঝে না নিয়ে বা দখলে না নিয়েই গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করা।
২. গ্রাহকের সাথে বিক্রয়-চুক্তি সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য দখলে নেওয়ার পরে করা।	গ্রাহকের সাথে বিক্রয়-চুক্তি সরবরাহকারীর নিকট থেকে পণ্য দখলে নেওয়ার পূর্বে সম্পন্ন করা।
৩. পণ্যের মূল্য বাবদ নির্ধারিত অর্থ কোনোভাবেই গ্রাহককে না দেওয়া।	পণ্যের মূল্যের অর্থ গ্রাহক বা তার প্রতিনিধিকে দিলে—চাই তা ক্যাশ থেকে হোক বা তার অ্যাকাউন্টে হোক—এ সময় এ অর্থ পণ্যের মূল্য বাবদ খরচ না হয়ে অন্য কিছুতে খরচ হতে পারে।
৪. বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করে পণ্যের মূল্য সরবরাহকারীকে দিলে।	সরবরাহকারীর নিকট গ্রাহক পূর্ব থেকে ঋণী থাকলে নামমাত্র ক্রয়-বিক্রয় দেখিয়ে সে টাকা সরবরাহকারীকে দিয়ে দিলে তা দিয়ে গ্রাহক ঋণশোধ করলে।
৫. চাহিদামতো গ্রাহক পণ্য নিজের কাজে ব্যবহার করলে।	গ্রাহককে পণ্য বুঝে দেওয়ার পর গ্রাহক উক্ত পণ্য ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে পুনরায় সরবরাহকারীর নিকট বিক্রয় করলে।

৬. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের মধ্যে অবশ্যই পণ্যের আদান-প্রদান হতে হবে। সরবরাহকারীর নিকট থেকে ব্যাংক পণ্য দখলে নিয়ে তারপর গ্রাহককে বুঝিয়ে দিতে হবে।	সরবরাহকারী পূর্ব থেকেই মুরাবাহা-এর জন্য গ্রাহককে বিল/ভাউচার প্রদান করে একইভাবে গ্রাহক ও সরবরাহকারীকে বিল/ভাউচার প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক হয় সরবরাহকারী আর উভয়ই ইসলামী ব্যাংকে এসে মুরাবাহা লেনদেনে অংশ নেয়। সে ক্ষেত্রে পণ্যের আদান-প্রদান হয় না; শুধু অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থই লেনদেন হয়।
৭. 'ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য অপারগ হলে শরীয়াহ কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে লিখিতভাবে গ্রাহককে এজেন্ট বা প্রতিনিধি বানিয়ে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করলে।	ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য অপারগ হলে শরীয়াহ কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে লিখিতভাবে গ্রাহককে এজেন্ট বা প্রতিনিধি না বানিয়ে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করলে।
৮. ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়-প্রতিনিধি থেকে পণ্য দখলে নিলে।	গ্রাহক ব্যাংকের ক্রয়-প্রতিনিধি হয়ে টাকা ব্যাংক থেকে গ্রহণ করে পণ্য ক্রয় করার পর তা ব্যাংক দখলে না নিয়ে গ্রাহকের নিকট পুনরায় বিক্রয় করলে।
৯. ক্রয়-প্রতিনিধি ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে তা দিয়ে নির্ধারিত মাল ক্রয় করলে এবং ব্যাংক তা দখলে নিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলে।	ক্রয়-প্রতিনিধি ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে তা দিয়ে নির্ধারিত মাল ক্রয় না করলে।
১০. পূর্বের দায় ভিন্ন কোনো ফান্ড থেকে পরিশোধ করে পরবর্তী সময়ে পুনরায় মুরাবাহা লেনদেনে অংশগ্রহণ করা।	নতুন মুরাবাহা লেনদেন চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পূর্বের দায় শোধ করা।

১১. পূর্বের দেনা পরিশোধের জন্য কোনো বিনিময় ছাড়াই সময় বাড়িয়ে দেওয়া।	পূর্বের দেনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক সময় বাড়িয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা।
১২. সহযোগিতার মাধ্যমে শরীয়া লঙ্ঘন না করেই Overdue পরিশোধের জন্য গ্রাহককে সুযোগ করে দেওয়া	ব্যাংক Overdue নামক অভিশাপ থেকে গ্রাহককে বাঁচানো ও ব্যাংক বাঁচার জন্য পুরাতন দায়কে নতুন দায়ে সমন্বয় করা
১৩. যত টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং যে পণ্য ক্রয়ের জন্য তা অনুমোদন নেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করা।	অনুমোদিত টাকার চেয়ে কম টাকার পণ্য ক্রয় অথবা অনুমোদিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য ক্রয় করা।
১৪. পণ্য সরবরাহকারী থেকে বুঝে নেওয়ার পরে গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে যদি ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহলে তা ব্যাংক বহন করা।	এ অবস্থায় ব্যাংক ক্ষয়ক্ষতির দায় বহন না করা।
১৫. গ্রাহকের জামানত লোকসান যদি না হয় পরিপূর্ণটা আর লোকসান হলে সমন্বয় করার পরে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহককে ফিরিয়ে দেওয়া।	গ্রাহকের জামানত ফিরিয়ে না দেওয়া।
১৬. মাল ক্রয়ের পূর্বে তার মূল্য বাবদ অর্থ ব্যাংক থেকে ক্রয়-প্রতিনিধিকে দেওয়া।	পূর্বে গ্রাহক মাল ক্রয় করে পরে ব্যাংক থেকে এর মূল্য বাবদ অর্থ নেওয়া। (এমনকি এ পরিস্থিতিতে পণ্য সরবরাহকারীকেও উক্ত টাকা দিলে তাও এটি অবৈধই থাকবে)।

১৭. প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হলে।	শুধু ক্যাশমেমো সরবরাহ করা ও কাগুজে ক্রয়-বিক্রয় হওয়া এবং প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া।
১৮. ব্যাংক কর্তৃক মাল ক্রয় করলে।	ক্রয়-প্রতিনিধি ও ব্যাংক ব্যতীত অন্য কেউ পণ্য ক্রয় করলে।
১৯. সরবরাহকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা।	সরবরাহকারীর অস্তিত্ব না পাওয়া।
২০. ডিসবার্সমেন্টের পরে ক্যাশমেমো ইস্যু হওয়া।	ডিসবার্সমেন্টের পূর্বে ক্যাশমেমো ইস্যু হওয়া।
২১. ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণের সাথে ক্যাশমেমোর পরিমাণ মিল থাকা।	ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণের সাথে ক্যাশমেমোর পরিমাণ মিল না থাকা

এখানে অবৈধতার সমস্যা উত্তরণের সর্বোত্তম পন্থাসমূহ হচ্ছে—

১. বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, গ্রাহক ও সরবরাহকারীদের আল্লাহ তায়ালার নিকট জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করা।

২. শরীয়ার প্রশিক্ষণকে আরও জোরদার করা।

৩. ব্যাংকিং মুরাবাহা একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, যা সম্পাদনের জন্য ব্যবসায়ীর প্রয়োজন। সেজন্য ব্যাংকের জনশক্তিকে ব্যবসায়ীগণ যেসব কার্য সম্পাদন করেন তা সম্পাদনকে মেনে নিয়ে কার্যক্রমে অংশ নেওয়া।

৪. এ পদ্ধতি শরীয়া অনুযায়ী সম্পাদিত না হলে লেনদেন সুদি লেনদেনে রূপান্তরিত হয়, সেজন্য সুদের ভয়াবহতা ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকের কাছে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা।

৫. শরীয়া পরিপালনকে জটিল মনে করে তা পরিপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন না করা।

৬. এ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া।

৭. বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বেই গ্রাহককে শারয়ী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া।

৮. শরীয়া লঙ্ঘনকারী কর্মকর্তাকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা।

৯. শরীয়া মুরাকিবগণকে তাদের পদোন্নতি, জবাবদিহি প্রভৃতির জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল না করে শরীয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিলের নিকট নির্ভরশীল করা।

১০. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদ শুধু ব্যাবসার স্বার্থে ব্যাংককে ইসলামীকরণ না করে সত্যিকার অর্থে আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকের প্রতিটি কাজে শরীয়া পরিপালনের ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর হওয়া।

ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহার ব্যাপক প্রয়োগ

বর্তমানে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন করে, তন্মধ্যে প্রধান হলো এই মুরাবাহা। বাংলাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগকৃত অর্থের সিংহভাগ এ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় অনেক ব্যাংকে মাত্র এ একটি পদ্ধতিই অবলম্বন করে বিনিয়োগ দেওয়া হয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ আধুনিক ইসলামী আইনজ্ঞের মতে—প্রচলিত মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি কঠোরভাবে নিয়মকানুন অনুসরণ সাপেক্ষে বৈধ; তবে তা যে বিনিয়োগের উত্তম ও আদর্শ পদ্ধতি নয়—এ বিষয়ে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মুরাবাহা মৌলিক কোনো ফাইন্যান্স পদ্ধতি নয়; বরং সুদি লোনের বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শুরু অবস্থায় সাময়িকভাবে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এটি সুদ থেকে বেঁচে থাকার একটি কৌশলী বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ড. আহমাদ আন-নাজ্জার المرابحة أسوأ أسلوب لعمل البنوك الإسلامية (মুরাবাহা ইসলামী ব্যাংকসমূহের নিকৃষ্টতম কর্মপদ্ধতি) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি সেখানে বলেন—

المرابحة أسوأ أسلوب لعمل البنك الإسلامي لأنها تعطي الفرصة للتحايل، وتدل على عجز القائمين على البنوك من ولوج نشاط المشاركة، وهو الأساس السليم

মুরাবাহা ইসলামী ব্যাংকের নিকৃষ্টতম কর্মপদ্ধতি। কারণ, তা হীলাবাজি করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। তদুপরি তা ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মুশারাকা কার্যক্রমে প্রবেশের অক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। অথচ মুশারাকাই হলো (ইসলামিক ব্যাকিং কার্যক্রমের) সুস্থ ও নিরাপদ ভিত্তি।[১৬০]

মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী লিখেছেন—

> It should never be overlooked that, originally, murabahah is not a mode of financing. It is only a device to escape from "interest" and not an ideal instrument for carrying out the real economic objectives of Islam. Therefore, this instrument should be used as a transitory step taken in the process of the Islamization of the economy, and its use should be restricted only to those cases where mudarabah or musharakah are not practicable.
>
> এ কথাটি কখনোই ভুলা যাবে না যে, মৌলিকভাবে মুরাবাহা কোনো ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। এটি কেবল সুদ থেকে বাঁচার একটি হীলা। এটি আদর্শিক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতিও নয়, যা দ্বারা ইসলামের অর্থনীতির মূলরূপ বাস্তবায়ন হবে। অতএব, অর্থনীতির ইসলামীকরণের সূচনালগ্নে সাময়িকভাবে এবং যেখানে মুশারাকা ও মুদারাবা সম্ভব হবে না, কেবল সে ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা উচিত।[১৬১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, দীর্ঘ গবেষণার পর ইসলামী ব্যাংকসমূহের সূচনাকালের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে 'মুরাবাহা' পদ্ধতিকে নির্বাচন করা হয়।

---

১৬০. নাজ্জার, ড. আহমাদ, *আল মুরাবাহাহ আসওয়াউ উসলূবি লি-আমালিল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ*, ওমান : মাজ্জালাতুশ শরীয়া, ১৯৮৪, খ. ৩৩৯ (মার্চ) পৃ. ৩৪

১৬১. Usmānī, Muftī Muhammad Taqī, *An Introduction to Islamic Finanace.* Pakistan: Quranic Studies Publishers, 1428H, p. 72

১৯৭৯ সালে দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রথম সম্মেলন। সেখানে بيع المرابحة لأجل للآمر بالشراء বা পণ্যক্রয়ের নির্দেশদাতার জন্য বাকিতে মুরাবাহাভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ পদ্ধতিটি প্রথমবারের মতো উপস্থাপিত হয়। সম্মেলনে বিশিষ্ট ফকীহ, অর্থনীতিবিদ ও আইনবেত্তাসহ মোট ৫৯ জন স্কলার উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর উপস্থিত ফকীহগণ কিছু শর্তসাপেক্ষে একে অনুমোদন প্রদান করে ফাতওয়া প্রকাশ করেন। উক্ত সম্মেলনের ফাতওয়ার মূল ভাষ্য নিম্নরূপ—

> يرى المؤتمر أن هذا التعامل(بيع المرابحة لأجل للآمر بالشراء) يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها أو وعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط، إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه، وتحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية و قد تحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون ذلك.

সম্মেলন অভিমত ব্যক্ত করছে যে, এ লেনদেনটি বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ব্যাংকের কাছ থেকে ক্রয় করে নেওয়ার ব্যাপারে গ্রাহকের অঙ্গীকার অথবা ক্রয়ের পর শর্তানুযায়ী গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করার ব্যাপারে ব্যাংকের পক্ষ থেকে আরেকটি অঙ্গীকার। মালিকী মাযহাব অনুযায়ী এ ধরনের অঙ্গীকার পূরণ করা উভয়ের জন্য বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাধ্যতামূলক। তবে অন্যান্য মাযহাবের বিধান মোতাবেক এ ধরনের অঙ্গীকার ধর্মীয় বিবেচনায় উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। অবশ্য যেটি ধর্মীয় বিবেচনায় বাধ্যতামূলক হয়, তা প্রয়োজন ও কল্যাণ অনুসারে আইনগতভাবেও বাধ্যতামূলক করা যাবে। তদ্রূপ তাতে আইনি হস্তক্ষেপও করা যাবে। এ লেনদেনের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের ভাষাসমূহ শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সাজাতে হবে। এ বিষয়ে আইনি হস্তক্ষেপের জন্য কোনো কোনো মুসলিম দেশে পৃথক আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন হতে পারে।[১৬২]

পরবর্তী সময়ে ক্রমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ফোরামে একাধিক শর্তসাপেক্ষে ব্যাংকিং মুরাবাহাকে অনুমোদন দেওয়া হয়।[১৬৩]

১৯৯২ সালে পাকিস্তানের 'মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা' (যুগের জটিল মাসআলার গবেষণা বোর্ড বা কাউন্সিল)-এর 'ইসলামী ব্যাংকিং রূপরেখা' শীর্ষক বৈঠকে মোট ২৪টি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এর ১২ নং সিদ্ধান্তটি ছিল এরূপ—

> যেখানে শিরকাত ও মুদারাবার ওপর আমল করা সম্ভব হবে না, কেবল সে ক্ষেত্রেই 'মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'[১৬৪] প্রয়োগ করা হবে।[১৬৫]

২০০২ সালে অনুষ্ঠিত ইসলামী ফিকহ কাউন্সিল, মাক্কাতুল মুকাররমার সপ্তম সেমিনারে উপস্থাপিত 'তাওয়াররুক'[১৬৬]-বিষয়ক আরবী প্রবন্ধে তকী উসমানী বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> তাওয়াররুক, মুরাবাহা ও এ জাতীয় অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতি মূলত হীলা বা কৌশল, যা কোনো সমস্যা বা কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এগুলো না বড়ো কোনো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, না ইসলামী অর্থনৈতিক কোনো প্রতিষ্ঠানের নিত্যদিনের ব্যবহারে পরিণত হতে পারে। এসব হীলার অধিক প্রচলন হলে ইসলামী অর্থনীতির স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগের আদর্শ পদ্ধতি হলো, মুদারাবা ও মুশারাকা; মুরাবাহা ও তাওয়াররুক নয়।

---

১৬৩. বিস্তারিতের জন্য দেখুন, আবদুল্লাহ মাসুম, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহা : প্রায়োগিক জটিলতা ও উত্তরণ ভাবনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, খ. ১৩, সংখ্যা : ৫০, এপ্রিল-জুন, ২০১৭

১৬৪. 'মুআজ্জাল' শব্দের অর্থ—বাকি। মুরবাহা মুআজ্জাল-এর অর্থ—বাকিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে মুরাবাহা করা। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এরই অধিক চর্চা হয়ে থাকে।

১৬৫. *আহসানুল ফাতাওয়া*, ১৯৯৬, খ. ৭, পৃ. ১১১

১৬৬. 'তাওয়াররুক' একটি বিশেষ লেনদেন। তা হলো, কোনো পণ্য বাকিতে ক্রয় করা। এরপর সেটা ক্রয়মূল্যের চেয়ে কিছুটা কমে নগদে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করা। উদ্দেশ্য হলো, নগদ টাকা হস্তগত করা। এটি সুদি কর্জের একটি বিকল্প বা হীলা।

আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরাম, সেমিনার, শরীয়া বোর্ড, ইসলামী অর্থনীতি সম্মেলন ইত্যাদিতে মুরাবাহা ও তাওয়াররুকের এত হীলামূলক লেনদেনগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মূলত ইসলামী ব্যাংকগুলোর সূচনাকালে তাদের সংকটাপন্ন অবস্থার দিকে লক্ষ করে। কারণ, ইসলামী ব্যাংকগুলোর পক্ষে সূচনালগ্নে মুদারাবা-মুশারাকা ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা জটিল ছিল। তাই পথ চলা শুরু করার স্বার্থে শুধু স্পষ্ট রিবা থেকে কোনোরকম বেঁচে থাকার জন্য কিছু হীলা বা কৌশল বাতলে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা যেন কোনোরকম স্পষ্ট সুদ থেকে বেঁচে যায়। এরপর যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মূল লক্ষ্যপানে ছুটে চলবে।

কিন্তু যেসব সম্মানিত ফকীহ উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর অনুমোদন দিয়েছিলেন, তাঁদের ধারণায়ও ছিল না যে—এই সকল ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো হীলাধর্মী বিনিয়োগপদ্ধতির ওপরই ক্ষান্ত হয়ে যাবে; সামনে অগ্রসর হবে না; লক্ষ্য ভুলে পথেই পড়ে থাকবে; ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল কার্যক্রম হিসেবে এগুলোকেই অতি আদরে গ্রহণ করে নেবে।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সূচনার পর থেকে এখন ৩০ বছরের[১৬৭] অধিক অতিবাহিত হচ্ছে। এই সময়ে বহু ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ব্যাংকের গ্রাহকও বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীত। সুতরাং, এখন সময় হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের শরীয়া বোর্ড তাদেরকে মুরাবাহা, তাওয়াররুকধর্মী লেনদেন হ্রাসের প্রতি জোর দেবে। আর শিরকাত ও মুদারাবার প্রতি গুরুত্ব দেবে, যেন ইসলামী ব্যাংকিং একটি আদর্শ ইসলামী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যায়। এ যেন শুধু 'হীলা কোম্পানি' না হয়।[১৬৮]

কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে আমরা কী দেখছি! ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম যেভাবে চলছে তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন প্রায়ই মুরাবাহানির্ভর হয়ে পড়েছে। তাদের

---

১৬৭. তাঁর এ মন্তব্য ২০০৩ সালের। বর্তমান ২০২৪ সাল; অর্থাৎ, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হচ্ছে।

১৬৮. উসমানী, *আহকামুত তাওয়াররুক ওয়া তাতবীকাতুহুল মাসরিফিয়্যাহ*, ১৪০৯ হি., পৃ. ৬৪

বিনিয়োগের প্রায় ৯০% লেনদেন হয় মুরাবাহা ভিত্তিতে। অথচ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা আলিমগণ মুরাবাহার পাশাপাশি মুদারাবা, মুশারাকাসহ ইসলামী ফিকহের অন্যান্য নীতিমালার সমান্তরাল প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তদুপরি, অতি দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ব্যাংকগুলোর বহু শাখা—বলতে গেলে—অনেকটা পণ্য ক্রয়ের নাম করে কৌশলে গ্রাহকদেরকে সরাসরি অর্থ প্রদান করছে। ফলে সুদি ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বড়ো একটা সাদৃশ্য তৈরি হয়ে যায়।

এ কারণে বর্তমানে জনমনে প্রায়ই এ প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবে কতটুকু ইসলামী? ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা আলিম-মনীষীগণ যেভাবে এর রূপরেখা বাতলে দিয়েছিলেন, সে পথে ইসলামী ব্যাংকিং কতটুকু অগ্রসর হচ্ছে? এ প্রশ্ন দিন যত যাচ্ছে ততই জোরালো হচ্ছে। উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে বিষয়টি প্রায়ই আলোচনার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে, তা হলো এই 'ব্যাংকিং মুরাবাহা'।

এতৎব্যতীত বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে চর্চিত মুরাবাহা যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি না—তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। কেননা, এর সাথে মুনাফার বড়ো ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে চর্চিত মুরাবাহায় কোনো ধরনের শরীয়াগত ত্রুটিবিচ্যুতি হলে মুনাফায় হারাম উপার্জন মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতএব, চর্চিত মুরাবাহার শরীয়াগত ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিতকরত এর থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা সময়ের একান্ত দাবি।

ব্যাংকিং মুরাবাহা : বৈধতা নিয়ে সংশয়

'সনাতন মুরাবাহা' মৌলিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের একটি শরীয়া-স্বীকৃত পদ্ধতি, সালাফে সালেহীনের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো মত সুপ্রমাণিত নয়। তবে আধুনিক ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে ইসলামী শরীয়া-বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কিছু সংশয় রয়েছে, নানা আপত্তি রয়েছে, যা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সেই সংশয় ও আপত্তিগুলো উপস্থাপন করত নিরসনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।[১৬৯]

---

১৬৯. বিস্তারিত দেখুন, প্রফেসর ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশ-শিরা' : একটি শরয়ী বিশ্লেষণ*, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬, এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ক. বাইউল ঈনা

কারও কারও মতে, ব্যাংকিং মুরাবাহা কারবার বাইউল ঈনার অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য এ লেনদেনও অবৈধ। ফকীহদের নিকট বাইউল ঈনা হচ্ছে দুটি ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের নাম, যার প্রথমটিতে যিনি বিক্রেতা থাকবেন, পরেরটিতে তিনি ক্রেতা হয়ে যান। একইভাবে প্রথমটিতে যিনি ক্রেতা থাকেন, পরেরটিতে তিনি বিক্রেতা হয়ে যান। আর পণ্যের মূল্যের দিক থেকে প্রথমটিতে বাকি মূল্যে বেশি দামে বিক্রয় হয় এবং দ্বিতীয়টিতে তা থেকে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ইমামগণের দৃষ্টিতে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।[১৭০]

সংশয় নিরসন :

ব্যাংকিং মুরাবাহা আর 'বাইউল ঈনা' এক নয়। কেননা, বাইউল ঈনাতে একই পণ্যের একবার যে ক্রেতা হয় পরবর্তী সময়ে সে হয় বিক্রেতা এবং সেখানেই প্রথম ক্রয়-বিক্রয়টি দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রত্যক্ষ শর্ত বলে উল্লেখ থাকে, যা ব্যাংকিং মুরাবাহায় ক্রয়-বিক্রয়ে থাকে না। এখানে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রেতা থাকে তৃতীয় অন্য ব্যক্তি, একইভাবে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়ার মত শর্তযুক্ত কোনোকিছু জড়িত থাকে না। ব্যাংকিং মুরাবাহায় প্রথম বিক্রেতাই পুনরায় একই পণ্যের মালিক হয় না; বরং তার মালিক হয় অন্য তৃতীয় ব্যক্তি (গ্রাহক)। পক্ষান্তরে বাইউল ঈনাতে প্রথম বিক্রেতাই পুনরায় ওই পণ্যের মালিক হয়। সুতরাং দুটি এক নয়। সেজন্য বাইউল ঈনা অবৈধ হলেও ব্যাংকিং মুরাবাহা লেনদেন বৈধ।

খ. একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয়

কারও কারও আপত্তি হলো—একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় (صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ) অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে ব্যাংকিং মুরাবাহা অবৈধ। একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয়ের উদাহরণ হচ্ছে, একজন ৫০ কেজি চাউল ২,০০০ টাকায় এক মাস পরে সরবরাহ করা হবে শর্তে ক্রয় করল। নির্ধারিত সময়ে বিক্রেতা বলল, তুমি আমাকে আরও একমাস সময় দাও, আমি তোমাকে ৫৫ কেজি চাউল দিয়ে দেবো। এটি মূলত একই লেনদেনে অন্য আরও একটি লেনদেন সংযুক্ত হয়ে দুই লেনদেন অনুষ্ঠিত হওয়ায় অতিরিক্ত ৫ কেজি চাউল এখানে সুদ হিসেবে গণ্য হয়।

---

১৭০. দ্র. ৬ষ্ঠ অধ্যায় (বাইউল ঈনা)।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন—

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا.

যে একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করল, তার জন্য উভয়ের মধ্যে নিম্নমূল্য গ্রহণ বৈধ হবে। অন্যথায় তা সুদ বলে গণ্য হবে।[১৭১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

রাসূলুল্লাহ সা. একই লেনদেনের মধ্যে দুই লেনদেনকে নিষিদ্ধ করেছেন।[১৭২]

হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট যে, একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

সংশয় নিরসন :

ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতি এবং একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় বা একই লেনদেনে দুটি লেনদেন পদ্ধতি এক নয়। ইমাম শাফিয়ী রাহ. একই ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি ক্রয়-বিক্রয় বলতে নিম্নলিখিত ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝিয়েছেন—

ক. বিক্রেতার পক্ষ হতে একই পণ্য বাকিতে হলে এত টাকায় এবং নগদে হলে এত টাকায় বিক্রয় করার প্রস্তাব দেওয়া। কোনো সন্দেহ নেই যে, মূল্য স্থির না হওয়ায় এ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ. বিক্রেতার পক্ষ থেকে এভাবে বলা যে, আমি আমার এই জমিটি এক লক্ষ টাকায় অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করলাম, যাতে সে আমার কাছে তার গাভিটি বিক্রয় করে। তা ছাড়াও ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে একই ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি ক্রয়-বিক্রয় বলতে অন্য পদ্ধতিও বোঝায়, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি ৫০ কেজি চাউল একমাস পরে

---

১৭১. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২৯০, আল হাকিম, *মুসতাদারক আলাছ ছাহীহায়ীন*, বৈরুত, ১৪১১ হি., খ. ২, পৃ. ৫২

১৭২. আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল মুসনাদ*, খ. ৬, পৃ. ৩২৪

সরবরাহ করা হবে শর্তে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করল। নির্ধারিত সময় ৫০ কেজি চাউল দিতে না পারায় সে আরও একমাস সময় বাড়িয়ে ৫৫ কেজি চাউল দেওয়ার নতুন চুক্তি করল। এখানে অতিরিক্ত ৫ কেজি অবশ্যই সুদ বলে গণ্য হবে।

উপর্যুক্ত কোনো পদ্ধতির সাথে ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতির মিল নেই। এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে ক্রেতা-বিক্রেতা মাত্র দুজনই উভয়ের মধ্যে এক লেনদেন দুই লেনেদেন পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতিতে একই ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানে একই লেনদেনের মধ্যে দুটি লেনদেন নয়; বরং প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহকারীর মধ্যে একটি লেনদেন আর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে দ্বিতীয় লেনদেন পৃথক পৃথকভাবে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং কোনোভাবেই এটি একই লেনদেনে দুটি লেনদেন হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন, যাদের পক্ষও ভিন্ন ভিন্ন। সেজন্য একই লেনদেনে দুটি লেনদেন মনে করে ব্যাংকিং মুরাবাহাকে অবৈধ বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

গ. পণ্যের অধিকার পাওয়ার আগে বিক্রয়

ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতি মূলত যে পণ্যের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বিক্রয়েরই নামান্তর। আর যে পণ্যের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথবা দখলে আসেনি তা বিক্রয় করা যেহেতু শরীয়তে বৈধ নয়, সেহেতু ব্যাংকিং মুরাবাহাও বৈধ নয়। যে পণ্যের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নেই তা বিক্রয় যে বৈধ নয় সে সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাইয়িদুনা হাকীম ইবনু হিযাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম—

> يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عندي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

> হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে যা বিক্রয়ের জন্য আমার নিকট নেই—এমন কিছু আমার থেকে ক্রয় করতে চায়। এরপর আমি তার কাছে তা বাজার থেকে এনে বিক্রয় করি। তিনি বললেন—যা তোমার কাছে নেই, তা তুমি বিক্রয় করো না।[১৭৩]

---

১৭৩. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩০২; আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, খ. ২৪, পৃ. ২৬; ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৭৩৭; তিরমিযী, *আস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৫৩৪

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত, হাকীম ইবনে হিযাম রা. বলেন, আমি বললাম—

يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

হে আল্লাহর রাসুল, আমি অনেক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করি, তন্মধ্যে কী কী হালাল রয়েছে আর কী কী হারাম রয়েছে? তিনি বললেন—তুমি কোনো পণ্য ক্রয় করলে যতক্ষণ না তুমি তা নিজের কবজায় নিতে পারবে, ততক্ষণ তা বিক্রয় করবে না।[১৭৪]

যেহেতু ব্যাংকিং মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো পণ্য নিজের দখল ও কবজায় না নিয়েই বিক্রয় করা হয়, সেহেতু এ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

সংশয় নিরসন :

ব্যাংকিং মুরাবাহা ও এখানে উল্লিখিত যে পণ্যের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বিক্রয় করা এক নয়। ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতিতে দুটি ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়। প্রথমটি হয় ব্যাংক ও পণ্য সরবরাহকারীর মধ্যে। সেখানে ব্যাংক সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে পণ্য নিজের দখলে নিয়ে নেয়। ব্যাংক উক্ত পণ্যের মালিক হয়। উক্ত পণ্য সে সময়ে নষ্ট হয়ে গেলে তার ঝুঁকিও ব্যাংককে বহন করতে হয়—এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংক তার গ্রাহককে উক্ত পণ্য নির্ধারিত লভ্যাংশ যুক্ত করে বাকিতে বিক্রয় করে। সুতরাং ব্যাংকিং মুরাবাহা লেনদেনে পণ্যের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বিক্রয় হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। উল্লেখ্য, যদি ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারী থেকে পণ্য বুঝে নেওয়ার পূর্বেই তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে তা অবশ্যই বৈধ হবে না। সে ত্রুটি এ পদ্ধতির নয়, সে ত্রুটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার। একইভাবে গ্রাহকের ক্রয় করার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক তার কাছে যা নেই তা কিন্তু তার কাছে বিক্রয় করে না। সে সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করে এনে দ্বিতীয় লেনদেনের মাধ্যমে তার সাথে ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন করে। সুতরাং ব্যাংক গ্রাহকের কাছে কোনো পণ্যের মালিক না হয়েই বিক্রয় করে—এমন কথা ঠিক নয়।

---

১৭৪. আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল মুসনাদ, খ. ৩য়, পৃ. ৩২

যা-ই হোক, এখানে বিক্রেতার নিকট নেই—এমন কোনো পণ্য সম্পর্কে তার উক্তি 'আমি অমুক পণ্য অমুক মূল্যে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম' এবং গ্রাহকের পক্ষ থেকে ব্যাংককে বলা 'আমি অমুক পণ্য ক্রয় করতে সম্মত আছি, আপনি তা আমাকে ক্রয় করে দিন'; উভয় বক্তব্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটিতে পণ্য অনুপস্থিত, তবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, যা অবৈধ। আর দ্বিতীয়টিতে তো ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্নই হয়নি, সে সময়ে পণ্যের অস্তিত্ব থাকা না থাকার প্রশ্ন অবান্তর। সুতরাং দুটি বিষয় কখনও এক নয়। সেজন্য যা দখলে নেই, ব্যাংকিং মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ে তা-ই বিক্রয় করা হয় বিষয়টি তেমন নয়। বরং রীতিমতো পণ্য দখলে এনেই তা বিক্রয় করা হয়। সেজন্য এ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

ঘ. ঋণের ওপর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ

ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ে سلف وزيادة অর্থাৎ, ঋণের ওপর অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়। কোনো ব্যবসায়ী অন্য কারও জন্য কোনো পণ্য নগদে ক্রয় করে তা উক্ত ব্যক্তির নিকট মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করার অর্থই হচ্ছে সুদ। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান আল বাজী রাহ. বলেন—

> لأَنَّهُ يَبْتَاعُ لَهُ الْبَعِيرَ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ بِعِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ سَلَّفَهُ عَشَرَةً فِي عِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ.
>
> একজন অন্যজনকে তার জন্য দশ দিরহাম দিয়ে একটি উট এই শর্তে ক্রয় করতে বলে যে, সে তা বাকিতে তার থেকে বিশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করবে। এর অর্থ হচ্ছে, সে তা থেকে দশ দিরহাম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করল আর তা (পরিশোধের জন্য সময় নিয়ে) বিশ দিরহাম হিসেবে পরিশোধ করল।[১৭৫]

এখানে একটি উট দশের বিনিময়ে ক্রয়ের নির্দেশ পেয়ে তা ক্রয় করে উক্ত ব্যক্তিকে বিশে বিক্রয় করা মূলত পরিশোধের ক্ষেত্রে সময় বাড়িয়ে দেওয়ার কারণেই হয়েছে, যা মূলত সুদেরই নামান্তর।

---

১৭৫. আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইবন খলফ আল-বাজী, *আল-মুনতাফা ফী শারহি মুওয়াত্তা*, তাবি, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯

সংশয় নিরসন :

ব্যাংকিং মুরাবাহা ও সুলাইমান আল বাজী রাহ.-এর কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাজী রাহ.-এর কথামতে, উক্ত উট মূলত আমিরের (ক্রয়ের নির্দেশদাতার) জন্যই দশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে তা ওই একই ব্যক্তির নিকট বাকিতে পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হবে বিধায় তা বিশেষ বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে। এখানে ক্রেতার পক্ষ থেকে দশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করার শর্ত দিয়ে দেওয়ায় এ লেনদেন অবৈধ। এটা সুদি লেনদেন সে বিষয়ে আমরাও একমত। তবে ব্যাংকিং মুরাবাহায় ব্যাংক প্রথমত পণ্য নিজেই মালিক হওয়ার জন্য নগদে নিজের টাকা দিয়েই ক্রয় করে যেখানে উক্ত পণ্যের মূল্য কত হবে—তা নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় না। সুতরাং ব্যাংক নিজের জন্য কমমূল্যে ক্রয়কৃত কোনো পণ্য আমিরের (ক্রয় করে দেওয়ার নির্দেশদাতার) নিকট বেশি দামে বিক্রয় করা অবশ্যই বৈধ। বাজী রাহ.-এর উপর্যুক্ত বর্ণনায় আমিরের পক্ষ থেকে ক্রয়ের জন্য দশ দিরহাম নির্ধারণ করে দেওয়া মূলত এটি তিনি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে ধর্তব্য, পরে তা বিশ দিরহামে বাকি ক্রয়ের অর্থই হচ্ছে অতিরিক্ত দশ টাকা ঋণের টাকার ওপর বেশি দেওয়া। সুতরাং সেটি সুদ। পক্ষান্তরে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রয়কৃত পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংক নিজেই ক্রয় করে তার ওপর লভ্যাংশ যোগ করে বিক্রয় করা মূলত আল বাজী রাহ.-এর বর্ণিত পদ্ধতি থেকে একেবারেই ভিন্ন। এটির পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণে এ লেনদেনের লভ্যাংশ সুদ হিসেবে পরিগণিত হয় না। সুতরাং ওই লেনদেন শারয়ী দৃষ্টিতে বৈধ। বাজী রাহ.-এর পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়টি ফকীহদের নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতিতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন উভয়টি বৈধ বলেই গণ্য।

ঙ. সময়ের জন্য বাড়তি মূল্য নির্ধারণ

ব্যাংকিং মুরাবাহার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর আপত্তি হলো—সময়ের জন্য বাড়তি মূল্য নির্ধারণ। এ পদ্ধতিতে যেহেতু মুরাবাহাকে একটি অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন বিক্রি সর্বদা বাকি মূল্যে হয়। অর্থায়নকারী ব্যাংক কাঙ্ক্ষিত পণ্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রি করে। বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে যতদিন পর গ্রাহক মূল্য পরিশোধ করে, সেই সময়ের দিকে লক্ষ রাখা হয় এবং সেই অনুপাতে ব্যাংক মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়। এ

কারণে ব্যাংকগুলোতে মুরাবাহায় পণ্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি হয়। এখন প্রশ্ন হলো—বাকি বিক্রয়ে কোনো জিনিসের মূল্য নগদ মূল্যের তুলনায় অধিক ধার্য করা যাবে কি না?

অনেকের সংশয় হলো, এ পদ্ধতিতে বাকিতে পণ্যের মূল্য বেশি ধার্য করা হয়; অর্থাৎ, পণ্য নগদে বিক্রি হলে এর যে দাম হয় বাকিতে তার চেয়ে বেশি দাম নেওয়া হয়। যেহেতু ক্রেতাকে দাম পরিশোধের জন্য সময় দেওয়ার কারণেই এ বাড়তি দাম নেওয়া হয়, তাই এটা সুদভিত্তিক ঋণের মতোই হয়ে যায়। এ কারণে কারও কারও মতে, এ পদ্ধতিতে কেনাবেচা করা যাবে না, শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। সামসময়িক আলিমদের মধ্যে শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. থেকে এরূপ অভিমত বর্ণিত রয়েছে। তাঁর অনুসারীরাও সাধারণত এরূপ মত পোষণ করেন।[১৭৬] প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিবও তাঁর এক প্রবন্ধে এ অভিমতকেই বিশুদ্ধ বলে দাবি করেছেন।[১৭৭] অবশ্যই কোনো কোনো রিওয়ায়ত থেকেও এ সংশয় তৈরি হয় যে, ব্যবসায় নগদে এক দামে আর বাকিতে অন্য দামে বিক্রি করা সমীচীন নয়। যেমন—ইমাম মালিক রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه ونهى عنه.
>
> জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলল, আপনি এই বাহনটি আমাকে নগদ অর্থে কিনে দিন এবং আমি বাকিতে আপনার থেকে কিনব। আবদুল্লাহ ইবন উমর রা.-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি একে অপছন্দ করলেন এবং তা করতে নিষেধ করলেন।[১৭৮]

অনুরূপভাবে ‘একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয়’-সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাবিঈ সিমাক রাহ. বলেন, এর অর্থ হলো— الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ

---

১৭৬. *আহকামু বাইয়িত তাকসীত*, আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ, পৃ. ২

১৭৭. https://at-tahreek.com/article_details/1025

১৭৮. মালিক, ইমাম, *আল মুওয়াত্তা*, বৈরুত : দারু ইহয়ায়িল উলূমিল আরবিয়্যাহ, ১৯৯৪, পৃ. ৪৯৮; ইবনু আবদিল বার, *আল ইস্তিযকার*, বৈরত : দারু কুতাইবাহ, ১৯৯৩, খ. ২০, পৃ. ১৭৩

فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا-"বিক্রেতা বলবে, বস্তুটি বাকিতে হলে এত টাকায় এবং নগদে হলে এত টাকায়।"[১৭৯]

সংশয় নিরসন :

এ আপত্তি ও সংশয় যথার্থ নয়। এর জবাব হলো—শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থ ও পণ্য উভয়েরই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উভয়ের জন্য শরীয়ত আলাদা-আলাদা নিয়মকানুন ও নীতিমালা প্রদান করেছে। অর্থের (মুদ্রার) নিজস্ব কোনো উপযোগ নেই; বিনিময়ের মাধ্যম হওয়া ছাড়া এর কোনো গুণ নেই। তাই কোনো একক অর্থের (মুদ্রার) সাথে একই জাতের অর্থের (মুদ্রার) বিনিময় করতে হলে উভয়ের মূল্য সমান সমান হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ যদি বেশি দেয়, তাহলে সেই অতিরিক্ত অংশ দেওয়া হবে বিনিময়হীন, যা রিবার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু স্বাভাবিক পণ্যসামগ্রীর ব্যাপারটি ভিন্ন। দ্রব্যসামগ্রীর নিজস্ব উপযোগ আছে আর আছে বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্য। মালিকের স্বাধীনতা আছে সে তার ইচ্ছামতো যেকোনো দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে, অবশ্য যদি সেই দাম পণ্যের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিক্রেতা যদি প্রতারণার আশ্রয় না নেয় অথবা আত্মসাৎ না করে, তাহলে ক্রেতা রাজি থাকলে সে বাজার দামের চেয়ে বেশি দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে। অর্থাৎ, ক্রেতা যদি বিক্রেতা কর্তৃক ধার্যকৃত বেশি দামে পণ্যটি কিনতে সম্মত হয়, তাহলে এ বাড়তি দাম গ্রহণ করা বিক্রেতার জন্য বৈধ। এভাবে বিক্রেতা নগদে বিক্রয়কালে যেমন বাজার দামের চেয়ে বেশি দাম নিতে পারে, তেমনি বাকিতে বিক্রি করার সময়েও বাড়তি দাম ধার্য করতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে অবশ্যই এ শর্ত পূরণ করতে হবে যে, সে ক্রেতার সাথে প্রতারণা বা ঠগবাজি করবে না এবং তাকে পণ্য ক্রয়ে কোনোভাবে বাধ্য করবে না। অপরদিকে ক্রেতাকেও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় সম্মত হওয়ার শর্ত পূরণ করতে হবে।

কখনও কখনও বলা হয়, নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বাড়তি দাম নেওয়া হলে তা দাম পরিশোধ বিলম্বিত করার কারণে অর্থাৎ সময়ের কারণে নেওয়া হয় না; এজন্য তা বৈধ। কিন্তু বাকি বিক্রয়ের দাম বেশি নিলে সেই বেশিটুকু দাম পরিশোধ

---

১৭৯. আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হা. নং : ৩৭৮৩; বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শুআইব আল আরনাউত রাহ. বলেন, হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহি।

বিলম্বিত করা তথা সময়ের বিপরীতে নেওয়া হয়; এজন্য তা সুদের সমতুল্য হয়। এ যুক্তিতে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দাম পরিশোধের মেয়াদকে বিবেচনায় রেখে পণ্যের দাম বাড়ানো হলে সেই লেনদেন সুদের সংজ্ঞার আওতায় এসে যায়। কিন্তু এটি আসলে একটি ভুল ধারণা। এই অনুমান সঠিক নয়। বিলম্বে দাম পরিশোধের কারণে অতিরিক্ত দাম ধার্য করা হলে দামের বাড়তি অংশ সুদ হয় কেবল তখন, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বিনিময়ের বস্তু হয় একই জাতের মুদ্রা বা অর্থ। অন্যথায় অর্থের বিনিময়ে কোনো পণ্য বিক্রি করা হলে সেই পণ্যের দাম নির্ধারণের সময় বিক্রেতা অনেক বিষয় বিবেচনা করে, যার মধ্যে দাম পরিশোধের সময়ও একটা বিবেচ্য বিষয় হিসেবে থাকে। বস্তুত বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রি করতে চায় সেই পণ্যের নিজস্ব উপযোগ আছে; বিক্রেতা বিভিন্ন কারণে এর দাম বেশি চাইতে পারে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন কারণে ক্রেতা উক্ত চড়া দাম দিয়ে পণ্যটি ক্রয় করতে রাজি হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ক্রেতার বিবেচ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ হতে পারে :

- বিক্রেতার দোকান ক্রেতার নিকটবর্তী এবং ক্রেতা এর চেয়ে দূরে অবস্থিত বাজারে যেতে চায় না।
- অন্যান্য বিক্রেতার চেয়ে এই বিক্রেতা অধিক বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন; বিক্রেতার ওপর ক্রেতার আস্থা আছে যে, সে তাকে কাঙ্ক্ষিত ও ভালো মানের জিনিস দেবে।
- বহু ক্রেতার ভিড়েও বিক্রেতা তাকে যথার্থ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়।
- অন্য দোকানের চেয়ে এই বিক্রেতার দোকান বেশি পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদ।
- অন্যদের তুলনায় সেই বিক্রেতা অধিক ভদ্র ও বিনয়ী।

এসব বিষয়ে এবং অনুরূপ আরও বহু বিবেচ্য বিষয় গ্রাহকের কাছে উচ্চ দাম ধার্য করায় ভূমিকা পালন করে। একইভাবে যদি তার পণ্যের দাম এজন্য বৃদ্ধি করে যে, সে তার গ্রাহককে বাকিতে মাল দিচ্ছে তাহলে ইসলামী শরীয়া অনুসারে এ উচ্চতর দাম অবৈধ নয়, যদি না এতে কোনো প্রতারণা বা ঠগবাজি থাকে এবং ক্রেতা যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সে দাম দিতে সম্মত হয়। কারণ, পণ্যের দাম বৃদ্ধি করার কারণ যা-ই হোক, গোটা দাম নির্ধারিত হয়েছে পণ্যের বিপরীতে; অর্থের বিপরীতে ধার্য হয়নি।

এ কথা ঠিক যে, দাম চাওয়া এবং দাম নির্ধারণ করার সময় বিক্রেতার দাম পরিশোধের জন্য প্রদত্ত মেয়াদের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রেখেছে; কিন্তু যখনই দাম নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন নির্ধারিত দামের সম্পর্ক হয় পণ্যের সাথে; সময়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং এ নির্ধারিত দাম সর্বদা একই থাকে; বিক্রেতা কখনও সেই দাম আর বাড়াতে পারে না। এ দাম যদি সময়ের বিপরীতে নির্ধারিত হতো, তাহলে মেয়াদ শেষে আরও সময় বাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিক্রেতা এ দাম বৃদ্ধি করতে পারত।[১৮০]

অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, ব্যাংকিং মুরাবাহা কারবারে বাকিতে বিক্রয় হওয়ার কারণে ঠিক সময় বাড়ানোর বিনিময়ে যে মূল্য বেশি নেওয়া হচ্ছে বিষয়টি তেমন নয়। সন্দেহকারীদের মতে, সময় বাড়ানোর বিনিময়ে অর্থ বেশি নেওয়া প্রত্যক্ষভাবে সময় বাড়ানোর মূল্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে ধারণা করা এজন্য সঠিক নয় যে, সময় বাড়ানোর কারণে পরোক্ষভাবে পণ্যের মূল্য বাড়তে পারে, যে বৃদ্ধিটি সরাসরি সময়ের বিনিময়ে নয়; বরং পণ্যের বিশেষ গুণের কারণে। পশুর পেটের বাচ্চা পৃথকভাবে বিক্রয় করা বৈধ নয়; তবে পশুর পেটে বাচ্চা থাকার কারণে পশুর মূল্য বাড়িয়ে বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। এ দ্বারা প্রমাণিত হলো, কিছু জিনিসের পৃথক মূল্য নেওয়া না গেলেও পরোক্ষভাবে তার কারণে উক্ত জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে দিলে শরীয়তের কোনো আপত্তি থাকে না। এখানে ব্যাংকিং মুরাবাহা কারবারে বাকিতে পণ্য দেওয়া হচ্ছে বলে মূল্য পরবর্তী সময়ে উসুল করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এ কারণে অর্থাৎ সময়ের বিনিময়ে পণ্যের মূল্য বাড়েনি; বরং যেহেতু এ লেনদেনে ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়, সেজন্য অতিরিক্ত মূল্য পরে দেওয়ার বিষয়টি উক্ত পণ্যের বিশেষ গুণ বিবেচনা করে মূল্য বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ, এ পণ্যের মূল্য দেরিতে পরিশোধযোগ্য বিধায় 'দেরিতে পরিশোধযোগ্য' বিষয়টি পরোক্ষভাবে পণ্যের একটি গুণে পরিণত হয়েছে। সেজন্য এই পণ্য বিশেষ গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে পণ্যটিকে বেশি দামে বিক্রয় করা বৈধ বিবেচিত হচ্ছে, যা কোনোভাবে পরোক্ষভাবে সময় বাড়িয়ে মূল্য পরিশোধ করা যাবে মনে করে উক্ত সময়ের বিনিময়ে বাড়ানো হচ্ছে বলে ধারণা করার সুযোগ নেই। সুতরাং বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের

---

১৮০. রহমতুল্লাহ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ১১৪; *সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, পৃ. ১১৩-১১৫

কারণে বাজার দরের চেয়ে পণ্যের অতিরিক্ত যে মূল্য নেওয়া হয়, তা সময় বাড়িয়ে পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়ার কারণেই নেওয়া হয়, এই অভিযোগ তুলে যারা ব্যাংকিং মুরাবাহা লেনদেনকে অবৈধ বলে ধারণা করেন আসলে তাদের এ ধারণা সঠিক নয়।

নগদের তুলনায় বাকিতে বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার বিষয়ে অনেক সাহাবী, তাবিঈ ও মুজতাহিদগণের অভিমত রয়েছে। চার মাযহাবের বিশিষ্ট ইমামগণ একমত যে, বিক্রেতা যদি কোনো জিনিসের নগদে এবং বাকিতে বিক্রির জন্য পৃথক পৃথক দুটি মূল্য নির্ধারণ করে এবং বাকি বিক্রির মূল্য নগদ মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয হবে। শর্ত শুধু এতটুকুই যে, চুক্তির সময় সওদা নগদ হবে না বাকি হবে—দুটির যেকোনো একটি নির্ধারণ করে নিতে হবে। তাতে অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকতে পারবে না। নিকট-অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য আলিম ও ফকীহও এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।[১৮১] হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. এ মতের ওপর আলিমগণের ইজমা নকল করেছেন। শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু বায রাহ. বলেন, ‘ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে নগদের তুলনায় বাকিতে বেশি জায়িয আছে।’[১৮২] শাইখ উছাইমীন রাহ. বলেন—

> ذلك جائز، لا بأس به؛ ..... وهذا المشتري عرضت عليه السلعة بثمنين: ثمن النقد، والثمن المؤجل، و لنفرض أن ثمن النقد مائة، وأن المؤجل مائة و خمسون، فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس، و ذهب بالسلعة، فثبت في ذمته مئة وخمسون علي وجه التحديد و التعين، فهذا بيع لا بأس به، لأن المشتري خير بين هذا، أو هذا
>
> এটি বৈধ, এতে কোনো সমস্যা নেই। ... এখানে ক্রেতাকে দু-ধরনের মূল্যে পণ্যটি সরবরাহ করা হচ্ছে—নগদ মূল্যে ও ধার বা বাকিতে। আমরা ধরে নিচ্ছি, নগদ মূল্য ১০০ টাকা, আর ধারের মূল্য ১৫০ টাকা। ওই বৈঠকেই ক্রেতা ধারের মূল্য ১৫০ টাকাতে ক্রয় করে পণ্যটি

---

১৮১. বিস্তারিত দেখুন, রহমতুল্লাহ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ১১৫-১১৮

১৮২. *ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৩৩১; *ইসলাম সাওয়াল জাওয়াব*, ফাতওয়া নং : ১৩৯৭৩

নিয়ে চলে গেলেন। অতএব, এখন তার দায়িত্বে নির্ধারিত মেয়াদে ১৫০ টাকা ঋণ প্রতিষ্ঠিত হলো। এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এখানে ক্রেতাকে ১০০ ও ১৫০ টাকার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।[১৮৩]

সউদী আরবের স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ডও উক্ত ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলে ফাতওয়া প্রদান করেছে।[১৮৪] ১৯৮৩ সালে মার্চ মাসে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক সম্মেলনে বিশ্ববরেণ্য ফকীহ ও আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির অধিবেশনে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ব্যাংকিং মুরাবাহা বা মুরাবাহা মুয়াজ্জালা বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দেওয়া হয়। শর্তগুলো হলো :

ক. বিনিয়োগ গ্রাহক বা ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের পূর্বে পণ্য বিনষ্ট হলে তার দায়দায়িত্ব ব্যাংককে বহন করতে হবে।

খ. কোনো অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেওয়াজনিত ক্ষতির দায়দায়িত্বও ব্যাংকের ওপর বর্তাবে।

গ. ব্যাংকের ক্রয়কৃত পণ্য বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক ক্রয় করে নেওয়ার ওয়াদা বা অঙ্গীকার বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি প্রতিটি ব্যাংক তার শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের অভিমত অনুযায়ী সিদ্ধান্তগ্রহণের ইখতিয়ার রাখবে।[১৮৫]

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত, ওপরে যে পদ্ধতির বৈধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো—নগদ ক্রয়-বিক্রয় অপেক্ষা বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য অধিক ধার্য করা যাবে; তবে ক্রয়-বিক্রয় যদি নগদই হয়ে থাকে, কিন্তু বিক্রেতা এরূপ শর্তারোপ করে দেয় যে, ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করে, তাহলে সে বার্ষিক দশ শতাংশ অতিরিক্ত জরিমানা হিসেবে গ্রহণ করবে, তাহলে এটা নিশ্চিতরূপে নাজায়িয। কেননা, এ অবস্থায় যে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে তা ঋণের ওপর গৃহীত সুদ ছাড়া কিছুই নয়।

---

১৮৩. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব*, খ. ৯, পৃ. ৫৭

১৮৪. *ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দায়িমাহ্*, খ. ১৩, পৃ. ১৫৬

১৮৫. সালুস, ড. আলী আহমাদ, মাওসূআহ আল কাদায়া আল ফিকহিয়্যাহ আল মুআসরাহ ওয়াল ইকতিসাদির ইসলামী, কাতার : দারুস সাকাফাহ, পৃ. ৬০

উভয় পদ্ধতির মাঝে প্রায়োগিক পার্থক্য এই যে, যেখানে অতিরিক্ত টাকা পণ্যের মূল্যের একটি অংশ হবে, সেখানে এই অতিরিক্ত টাকা একবারেই নির্ধারণ করা হবে; দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারে নয়। ক্রেতা যদি সময়মতো পরিশোধ না করে, তাহলে এ কারণে বিক্রেতা অতিরিক্ত টাকা দাবি করতে পারবে না; বরং মূল্য ততটুকুই থাকবে। পক্ষান্তরে যেখানে বাজার মূল্যের অতিরিক্ত টাকা পণ্যের মূল্যের অংশ হয় না, সেখানে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এ অতিরিক্ত টাকা বাড়তে থাকবে।[১৮৬]

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত যে রিওয়ায়তগুলো থেকে এ সংশয় তৈরি হয়, তন্মধ্যে প্রথম রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যায় মুওয়াত্তার বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইবনু আবদিল বার রাহ. লিখেছেন—

> هذا الحديث عند مالك فيه وجهان: أحدهما – العينة، وقد تقدم تفسيرها ... والثاني أنه من باب بيعتين في بيعة، لأنها صفقة جمعت بيعتين، أصلها البيعة الأولى.
>
> ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট উক্ত হাদীসে বর্ণিত লেনদেনটি নিষিদ্ধ হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে। যথা—এক. এটি নিষিদ্ধ ঈনা। এর ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দুই. এটি নিষিদ্ধ বাঈআতাইন ফী বাঈআ (এক চুক্তিতে দুটি দুই বিক্রয়)-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে দুটি চুক্তি একইসাথে একত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল হলো, প্রথম বিক্রয়-চুক্তিটি।[১৮৭]

ইবনু আবদুল বার রাহ.-এর মতে, আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. উক্ত লেনদেনটি নিষেধ করার দুটি কারণ রয়েছে :

প্রথমটি হলো, তিনি একে নিষিদ্ধ 'ঈনার' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। 'ঈনা' সুদ গ্রহণের একটি অপকৌশলের নাম। ইমাম মালিক রাহ. এর আগে উনিশতম অধ্যায়ে 'ঈনা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে ইমাম মালিক রাহ. থেকে ইবনু আবদিল বার রাহ. ঈনার যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তা হলো—

---

১৮৬. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, ১১২

১৮৭. ইবনু আবদিল বার, *আল ইস্তিযকার*, বৈরত : দারু কুতাইবাহ, ১৯৯৩, খ. ২০, পৃ. ১৭৩-১৭৪

একজন আরেকজনের নিকট এসে বলল, আমাকে নির্দিষ্ট মেয়াদে কিছু দিরহাম ঋণ দিন। আমি আপনাকে অধিক পরিশোধ করব। উত্তরে সে ব্যক্তি বলল, এটি তো বৈধ হবে না; বরং সুদ হয়ে যাবে। সুতরাং তা করা সম্ভব নয়। তবে এমনটি হতে পারে যে, তুমি আমার কাছে যে পরিমাণ ঋণ চেয়েছ, ওই পরিমাণ মূল্যে আমি তোমার নিকট থেকে নগদে একটি পণ্য ক্রয় করে নেব, যে পণ্যটি তোমার কাছে নেই, যার মালিক তুমি এখনও হওনি। এরপর তুমি সেটা বাজার থেকে বা যার কাছে পণ্যটা আছে তার থেকে (বাকিতে) ক্রয় করে আমাকে দেবে।

এরপর ইবনু আবদিল বার রাহ. লিখেছেন-এ পদ্ধতিটি সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ ঈনার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে যা নেই, যার মালিক বিক্রেতা নয় তা বিক্রি করা হয়েছে; যা কবজ করা হয়নি তা বিক্রি করা হয়েছে; রিস্ক গ্রহণ ছাড়া মুনাফা করা হয়েছে।

এরপর তিনি এর সমর্থনে সালাফ থেকে বেশ কয়েকটি ফাতওয়া উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে উপরিউক্ত রিওয়ায়াতটিও রয়েছে।

অতএব বোঝা যায়, লোকটি বাহনের মালিক না হয়েই তা বিক্রি করে দিয়েছে। তাই তা ইমাম মালিক রাহ.-এর মতে, ঈনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এ কারণে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-ও তা অপছন্দ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর সাথে ইসলামী ব্যাংকসমূহে চর্চিত মুরাবাহার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, নীতিগতভাবে ব্যাংক পণ্যের মালিক হওয়ার আগে তা অন্যত্র বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়টি হলো, তিনি একে নিষিদ্ধ بيعتان في بيعة (একই চুক্তিতে দুটি বিক্রয় একত্রিত করা)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, এখানে প্রথম লেনদেন হলো, মালিকানাহীন বাহন এই শর্তে বাকিতে বিক্রয় করা যে, বিক্রেতা তা বাজার থেকে নগদে ক্রয় করে নিয়ে আসবে। অতএব, এখানে নগদ ও বাকি দুটি লেনদেন শর্তযুক্ত হয়েছে।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ীও এর সাথে ব্যাংকিং মুরাবাহার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, ব্যাংকিং মুরাবাহার নীতি হলো, ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পরই তা বিক্রি করবে; এর আগে নয়। পক্ষান্তরে এখানে বাহন বিক্রি করা হয়েছে তা ক্রয়ের

আগেই। অবশ্য ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক ওয়াদা প্রদান করে যে, ব্যাংক পণ্য নিয়ে আসলে গ্রাহক তা ক্রয়ে বাধ্য থাকবেন। তবে যখন ক্রয় করবে, তখন স্বতন্ত্র ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। অতএব, কোনোভাবেই উপযুক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত নিষিদ্ধ লেনদেনের সাথে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে চর্চিত মুরাবাহার সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় রিওয়ায়াতের ব্যাপারেও কথা হলো—এটি নিষিদ্ধ বাঈআতাইন ফী বাঈআ (এক চুক্তিতে দুটি দুই বিক্রয়)-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে দুটি চুক্তি একই সাথে একত্রিত করা হয়েছে।

চ. অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য

ব্যাংকিং মুরাবাহা আসলে যত না বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, তার চেয়েও এটি অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থের আদান-প্রদান, যাকে হালাল করার জন্য মাঝখানে পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে মাত্র। সুতরাং এখানে ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ সুদ আদায়ই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং এ লেনদেন অবৈধ।

সংশয় নিরসন :

সকল ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক বা বাকিতে হোক নিরপেক্ষ বিচারে তো প্রত্যেকটিকে এভাবেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, যেমনটি এখানে করা হয়েছে; অর্থাৎ, তাদের ভাষায়—সেখানে যত না ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন তা থেকে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনই উদ্দেশ্য। যেমন তারা বলেন—একজন বিক্রেতা একশত টাকা মূল্যে কিছু ক্রয় করে তা একশত দশ টাকায় বিক্রয় করলে আসল কথা দাঁড়ায়, সে তা থেকে একশত টাকার বিনিময়ে একশত দশ টাকা গ্রহণ করেছে আর একে বৈধ করার জন্য পণ্যটিকে এ লেনদেনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে মাত্র। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে বিশ্লেষণে এরূপ উল্লেখ করার সুযোগ থাকলেও কিন্তু বিষয়টি এমন নয়, যেমনটি তারা বুঝাতে চেয়েছেন। মূলত আল্লাহ তায়ালা এ লেনদেনকে হালাল করেছেন। এর কারণ হচ্ছে :

বিক্রেতা এখানে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক তার শ্রম-মেধা-অর্থ পূর্ব থেকেই এ পণ্যের মধ্যে বিনিয়োগ করে রেখেছেন। এ পণ্য জমা করে রাখলে কালের আবর্তে গুণগত পরিবর্তনও হয়ে থাকে, যা অবশ্যই বিক্রেতার

জন্য একটা ঝুঁকি। তার শ্রম, মেধা যা-কিছু সে সেখানে খাটিয়েছে, তার বিনিময়ে সে অবশ্যই লাভে উক্ত পণ্য বিক্রয় করতে পারে। সেজন্য এ ক্রয়-বিক্রয়ে লভ্যাংশ বৈধ। পক্ষান্তরে টাকার বিনিময়ে টাকা বেশি নিলে সেখানে যেমন ঝুঁকিও থাকে না, তেমনি তার কোনো কর্মকাণ্ড সেখানে ভূমিকা রাখে না, যার বিনিময়ে সে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা ক্রেতা থেকে পেতে পারে। সেজন্য অর্থের বিনিময়ে অর্থ বেশি নিলে তা হয় সুদ। সে কারণে এ ধরনের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা অবৈধ। আলোচ্য ব্যাংকিং মুরাবাহা লেনদেনে সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই ঝুঁকি থাকে। বিক্রেতার শ্রম, মেধাও বিনিয়োগ হয়, যার বিপরীতে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া বৈধ।

ছ. দাইনের বিপরীতে দাইন বিক্রয়

ব্যাংকিং মুরাবাহায় বিক্রেতা যেহেতু কার্যত পণ্যও দিচ্ছে না, ক্রেতা মূল্যও দিচ্ছে না; পরস্পরের মধ্যে কেবল অর্থের বিনিময় হচ্ছে, তাই এরূপ লেনদেন 'দাইনের বিপরীতে দাইন[১৮৮] বিক্রয়'-এরই নামান্তর, যা ইসলামে অবৈধ। সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

"রাসূলুল্লাহ সা. এক ঋণের বিনিময়ে অন্য ঋণকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[১৮৯]

সংশয় নিরসন :

আসলে তো এটি 'ওয়াদ বিল বাঈ' (ক্রয়চুক্তি); মূল ক্রয়-বিক্রয় নয়। ব্যাংক পণ্য হাতে পেলেই তো মূল ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হবে। পণ্যও ক্রেতাকে বুঝে দেওয়া হবে। সুতরাং এটা 'দাইনের বিপরীতে দাইন বিক্রয়' নয়। বিষয়টি তা

---

১৮৮. দাইন : এর অর্থ দেনা, দায়, ঋণ ইত্যাদি। পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে অথবা ঋণগ্রহণের কারণে ওই ব্যক্তির ওপর যে অর্থের দায় বর্তায় এবং যা থেকে মুক্ত হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়, তাকে 'দাইন' বলে। 'দাইন' কর্জ থেকে ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, রিবাদ দাইন রিবার কোনো স্বতন্ত্র প্রকার নয়। এটি মূলত রিবান নাসিয়াহর একটি প্রকার। পার্থক্য শুধু ক্ষেত্র নিয়ে। রিবান নাসিয়াহ হয় কর্জের মধ্যে; আর রিবাদ দাইন হয় দায়-দেনার ক্ষেত্রে।

১৮৯. দারা কুতনী, *আস সুনান*, বৈরুত, ১৩৮৬ হি., খ. ৩, পৃ. ৭১

থেকে ভিন্ন। সুতরাং ব্যাংকিং মুরাবাহা যেহেতু লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয় নয়; ক্রয়ের চুক্তিমাত্র, তাই অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ আদান-প্রদানের অভিযোগে এই লেনদেনকে অবৈধ বলার কোনো সুযোগ নেই।

আমাদের অভিমত

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যাংকিং মুরাবাহা একটি বৈধ ক্রয়-বিক্রয়। এখানে ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারী এবং ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে পৃথক পৃথক যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, তা ইসলামী ক্রয়-বিক্রয় নিয়মনীতির আলোকেই সম্পাদিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, স্বার্থান্বেষী লোকেরা এ পদ্ধতিকে কৌশলে ব্যবহার করবে। তারা অনেকটা পণ্য ক্রয়ের নাম করে সুকৌশলে নগদ টাকার লেনদেন করতেও পারে। তদুপরি যেহেতু এ পদ্ধতি নিয়ে নানা ঘোরতর সংশয় ও আপত্তি রয়েছে—যদিও এসব সংশয় ও আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে—, তাই পারতপক্ষে এ পদ্ধতির অনুশীলন থেকে বিরত থাকাই সমীচীন এবং ব্যাংক যথাসম্ভব ক্রমশ এ পদ্ধতিতে লেনদেন কমিয়ে ফেলবে। এর বিপরীতে মুশারাকা ও মুদারাবা প্রভৃতি পদ্ধতির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেবে, যাতে ইসলামী ব্যাংকিং একটি আদর্শ ইসলামী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যায়; এ যেন কেবল 'হীলা কোম্পানি' না হয়।

বিনিয়োগগ্রহীতাকে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাংকিং মুরাবাহার মৌলিক নীতি হলো, যে পণ্যে মুরাবাহা করা হবে, সেটা ব্যাংক প্রথমে নিজে সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ, ব্যাংকিং মুরাবাহায় ব্যাংককেই পণ্য ক্রয়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এরূপ পদ্ধতিতে ব্যাংক লেনদেন করতে চাইলে ব্যাংক হবে আসলে একজন ব্যবসায়ী। ময়দানে একজন ব্যবসায়ী যেমন নিজেই পণ্য ক্রয় করে তা অন্যত্র বিক্রয় করেন, তেমনি ব্যাংককেও অবশ্যই তা ক্রয় করে গ্রাহককে বিক্রয় করতে হবে। ব্যাংকের এসি রুম ছেড়ে বাজারে গিয়ে মাল ক্রয় করেই গ্রাহককে বুঝে দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি ও তা বাস্তবায়নে আন্তরিক হয়েই ব্যাংক কর্মকর্তাকে ইসলামী ব্যাংকে চাকরি নেওয়া উচিত। তাকে মনে রাখতে হবে, তিনি যত না ব্যাংকার তার চেয়ে তিনি একজন ব্যবসায়ী।

তবে ব্যাংক প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বস্ত কাউকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ দিতে পারবে। অর্থাৎ, এমন কোনো পণ্য, যা ব্যাংকের জন্য সরাসরি ক্রয় করে দেওয়া অসম্ভব—শুধু সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষ থেকে তৃতীয় কাউকে ওয়াকিল বা ক্রয়-প্রতিনিধির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই লিখিত আকারে হতে হবে এবং পণ্য ক্রয়ের অপারগতা যৌক্তিক হতে হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে খোদ গ্রাহককেই পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি বা ওয়াকিল বানানো কতটুকু শরীয়াসম্মত এবং নিরাপদ—তা একান্ত বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। বলার অপেক্ষা রাখে না, খোদ গ্রাহককে পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি বা ওয়াকিল বানালে শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি ও সুদি কারবারে পতিত হওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। কেননা, গ্রাহক ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে পণ্য ক্রয় করার পরই তা গ্রাহকের হয়ে যায় না। বরং গ্রাহককে পণ্য নিজের মালিকানায় নিয়ে আসার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ক্রয়ের প্রস্তাব (ঈজাব) করতে হয়। এরপর ব্যাংক সেই প্রস্তাব গ্রহণ (কবুল) করার পরেই কেবল পণ্যটি গ্রাহকের মালিকানায় আসে। এই মধ্যবর্তী সময়ে (গ্রাহকের মালিকানায় আসার পূর্বপর্যন্ত) পণ্যটি সম্পূর্ণ ব্যাংকের ঝুঁকিতে থাকবে। কিন্তু গ্রাহককে প্রতিনিধি বানালে এ নিয়ম অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা হয় না। দেখা যায়, গ্রাহক প্রতিনিধি হয়ে পণ্য ক্রয়ের পর থেকেই; এমনকি গ্রাহককে অর্থ প্রদানের পরপরই ব্যাংক দায়মুক্ত হয়ে যায়, কার্যত সম্পূর্ণ ঝুঁকি গ্রাহকের ধরা হয়। এক মুহূর্তের জন্যও ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণ নিশ্চিত হয় না। লেনদেনটি তখন নিশ্চিতভাবে সুদি লেনদেনে পরিণত হয়। কার্যত ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়ায় যে, ধরুন, ব্যাংক দুই লক্ষ টাকা মুরাবাহার শর্তে গ্রাহককে প্রদান করেছে; ব্যাংক কোনো ঝুঁকিই গ্রহণ করেনি। গ্রাহক কিস্তিতে কিস্তিতে অতিরিক্ত লাভসহ দুই লক্ষ টাকা ব্যাংককে পরিশোধ করে দিলো। এরূপ অবস্থায় একে সুদ বলা ছাড়া ভিন্ন কিছু বলার সুযোগ নেই।

তদুপরি এ খেয়ালও রাখতে হবে যে, এই ক্রয়-প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রাহককে দেওয়ার মাধ্যমে যাতে প্রতিনিধি নিয়োগের দরজা এমনভাবে খুলে না যায় যে, যেকোনো সামান্য অজুহাতে ব্যাংক নিজে ক্রয়-বিক্রয় না করে শুধু গ্রাহককেই ক্রয়-প্রতিনিধি বানাবে, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো—অবৈধ পথ খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে অনেক সময় বৈধ জিনিসকেও সাময়িকভাবে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে ব্যাপকভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে উক্ত বায়িং এজেন্টভিত্তিক মুরাবাহা চর্চা হচ্ছে। অথচ ব্যাপকভাবে এরূপ লেনদেনের শারয়ী কোনো ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক কোনো শরীয়া বোর্ড এর অনুমোদন করেনি। তবে একান্ত অপারগতার মুহূর্তে কিছু শর্তসাপেক্ষে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মাত্র।

AAOIFI ২০০২ সালে ব্যাংকিং মুরাবাহা-সংক্রান্ত ৮ নং *Shari'as Standard* -এর ধারা ৩-এর ৩/১/৩ উপধারায় এ ব্যাপারে লেখা হয়েছে—

> الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوزلها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولاتلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة.
>
> শরীয়ার মূল নিয়ম হলো, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রেতা থেকে পণ্য ক্রয় করবে। অবশ্য এতটুকু অনুমোদন আছে যে, পণ্য ক্রয়ের কাজটি মুরাবাহার গ্রাহক ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিনিধি বানিয়েও করতে পারবে। তবে একান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্ত ছাড়া মুরাবাহার গ্রাহককেই পণ্য সরবরাহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের পথ বেছে নেবে না।

এখানে 'একান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্ত' বলতে বোঝানো হয়েছে এমন পরিস্থিতি, যেখানে গ্রাহক ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন, বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কখনও এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে। এ ছাড়া দেশীয় মুরাবাহার ক্ষেত্রে একান্ত বিনা প্রয়োজনে 'বায়িং এজেন্ট মুরাবাহা' অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ।[১৯০] বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বায়িং এজেন্ট মুরাবাহার জন্য AAOIFI দুটি শর্ত প্রদান করেছে। তা হলো—

---

১৯০. এসআইবি পিএলসি-এর শরীয়া ম্যানুয়ালে বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—বাই মুরাবাহা ও বাই মুআজ্জাল পদ্ধতিতে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য কিনে তা বিনিয়োগ-গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার কারণে ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সরবরাহকারী থেকে সরাসরি পণ্য কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্যাংক নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করে পণ্য ক্রয় করতে পারে :

ক. পণ্যের মূল্য ব্যাংক সরাসরি বিক্রেতা বা সরবরাহকারীকে প্রদান করবে। গ্রাহককে বা গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে তা প্রদান করা যাবে না।

খ. বাস্তবে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে—এ মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাংকের নামে হতে হবে এবং তা সংগ্রহ করতে হবে।[১৯১]

এর আরও আগে ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের 'মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা' (যুগের জটিল মাসআলার গবেষণা বোর্ড বা কাউন্সিল)-এর এক অধিবেশনে 'ইসলামী ব্যাংকিং রূপরেখা' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাদের সেই সিদ্ধান্তের ১৪ নং ধারায় মুরাবাহা বিষয়ে আরও একটি শর্ত প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ধারার উর্দু ভাষ্যটির অনুবাদ নিম্নরূপ—

> গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষে পণ্য বাস্তবেই কিনল কি না, হস্তগত করল কি না—তা যাচাই করার জন্য ব্যাংক নিজের কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। ওই প্রতিনিধি পণ্যের ওপর গ্রাহকের কবজ (হস্তগত) হয়েছে মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করবে। এরপর গ্রাহক সম্পূর্ণ নতুন করে যথানিয়মে ক্রয়ের প্রস্তাব (ঈজাব) করলে ব্যাংক তখন মুরাবাহা ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট পণ্যটি বিক্রি করবে।[১৯২]

ক. ব্যাবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কেনার সময় পণ্যের গুণগতমান, বাজারমূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা জরুরি। এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে ব্যাংক কর্মকর্তার চেয়ে বিনিয়োগ গ্রাহকই বেশি পারদর্শী হয়ে থাকেন। কাজেই ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

খ. অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পণ্য বিভিন্ন সরবরাহকারী, বাজার বা এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে দর কষাকষির মাধ্যমে কিনতে হয়, যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

গ. অনেক বিক্রেতা নগদ টাকা ছাড়া ডিমান্ড ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করতে চান না। তাই ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে নগদ টাকা নিয়ে বিভিন্ন বাজার বা এলাকা থেকে পণ্য ক্রয় করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

ঘ. অনেক সময় একাধিক ছোটো ছোটো পণ্য বিভিন্ন দোকান থেকে নগদ টাকায় কিনতে হয়, যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

১৯১. AAOIFI. *Shariah Standards*. 2008, 1/112

১৯২. *আহসানুল ফাতাওয়া*, ১৯৯৬, খ. ৭, পৃ. ১১১

এসআইবি পিএলসি-এর শরীয়া ম্যানুয়ালে বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য কতিপয় শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শর্তগুলো হলো—

ক. প্রথমে গ্রাহক ক্রয়-প্রতিনিধিরূপে সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবেন। অতঃপর ঈজাব ও কবুল (বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্র পূরণ)-এর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত দামে নিজের জন্য তা ক্রয় করে নেবেন। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকের দুটি বৈশিষ্ট্যের একটিকে অন্যটি হতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, তিনি কখনও একজন গ্রাহক এবং কখনও একজন প্রতিনিধি। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রতিনিধিরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর প্রতিনিধিত্বের বিধান বলবৎ থাকবে। অতঃপর যখন তিনি ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পণ্য ব্যাংক থেকে ক্রয় করে নেবেন, তখন থেকে উক্ত পণ্যের মালিকানা ও ঝুঁকি গ্রাহককেই বহন করতে হবে।

খ. শাখার আওতা বহির্ভূত স্থান এবং স্থানীয় বিক্রেতা থেকে খুচরা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই শুধু গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক বা প্রতিনিধির ক্রয়কৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট শাখার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে নির্ধারিত সময়েই পণ্য ক্রয় করতে হবে। কোনোভাবেই তা দীর্ঘদিন গ্রাহকের হিসাবে ফেলে রাখা যাবে না কিংবা তা দিয়ে গ্রাহকের অন্য বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করা যাবে না।

ঘ. স্থানীয় একজন সরবরাহকারী, যার নিকট থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করা সম্ভব তার কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না।

ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুরসণ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর কর্তৃক সংকলিত 'শরীয়াহ সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি'-তে উল্লেখ করা হয়েছে—

ক. গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ মঞ্জুরি ও গ্রাহক কর্তৃক উক্ত মঞ্জুরিপত্রে স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদিত

হতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয়ের জন্য আবেদনপত্র নিতে হবে।

খ. গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয়ের আবেদনপত্র পাওয়ার পর গ্রাহককে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয়ের জন্য কর্তৃত্ব প্রদানপূর্বক নিয়োগপত্র দিতে হবে।

গ. পণ্য ক্রয়ের জন্য গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাব বিকলন করে সরবরাহকারী/বিক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট ইত্যাদি প্রতিনিধির কাছে যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকারের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে। প্রয়োজনে পণ্যের ক্রয়মূল্য ব্যাংকের কাছে রক্ষিত গ্রাহকের প্রতিনিধির হিসাবে আকলন করা যেতে পারে অথবা যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকার-পূর্বক প্রতিনিধিকে নগদ অর্থও প্রদান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বাস্তবতার দিক লক্ষ রেখে শাখা ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ঘ. ক্রয়ের পর প্রতিনিধি পূর্বনির্ধারিত স্থানে পণ্য মজুত করে অবিলম্বে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে পণ্যের দখল (কবজ) ও ক্রয়-সংক্রান্ত প্রমাণাদি যথা—ক্যাশমেমো, চালান, পরিবহন রশিদ, বিমাপত্র ইত্যাদি হস্তান্তর করবে। অতঃপর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রাহককে পণ্য হস্তান্তরপূর্বক পারচেজ শিডিউল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রে তার স্বাক্ষর নেবেন।

ঙ. সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি/দলিলাদি শাখার গ্রাহকের ফাইলে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।[১৯৩]

এ প্রসঙ্গে অপর একটি বিবেচনার বিষয় হলো, এরূপ কারবারে ব্যাংক যখন গ্রাহককে তার পক্ষ থেকে ক্রয়ের জন্য ওয়াকিল (প্রতিনিধি) বানায় এবং ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে তিনি সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয় করেন, তখন তাকে কোনোরূপ পারিশ্রমিক ছাড়াই তার কাছ থেকে এই অতিরিক্ত কাজটি করানো কতটুকু শরীয়াসম্মত হবে? যেহেতু এ কাজটি মূলত ব্যাংকের ছিল এবং উক্ত প্রতিনিধি ব্যাংকের নিকট থেকেই বিনিয়োগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। অধিকন্তু, তা থেকে যে শ্রমটুকু কোনো বিনিময় ছাড়াই গ্রহণ করা হলো, كل قرض جر نفعا-

১৯৩. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল, পৃ. ৪২-৪৩

'প্রত্যেকটি ঋণ যা মূলধনের অতিরিক্ত কিছু নিয়ে আসে তা সুদ'—এই মাপকাঠিতে এ বিষয়টি আদৌ বৈধ কি না—তাও মূল্যায়নের প্রয়োজন। তবে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিয়ে দিলে সেটি অন্য কথা।

কোনো কোনো ফকীহ বলে থাকেন, ওয়াকিলকে—সে যেই হোক না কেন—পারিশ্রমিক না দিলেও শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দোষের নয়। সেহেতু এখানে গ্রাহক ওয়াকিল বা প্রতিনিধি হলেও সেজন্য তার পারিশ্রমিক দেওয়া অত্যাবশ্যক নয়। আমরা মনে করি, সাধারণ প্রতিনিধি বা ওয়াকিল যদি পারিশ্রমিক না নিয়েই কোনো কাজ করে এবং মুওয়াক্কিলের (যিনি ওয়াকিল বানিয়েছেন) নিকট থেকে কোনো পারিশ্রমিক না দেওয়া হয় তাতে দোষের কিছু নেই—এটা ঠিক আছে, তবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে উক্ত ওয়াকিল আসলেই ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের নামে ঋণ নিচ্ছে, সেজন্য ঋণী ব্যক্তির থেকে ঋণদাতা অতিরিক্ত কোনো সুযোগ নেওয়া বৈধ নয়, সেই আলোকে বিনা পারিশ্রমিকে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকের কাজ করানো উচিত নয় বলে আমরা মনে করি।

এখানে অপর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি ব্যাংক গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তাহলে সরবরাহকারী থেকে উক্ত ক্রয়-প্রতিনিধি মাল ক্রয় করার পর ব্যাংককে তার কাছ থেকে তা বুঝে না নিলেও চলবে বলে দু-একজন ফকীহ মত দিয়েছেন। তাদের মতে, ঈজাব ও কবুল ছাড়াই বৈধ যে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি রয়েছে—যাকে بيع التعاطي (Non-bargain sale) বলে—এটি সেই লেনদেনেরই অন্তর্ভুক্ত। আসলে ক্রয়-বিক্রয় দুই প্রকার :

ক. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের মৌখিকভাবে ঈজাব ও কবুল প্রয়োজন হয় না। একজন মৌখিকভাবে হয় ঈজাব না হয় কবুল উচ্চারণ করলেই অন্যজন চুপ থাকার পরেও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়ে যায়।

খ. বিশেষ অবস্থায় মৌখিক ঈজাব-কবুল ছাড়াই এ ক্রয়-বিক্রয় সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন এক ব্যক্তি কোনো দোকানে প্রবেশ করল। সেখানে সকল পণ্যের ওপর মূল্য লেখা রয়েছে। তিনি কোনো স্পষ্ট উচ্চারণ না করে তার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো বিক্রেতার সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং লিখিত মূল্য পরিশোধ করে তা ক্রয় করে নিয়ে গেলেন। সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার ঈজাব-কবুলের কিছুই উচ্চারণ করলেন না। নিঃসন্দেহে এই দু-প্রকারের

লেনদেন بيع التعاطي-এর অন্তর্ভুক্ত, যা শরীয়তে বৈধ। তবে ব্যাংকিং মুরাবাহায় সরবরাহকারীর নিকট থেকে সরাসরি ব্যাংকের কবজ ব্যতীতই ক্রয়-প্রতিনিধি পণ্য নিজে গ্রহণ করলে তা কয়েকটি কারণে بيع التعاطي বলে গণ্য হবে না—

১. بيع التعاطي ঈজাব ও কবুলের সাথে সম্পর্কিত, যা মূলত এ ক্রয়-বিক্রয়ে মৌখিক উচ্চারিত না হলেও বাস্তবতার আলোকে ঈজাব ও কবুল সম্পন্ন হয়েছে। একপক্ষ পণ্য নিয়ে নিলো, অপর পক্ষ দিয়ে দিলো, পণ্যের মূল্যও নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং এটি যে ঈজাব-কবুল তাতে সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে ব্যাংকিং মুরাবাহায় ব্যাংক কবজ না করতে পারার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে 'ওয়াদ বিল বাঈ' (ক্রয়চুক্তি)-এর পরে মূল ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্নই হয়নি। بيع التعاطي-তে উভয় পক্ষ উপস্থিত আর এখানে একপক্ষ অনুপস্থিত; সুতরাং بيع التعاطي বলে গণ্য হবে না।

২. ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহককে বিক্রয়-প্রতিনিধি করাও বৈধ হবে না। কেননা, একই ব্যক্তি একই পণ্যের ক্রয়-প্রতিনিধি ও বিক্রয়-প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ ইসলামী শরীয়তে একই লেনদেনে দেওয়া হয়নি।

৩. পণ্য সরাসরি সরবরাহকারীর নিকট থেকে ব্যাংকের ক্রয়-প্রতিনিধির হাতে পৌঁছানোর সাথে সাথেই بيع التعاطي হওয়ার সুযোগ এজন্য নেই যে, এই পদ্ধতি সুদি পদ্ধতিরই নামান্তর। উক্ত মালে যেমন ব্যাংকের কবজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তেমনি তার ক্ষতির ঝুঁকিও তার ওপর সামান্য সময়ের জন্য হলেও বর্তায়নি। সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয় কখনও বৈধ নয়। তাহলে সুস্পষ্ট হলো যে, এ ক্রয়-বিক্রয়কে بيع التعاطي নাম দিয়ে বৈধ করার কোনো সুযোগ নেই।

গ্রাহকের জন্য চুক্তিপালন কি বাধ্যতামূলক?

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাংকিং মুরাবাহা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষ একটি ওয়াদাপত্রে স্বাক্ষর করে এবং সেখানে একটি শর্ত এই থাকে যে, বিনিয়োগকারী প্রার্থিত পণ্য নির্ধারিত সময়ে বিক্রি করবেন এবং গ্রাহক তা যথাসময়ে নির্ধারিত মুনাফা অনুপাতে ক্রয় করতে বাধ্য

থাকবেন। প্রশ্ন হলো—যেখানে এখনও পণ্য ব্যাংকের দখলে বা কবজে আসেনি, সেই অবস্থায় এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের অগ্রিম শর্তারোপ কতটা শরীয়তসম্মত?

এ বিষয়টি নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকের মতে, এই ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার অনিবার্য শর্তটি হচ্ছে, পণ্য ব্যাংকের দখলে আসার পর গ্রাহক উক্ত পণ্য নিতে বাধ্য থাকবে—এমন কোনো চুক্তি সম্পাদন না হওয়া। কারণ, এরূপ পরিস্থিতিতে গ্রাহক উক্ত পণ্য যদি ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে থাকে, তাহলে তা মূলত ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ারই নামান্তর। আর পণ্য তো সরবরাহকারীর নিকট থেকে ক্রয়ের পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দখলে পেলেও 'ওয়াদ বিশ শিরা' (ক্রয়চুক্তি)-এর সময়ে চুক্তি পালন যদি গ্রাহকের জন্য অপরিহার্য হয়ে থাকে, তাহলে ওই সময়েই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে। অথচ তখন উক্ত পণ্য ব্যাংকের দখলে আসে না। অতএব, ব্যাংক দখলে না আসা পণ্য বিক্রয় করার কারণে এই পরিস্থিতিতে শরীয়তে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়নি।[১৯৪]

তবে অধিকাংশ বিজ্ঞ আধুনিক ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, এ জাতীয় বেচাকেনায় ব্যাংক ও গ্রাহক দু-পক্ষই নিজ নিজ চুক্তি প্রতিপালনে বাধ্য থাকবে। এ জাতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—ড. সামী হাম্মূদ, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. আহমাদ আলী আস-সালূস, ড. সিদ্দীক মুহাম্মাদ আল-আমীন, ড. মুহাম্মাদ আল-বাদাভী, ড. ইবরাহীম ফাযিল আদদব্বু, শাইখ মুহাম্মাদ আলী আত-তাসখীরী, শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু উমর, শাইখ আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, শাইখ আবদুল হামিদ আস-সায়িহ, ড. মুহাম্মাদ উমর শাবিরা এবং আরও অনেকেই।[১৯৫]

আমরা মনে করি যে, ক্রয়ের ওয়াদা করার পর তা পালন করা বাধ্যতামূলক না হওয়া মর্মে অনেকের যে বক্তব্য তা গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি এরূপ কথা ইসলামের মূল আদর্শেরও পরিপন্থি। ইসলামের আলোকে প্রত্যেক মুমিনই তার প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পালন করতে নৈতিক ও আইনগতভাবে বাধ্য। যে প্রতিশ্রুতি

---

১৯৪. http://alkafeel.net/islamiclibrary

পূরণ করার বাধ্যবাধকতা নেই, তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি করার শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন কী? তা ছাড়া বেচাকেনার অগ্রিম অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং চূড়ান্তভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা এক কথা নয়। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে কুয়েতে ওআইসি ফিকহ অ্যাকাডেমির সম্মেলনে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা ও ওয়াদা পরিপালন' সম্পর্কে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে—

> কোনো পণ্যের ওপর শরীয়াসম্মত উপায়ে অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতার মালিকানা ও দখল লাভের পর 'মুরাবাহা লিল আমরি বিশ শিরা'-এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হলে তা বৈধ ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে। শর্ত হচ্ছে, অর্ডারদাতা ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের পূর্বে পণ্য নষ্ট হলে তার দায়দায়িত্ব অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। ... এখানে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা পালন দ্বীনী দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক; তবে কোনো ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।[১৯৬]

মার্চ ১৯৮৩ সালে কুয়েতে ইসলামী ব্যাংক সম্মেলনে গঠিত ফকীহদের বিশেষ কমিটি এ সম্পর্কে সুপারিশ করে যে—

> ক্রয়কৃত পণ্যের মালিকানা ও দখল লাভের পর 'মুরাবাহা লিল আমির বিশ শিরা'-এর ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পারস্পরিক ওয়াদা করা এবং উক্ত ওয়াদাপত্রে লাভে ক্রয়ের আদেশদাতার কাছে বিক্রি করা শরীয়াসম্মত হবে।...উল্লিখিত ওয়াদা গ্রাহক অথবা ব্যাংক কিংবা উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও লেনদেনে শৃঙ্খলার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। এতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা বাধ্যতামূলক করাটা শরীয়তের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য। ...[১৯৭]

তবে মুরাবাহা-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রাহক যদি বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক কোনো কারণে নিজের অঙ্গীকার থেকে সরে আসতে চায়, তবে বিষয়টি ব্যাংকের সুবিবেচনায় নেওয়া উচিত। এ অবস্থায় ব্যাংক গ্রাহককে চুক্তি

---

১৯৬. ইসলামী ফিকহ একাডেমি, পঞ্চম অধিবেশন, কুয়েত, ডিসেম্বর ১৯৮৮, সিদ্ধান্ত নং : ৪০-৪১ (৫/২ ও ৫/৩)

১৯৭. ড. আলী আহমাদ আস-সালূস, *মাওসূআতুল কাদায়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মুআছারাহ ওয়াল ইকতিসাদিল ইসলামী*, কাতার : দারুস সাকাফাহ, পৃ. ৬০১

অনুসারে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করবে না এবং ব্যাংক যদি গ্রাহক থেকে গ্যারান্টি মানি (নিরাপত্তা প্রদানমূলক অর্থ) নিয়ে থাকে, তাহলে ব্যাংক গ্যারান্টি মানি জব্দ করবে না; ফিরিয়ে দেবে। তবে এ কারবারে ব্যাংকের যদি কিছুমাত্র ক্ষতিসাধন হয়, তাহলে ব্যাংক গ্রাহক থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ নিতে পারবে; তবে তা একান্তই ক্ষতির বাস্তব পরিমাণ অনুসারে হবে; সম্ভাব্য ক্ষতির[১৯৮] পরিমাণ অনুসারে নয়।

মুনাফার হার ও সুদের হারের মধ্যে সাদৃশ্য

ইতঃপূর্বে আমরা এ কথা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছি যে, ব্যাংকিং মুরাবাহা যদি সঠিক নিয়ম অনুযায়ী করা হয়, তা বৈধ। কিন্তু বর্তমান ব্যাংকগুলো যেসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মুরাবাহা কারবারগুলো পরিচালনা করে, তা যদিও কাগজে-কলমে বা তত্ত্বগত দিক থেকে শরীয়া-বিচারে সঠিক বলা যায়, তবে পুরো ব্যাপারটা মোটেই ইসলামী অর্থনীতির আদর্শিক পদ্ধতির সাথে যায় না। যে প্রক্রিয়া ও হারে বস্তুর মুনাফা নির্ধারণ করা হয় তা অনেকটা কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোর সুদের হারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলে। যেমন, আপনি একটি গাড়ি কিনতে চান এবং এর জন্য আপনার বিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এ অবস্থায় আপনি কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোতে গেলে ব্যাংকগুলো আপনাকে সরাসরি বিশ লক্ষ টাকা লোন দেবে এবং তাদের সুদের হার অনুসারে—ধরুন—প্রতি বছরে ৬ লক্ষ টাকা করে ৫ বছরে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে বলবে। অপরদিকে আপনি ইসলামী ব্যাংকগুলোতে গেলে ব্যাংকগুলো আপনাকে বিশ লক্ষ টাকায় গাড়ি কিনে দেবে এবং তারা গাড়ির

---

১৯৮. সম্ভাব্য ও বাস্তব ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য হলো—পণ্যক্রয় বাবদ ব্যাংকের যে খরচ হয়েছে এর চেয়ে কম মূল্যে মুরাবাহা পণ্য বিক্রয় হলে সেটা বাস্তব ক্ষতি। পক্ষান্তরে সম্ভাবনামূলক ক্ষতির অর্থ হলো—পণ্যটি যথাসময়ে বিক্রি হলে এত মুনাফা হতো, এখন কাঙ্ক্ষিত মুনাফা পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংক মুরাবাহা ভিত্তিতে পণ্যটি ক্রয় করেছে এক লক্ষ টাকা দিয়ে। গ্রাহক পণ্যটি ওয়াদানুযায়ী ক্রয় না করার কারণে মার্কেটে তা বিক্রি করতে গিয়ে ব্যাংক মূল্য পেয়েছে আশি হাজার টাকা। তাহলে বিশ হাজার টাকা হলো ব্যাংকের মূল ক্ষতি। এটি ব্যাংক গ্রাহক থেকে নিতে পারবে। কিন্তু সম্ভাবনা ছিল, পণ্যটি ব্যাংক এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করবে। সুতরাং তার ক্ষতি হলো, ৪০ হাজার টাকা। এখানে বিশ হাজার টাকা হলো সম্ভাবনামূলক ক্ষতি; বাস্তব ক্ষতি নয়। সুতরাং এটি ধর্তব্য হবে না।

মূল্যের সাথে মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণ যোগ করে এভাবে সর্বমোট প্রদেয় মূল্য নির্ধারণ করবে যে, হয়তো ঠিক ৫ বছরে কিস্তিতে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা বা সামান্য কমবেশি আপনাকে পরিশোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো কোনো শরীয়া আইন লঙ্ঘন করেছে। তবে দৃশ্যত লাভের দিক দিয়ে কনভেনশনাল ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে বড়ো কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। এ কারণে সাধারণ জনমনে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সংশয় তৈরি হয়। তারা মনে করে যে, ইসলামী ব্যাংক সরাসরি হয়তো সুদ খায় না; কিন্তু ঘুরিয়ে খায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, হালাল মুনাফা নির্ধারণের জন্য সুদের হারকে ব্যবহার করা মোটের ওপর পছন্দনীয় নয় এবং এর দ্বারা এ লেনদেন ন্যূনপক্ষে বাহ্যিকভাবে হলেও সুদি ঋণের সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর সুদ কঠোরভাবে হারাম হওয়ার দাবি হলো, এই বাহ্যিক সাদৃশ্য থেকেও যথাসম্ভব বেঁচে থাকা উচিত। শরীয়তের একটি স্বীকৃত মূলনীতি হলো—'সন্দেহসূচক ও অভিযোগ আরোপের ক্ষেত্রগুলো' (مواطن الشبهات والريبة|التهمة) থেকে বেঁচে থাকা, দূরে থাকা। এখানে সন্দেহসূচক ও অভিযোগ আরোপের ক্ষেত্রগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সন্দেহ ও অভিযোগের জায়গায় উপনীত করে, ফলে লোকেরা তার সম্পর্কে নানান বাজে ধারণা পোষণ করতে থাকে এবং তার প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। এ ক্ষেত্রগুলো এমন, যা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে এ মর্মে সন্দেহ তৈরি করে যে, সে কি সত্য না মিথ্যা, ভুল নাকি সঠিক। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ-"যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে আপতিত করে তা ত্যাগ করে এমন বিষয় ইখতিয়ার করো, যা তোমাকে সন্দেহে আপতিত করে না।"[১৯৯] এর কারণ হলো, এমন কিছু বিষয় থাকে, যা মানুষ হয়তো ভালো নিয়তেই এবং সৎ উদ্দেশ্যেই করে; কিন্তু কার্যত তা জনমনে নানারূপ সন্দেহ তৈরি করতে পারে এবং বিভিন্ন অভিযোগ আরোপের কারণ হতে পারে, এমনকি যদি তা সঠিকও হয়। এ অবস্থায় একজন বিবেকবান ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, এ জাতীয় বিষয়গুলো পারতপক্ষে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা। তার জন্য এটা কোনোক্রমেই উচিত নয় যে, সে নিজের

---

১৯৯. তিরমিযী, *আস সুনান*, হা. নং : ২৫১৮; ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ভালো নিয়ত ও সৎ উদ্দেশ্যের ওপর একান্ত আস্থাশীল হয়ে এ জাতীয় বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতসমূহ অবমূল্যায়ন করবে, কোনোরূপ গুরুত্ব দেবে না। এসব প্রেক্ষিত ইতিবাচকভাবে বিবেচনায় নেওয়ার ফলে একদিকে সে নিজেও সন্দেহ ও অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, অপরদিকে অন্যরাও কোনোরূপ খারাপ ধারণা পোষণ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা থেকে রক্ষা পেলো। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً جَبَّ الْغِيبَةَ عَنْ نَفْسِهِ- "আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে নিজের থেকে গীবত বন্ধ করে দেয়।"[২০০] অর্থাৎ, সে গীবতের উপলক্ষ্যগুলো বন্ধ করে দেয় এবং সন্দেহ ও অযাচিত ধারণা পোষণের ক্ষেত্রগুলো থেকে নিজেকে দূরে রেখে গীবতের পথগুলো রুদ্ধ করে দেয়।

সুতরাং, শরীয়তের এ স্বীকৃত সূত্র অনুসারে মুরাবাহা কারবারে পণ্যের এভাবে মুনাফার হার নির্ধারণ করা উচিত, যাতে সাধারণ জনমনে এ হার নিয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন দেখা না দেয়, সংশয় তৈরি না হয়। এতদুদ্দেশ্যে পণ্যের মুনাফার হার নির্ধারণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এ হার সুদের হারের সাথে কোনোরূপ মিলে যাচ্ছে কি না, মুনাফার এ হার বাস্তবসম্মত ও ন্যায়সংগত কি না, বাজারে প্রচলিত মুনাফার হারের বৃদ্ধির সাথে মিল আছে কি না .. প্রভৃতি।

উদাহরণস্বরূপ, একটা পণ্যের বর্তমান বাজার মূল্য এক লক্ষ টাকা। ধরুন, ৫ বছরে মুদ্রাস্ফীতিসহ নানা কারণে স্বাভাবিকভাবে এর বাজার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং ব্যাংক এক লক্ষ টাকায় পণ্যটি ক্রয় করে এর ওপর বিশ হাজার টাকা মুনাফা যোগ করে মোট এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় যদি গ্রাহককে বিক্রি করে এবং এজন্য তাকে ৫ বছরে কিস্তিতে মূল্য আদায়ের সুবিধা দেয়, তবেই তা বাস্তব ও ন্যায়সংগত হবে। আর যদি ব্যাংক একই সময়ের জন্য এক লক্ষ টাকার ওপর বিশ হাজার টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুনাফা যোগ করে মোট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করে, তবে তা হবে অন্যায্য ও অবাস্তব, যদিও তা নীতিগতভাবে সঠিক এবং শরীয়া-আইনসম্মত।

---

২০০. সাফারীনী, *গিযাউল আলবাব...*, খ. ২, পৃ. ৩১৭; আজালুনী, *কাশফুল খফা..*, খ. ১, পৃ. ৪২৬, হা. নং : ১৩৬৭

মোটকথা, মুরাবাহা যদি শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং এর অপরিহার্য শর্তসমূহও পূরণ করা হয়, তাহলে কেবল মুনাফার হারকে প্রচলিত সুদের হারের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে কিংবা উচ্চ হার নির্ধারণ করার কারণে মোটের ওপর এ কারবারকে নাজায়িয বলা যাবে না। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য যত দ্রুত সম্ভব এরূপ পদ্ধতির অনুসরণ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। কেননা, প্রথমত এতে সুদের হারকে বৈধ ব্যাবসার জন্য আদর্শ ও মানদণ্ড মনে করা হচ্ছে, যা একান্তই অপছন্দনীয়। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়।

বিলম্বে মূল্য পরিশোধের জন্য ক্ষতিপূরণ গ্রহণ

শরীয়তের বিধান হলো—দেনাদার যদি তার অনিচ্ছাবশত এবং একান্তই অপারগতার কারণে যথাসময়ে দেনা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়; তাহলে এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে দেনা আদায়ের ব্যাপারে অবশ্যই অবকাশ দিতে হয়। এ ব্যাপারে আল কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ -"সে (ঋণী ব্যক্তি) যদি একান্ত অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতা ফিরে পাওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে।"[২০১]

এ নির্দেশনা অনুসারে মুরাবাহা কারবারে গ্রাহক যদি সময়মতো মূল্য পরিশোধ না করে বিলম্ব করে, তাহলে চুক্তির সময় নির্ধারিত মূল্যের ওপর অতিরিক্ত কিছু নিতে পারে না। সুদভিত্তিক ঋণে অনাদায়ের সময়ানুযায়ী দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে; কিন্তু মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে মূল্য একবার মাত্র নির্ধারণ করা যায়, এরপর আর অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করা যায় না। কিন্তু কার্যত আমরা দেখতে পাই, কোনো গ্রাহক যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য ব্যাংককে পরিশোধ করতে না পারে, তবে ব্যাংক গ্রাহকের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে বা পরিমাণে জরিমানা/ক্ষতিপূরণ আরোপ করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো—এ জরিমানা/ক্ষতিপূরণ আদায় করা কতটুকু শরীয়াসম্মত? এ ধরনের জরিমানা/ক্ষতিপূরণ আরোপকে অনেকেই প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের সুদের সাথে তুলনা করেন। আশির দশকেও মধ্যপ্রাচ্যের শরীয়া স্কলারগণ এই ধরনের জরিমানা/ক্ষতিপূরণ আরোপের বিরোধী ছিলেন। তারা যখন দেখলেন

---

২০১. আল কুরআন, ২ (সূরা আল বাকারা) : ২৮০

যে, গ্রাহকের ঠিকই দায় পরিশোধ করার এত সম্পদ রয়েছে; কিন্তু যেকোনো কারণে সে এ দায় পরিশোধ করতে টালবাহানা করছে, তখন তারা বাস্তবতা উপলব্ধি করেন এবং জরিমানা/ক্ষতিপূরণে আরোপের পক্ষে মত দেন এবং জরিমানা/ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায়কৃত অর্থ সরাসরি বিভিন্ন সেবামূলক খাতে খরচ করতে বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আওফি শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে—

> ঋণচুক্তিতে (যেমন—মুরাবাহা) ঋণখেলাপির ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ওপর অতিরিক্ত অর্থ বা শতকরা হারে অর্থ পরিশোধের শর্ত আরোপ করা বৈধ এই শর্তে যে, শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে উক্ত অর্থ কোনো দাতব্য খাতে ব্যয় করা হবে।[২০২]

এটা একটি বড়ো জটিল বিষয় যে, মুরাবাহা কারবারে অনেক বদদ্বীন গ্রাহক জেনেশুনে সময়মতো মূল্য পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ, তারা জানে যে, সময়মতো মূল্য পরিশোধ না করার কারণে তাদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে না।

এ সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমান যুগের কোনো কোনো আলিম এই প্রস্তাব পেশ করেন, যে গ্রাহক জেনেশুনে স্বেচ্ছায় মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে যে, তার সময়মতো মূল্য পরিশোধ না করার কারণে ব্যাংকের যে পরিমাণ লোকসান হবে তার বিনিময়স্বরূপ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। এসব আলিম মনে করেন, এ ক্ষতিপূরণ সেই মুনাফার সমানও হতে পারে, যা এই সময়ে ব্যাংক তার আমানতকারীদেরকে প্রদান করেছে। যেমন ঋণখেলাপি ব্যক্তি নির্ধারিত সময় থেকে তিন মাস বিলম্ব করে মূল্য পরিশোধ করেছে, এই তিন মাসে ব্যাংক যদি তার আমানতকারীদের ১০% হিসেবে মুনাফা প্রদান করে থাকে, তাহলে এই ঋণখেলাপি ব্যক্তিকেও মূল ঋণের অতিরিক্ত ১০% ব্যাংকের লোকসান হিসেবে প্রদান করতে হবে। যারা এ বিনিময়কে জায়িয বলেছেন, তারা কয়েকটি শর্তারোপ করেছেন।

১. পরিশোধের সময় আসার পর ঋণখেলাপিকে কমপক্ষে অতিরিক্ত আরও এক মাসের সুযোগ প্রদান করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে তাকে সতর্ক করে এ মর্মে নোটিশ পাঠাতে হবে যে, সে যেন মূল্য পরিশোধ করে, অন্যথায় তাকে লোকসানের বিনিময় পরিশোধ করতে হবে।

---

২০২. আওফি, *শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড*, পৃ. ৩২

২. নিঃসন্দেহে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব এবং টালবাহানা যুক্তিসংগত কোনো ওজর-আপত্তি ব্যতীত করতে হবে। যদি এ কথা স্পষ্ট হয় যে, সে ব্যক্তি দারিদ্র্যের কারণে বিলম্ব করছে, তাহলে তার কাছ থেকে কোনোরূপ বিনিময় নেওয়া যাবে না। বস্তুত যতদিন পর্যন্ত সে মূল্য পরিশোধে সক্ষম না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে সুযোগ প্রদান করা জরুরি।

৩. এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ কেবল সেসময় জায়িয, যখন ইসলামী ব্যাংকে পুঁজি বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টে কিছু মুনাফা অর্জিত হবে, যা আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। যদি পুঁজি বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টে এ সময় কোনো মুনাফা অর্জিত না হয়, তাহলে গ্রাহক থেকেও কোনো রকম বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিম এরূপ বিনিময় গ্রহণকে সমর্থন করেননি। তাদের কথা হলো, এ প্রস্তাব শরীয়তের নীতিমালার সাথেও সামঞ্জস্য রাখে না এবং ঋণখেলাপির সমস্যাকে সমাধান করার যোগ্যতা রাখে না। আমরাও তা-ই মনে করি।

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো—ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত যেকোনো অর্থ নেওয়া হবে তা সুদ হবে। জাহিলী যুগে ঋণগ্রহীতা যখন নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হতো, তখন ঋণদাতা তার থেকে সাধারণত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করত।[২০৩] বিনিময় আদায়ের উল্লিখিত প্রস্তাব এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে যে, উল্লিখিত প্রস্তাব জাহিলী যুগের ওই নিয়মনীতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। কেননা, ক্ষতিপূরণ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত এক মাসের সুযোগ প্রদান করা হয়, যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে কোনো যুক্তিসংগত ওজর ব্যতীত পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করছে এবং যাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিশোধ না করার কারণ দারিদ্র্য অথবা অন্য কোনো জটিলতা, সে ক্ষেত্রে তার থেকে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে না। কিন্তু এ ধারণাকে কার্যকর করার সময় সেসব শর্ত পূরণ করা জটিল ব্যাপার। কেননা, সকল ঋণগ্রহীতাই এ দাবি করবে যে, তার পক্ষ থেকে সময়মতো পরিশোধ না করার কারণ তার আর্থিক অক্ষমতা। কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা

সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করা এবং এ কথার সত্যায়ন করা যে, পরিশোধ করার ব্যাপারে সে অক্ষম কি না—তা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। সাধারণত ব্যাংক এটাই মনে করে যে, প্রত্যেক গ্রাহকই পরিশোধে সক্ষম। কিন্তু তাকে যদি দেউলিয়া ঘোষণা করে দেওয়া হয়, তাহলেই তাকে অক্ষম মনে করা হবে। অর্থাৎ, উল্লিখিত প্রস্তাবে যে সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া হয়েছে তা থেকে কেবল দেউলিয়া ঘোষিত লোকেরাই উপকৃত হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেউলিয়ার অস্তিত্ব অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ। এমন বিরল ঘটনায় সাধারণ সুদি ব্যাংকও ঋণগ্রহীতা থেকে সুদ গ্রহণ করে না। এ কারণে এ প্রস্তাব অনুযায়ী সুদি অর্থায়ন এবং ইসলামী অর্থায়নের মাঝে কোনো প্রায়োগিক এবং উদ্দেশ্যগত পার্থক্য থাকে না। অপরদিকে অতিরিক্ত সময়ের যে বিষয়টি তা তো সাধারণ সুযোগ, যা কোনো কোনো সময় আধুনিক ব্যাংকের পক্ষ থেকেও দেওয়া হয়। পুনরায় একই কথা, সুদ এবং বিলম্বে পরিশোধের ওপর আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাঝে বাস্তবিক পক্ষে কোনো পার্থক্য নেই।

মূলত ব্যাংকের মুনাফার সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ করা অর্থের প্রত্যাশিত মুনাফার[২০৪] ধারণার ওপর ভিত্তিশীল। এরূপ ধারণা শরীয়তের নীতিমালার সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখে না। ইসলাম সম্ভাব্য মুনাফার এ ধারণাকে সমর্থন করে না। কেননা, অর্থনীতি থেকে সুদের পরিসমাপ্তির পর অর্থের কোনো নির্দিষ্ট মুনাফা অবশিষ্ট থাকে না। এতে যেখানে মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে, সেখানে লোকসানের আশঙ্কাও রয়েছে। লোকসানের এ ঝুঁকিই তাকে মুনাফা অর্জনে সক্ষম করে তুলে।[২০৫]

এসব কারণেই বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিমই ঋণখেলাপি ব্যক্তি থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেননি। ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমি, জেদ্দার বার্ষিক সেমিনারেও এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সেখানেও এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের বিনিময় গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।[২০৬]

---

২০৪. প্রত্যাশিত মুনাফা : অন্যত্র বিনিয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করার কারণে যে সম্ভাব্য মুনাফা হারানো হয়।

২০৫. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*.., পৃ. ১২৭- ১৩০

২০৬. সিদ্ধান্ত নং : ৫৩, পঞ্চম বার্ষিক সেমিনার, পত্রিকা নং-৬, খ. ১, পৃ. ৪৪৭

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হিসেবে মুফতী তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহু একটি বিকল্প চিন্তা পেশ করেছেন। তা হলো—

প্রথমত, অসৎ লোকেরা যাতে ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে কোনোরূপ টালবাহানা করতে না পারে এবং যথাসময় ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়, সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা, যার দ্বারা ঋণখেলাপি ব্যক্তিকে এই শাস্তি দেওয়া যায় যে, সে ভবিষ্যতে যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সকল আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অথবা ব্যাংকগুলো এরূপ গ্রাহকদের কালো তালিকাভুক্ত করবে এবং সকল ব্যাংক এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, তারা কালো তালিকাভুক্ত কোনো গ্রাহকের সাথে লেনদেন করবে না।

দ্বিতীয়ত, যতদিন পর্যন্ত এরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত একটি বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি হলো—মুরাবাহা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির সময় গ্রাহক এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সময়মতো পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে সে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি জনকল্যাণমূলক ফান্ডে একটি নির্দিষ্ট অর্থের ফান্ড প্রদান করবে। টাকার পরিমাণ ঋণের শতকরা হারের ভিত্তিতেও নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং কমবেশি যেকোনো হার ধার্য করা যেতে পারে। সুতরাং হার বেশি ধার্য করা হলে ঋণগ্রহীতার ঋণের ওপর বর্ধিত টাকার চাপ বাড়বে। ফলে ঋণ যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে তা যথেষ্ট সহায়ক প্রমাণিত হবে।

অবশ্যই এ প্রসঙ্গে এ নিশ্চয়তা প্রদান করা অপরিহার্য যে, এ অর্থের কোনো একটি অংশ ও ব্যাংকের আয়ের অংশ হবে না। ব্যাংক এ উদ্দেশ্যে একটি জনকল্যাণমূলক ফান্ড গঠন করবে এবং এ ফান্ডে অর্জিত অর্থ শরীয়ত অনুযায়ী একমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করবে। ব্যাংক এ কল্যাণ ফান্ড থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিনা সুদে ঋণও প্রদান করতে পারে।

এ প্রস্তাবটি মালিকী মাযহাবে বর্ণিত একটি ফিকহী বিধানের ওপর ভিত্তিশীল। তাদের কারও কারও মতে—যদি ঋণগ্রহীতা থেকে এ দাবি করা হয় যে, সে সময়মতো পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করবে, তাহলে এ পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয হবে। কেননা, এটা সুদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু ঋণদাতাকে সময়মতো ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানের

জন্য ঋণগ্রহীতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে—সে সময়মতো পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে কিছু অর্থ দান হিসেবে প্রদান করবে। এটা মূলত একধরনের হলফ (কসম), যা কোনো ব্যক্তির স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে নিজের কাঁধে আরোপিত একটি শাস্তি, যাতে সে নিজেকে ঋণখেলাপি হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। সাধারণ অবস্থায় এ ধরনের কসম দ্বারা নৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পিত হয়; কিন্তু তাদের কারও কারও নিকট তাকে বিচারের দৃষ্টিতেও অপরিহার্য বলা যায়[২০৭] এবং কুরআন-হাদীসেও এমন কোনো কথা নেই যে, এ ধরনের কসমকে আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে।

কাজেই যেখানে বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজন হবে, সেখানে এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু এ প্রস্তাবের ওপর আমল করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখতে হবে—

১. এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কেবল ঋণগ্রহীতার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে করে সে তার দায়িত্ব আদায় করে। এর উদ্দেশ্য ঋণদাতা/অর্থায়নকারীর আয়-উপার্জনে প্রবৃদ্ধি ঘটানো কিংবা তার থেকে প্রত্যাশিত মুনাফার ক্ষতিপূরণ আদায় করা নয়। এজন্য এ কথা নিশ্চিত করতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই এ জরিমানার কোনো একটি অংশও ব্যাংকের আয়ের অংশ হবে না, ব্যাংক নিজের লাভের জন্য (যেমন—বিজ্ঞাপন) খরচ করতে পারবে না, এর দ্বারা ট্যাক্সও আদায় করা যাবে না এবং এগুলোকে অর্থায়নকারীর কোনো দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যাবে না।

২. ব্যাংক তার আয় হিসেবে যেহেতু জরিমানার এ টাকার মালিক হয় না; বরং তা জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে, সেজন্য এ টাকার পরিমাণ এমন হতে পারে, যে পরিমাণ ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে। তা বার্ষিক শতকরা হিসাবেও নির্ধারিত হতে পারে।

৩. এ জরিমানা যেহেতু মূলত গ্রাহকের নিজের পক্ষ থেকে নিজের ওপর আরোপিত কসমবিশেষ; এমন জরিমানা নয় যে, যা অর্থায়নকারীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এজন্য চুক্তিতে এ চিন্তাভাবনার প্রতিফলন হওয়া উচিত। এ কারণে জরিমানা-সংশ্লিষ্ট ধারার কিছু বাক্য এরূপ হতে পারে—

---

২০৭. হাত্তাব, *তাহরীরুল কালাম ফী মাসায়িলিল ইলতিযাম*, বৈরুত, ১৪০৪ হি., পৃ. ১৭৬

"গ্রাহক এ মর্মে দায়িত্ব গ্রহণ করছে যে, সে যদি এ চুক্তির আলোকে পরিশোধযোগ্য অর্থের কোনো অংশ যথাসময়ে আদায় না করে, তাহলে সে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জনকল্যাণমূলক অ্যাকাউন্টে/ফান্ডে এত টাকা দান করবে, যার হিসাব অনাদায়ের প্রতিদিনের বিনিময়ে বার্ষিক ...% ভিত্তিতে করা হবে। কিন্তু সে যদি ব্যাংক/অর্থায়নকারীর নিকট বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষী দ্বারা এ কথা প্রমাণ করে দেয় যে, অনাদায়ের কারণ দারিদ্র্য কিংবা তার একান্ত অক্ষমতা ও অপারগতা ছিল, তবে সে এ দেনা থেকে রেহাই পাবে।"

৪. যেহেতু এটা কল্যাণমূলক কাজের কসমবিশেষ, তাই মূলত সেই নির্দিষ্ট অর্থ স্বয়ং গ্রাহক নিজের মনমতো কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাও জায়িয ছিল; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে যে এই অর্থ পরিশোধ করবে—এ কথা নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে কল্যাণ ফান্ড/অ্যাকাউন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। এরূপ নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা শরীয়তের কোনো উসূলের পরিপন্থি নয়। কিন্তু এ কথা অপরিহার্য যে, ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এতদুদ্দেশ্যে একটি ফান্ড অথবা কমপক্ষে একটি পৃথক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা করবে এবং তাতে সংগৃহীত অর্থ গ্রাহক/ঋণগ্রহীতার অবগতিক্রমে শরীয়াসম্মত কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হতে হবে।[২০৮]

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অপরিশোধিত অর্থের ওপর অতিরিক্ত আদায়ের ক্ষেত্রে দু-ধরনের প্র্যাকটিস বিদ্যমান :

ক. অতিরিক্ত হিসেবে আদায়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ জরিমানা হিসেবে নিয়ে তা সেবামূলক খাতে দিয়ে দেয় অনেক ব্যাংক।

খ. আবার অনেক ব্যাংক (যেমন—মালয়েশিয়াতে) অতিরিক্ত হিসেবে আদায়কৃত অর্থকে দুইটি অংশে ভাগ করে—এক অংশ ক্ষতিপূরণ (তাভীদ/কম্পনসেশন) হিসেবে এবং অপর অংশ জরিমানা (গরামাহ) হিসেবে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায়কৃত অংশ ইসলামিক ব্যাংকের আয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং জরিমানার অর্থ সরাসরি সেবামূলক খাতে দিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শরীয়া

---

২০৮. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ১৩৩-১৩৬

নিয়মকানুন পালন করতে হয় (যেমন, গ্রাহক বকেয়া পরিশোধ করতে না পারার ফলে ব্যাংকের যে অ্যাকচুয়াল কস্ট বা লস হয়েছে তার বেশি হতে পারবে না, মালয়েশিয়াতে অনাদায়ী দায়ের ১% বেশি হতে পারবে না, চক্রবৃদ্ধি হারে হতে পারবে না, .. ইত্যাদি)। সম্প্রতি বাংলাদেশেও প্রায়ই এ নীতি অনুশীলন করা হচ্ছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এ প্র্যাকটিসের ব্যাপারে অধিকাংশ আলিমের আপত্তি রয়েছে।

শরীয়া অডিটররা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন, বকেয়ার ওপর অতিরিক্ত হিসেবে আদায় করা কোনো অর্থ ইসলামিক ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না, করলে তার সপক্ষে কোনো শরীয়া জাস্টিফিকেশন আছে কি না, জরিমানার অর্থ যথাযথভাবে সেবামূলক খাতে ব্যয় করা হয়েছে কি না এবং জরিমানার অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এডভার্টাইজ করা হয়েছে কি না।

উল্লেখ্য, সময়মতো বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে যদি সত্যিকার অর্থেই গ্রাহকের আর্থিক অক্ষমতা বা জটিলতা থাকে, তাহলে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোর বকেয়া আদায়ে নমনীয় হওয়া জরুরি, যেমন—কোনো জরিমানা আরোপ না করা, বকেয়া পরিশোধে বর্ধিত সময় দেওয়া এবং অতীব প্রয়োজনে বকেয়া আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেওয়া ইত্যাদি। বাস্তবে কীভাবে এই ধরনের মেকানিজম এপ্লাই করা যায়—তা নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা আছে এবং কেস বাই কেস কিছু উদাহরণও আছে। ইসলামিক ব্যাংকের যাকাত এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কি না—সে নিয়েও আলোচনা আছে। ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের সত্যিকার স্পিরিট বজায় রাখার জন্য এ বিষয়ে আরও আলোচনা, গবেষণা এবং প্রচেষ্টা জরুরি।

রোলওভার পদ্ধতির অনুসরণ

অর্থবিজ্ঞানে রোলওভার (Rollover)-এর মানে হলো—অর্থ এক বিনিয়োগ থেকে অন্য বিনিয়োগে স্থানান্তরিত করা; কোনো দেনা বা ঋণ পূর্বসম্মত সময়ের চেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য চলতে দেওয়া।[২০৯] এ ব্যবস্থাকে দেনা বা ঋণ পরিশোধ করার একটি কার্যকর উপায় বলা হয়।

---

২০৯. https://dictionary.cambridge.org/bn/dictionary/english/rollover

সুদভিত্তিক অর্থায়নে কোনো ব্যাংকের গ্রাহক যদি কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে সে ব্যাংকের নিকট তার ঋণের ব্যাপারে আরেকটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নবায়নের জন্য আবেদন করে। ব্যাংক যদি তার সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে সুদকে আসলের সঙ্গে মিলিয়ে তার ওপর পরবর্তী মেয়াদের সুদ হিসাব করে থাকে। পরিভাষায় এটি 'রোলওভার' হিসেবে অভিহিত। কার্যত এর অর্থ এই যে, ততটুকু পরিমাণে একটি নতুন ঋণ (নতুন করে সুদের হারে) ঋণগ্রহীতাকে পুনর্বার প্রদান করা হয়েছে। মুরাবাহা কারবারে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য এরূপ রোল ওভারের কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যারা মুরাবাহা পদ্ধতিকে ভালো করে বোঝে না এবং একে সুদি লেনদেনের মতো কেবল একটি অর্থায়ন-পদ্ধতি মনে করে, তারা রোলওভারের পদ্ধতিকে মুরাবাহায়ও ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। গ্রাহক যদি তাদের কাছে মুরাবাহায় মূল্য পরিশোধের তারিখ নবায়নের আবেদন করে, এসব ব্যাংক ওইসব মুরাবাহাকে রোলওভার করে অতিরিক্ত মুনাফার শর্তের সাথে পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দেয়। কার্যত এর অর্থ এই যে, সেই পণ্যে আরেকটি মুরাবাহা সংঘটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, ব্যাংক সেই একই জিনিস গ্রাহকের কাছে নতুন মুনাফার ভিত্তিতে বিক্রি করে দিয়েছে। এ নীতি শরীয়াসম্মত উসূলের পরিপন্থি।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুরাবাহা কোনো ঋণ নয়; বরং একটি পণ্যের বিক্রি, যার মূল্য পরিশোধ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করে দেওয়া হয়েছে। যখন একবার এ পণ্য বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তখন এর মালিকানা গ্রাহকের কাছে অর্পিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর বিক্রেতার (ব্যাংকের) মালিকানা নেই। বিক্রেতা আইনগতভাবে কেবল মূল্যের দাবি করতে পারে, যা ক্রেতার দায়িত্বে পরিশোধযোগ্য 'ঋণ'। এ কারণে পূর্বের ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে একই বস্তুকে পুনর্বার বিক্রির প্রশ্নই উঠতে পারে না। রোলওভার নির্ভেজাল সুদ। কেননা, এটা মুরাবাহা বিক্রি থেকে সৃষ্ট ঋণের ওপর অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার চুক্তি।[২১০]

---

২১০. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ১৩৬-১৩৭

ইবরা বা রেয়াত সুযোগ

'ইবরা' (إبراء) আরবী শব্দ। এর মূল অর্থ অব্যাহতি দান, মুক্তকরণ, রেয়াত দান, Rebate। পরিভাষায় কাউকে ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি দানকে 'ইবরা' বলা হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ে, বিশেষ করে মুরাবাহা পদ্ধতির কোনো বিনিয়োগ গ্রাহক নির্ধারিত মেয়াদের আগে বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধ করলে তাকে মুনাফা থেকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়টি বিশেষভাবে 'ইবরা' নামে পরিচিত। একে 'রেয়াত'-ও বলা হয়।

ব্যাংকের ম্যানুয়ালগুলোতে সাধারণত এ কথা লেখা থাকে যে, গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে দিলে তাকে রেয়াত প্রদান করা যাবে। এ কারণে অনেক সময় বিনিয়োগগ্রাহকগণ বাকি মূল্যে কিছুটা হ্রাস পাওয়ার উদ্দেশ্যে চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে থাকেন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ রেয়াত দেওয়ার অনুমতি আছে কি না—তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। ফিকহের গ্রন্থাবলিতে এ বিষয়টি ضع وتعجل-'ঋণের পরিমাণ হ্রাস করো এবং দ্রুত উসুল করো' শিরোনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কোনো কোনো ফকীহ এরূপ ব্যবস্থাকে জায়িয বলেছেন। তবে চার ইমামসহ অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামের দৃষ্টিতে—যদি সময়ের পূর্বে পরিশোধের জন্য এই হ্রাসকে শর্ত হিসেবে আরোপ করে, তবে জায়িয নেই।

যেসব ফকীহের দৃষ্টিতে বিষয়টি জায়িয, তাদের মতের ভিত্তি হলো—সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের ওপর। হাদীসটি হলো—যখন বনূ নদীরের ইহুদীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বহিষ্কার করা হলো, তখন কিছুসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আপনি তো তাদেরকে দেশান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু কিছু লোকের নিকট ওই ইহুদীদের ঋণ রয়েছে, যা পরিশোধের তারিখ এখনও আসেনি। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. সেই ইহুদীদের লক্ষ করে বললেন, ضعوا وتعجلوا-"ঋণের পরিমাণ হ্রাস করো এবং দ্রুত উসুল করো।"[২১১]

---

২১১. দারাকুতনী, *আস সুনান*, অধ্যায় : আল বুয়ূ, হা. নং : ১৯০; বাইহাকী, *আস সুনানুল কুবরা*, হা. নং : ১০৯২০

অধিকাংশ ফকীহ এ হাদীসটিকে সঠিক বলে সমর্থন করেননি। হাদীসের বর্ণনাকারী স্বয়ং ইমাম বাইহাকী রাহ. হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, এটি একটি যঈফ (দুর্বল) হাদীস। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, হাদীসটি সহীহ, তাহলেও বনূ নদীরের দেশান্তর হিজরতের দ্বিতীয় বছর সংঘটিত হয়েছে। অথচ তখনও সুদের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হয়নি। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ওয়াকিদী রাহ. লিখেছেন, বনূ নদীর সুদি ঋণ প্রদান করত। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. যে ব্যবস্থার অনুমতি দিয়েছিলেন তা এই ছিল যে, ঋণদাতা সুদ ছেড়ে দেবে এবং ঋণগ্রহীতা মূল পুঁজি জলদি আদায় করবে।

ওয়াকিদী রাহ. বর্ণনা করেছেন, বনূ নদীরের জনৈক ইহুদী সাল্লাম ইবন আবিল হুকাইক সাহাবী উসাইদ ইবনু হুদাইর রা.-কে ৮০ দীনার দিয়েছিল, যা এক বছর পর অতিরিক্ত ৪০ দীনার পরিশোধ করতে হবে। এভাবে উসাইদ রা.-এর ওপর মোট ১২০ দীনার পরিশোধ করার দায়িত্ব ছিল। এ ব্যবস্থার পর উসাইদ রা. সাল্লামকে মূল পুঁজি অর্থাৎ ৮০ দীনার পরিশোধ করে দেন এবং এভাবে তিনি অবশিষ্ট পাওনা থেকে দায়মুক্তি লাভ করেন।[২১২]

এসব কারণে অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হলো, যদি সময়ের পূর্বে পরিশোধ করাকে ঋণ হ্রাস করার শর্ত হিসেবে আরোপ করা হয়, তাহলে এটা জায়িয নেই। তবে জলদি পরিশোধের জন্য এ শর্তারোপ না করা হয় এবং ঋণদাতা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে রেয়াত দেয়, তাহলে জায়িয আছে। এ অভিমতকে ইসলামী ফিকহ অ্যাকাডেমি তাদের বার্ষিক সেমিনারে গ্রহণ করেছে।[২১৩]

এর ব্যাখ্যা হলো—একটি ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক মুরাবাহার চুক্তিতে এ ধরনের রেয়াত চুক্তির সময় করা যাবে না এবং গ্রাহকও তার প্রাপ্য হিসেবে তা দাবি করতে পারবে না। তবে ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি তাদের সম্মতিক্রমে এ ধরনের সুযোগ দিয়ে দেয়, তাহলে এটাও প্রশ্নযোগ্য নয়, বিশেষ করে গ্রাহক যখন অভাবগ্রস্ত হবে।[২১৪]

আধুনিক ফকীহগণ এ ধরনের রেয়াত বা 'ইবরা' বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটিও দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন।

---

২১২. ওয়াকিদী, *আল মাগাযী*, খ. ১, পৃ. ৩৭৪

২১৩. সিদ্ধান্ত নং : ৬৬, ৬ষ্ঠ সেমিনার, পত্রিকা নং : ৭, খ. ১, পৃ. ২১৭

২১৪. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ১৩৮-১৩৯

সাইয়িদুনা কাব ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে আবদুল্লাহ ইবনু আবী হাদরাদ আল আসলামী রা. নামক এক ব্যক্তির কাছে তাঁর পাওনা ছিল। একদিন তিনি তাঁর দেনাদারের দেখা পেয়ে মসজিদের ভেতর পাওনা পরিশোধের তাগাদা দিলেন। এমতাবস্থায় তাদের কথা কাটাকাটিতে হইচই বেধে গেল। তাদের হইচই শুনে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর হুজরার পর্দা ফাঁক করলেন এবং তাদের কাছে গিয়ে কাব রা.-কে ডেকে বললেন, 'হে কাব।' কাব রা. উত্তরে বললেন, 'জী, আমি হাজির, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তখন রাসূলুল্লাহ সা. হাতের ইশারায় তাকে অংশবিশেষ ছেড়ে দিতে বললে কাব রা. বললেন, 'ছেড়ে দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' এরপর রাসূলুল্লাহ সা. দেনাদার ইবনু হাদরাদ রা.-কে বাকি অর্ধেক দেনা পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন।[২১৫]

ব্যাংকিং মুরাবাহা-সংক্রান্ত ব্যাংকের কাগজপত্র : শারয়ী পর্যালোচনা

কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের মুরাবাহা-বিষয়ক ডকুমেন্ট ও কাগজপত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো শরীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার দাবি রাখে।[২১৬] যেমন—

এক. ক্ষতিপূরণ : বাই মুরাবাহা ভিত্তিতে মালামাল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন এলে তার নীতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে—

> ক্ষতিপূরণ : নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উল্লিখিত বিক্রয়মূল্যসহ ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক মেয়াদোত্তীর্ণ সময়ের জন্য স্থিরকৃত মুনাফার হারে ক্ষতিপূরণ/ জরিমানা আরোপ করতে পারবে, যা আপনাকে/আপনাদেরকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

এ নীতিটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শরীয়তের বিধান হলো—বিক্রয়মূল্যটা মূলত গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের পাওনা/ঋণ। কোনো ঋণ যথাসময়ে আদায়ে বিলম্ব করলে এ কারণে কোনো ধরনের

---

২১৫. বুখারী, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আস সুলহ, হা. নং : ৪৪৫; মুসলিম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাকাত, হা. নং : ৪০৬৭

২১৬. বিশেষ বিবেচনায় এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো ইসলামী ব্যাংকের নাম নেওয়া হয়নি। এর প্রয়োজনও নেই। কারণ, সবকটি ইসলামী ব্যাংকের কাগজপত্র প্রায় কাছাকাছি।

Financial Compensation বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়া বৈধ নয়। চাই তা পূর্বে চুক্তিতে উল্লেখ হোক বা না হোক। কারণ, তা ঋণের ওপর অতিরিক্ত গ্রহণের নামান্তর, যা সুদ। কোনো সুদ শর্ত করেও নেওয়া বৈধ নয়। আন্তর্জাতিক শরীয়া বোর্ডে AAOIFI-এর তিন নং শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড Default in payment by a Debtor (ঋণখেলাপি)-এর ধারা ২-এর ২/১-এ লেখা আছে—

> لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقداً أو عيناً، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.

> ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যথাসময়ে ঋণ আদায়ে বিলম্ব করলে এ কারণে কোনো ধরনের আর্থিক জরিমানা প্রদানের শর্তারোপ বৈধ নয়। চাই সেটা নগদ টাকায় হোক বা বস্তুতে হোক। একেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ বলা হয়। তদ্রূপ সম্ভাব্য মুনাফা না হওয়ার কারণে অথবা মুদ্রার মূল্যের পরিবর্তন হেতু ক্ষতির জন্যও আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়া যাবে না।

সুতরাং ঋণ বা মূল্য পরিশোধে বিলম্বের কারণে আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা গ্রহণ বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। তা হলো—

গ্রাহক যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারে—

১. গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করা হবে।

২. নোটিশ প্রদানের পরও সতর্ক না হলে অন্তত দুই সপ্তাহ পর সকল অনাদায়ী পাওনা নগদ আদায়যোগ্য হয়ে যাবে।

৩. মুরাবাহা পণ্য ক্রেতার কাছে এখনও আগের মতোই বহাল তবিয়তে থাকলে তা ব্যাংক ফেরত নিয়ে নেবে। এজন্য আগেই মূল্য আদায়ে বিলম্ব করলে পণ্য ফেরত নেওয়ার শর্ত রাখতে পারে।

৪. শুরুতেই গ্রাহক থেকে ওয়াদা নিয়ে রাখবে যে, যথাসময়ে মূল্য আদায়ে বিলম্ব হলে গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা হার সদকা (Donate) করতে বাধ্য থাকবে। এরপর সেই সদকাটি কল্যাণমুখী কোনো কাজে ব্যয় করা হবে। এটি ব্যাংকের মুনাফা হিসাবে গণ্য হবে না।

৫. মর্গেজকৃত সম্পদ বিক্রি করে ঋণ উসুল করে নেবে।

উপর্যুক্ত ৫টি পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত সমস্যার সমাধান করা যায়।[২১৭]

দুই. মুরাবাহায় ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগদান পত্রের ৪ নং ধারায় লেখা আছে—

> মালামালসমূহ ক্রয়ের জন্য উক্ত বিনিয়োগ সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল আপনার/আপনাদের চলতি হিসাবেও আকলন করা যেতে পারে।

এ ধারাটির সারকথা হলো—পণ্যমূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সরাসরি গ্রাহকের চলতি হিসাবে প্রদান করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক শরীয়া বোর্ড AAOIFI-এর সিদ্ধান্তের পরিপন্থি। তাদের সিদ্ধান্ত হলো—মুরাবাহা পণ্যের মূল্য সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে প্রদান করা যাবে না; বরং তা সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে। মুরাবাহা-সংক্রান্ত ৮ নং শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ৮-এর ৩/১/৪-এ উল্লেখ হয়েছে—

> أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل
>
> আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি সাপ্লাইয়ার/বিক্রেতাকে পণ্য মূল্য পরিশোধ করবে; এজেন্ট-গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পণ্যমূল্য প্রদান করবে না।

অতএব, এটি পরিবর্তনযোগ্য। অবশ্য কিছু কিছু ব্যাংকে সরবরাহকারীর নামেই পে-অর্ডার ইস্যু করা হয়। এমনটি হওয়াই কাম্য।

তিন. Letter of undertaking-এ লেখা থাকে—

> If I fail to pay the Bank's aforesaid dues as per Schedule, Bank may charge compensation etc.

অর্থাৎ, যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক গ্রাহক থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।

এ বিষয়ে একটু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল শরীয়া নির্দেশনাটি হলো—শুরুতেই গ্রাহক থেকে ওয়াদা নিয়ে রাখা হবে যে, যথাসময়ে মূল্য আদায়ে বিলম্ব হলে গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা হার সদকা

---

২১৭. AAOIFI. *Shariah Standards*. 2008, 1/30

(Donate) করতে বাধ্য থাকবে। এরপর সেই সদকাটি কল্যাণমুখী কোনো কাজে ব্যয় করা হবে। এটি ব্যাংকের মুনাফা হিসাবে গণ্য হবে না। গ্রাহক চুক্তির শুরুতে উক্ত Donate (অনুদান)-এর Undertaking (নিজের ওপর আবশ্যক করা) করবে। আন্তর্জাতিক শরীয়া বোর্ড AAOIFI-এর ৩ নং স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ২/১, উপধারা, 'জ'-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে—

يجوز أن ينص في عقود المداينة مثل المرابحة على التزام المدين عند المماطلة بالتصديق بمبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.

মুরাবাহার মতো ঋণ সৃষ্টি হয় এমন লেনদেনের মূল চুক্তিতে এরূপ শর্ত করা বৈধ যে, যথাসময়ে ঋণ আদায়ে বিলম্ব করলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা পার্সেন্ট অনুদান করতে বাধ্য থাকবে। তবে শর্ত হলো, উক্ত অনুদান প্রতিষ্ঠানের শরীয়া বোর্ডের পরামর্শক্রমে জনকল্যাণমূলক কোনো খাতে ব্যয় করতে হবে। (প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হিসেবে একে গণ্য করা যাবে না।)

প্রয়োগগত শরীয়া-লঙ্ঘন

প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরত দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতির নিয়মনীতি ও শর্তাবলি মেনে চলার ক্ষেত্রে খুব বেশি সচেতন নন। তাদের অনেকেই মুরাবাহার উপর্যুক্ত শর্তগুলো হুবহু পালন করেন না, অনেক সময় অনুশীলনে ভুলত্রুটিও করে থাকেন, আবার গ্রাহকদের সচেতনতা কিংবা সততার অভাবেও বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হয়, যেগুলো মূলত এ পদ্ধতিকে প্রায় সময় প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি সমস্যা ও ভুল তুলে ধরা হলো—

ক. মুরাবাহার কৌশলগত ব্যবহার

কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাহক মুরাবাহার ডকুমেন্টের ওপর শুধু ফান্ড অর্জনের জন্য স্বাক্ষর করে। তার সেই ফান্ড দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো জিনিস ক্রয় করা উদ্দেশ্য হয় না; অনির্ধারিত উদ্দেশ্যের জন্য ফান্ডের প্রয়োজন হয়, কিন্তু পদ্ধতিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য সে কাল্পনিকভাবে কোনো জিনিসের নাম উল্লেখ করে দেয়, অর্থ উত্তোলনের পর সে তাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যয় করে এবং ওই জিনিস ক্রয় করে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা কেবল কাগজি চুক্তি, যা নিছক একটি কাল্পনিক এবং মিথ্যা লেনদেন। ইসলামী অর্থায়নকারীদের এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। এ নিশ্চয়তা অর্জন করা তাদের দায়িত্ব যে, যার ভিত্তিতে মুরাবাহা হচ্ছে গ্রাহক বাস্তবিকপক্ষে সেই জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছুক কি না? যেসব দায়িত্বশীল লোক মুরাবাহা সুযোগের মঞ্জুরি প্রদান করে তাদের এ কথার নিশ্চয়তা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আর লেনদেন সঠিক কি না—এ কথার নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে—

১. ব্যাংক গ্রাহককে প্রার্থিত পণ্য ক্রয় করার জন্য ফান্ড দেওয়ার পরিবর্তে সরাসরি সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করবে।

২. যেখানে ফান্ডের ব্যাপারে গ্রাহকের ওপরই ভরসা করা ব্যতীত কোনো উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্য ক্রয় করে মেমো কিংবা অন্য কোনো প্রামাণ্য ডকুমেন্ট অর্থায়নকারী ব্যাংকের নিকট পেশ করবে।

৩. যেসব ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পদ্ধতি দুটি কার্যকর করা যাবে না, সেসব ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেই ক্রয়কৃত জিনিস প্রকাশ্যে দেখার ব্যবস্থা করবে।

মোটকথা, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো, এ বিষয় নিশ্চিত করা যে, এখানে কার্যত ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে; সুদি ঋণকে গোপন করার জন্য মুরাবাহার কৌশলগত ব্যবহার করা হয়নি।

কোথাও কোথাও দেখা যায়, গ্রাহকের নিজস্ব সম্পদ রয়েছে। তিনি তা বিক্রি করতে পারছেন না। ওই সম্পদই তিনি তার সহযোগী কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসেবে দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং মুরাবাহা চুক্তি করে ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করছেন। পরে গ্রাহক এ দ্রব্য ক্রয় করে নিতে গড়িমসি করে এবং ব্যাংককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ ধরনের বিক্রয় সত্য গোপন করে ব্যাংককে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়তে হয়ে থাকে। এটা স্পষ্ট প্রতারণা।

খ. গ্রাহকের সাথে সরবরবাহকারী বা ব্যাংক-প্রতিনিধির যোগসাজশ

গ্রাহক পণ্যের সরবরাহকারীর সাথে কিংবা ব্যাংকের প্রতিনিধির সাথে যোগসাজশ করে নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় না করে বিনিয়োগের টাকা নগদ নিয়ে অন্য কোনো প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। এটি স্পষ্ট শরীয়া লঙ্ঘন তো বটেই;

অধিকন্তু, এ বিনিয়োগ কার্যক্রম সুদি ব্যাংকের অনুরূপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, গ্রাহককে মালামাল প্রদানের পরিবর্তে বিভিন্নভাবে নগদ সুবিধা প্রদান এবং তার নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

ব্যাংকের শরীয়া অডিটে এ ধরনের কোনো লেনদেন দৃষ্টিগোচর হলে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা প্রতিনিধির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রাহককে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। আর এরূপ কারবার থেকে প্রাপ্ত মুনাফা সন্দেহযুক্ত হওয়ায় জনকল্যাণমূলক তহবিলে চলে যাবে।

গ. ব্যাংক পণ্য বুঝে না নিয়ে বিক্রি করা

অনেক সময় বিক্রেতার কাছ থেকে ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে ঠিকই; কিন্তু ক্রয় করার পর তা নিজের নিয়ন্ত্রণে না এনেই সরাসরি গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে দেয়। ফলে বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের কাছ থেকে মালামাল গ্রহণ না করে সরাসরি বিক্রেতার কাছ থেকে গ্রহণ করে, যা শরীয়াসম্মত নয়। কোনো দ্রব্য বা পণ্য বিক্রি করার জন্য পণ্যটি বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানায় থাকা জরুরি। পূর্ণ মালিকানা অর্জনের জন্য দ্রব্য বা পণ্যের ওপর মালিকের কবজ বা নিয়ন্ত্রণ থাকা শর্ত। এই নিয়ন্ত্রণ প্রমাণ করার জন্য দ্রব্যটি নিজের দখলে আনা এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও ঝুঁকি গ্রহণ করা দরকার। তা না হলে দ্রব্য বা পণ্যের মালিক না হয়েই তা বিক্রয় করার সমতুল্য হবে, যা শরীয়াসম্মত নয়।

উল্লেখ্য, ব্যাংক পণ্য বুঝে না নিয়ে বিক্রি করার সমস্যাটা প্রায়ই ওইসব লেনদেনে হয়, যেখানে মুরাবাহার সকল ডকুমেন্টে একই সময় স্বাক্ষর করা হয় এবং মুরাবাহার বিভিন্ন ধাপের প্রতি লক্ষ রাখা হয় না। কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহার শুধু একটি লেনদেনই করে, যার ওপর অর্থপ্রদানের সময় কিংবা কখনও এ সুযোগের মঞ্জুরি প্রদানের সময় স্বাক্ষর করা হয়। এরূপ কর্মনীতি মুরাবাহার মৌলিক নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাংকিং মুরাবাহা বিভিন্ন চুক্তির একটি প্যাকেজ, যা ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট ধাপে ধাপে কার্যকর হয়।

ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের প্রতিনিধিগণ ব্যাংকের লেনদেন শরীয়াসম্মত হচ্ছে কি না—তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন। তাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, লেনদেনে প্রয়োজনীয় ধাপগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেক লেনদেন তার নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

ঘ. গ্রাহককে ওয়াকিল নিয়োগ করে ঝামেলা চোকা

আজকাল অনেক ব্যাংক মুরাবাহায় বিনিয়োগ করতে গিয়ে গ্রাহককে প্রদেয় দ্রব্যটির মূল্য যা হয় সেই পরিমাণ অংশ মুরাবাহার জন্য বরাদ্ধ করার পর ব্যাংক নিজে ক্রয় করার ঝামেলা না পোহায়ে খোদ গ্রাহককেই দ্রব্যটি ক্রয় করার জন্য ওয়াকিল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে ব্যাংক অনেক সময় দ্রব্যটি দেখেও না, গ্রাহক থেকে বুঝেও নেয় না।

আর গ্রাহকও ব্যাংকের নিয়োজিত প্রতিনিধি হিসেবে দ্রব্যটি ক্রয় করে বটে; তবে সেও দ্রব্যটি আবার ব্যাংককে বুঝিয়ে দেওয়ার ঝামেলা পোহাতে চায় না; বরং ক্রয়ের পর সরাসরি সেটি নিজের ব্যবহারে নিয়ে নেয়। ফলে এ ক্ষেত্রে বাস্তবে মুরাবাহা আইনানুগভাবে সংঘটিত হয় না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্রব্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংককে মালিকানা বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় মুরাবাহার ঈজাব (প্রস্তাব) ও কবুলের মাধ্যমে তা গ্রহণ করা না হলে তা শরীয়াসম্মত হবে না।

ঙ. পূর্বে ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর মুরাবাহা করা

কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এরূপ অবস্থাও দেখা যায়, তারা ওই সম্পদের ওপর মুরাবাহা করে, যা গ্রাহক পূর্বেই তৃতীয় কোনো পার্টি থেকে ক্রয় করে নিয়েছে। এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নয়। যখন গ্রাহক স্বয়ং একবার যে জিনিসটি ক্রয় করে নিয়েছে, তাহলে একই পণ্যকে পুনর্বার সেই সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করতে পারে না। যদি সেই পণ্যকেই ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে ক্রয় করে পুনরায় তার নিকটই বিক্রয় করে দেয়, তাহলে এটা বাই ব্যাক (buy-back)-এর কৌশল হবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নেই। বিশেষ করে মুরাবাহায়। মূলত গ্রাহক যদি প্রথমেই সেই পণ্য ক্রয় করে নেয় এবং পরে ফান্ডের জন্য ব্যাংকের নিকট আসে, তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো তার ওপর বিক্রেতার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া কিংবা ওই ফান্ডকে সে অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়। এ দু-উদ্দেশ্যের কোনোটার জন্যই ব্যাংক তাকে মুরাবাহার ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে পারবে না। মুরাবাহা কেবল সে ক্ষেত্রেই হতে পারে, যখন উক্ত পণ্য গ্রাহকের পূর্ব থেকে ক্রয়কৃত না হবে।

চ. পূর্ব থেকে গ্রাহকের নিকট থাকা পণ্যের ওপর মুরাবাহা করা

কখনও এরূপ অবস্থাও দেখা যায় যে, বর্তমানে যে পণ্য পূর্ব থেকেই গ্রাহকের নিকট থাকে তার ওপরই মুরাবাহার চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ব্যাংক উক্ত ব্যক্তি থেকে নগদ কম মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করে নেয় এবং তার ওপর লভ্যাংশ সংযোজন করে বাকিতে আবার তারই নিকট বিক্রি করে দেয়। বাস্তবে এটা মুরাবাহা হয় না; বরং এর সাথে বর্ধিত মুনাফা সংযোজন করে দেওয়া হয়। এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা, কোনো পণ্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করার পর আবার তারই নিকট অধিক মূল্যে বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ, এটি সুদি ঋণেরই সাদৃশ্য হয়ে যায়। ধরুন, যদি পণ্যটি ১০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করে ১২০ টাকায় বিক্রি করা হয়, তাহলে ১০০ টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে ১২০ টাকা নেওয়ার মতোই মনে হয়। বিশেষ করে যখন ক্রয় করার সময় তার কাছেই পুনরায় বিক্রয় করার শর্ত লাগানো হবে, তখন তো তা বিক্রয়ের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণেও অবৈধ হয়ে যাবে।

ছ. পণ্যের মালিকানা অর্জনের আগে মুনাফা নির্ধারণ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুরাবাহা চুক্তির সময়ই মুনাফা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, ভবিষ্যতে ঘটবে বা হবে, এমন অস্পষ্ট কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক কোনো বস্তুর মালিকানা অর্জন ও কবজ করার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। কাজেই ব্যাংক কর্তৃক পণ্যের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ/ডিসবার্সমেন্টের সময় গ্রাহকের সাথে বিক্রয়চুক্তি করা এবং ক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফা আরোপ করা বৈধ হবে না।

জ. ইবরা প্রদানকে বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকে পারস্পরিক মুরাবাহার চুক্তিতে গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের আগে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের জন্য ইবরা (রিবেট) প্রদানের বিষয়টি চুক্তির সময় নিষ্পন্ন করা যাবে না এবং গ্রাহকও তার প্রাপ্য হিসেবে তা দাবি করতে পারবে না। তবে ব্যাংক যদি তার সম্মতিক্রমে এ ধরনের সুযোগ দিয়ে দেয়, তাহলে এটাও প্রশ্নযোগ্য নয়, বিশেষ করে গ্রাহক যখন অভাবগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমরা কার্যত দেখি, ইবরার বিষয়টি বর্তমানে

একটি বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। গ্রাহকরাও একে তার ন্যায্য প্রাপ্য মনে করে এবং ব্যাংকও তা একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম হিসেবে মেনে চলে। এ প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির ২৫ জুন, ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির ১৭৮তম অধিবেশনে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে—

> ...মুরাবাহা চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির আগে অগ্রিম পরিশোধকৃত আংশিক বিনিয়োগ পাওনার ওপর রিবেট প্রদান করতে হবে।..[২১৮]

এ সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইবরা প্রদানের বিষয়টি ব্যাংক এখন একটি নিয়মে পরিণত করে নিয়েছে, যা সে কার্যত বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলে। শরীয়তের দৃষ্টিতে, একে নিয়মে পরিণত করা সমীচীন নয়।

ঝ. ক্যাশমেমো না থাকা, গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেওয়া, গ্রাহক কর্তৃক ক্যাশমেমো সংগ্রহ

ব্যাংক কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের প্রমাণস্বরূপ ক্রয়মূল্য প্রদানের বিপরীতে যথাযথ ক্যাশমেমো সংরক্ষণ করতে হবে। এটা ঠিক যে, ক্যাশমেমো ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো শর্ত নয়; তবে ক্রয়-বিক্রয় প্রমাণ করার জন্য এটি জরুরি বিধায় এর অনুপস্থিতি ক্রয়-বিক্রয়কে সন্দেহযুক্ত করে তোলে।

অনুরূপ ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এ অবস্থায়ও এ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে, ব্যাংক নিজে মালামাল ক্রয় করেনি; বরং তার পরিবর্তে গ্রাহক নিজেই মাল ক্রয় করেছে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কারণ, মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্তৃক মালামাল ক্রয় ও তার ওপর দখল লাভের পরই গ্রাহকের কাছে বিক্রি করতে হয়।

অনুরূপভাবে ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহণ করাও সমীচীন

---

২১৮. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ২৩

নয়। কারণ, এ অবস্থায়ও এ ধরনের সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে, ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক নিজেই মালামাল ক্রয় করেছেন এবং মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো ভূমিকা নেই।

ঞ. ক্যাশমেমো আগের অথবা পরের তারিখের হওয়া

ক্যাশমেমো ক্রয়-বিক্রয়ের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। ক্যাশমেমো যদি আগের তারিখের হয় এবং ব্যাংকের নামে হয় তবে দোষের কিছু নেই। কারণ, ব্যাংক মাল আগে ক্রয় করে পরে বিক্রয় করছে। কিন্তু ক্যাশমেমো যদি বিনিয়োগগ্রহীতার নামে এবং আগের তারিখের হয় তবে বোঝা যাবে যে, ব্যাংক মাল ক্রয়ই করেনি। সুতরাং মাল বিক্রয় করারও প্রশ্নই আসে না। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, বিনিয়োগগ্রহীতা আগে নিজেই মাল ক্রয় করেছিল এবং ব্যাংক তাকে ওই টাকাই পরিশোধ করছে, যা শরীয়ার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ট. পণ্য ক্রয় ও সরবরাহের আগেই বিলে বা প্রমিসরি নোটে গ্রাহকের স্বাক্ষর গ্রহণ

আজকাল অনেক ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের সাথে মুরাবাহার চুক্তি করার সিদ্ধান্ত করার পর কত টাকা এ খাতে বরাদ্ধ করা হবে এই সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত করে। এরপর গ্রাহকের বরাবরে ওই পাওনা টাকার বিল পেশ করে তাতে তার এন্ডোসমেন্ট নিয়ে নেয়। ফলে সেটি বিল অব এক্সচেঞ্জে পরিণত হয় কিংবা প্রমিসরি নোটে তার স্বাক্ষর নিয়ে নেওয়া হয়। অথচ দ্রব্যটি তখনও ক্রয় করাই হয়নি এবং গ্রাহককে তা সরবরাহও করা হয়নি। এ ধরনের অগ্রিম স্বাক্ষর গ্রহণ করাও বৈধ হবে না। কেননা, যখন তার কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের স্বীকারোক্তিমূলক স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে, তখন সে ব্যাংকের কাছে ঋণীই হয়নি। সে ঋণী সাব্যস্ত হবে তখন, যখন ব্যাংক দ্রব্যটি ক্রয় করে মুরাবাহার ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে সেটি তাকে হস্তান্তর করা হবে। যদি বিলে কিংবা প্রমিসরি নোটে স্বাক্ষর নিতে হয়, তাহলে দ্রব্যটি তাকে সরবরাহ করার পর নিতে হবে।

ঠ. বিলম্বের জন্য পণ্যের পুনঃমূল্য ধার্য করা

আজকাল অনেক ইসলামী ব্যাংক বাকিতে মুরাবাহা করতে গিয়ে যত দিনের জন্য বাকি দেওয়া হয় সেই হিসেবে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন করে; কিন্তু যদি ওই নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে গ্রাহক দেনা পরিশোধ করতে না পারে তাহলে

Rollover-এর ন্যায় পুনঃমূল্য ধার্য করে। অর্থাৎ, যদি ১,০০০ টাকার দ্রব্য ৬ মাসের বাকিতে ১,১০০ টাকায় মুরাবাহা করা হয়ে থাকে, আর গ্রাহক ৬ মাসের মাঝে তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে সেই চুক্তিকে নবায়ন করে এক বছরের জন্য ১,২০০ টাকায় পুনঃমুরাবাহা করা হয়। এরূপ কারবারও শরীয়াসম্মত নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি দ্রব্যের মূল্য একবার নির্ধারণ করার পর সেই ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পুনঃমূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তা ছাড়া একবার বর্ধিত মূল্য সংযোজন করার পর পুনরায় মূল্য সংযোজন করাও বৈধ নয়। বস্তুত মুরাবাহার শর্তাবলির প্রতি লক্ষ না রাখার কারণে এ ধরনের জটিলতাসমূহ সৃষ্টি হয় এবং লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়।

ড. পুরাতন বিনিয়োগ সমন্বয় করা

বিনিয়োগের অর্থ দ্বারা পণ্য ক্রয় না করে পুরাতন বিনিয়োগ সমন্বয় করা। এ ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না। ফলে এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা হলে তা সুদ গণ্য হবে।

ঢ. মুরাবাহার পণ্যকে বন্ধকি হিসেবে রেখে দেওয়া

বাকিতে যখন মুরাবাহা করা হয়, তখন গ্রাহক ব্যাংকের কাছে ঋণী হয়ে যায়। এ ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে ব্যাংক বন্ধকির দাবি করতে পারে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে যে পণ্যটি মুরাবাহায় বিক্রি করা হয় সেটিকেই বন্ধকি হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিটি বৈধ নয়। কেননা, মূল্য পরিশোধ করার জন্য পণ্য আটকিয়ে রাখার অধিকার বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার নেই। তবে বন্ধকি হিসেবে দ্রব্যটি বিক্রেতা নিজের কাছে রাখতে পারে; কিন্তু তার জন্য শর্ত এই যে, প্রথমে দ্রব্যটি ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছ থেকে হস্তগত করতে হবে। অতঃপর বন্ধকি হিসেবে ক্রেতা নতুন করে বিক্রেতার কাছে তা সমর্পণ করবে।

এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, ক্রেতা কর্তৃক দ্রব্যটি হস্তগত করার পর পুনরায় বন্ধকি হিসেবে বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা, আর দ্রব্যটি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় এ কথা বলা যে, এটি বন্ধকি হিসেবে আপনার হাতে থাক—এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

ফিকহশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কেননা, ক্রেতা দ্রব্যটি হস্তগত করার পূর্বপর্যন্ত এটি এমন বিক্রিত পণ্য হিসেবে গণ্য হবে, যা বিক্রেতাকে সরবরাহ করা হয়নি। বিক্রিত পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করার পূর্বে যদি বিক্রেতার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ক্রেতা উক্ত পণ্যের বাজারদর হিসেবে যা মূল্য দাঁড়ায় সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে এবং দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যখন ক্রেতা হস্তগত করার পর বন্ধকি হিসেবে বিক্রেতাকে তা সমর্পণ করবে, তখন বিক্রেতার হাতে এটি বন্ধকি হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এমতাবস্থায় যদি দ্রব্যটি স্বাভাবিক কারণে বিনষ্ট হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের কারণে দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। বাজারদর হিসাবে যা মূল্য হয় সে পরিমাণ পরিশোধ করলে চলবে না। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলেও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিটি বাতিল হবে না।

আজকাল সিম্পল মর্টগেজ নামে নতুন একধরনের বন্ধকি প্রথার প্রচলন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যে বস্তু বন্ধক দেওয়া হয় তা বন্ধকদাতার হাতেই থাকে এবং সে তা ব্যবহারও করতে পারে। তবে সে তা বিক্রি করতে বা অন্যকে ব্যবহার করতে দিতে পারে না; কিন্তু শারয়ীভাবে বন্ধকগ্রহীতার এই অধিকার থাকে যে, যথাসময়ে ঋণের টাকা আদায় না করলে সে তা বিক্রি করে ঋণের টাকা উসুল করে নিতে পারে।

সাধারণ নিয়মানুসারে বন্ধক হিসেবে প্রদত্ত বস্তু বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করে দিতে হয়। তা না হলে বন্ধকির চুক্তি শুদ্ধ হয় না। তবে বৃহৎ মেশিনারি স্থানান্তর অসুবিধার হওয়ায় এটি রাখার জন্য স্থানের প্রয়োজন হয় বিধায় বন্ধকগ্রহীতা যদি তা বন্ধকদাতার নিকট রাখতে চায়, তাহলে তা রাখতে পারবে। তবে বন্ধকগ্রহীতা সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে মেশিনটি যদি দেখে আসে এবং তার গায়ে অমুকের

দৃষ্টিতে বৈধ; তবে যিনি কফীল বা জামিন হবেন, তিনি এ বাবদ কোনো ফি গ্রহণ করতে পারবেন না। পরবর্তী সময়ে আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

ণ. দীর্ঘ সময় ধরে বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে পণ্য ক্রয় না করা

কখনও এমন হয় যে, ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করে তার অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগের টাকা স্থানান্তর করে দেয়; কিন্তু গ্রাহক দীর্ঘদিন পরও বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় করে না। অপরদিকে প্রথম দিনেই পণ্য ক্রয়ের ক্যাশমেমো প্রদান করা হয় এবং যথারীতি মুনাফা ধার্য করা হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রাহকের কাছে পণ্য স্থানান্তর ব্যতীত মুনাফা ধার্য করা বৈধ নয়।

কেস স্টাডি-১

একজন গ্রাহক ব্যাংকে এসে বিনিয়োগ কর্মকর্তার কাছে বললেন, আমি কীভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারি? বিনিয়োগ কর্মকর্তা বললেন, ইসলামী ব্যাংক ঋণের ব্যাবসা করে না। তবে আপনার কোনো ব্যাবসা থাকলে ব্যাংক আপনাকে সেই ব্যাবসার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে দিতে পারে। তিনি বললেন, আমার কাপড়ের ব্যাবসা আছে। আমি ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে কিছু কাপড় ক্রয় করতে চাই। বিনিয়োগ কর্মকর্তা বললেন, আপনি যে ধরনের কাপড় ক্রয় করতে চান তার একটি দরপত্র নিয়ে আসেন। আগন্তুক কাপড় ক্রয়ের একটি দরপত্র ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর বিনিয়োগ কর্মকর্তা তার সঙ্গে একটি মুরাবাহা চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন। এরপর বিনিয়োগ কর্মকর্তা গ্রাহকের নামে একটি বিনিয়োগ হিসাব খুললেন এবং তা বিকলন করে মালামালের মূল্য দ্বারা সরবরাহকারীর নামে একটি পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু করলেন। গ্রাহক পেমেন্ট অর্ডারটি গ্রহণপূর্বক সরবরাহকারীর কাছে গেলেন এবং সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা নিজের নামে বিভিন্ন ধরনের কাপড় ক্রয় করলেন। কাপড় ক্রয় শেষে নিজের নামের ক্যাশমেমোটি ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে জমা দিলেন এবং এর পেছনে মালামাল বুঝে পেয়েছেন বলে স্বাক্ষর করলেন।

এ বিনিয়োগটিতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে শরীয়ানীতি লঙ্ঘিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ক. আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের সঙ্গে ক্রয় প্রতিশ্রুতি চুক্তির পরিবর্তে সরাসরি মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। অথচ 'মুরাবাহা লিল আমির বিশ-শিরা' অর্থাৎ ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতিতে মালামালের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল লাভ ছাড়া গ্রাহকের সঙ্গে মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়।

খ. ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি কিংবা টেলিফোন/প্রতিনিধির মাধ্যমে সরবরাহকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মালামাল ক্রয় করবে। কিন্তু এখানে মালামাল ক্রয় করেছেন বিনিয়োগ গ্রাহক নিজেই। ফলে সরবরাহকারীর সঙ্গে ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়নি। অথচ ব্যাংকিং মুরাবাহা পদ্ধতিতে প্রথম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হতে হবে। প্রথম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ না হলে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ও শুদ্ধ হবে না।

গ. এখানে গ্রাহক মালামাল নিজের নামে ক্রয়পূর্বক ক্যাশমেমো গ্রহণ করেছেন। ফলে এ মালের মালিক গ্রাহক নিজে। আর গ্রাহকের মালিকানাধীন মালামাল পুনরায় তারই কাছে বিক্রি করাকে বাই ঈনা বলা হয়; যা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়।

কেস স্টাডি-২

একজন গ্রাহক কৃষকদের নিকট থেকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার ধান ক্রয়ের জন্য ইসলামী ব্যাংকের কাছে আবেদন করলেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগ কর্মকর্তা উক্ত গ্রাহকের সঙ্গে মুরাবাহা চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন এবং উক্ত মালামাল ব্যাংকের পক্ষে সরাসরি ক্রয় করা সম্ভব নয় বলে উক্ত গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করলেন। এরপর বিনিয়োগ কর্মকর্তা গ্রাহকের নামে একটি বিনিয়োগ হিসাব খুললেন এবং তা বিকলন করে মালামালের মূল্য গ্রাহকের চলতি/সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তর করলেন। এরপর বিনিয়োগ গ্রাহক একটি চেকের মাধ্যমে ১,০০,০০/- টাকা তার পুরাতন মুরাবাহা হিসাবে স্থানান্তর করলেন এবং ৮০,০০০/- টাকা নগদ উত্তোলনপূর্বক বিভিন্ন কৃষকের নিকট থেকে ধান ক্রয় করলেন। অবশিষ্ট ১০,০০০/- টাকা তার হিসাবে উত্তোলনবিহীন অবস্থায় থেকে গেল। বিনিয়োগ প্রদানের ১০ দিন পরে বিনিয়োগ গ্রাহক ১,০০,০০০/- টাকার ধান ক্রয় করেছেন মর্মে ক্যাশমেমো ব্যাংকে জমা দিলেন এবং উক্ত মালামাল বুঝে পেয়েছেন মর্মে ক্যাশমেমোর পেছনে স্বাক্ষর করলেন।

এ বিনিয়োগটিতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে শরীয়ানীতি লঙ্ঘিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ক. এখানে গ্রাহকের সঙ্গে ক্রয়-প্রতিশ্রুতি চুক্তির পরিবর্তে সরাসরি মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। অথচ 'মুরাবাহা লিল আমির বিশ-শিরা' পদ্ধতিতে মালামালের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল লাভ ছাড়া গ্রাহকের সঙ্গে মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়।

খ. গ্রাহক ১০,০০০/- টাকা তার পুরাতন মুরাবাহা হিসাবে স্থানান্তর করেছেন। অর্থাৎ গ্রাহক ১০,০০০/- টাকার মালামাল ক্রয় না করে তার পুরাতন দায় পরিশোধ করেছেন। কিন্তু ব্যাংক গ্রাহকের দায় পরিশোধের জন্য বিনিয়োগ দিতে পারে না। কারণ, ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রয়ের পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদান করে তার ওপর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সুদ।

গ. এ ক্ষেত্রে গ্রাহক/প্রতিনিধির ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট শাখার একজন কর্মকর্তা পরিদর্শনপূর্বক দখল লাভ করবেন এবং গ্রাহককে বুঝিয়ে দেবেন। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের একটি শর্ত হলো—পণ্যের ওপর বিক্রেতার দখল স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা। এ ক্ষেত্রে পণ্যের ওপর ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে ক্রয়-বিক্রয়টি শুদ্ধ হয়নি।

ঘ. গ্রাহকের হিসাবে স্থানান্তরিত বিনিয়োগের অর্থ থেকে অবশিষ্ট ১০,০০০/- টাকা উত্তোলনবিহীন অবস্থায় রয়েছে এবং ১০,০০০/- টাকা দ্বারা গ্রাহক তার পুরাতন বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করেছে। এ সত্ত্বেও তিনি পুরো টাকার মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো উপস্থাপন করেছেন।

কেস স্টাডি-৩

কোনো নির্দিষ্ট সরবরাহকারীর নিকট থেকে একটি ক্যাশমেমো সংগ্রহপূর্বক একজন গ্রাহক ব্যাংকের কাছে বিনিয়োগের আবেদন করলেন। ব্যাংকের বিনিয়োগ কর্মকর্তা গ্রাহকের নামে একটি বিনিয়োগ হিসাব খুললেন এবং তা বিকলনপূর্বক মালামালের মূল্য দ্বারা সরবরাহকারীর নামে একটি পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু করলেন। গ্রাহক পেমেন্ট অর্ডারটি গ্রহণপূর্বক সরবরাহকারীর কাছে গেলেন এবং সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা নিজের নামে বিভিন্ন ধরনের কাপড় ক্রয়

করলেন। কাপড় ক্রয় শেষে নিজের নামের ক্যাশমেমোটি ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে জমা দিলেন এবং এর পেছনে মালামাল বুঝে পেয়েছেন মর্মে স্বাক্ষর করলেন। এরপর সাপ্লায়ার সমপরিমাণ টাকার একটি চেক ইস্যু করলেন। বিনিয়োগ গ্রাহক চেকটির পেছনে স্বাক্ষরপূর্বক নগদ অর্থ গ্রহণ করলেন।

এ বিনিয়োগে যেসব শরীয়ানীতি লঙ্ঘিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ক. ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি কিংবা টেলিফোন/প্রতিনিধির মাধ্যমে সরবরাহকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মালামাল ক্রয় করবে। কিন্তু এখানে মালামাল ক্রয় করেছেন বিনিয়োগ গ্রাহক নিজে। ফলে সরবরাহকারীর সঙ্গে ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়নি। অথচ মুরাবাহা লিল আমির বিশ-শিরা পদ্ধতিতে প্রথম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হতে হবে। প্রথম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ না হলে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না।

খ. বিনিয়োগ গ্রাহক সরবরাহকারীর ইস্যু করা চেকের পেছনে স্বাক্ষর করে নগদ অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, এখানে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়নি; বরং গ্রাহক ক্রয়-বিক্রয়ের নামে সরবরাহকারীর মাধ্যমে নগদ সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সুদ বলে গণ্য হবে।[২১৯]

মুরাবাহার বর্তমান সাধারণ চিত্র

বস্তুতপক্ষে বর্তমানে গ্রাহকগণ ও অভিজ্ঞ মহল ব্যাংকের মুরাবাহা বলতে কার্যত যা বোঝেন তা হলো—কাঙ্ক্ষিত টাকার জন্য সেই পরিমাণ মূল্যের মেমো গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকে উপস্থাপন করা এবং কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা শেষে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক চেক প্রদান করা। অনেক ব্যাংকের কর্মকর্তাগণই স্বীকার করে থাকেন যে, তারা গ্রাহক কর্তৃক প্রদর্শিত মেমোর মাধ্যমেই ব্যাংকের খরিদদার হওয়া এবং তা হস্তগত করার দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। ব্যাংক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রথমে পণ্য ক্রয় করত তা হস্তগত করে নিজ রিস্কে নিয়ে অতঃপর গ্রাহককে বিক্রি করা—এত কিছুর প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেন না। কোনো কোনো ব্যাংক অবশ্য গ্রাহক থেকে যে সকল কাগজপত্রে স্বাক্ষর

নিয়ে থাকে তার মধ্যে একটি কাগজ ওকালত-সম্পর্কিত নিয়োগপত্রও থাকে। অর্থাৎ, ব্যাংক গ্রাহককে তার পক্ষ থেকে মালামাল ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা এ পর্যন্তই শেষ হয়ে যায়। এরপরই পণ্য বিক্রয়ের পেপারগুলোতে স্বাক্ষর রেখে কাঙ্ক্ষিত টাকার চেক দিয়ে গ্রাহককে ছেড়ে দেওয়া হয়। অথচ ওই নিয়োগের দ্বারা সে প্রতিনিধির দায়িত্ব পেল মাত্র। এরপর যদি লোকটি সৎ হয় এবং বাস্তবেই ওই টাকা দ্বারা পণ্যটি খরিদ করে তবে ওই পণ্যের মালিক তো হলো ব্যাংক। এখন ব্যাংক তার কাছে বিক্রির পূর্বে এটি তো তার পণ্য হলো না। সে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের কাছে তো আর তা বিক্রয় করতে পারে না। এ তো গেল ভালো গ্রাহকের কথা, যে টাকা দ্বারা অন্তত পণ্য ক্রয় করছে। কিন্তু ব্যাংকের উদাসীনতার সুযোগে অনেক গ্রাহক এমনও থাকে, যারা বাস্তবে পণ্য ক্রয়ের কাছেও যায় না; বরং কাঙ্ক্ষিত টাকা হস্তগত করে তা ইচ্ছামতো খরচ করে। আবার কেউ কেউ ওই টাকা দ্বারা পূর্বে খরিদকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে থাকে, যা ব্যাংকে যাওয়ার আগেই সে নিজের জন্য খরিদ করেছিল।

ওয়াকিবহাল মহল জানেন যে, বর্তমানে এ জাতীয় ঘটনাই ব্যাংকগুলোর 'মুরাবাহার' সাধারণ চিত্র। হয়তো দু-এক জন ব্যতিক্রমী রয়েছেন। অবশ্যই দ্বীনদার শাখা ম্যানেজারের অথবা বিনিয়োগের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে ভালো কথাও শোনা যায়, যারা মুরাবাহার শর্তগুলো পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন; কিন্তু ব্যাংকপাড়ায় তা শুধুই ব্যতিক্রম।

৪. বাই মুয়াজ্জাল

'মুয়াজ্জাল' শব্দটি আজল শব্দ থেকে গঠিত। 'আজল' শব্দের অর্থ নির্ধারিত সময়। এ অর্থে বাই মুয়াজ্জাল হলো নির্ধারিত সময়ে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে বিক্রি করা। অর্থাৎ, বাই মুয়াজ্জাল হলো এমন প্রকৃতির ক্রয়-বিক্রয়, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্যের মূল্য ভবিষ্যতের কোনো নির্ধারিত সময়ে কিস্তিতে বা একসাথে পরিশোধের শর্তে পণ্যের মালিকানা ও দখলিস্বত্ব তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তর করে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয়টি আরবীতে 'বাই ইলা আজল' (بيع إلى أجل), 'বাই বিছ ছামানিল আজিল' (بيع بالثمن الآجل), 'বাইয়ুন নাছিয়াহ' (بيع النسئية) প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

বাই মুয়াজ্জাল একটি শরীয়া-অনুমোদিত বহুল প্রচলিত স্বাভাবিক ব্যবসায় পদ্ধতি, সালাফে সালেহীনের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো মত প্রমাণিত নয়।

বর্তমান ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপর্যুক্ত স্বাভাবিক ব্যাবসা-পদ্ধতি বাই মুয়াজ্জালের প্রচলিত নিয়মনীতির সাথে আরও কিছু নিয়মনীতি বৃদ্ধি করে একে অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাই মুয়াজ্জাল অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাই মুয়াজ্জালের অনুশীলন করতে হলে বাই মুরাবাহার মতো শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো হলো—

১. পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার : প্রথমে উভয় পক্ষ একটি ওয়াদাপত্রে এ মর্মে স্বাক্ষর করবে যে, বিনিয়োগকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রার্থিত পণ্য নির্ধারিত সময়ে ক্রয় করবেন, অতঃপর গ্রাহক তা যথাসময়ে কিনে নেবেন। ওয়াদা-চুক্তিনামায় উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাস্তবায়নের সর্বশেষ সময়ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. পণ্য ক্রয় : পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী বিনিয়োগকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয় করবে।

৩. মালিকানা ও দখল লাভ : বিনিয়োগ-গ্রাহকের কাছে উক্ত পণ্য বিক্রির পূর্বে ব্যাংক তা নিজের মালিকানায় নিয়ে আসবে এবং এর ওপর নিজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দখল অর্জন করবে। অতঃপর ব্যাংক গ্রাহককে পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অবহিত করবে।

৪. ব্যাংক কর্তৃক পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গ্রাহক অবহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য গ্রাহক সরাসরি ব্যাংককে স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব (ঈজাব) করবে। এটি লিখিতও হতে পারে, মৌখিকও হতে পারে।

৫. ব্যাংক গ্রাহকের উক্ত ঈজাব বা ক্রয়ের প্রস্তাব কবুল করবে। এভাবে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন হবে। তখন পণ্যের মালিকানা ও ঝুঁকি উভয়টি গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সঠিক বাই মুয়াজ্জালের জন্য উক্ত পাঁচটি ধাপ পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ ছাড়া মুরাবাহার মতো এ পদ্ধতিতেও ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে আরও ধাপ তৈরি হতে পারে। যেমন—প্রথমে গ্রাহক ব্যাংক বরাবর বাই মুয়াজ্জালের জন্য দরখাস্ত করবে। তাতে পণ্য-সংক্রান্ত তথ্য থাকবে, গ্রাহকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য থাকবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই আবেদনপত্র ব্যাংক যাচাই-বাছাই করবে। এরপর ওয়াদাপত্র প্রস্তুত হবে, .. ইত্যাদি। আমরা এখানে এরকম ব্যবস্থাপনাগত কোনো ধাপ উল্লেখ করিনি। কারণ, এসব ধাপ দেশ ও ব্যাংকভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই কেবল ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো উল্লেখ করেছি, যা সকল দেশ ও সকল ব্যাংকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু ব্যাংকই নয়; যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্স হিসেবে বাই মুয়াজ্জাল করতে হলে উক্ত পাঁচটি ধাপ অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

বাই মুয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য

ব্যাংকিং বাই মুয়াজ্জালের অনুশীলন ব্যাংকিং মুরাবাহার অনুশীলনের প্রায়ই অনুরূপ এবং দুটি পদ্ধতির শর্তাবলিও প্রায় একই রূপ। দুটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক সাধারণত ক্রেতার চাহিদামতো পণ্য ক্রয় করে বাকিতে বিক্রি করে থাকে। এ দুটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পার্থক্য হলো :

ক. বাই মুয়াজ্জালে ব্যাংকের পণ্যের দাম ও মুনাফার হার গ্রাহককে জানানো শারয়ীভাবে বাধ্যতামূলক নয়, অপরদিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে ব্যাংক বা বিক্রেতা পণ্যের দাম এবং যে পরিমাণ মুনাফা করে তা গ্রাহককে জানানো বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক কী দামে পণ্য ক্রয় করেছে, এর ক্রয়মূল্যের ওপর কত মুনাফা নেবে এবং অতিরিক্ত ব্যয় (যেমন—পরিবহন ব্যয়, গুদাম খরচ, পাহারাদার খরচ ইত্যাদি) বাবদ যা গ্রাহক থেকে আদায় করবে তা গ্রাহককে জানাতে হবে। কিন্তু বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা বিক্রেতা গ্রাহককে কেবল বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করলেও চলে; কত লাভ করছে বা অন্যান্য খরচ বাবদ কত নিচ্ছে—তা জানানোর প্রয়োজন নেই।

খ. বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে লাভ সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত এবং লোকসানের কোনো আশঙ্কা নেই। পক্ষান্তরে বাই মুয়াজ্জালে লাভ মুখ্য বিষয় নয়; বাকিতে মূল্য পরিশোধই মুখ্য বিষয়।

গ. মুরাবাহা বিনিয়োগে পণ্য ব্যাংক তার নিয়ন্ত্রণে রেখে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধসাপেক্ষে গ্রাহককে কিস্তির অনুপাতে পণ্য সরবরাহ করতে পারে; পক্ষান্তরে মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে পণ্য গ্রাহককে দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ পদ্ধতিতে গ্রাহক পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করেও অন্য ব্যবসায়ে ব্যাংকের বাকিতে দেওয়া পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরানোর সুযোগ বেশি পায়। তাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ব্যাংককে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

ইসলামী ব্যাংকসমূহে বাই মুয়াজ্জালের প্রয়োগিক অবস্থা : শরীয়া পরিপালন ও লঙ্ঘন

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহার পাশাপাশি এ পদ্ধতিটিও বেশ প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক নগদ মূল্যে পণ্য বাজার থেকে ক্রয় করে তার সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে ক্রেতার নিকট বাকিতে বিক্রয় করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়মূল্য জানাতে বাধ্য নয়। তবে বর্তমানে প্রচলিত প্রথানুসারে দেখা যায়, ব্যাংক গ্রাহকের পছন্দসই পণ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে ক্রেতার পছন্দমতো উৎস থেকে তারই পছন্দের পণ্যটি ক্রয় করে দেয়। আবার যে ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃতিগত জটিলতার কারণে ব্যাংকের পক্ষে বাজার থেকে পণ্যটি প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করে পণ্যটি ক্রয় করে সরবরাহ করে। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই বিনিয়োগগ্রহীতাকেই ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলে প্রায়ই উক্ত পণ্যের ক্রয়মূল্যও গ্রাহকের জানা থাকে। অবশ্য এরূপ জানা থাকাতে কোনো সমস্যা নেই।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ জোগানোর জন্য এ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি উপযোগী। ব্যাংক কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এ ব্যবস্থায় সরবরাহ করতে পারে। কৃষকরা শস্য কাটার পর বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ পরিশোধ করতে পারে। আমদানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সাধারণত ব্যাক টু ব্যাক এলসি (Back to Back L/C) খুলতে চায়। সে ক্ষেত্রে ব্যাংক বিদেশ থেকে মালামাল আমদানি করে দেয় এবং মালামালের মূল্য এক্সপোর্ট এলসির মূল্য থেকে গ্রহণ করে। রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি দ্রব্যের কাঁচামাল বাজার থেকে নগদে ক্রয়পূর্বক রপ্তানিকারকের কাছে বাকিতে বিক্রি করে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে।

ব্যাংকিং মুরাবাহা কারবারে সাধারণত যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ও সমস্যা দেখা যায়, সেসব প্রায়ই ব্যাংকিং বাই মুয়াজ্জালের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন—গ্রাহককে নগদ সুবিধা দেওয়া, গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করা, বিলম্বে মূল্য পরিশোধের জন্য ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/অতিরিক্ত চার্জ আদায় এবং তা ব্যাংকের মূল আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পাওনা পরিশোধের জন্য রেয়াত প্রদান, ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক বিক্রেতা থেকে সরাসরি মাল বুঝে নেওয়া, পণ্য বুঝে নেওয়ার রেকর্ড না থাকা, এমপিআই/ডিলারশিপের বেলায় লেটার অব অথরিটি না নেওয়া, নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরোনো বিনিয়োগ সমন্বয় করা, গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেওয়া, ক্যাশমেমো রেকর্ডে না রাখা, বিনিয়োগ বিতরণের আগে বা পরের তারিখে ক্যাশমেমো নেওয়া, চুক্তিপত্র কেবল স্বাক্ষর নিয়ে রাখা ইত্যাদি।

ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এএমডি মুহাম্মাদ শামসুজ্জামান বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালের সুবিধা ও অপব্যবহার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—

> বাই মুয়াজ্জাল এবং বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় অতি সহজ এবং এতে ঝুঁকিও খুব কম; অথচ মুনাফা অর্জনের দিক থেকে এ পদ্ধতি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। ক্রেতা যদি ওয়াদা খেলাপ না করে অথবা যদি দেউলিয়া হয়ে না যায়, তাহলে এরূপ কারবারে লোকসান হওয়ার তেমন কোনো আশঙ্কা নেই। তবে এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার করা হলে এর মাধ্যমে ব্যাংকের লেনদেনে সুদ ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যাংক বাস্তবে মাল ক্রয়-বিক্রয়ের ঝামেলায় না গিয়ে কেবল কাগজে-কলমে ক্রয়-বিক্রয় দেখিয়ে নির্ধারিত মুনাফা বা মার্জিনের ছদ্মাবরণে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা দান করতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে সুদি লেনদেনে পর্যবসিত হবে। এ ছাড়া ক্রেতার আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে অতিরিক্ত মুনাফা আদায়ের আশঙ্কাও এ পদ্ধতিতে রয়েছে, যা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব দিক চিন্তা করে বিশেষজ্ঞগণ বাই মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতিকে সীমিত ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি একান্ত অপরিহার্য ও নিরূপায় অবস্থা ছাড়া এ পদ্ধতি ব্যবহার না করার ওপর জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে।

মুশকিল হলো—এরূপ সুন্দর লেনদেন ব্যবস্থায়ও কিছু গ্রাহক এখনও কমফোর্ট ফিল করেন না; কারণ, তাদের অস্থিমজ্জায় শুধু নগদ বের করার প্রবণতাই মিশে আছে। চরম সত্য যে, ইসলামী ব্যাংক ইসলামী

পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করলে প্রথমত মালামালের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। দ্বিতীয়ত, এ পদ্ধতিতে হয় গুদামে মালামাল থাকবে নতুবা ব্যাংক হিসাবে তার মূল্য জমা থাকবে। তৃতীয়ত, কোনোভাবে ব্যাংকের অগোচরে মালামাল বের হতে পারে না। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নিবিড় তত্ত্বাবধানমূলক এবং এতে গ্রাহকের খেলাপি হওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

তারপরও কথা থাকে, সত্যিই কি ইসলামী ব্যাংকগুলো এত নিবিড়ভাবে মালামালের মুভমেন্ট পরিদর্শন করে? করলে তো ব্যাংক থেকে নগদ টাকা বের হতে পারে না। তবে কীভাবে এত এত হাজার কোটি টাকা বেরিয়ে গেল? তাহলে মালামাল কোথায়? ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট, অডিট এবং শরীয়া বোর্ড সবাই কি এক কম্বলের নিচে শীতনিদ্রায় কাতর ছিল? গত কয়েক বছরে তারা কতগুলো সভা করেছেন আর সেখানে কী আলোচনা করেছেন? ব্যাংকগুলোর ভিত্তি ধসে যাচ্ছে আর তারা সভার পর সভা করে এই ধস উপভোগ করছেন (!)।[২২০]

বাকি ও মুরাবাহাতে স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়

স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য কিংবা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে যেকোনো বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করা যাবে; তবে উভয় বিনিময় নগদে হস্তান্তরিত হতে হবে; বাকি রাখা যাবে না।[২২১] এর দলিল হলো—হাদীসে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় হাতে হাতে

২২০. শামসুজ্জামান, ইসলামী ব্যাংকে শরিয়া পরিপালন নিশ্চিতকল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে, ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টে শরীয়া পরিপালন কতটুকু হয়? সপ্তম পর্ব : দ্বিতীয় অংশ, https://www.facebook.com/share/p/1Kej4wfeZ4gce4Dh/?mibextid=oFDknk

২২১. https://binbaz.org.sa/fatwas/3252/حكم-بيع-الذهب-بالدين-مع-التقسيط

هذا لا يجوز، بيع الذهب، أو غيره من العُمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربًا، فإذا باع ذهبًا بدولار، أو بجنيه استرليني، أو بدينار أردني، أو عراقي، أو غير ذلك، أو بالعملة السعودية نسيئة، أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا.

অর্থাৎ উভয়টির হস্তান্তর নগদে করার নির্দেশ রয়েছে।[২২২] আর মুদ্রার বিধানও স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধানের মতো। আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ্ অ্যাকাডেমির স্বীকৃতি মতে, মুদ্রার বিধান স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধানের মতো।[২২৩] এ প্রসঙ্গে আওফির শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ করা হয়েছে—

ক. স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির বৈঠকে উভয় পক্ষের বিনিময় হস্তগত করা জরুরি; তবে এই হস্তগত করা বাস্তবিক বা বিধানগতভাবে হতে পারে, যদি এ তিনটি জিনিস ছাড়া অন্য কোনোকিছুর বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হয়, তাহলে যেকোনো এক পক্ষের বিনিময় বাকি রাখা যেতে পারে—স্বর্ণ নতুন বা পুরাতন হওয়া বা স্বর্ণের মানগত ভিন্নতার কারণে এই বিধানে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

খ. স্বর্ণ বিক্রয়ের চুক্তিকে কোনো একটি বিষয়ে ঘটে যাওয়া বা ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত করা জায়িয নয়। স্বর্ণ বিক্রয়ের চুক্তিতে খিয়ারুশ শর্ত[২২৪] জায়িয নয়।

গ. যেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে দুটি বিনিময়ই বাকি থাকে, সে ক্ষেত্রে স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নয়। ফরওয়ার্ড এবং ফিউচার সেল হিসেবে যা পরিচিত, সেসব ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।[২২৫]

পক্ষান্তরে মিশরের প্রখ্যাত মুফতী ও জামিয়াতুল আযহারের 'আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াশ শরীয়া' বিভাগের প্রফেসর ড. শাওকী ইবরাহীম আল্লাম (জন্ম : ১৯৬১) ও অন্যান্য অনেক মুফতীর মতে—শরীয়তের দৃষ্টিতে কিস্তিতে স্বর্ণালংকার বিক্রি করতে কোনো বাধা নেই এবং বিক্রির সময় নগদ মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়। কারণ, এ অবস্থায় স্বর্ণ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে

---

২২২. মুসলিম, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আল বুয়ূ, হা. নং : ৪১৫৭; ইবনু হিব্বান, *আস সহীহ*, হা. নং : ৫০১৪

২২৩. আওফি, *শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড*-৮

২২৪. খিয়ারুশ শর্ত (শর্তভিত্তিক ইখতিয়ার) : ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি তিন দিন কিংবা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা প্রত্যাহার করার ইখতিয়ার থাকার শর্তারোপ করাকে 'খিয়ারুশ শর্ত' বলা হয়।

২২৫. আওফি, *শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড*-৫৭

তার ছামানিয়্যাত (বিনিময়যোগ্যতা) হারিয়ে ফেলেছে এবং অন্যান্য পণ্যের মতো একটি সাধারণ পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে, যা নগদেও বিক্রি করা যায় এবং বাকিতেও বিক্রি করা যায়। কাজেই যে নকদিয়্যাত (মুদ্রা হওয়া)-এর কারণে স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় হাতে হাতে করতে হয় তা এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই।[২২৬] ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও এরূপ কথা বোঝা যায়। তিনি বলেন—

> الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها.

> বৈধ গহনা বৈধ শিল্পসৌকর্যের কারণে কাপড়চোপড় ও পণ্যসমূহের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়; 'ছামান' (অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ের যোগ্য উপকরণ যেমন—মুদ্রা)-এর পর্যায়ভুক্ত থাকে না। এ কারণে গহনার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় না। ফলে এর ও ছামানের মধ্যে রিবার (সুদের) বিধান প্রযোজ্য হবে না, যেমন ছামান ও অন্যান্য সকল পণ্যের মধ্যে রিবার বিধান প্রযোজ্য হয় না। যদি এ গহনা সমজাতীয় পর্যায়ের বিনিময়ে না হয়, (তাহলে তো কোনো কথাই নেই)। কারণ, এ গহনা শিল্পসৌকর্যের কারণে উদ্দেশ্যগত বিচারে ছামানিয়্যাত থেকে বেরিয়ে যায় এবং তা ব্যাবসার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এ কারণে তা সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়েও কেনাবেচা করতে কোনো বাধা নেই।[২২৭]

মুফতী তকী উসমানী ও ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক আলিমেরও একটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো—কাগুজে নোটের বিনিময়ে বাকিতে স্বর্ণ-রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো—চুক্তির দিনের বাজারমূল্যে লেনদেন হতে হবে; তবে চুক্তির বৈঠকে উভয় বিনিময় কবজ করা শর্ত নয়; বরং বাস্তবিকভাবে অলংকার কবজ করাও শর্ত নয়; কেবল অলংকার নির্দিষ্ট করলেই হবে। কারণ,

---

২২৬. https://www.elbalad.news/5503948#

২২৭. ইবনুল কাইয়িম, *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন*, খ. ২, পৃ. ১৬০

কাগুজে নোটে প্রচলিত পয়সার হুকুম প্রযোজ্য। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পয়সার মাধ্যমে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বিনিময়ের কবজ শর্ত নয়; বরং অলংকার নির্দিষ্ট করলেই যথেষ্ট হবে।[২২৮]

৫. ইজারা

'ইজারা' আরবী শব্দ 'আজর' বা 'উজরাহ' থেকে উদ্ভূত। 'আজর' অর্থ (কোনোকিছুর বিপরীতে প্রদেয়) বিনিময়, প্রতিদান; 'উজরাহ' অর্থ পারিশ্রমিক, মজুরি, ভাড়া ইত্যাদি। আর 'ইজারা'র অর্থ হলো—কোনো জিনিস ভাড়ায় প্রদান করা; কোনো বস্তুর উপকারিতা/সুযোগ-সুবিধাগুলো (Utility, Advantage) বিক্রি করা[২২৯]। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় 'ইজারা' হলো—এমন এক চুক্তি, যেখানে ভাড়ার বিনিময়ে কারও কোনো সম্পদ ব্যবহারের অধিকার লাভ করা যায়। অর্থাৎ, ইজারা এমন একধরনের ব্যাবসায়িক চুক্তি, যেখানে ভাড়াগ্রহীতা নির্ধারিত ভাড়া প্রদানপূর্বক ভাড়াদাতার সম্পদ থেকে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। *হিদায়াহ* প্রণেতা এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—

الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع.

> ইজারা হলো—কোনোকিছুর বিনিময়ে (বস্তুর) উপকারিতাসমূহ ভোগের চুক্তিবিশেষ। কারণ, ইজারার আভিধানিক অর্থ হলো—(বস্তুর) উপকারিতাসমূহ বিক্রি করা।[২৩০]

এ অর্থে ইজারা ইংরেজি লিজিং (Leasing)-এর সমার্থক। এর সম্পর্ক হলো সম্পদ ও আসবাবপত্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগের সাথে। আরবীতে এর জন্য كِرَاء (কিরা) শব্দও ব্যবহার করা হয়।

ইজারার অন্য একটি অর্থ রয়েছে। এ অর্থানুসারে ইজারা হলো—কোনো ব্যক্তি থেকে কোনো সেবা (সার্ভিস) বা শ্রম গ্রহণ করা, যার বিনিময়ে তাকে বেতন-ভাতা-মজুরি প্রদান করা হয়। এ অর্থে ইজারার সম্পর্ক হলো—মানুষের

---

২২৮. তকী উসমানী, *ফিকহুল বুয়ূ*, পৃ. ৯৮৪

২২৯. মরগীনানী, *আল হিদায়াহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩১

২৩০. *তদেক*

যেকোনো সেবা ও শ্রমের সাথে। এ কারণে একে 'ইজারাতুল আশখাস' ও 'ইজারা আলাল আমল' (সার্ভিস ইজারা)-ও বলা হয়। এ প্রকারের ইজারা ওইসব লেনদেন অন্তর্ভুক্ত, যে লেনদেনগুলোতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি থেকে কোনো শ্রম বা সেবা গ্রহণ করে। শ্রম বা সেবাগ্রহণকারীকে 'মুস্তাজির' (ইজারাগ্রহীতা) এবং শ্রম ও সেবাদাতাকে 'আজীর' (মজুর/শ্রমিক/বেতনভোগী) বলা হয়। এ অর্থে যেকোনো পেশাজীবী যেমন—চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, শিক্ষক, মজদুর .. যাদের থেকে কোনো না কোনো শ্রম বা সেবা গ্রহণ করা হয় এবং তাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করা হয়, তাদের প্রত্যেককে 'আজীর' বলা যাবে এবং তাদেরকে প্রদেয় বেতন-ভাতা ও মজুরিকে 'উজরাহ' বলা হবে। ইজারার এ পদ্ধতি সম্পর্কে ফিকহের গ্রন্থগুলোতে বিশদ আলোচনা রয়েছে; তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ইজারা-সংশ্লিষ্ট কতিপয় মৌলিক বিধান ও শর্ত

ইজারা-চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় বিধান ও শর্ত রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক লেখক মুফতী তকী উসমানী তার *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি* বইয়ের মধ্যে এ বিধান ও শর্তগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ বিধান ও শর্তগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক বিধান ও শর্ত যদি পালন না করা হয়, তবে সেই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। নিম্নে ইজারার কতিপয় মৌলিক বিধান ও শর্ত অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

১. চুক্তিতে ইজারায় প্রদেয় সম্পদের বিবরণ, ভাড়ার মেয়াদকাল, ভাড়ার পরিমাণ, ভাড়া আদায়ের সময় সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

২. ইজারায় প্রদত্ত সম্পদ দীর্ঘসময় ধরে ভোগ-ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে। কাজেই প্রত্যেক এমন জিনিস, যা খরচ অর্থাৎ হাতছাড়া করা ব্যতীত ব্যবহার করা যায় না, সেগুলোর ইজারাও হবে না। এ কারণে নগদ অর্থ, পানাহারের বস্তু, লাকড়ি ও গোলা-বারুদ ইত্যাদির ইজারা সম্ভব নয়।

৩. ইজারার ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ যেহেতু মূলগতভাবে ইজারাদাতার মালিকানায় থাকে, তাই মালিকানার কারণে উদ্ভাবিত দায়িত্বসমূহও সে নিজেই বহন করবে; কিন্তু তা ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ

ইজারাগ্রহীতা বহন করবে। যেমন—বাড়ির ওপর আরোপিত সরকারি ট্যাক্স ইজারাদাতার দায়িত্বে থাকবে; পক্ষান্তরে পানি, বিদ্যুৎবিল ও বাড়ি ব্যবহারের কারণে অন্যান্য খরচ ইজারাগ্রহীতার দায়িত্বে থাকবে।

৪. ইজারা-চুক্তিতে যে উদ্দেশ্যে ইজারা নেওয়া হয়েছে ইজারাগ্রহীতা সেই সম্পদকে তা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না। চুক্তিতে যদি কোনো উদ্দেশ্য নির্ধারিত না হয়, তাহলে ইজারাগ্রহীতা তাকে ওইসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে, যেসব উদ্দেশ্যের জন্য সাধারণত তা ব্যবহার করা হয়।

৫. ইজারার ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ ইজারা চলাকালে ইজারাদাতার দায়ভারে থাকবে। অর্থাৎ, ইজারাগ্রহীতার কোনোরূপ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষয়ক্ষতি ইজারাদাতা বহন করবে। আর ইজারাগ্রহীতার পক্ষ থেকে সেই জিনিসের অন্যায় ব্যবহার কিংবা তার উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হবে—তার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব ইজারাগ্রহীতা বহন করবে।

৬. দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা সম্পদও ইজারার ভিত্তিতে দেওয়া যাবে এবং ভাড়া মালিকদের মাঝে মালিকানায় তাদের অংশানুপাতে বণ্টন হবে।

৭. যে ব্যক্তি কোনো সম্পদের মালিকানায় অংশীদার হবে, সে তার আনুপাতিক অংশ স্বীয় অপর অংশীদারকেই ভাড়া দিতে পারবে। অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া দিতে পারবে না।

৮. ইজারার পূর্ণ মেয়াদের জন্য চুক্তির সময় ভাড়া নির্ধারিত হতে হবে। ইজারার মেয়াদের বিভিন্ন ধাপের জন্য ভাড়ার বিভিন্ন পরিমাণ ধার্য করাও জায়িয আছে। যেমন—নির্দিষ্ট সময়ের পর (যেমন—এক বছর পর ভাড়া বিশেষ অনুপাতে যেমন—৫% বৃদ্ধি পাবে।) কিন্তু শর্ত হলো—প্রত্যেক ধাপের ভাড়ার পরিমাণ ইজারার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার সময়ই পরিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হতে হবে।

সমকালীন কোনো কোনো আলিম দীর্ঘমেয়াদি লিজে এ কথারও অনুমতি প্রদান করেন যে, ভাড়ার পরিমাণকে এমন পরিবর্তনীয় মাপকাঠির (ব্যাঞ্চমার্ক) সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, যা ভালোভাবে পরিজ্ঞাত হবে।

তাদের মতে—চুক্তিতে এরূপ শর্তারোপ করাও জায়িয আছে যে, যদি সরকারের পক্ষ থেকে ইজারাদারের ওপর ধার্যকৃত ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে ভাড়ায়ও সে-ই অনুপাতে বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। তারা আরও মনে করেন যে, ভাড়ায় বার্ষিক বৃদ্ধিকে মুদ্রার মূল্যমান হারের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। যদি মুদ্রার মূল্যমানের হার ৫% হয়, তাহলে ভাড়ায়ও ৫% বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

৯. ভাড়া সেই সামগ্রিক ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে, যা ইজারাদাতার এই জিনিস ক্রয়ে বহন করতে হয়েছে।

১০. ইজারাদাতা এককভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং এ ধরনের শর্তকৃত চুক্তিও বিশুদ্ধ হবে না।

১১. ভাড়ায় প্রদানকৃত সম্পদ ইজারাগ্রহীতাকে হস্তান্তর করার পূর্বে পূর্ণ ভাড়া বা তার কিছু অংশ অগ্রিমও আদায় করা যাবে। কিন্তু ইজারাদাতা এভাবে যে অর্থ গ্রহণ করবে তা অন অ্যাকাউন্টের ভিত্তিতে আদায় হবে এবং ভাড়া পরিশোধ হওয়ার পর তা তাতে সংযুক্ত করে নেওয়া হবে।

১২. ইজারার মেয়াদ ওই তারিখ থেকে শুরু হবে, যে তারিখে ইজারায় প্রদত্ত সম্পদ ইজারাগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করা হবে, চাই সে তা ব্যবহার করা শুরু করুক বা না করুক।

১৩. ইজারায় প্রদেয় সম্পদ যে উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হয়েছে যদি তা নষ্ট হয়ে যায় এবং মেরামত করাও সম্ভব না হয়, তাহলে ইজারা ওই তারিখ থেকে বাতিল হয়ে যাবে, যে তারিখে এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অনুসৃত ইজারার প্রকরণসমূহ

'ইজারা' ইসলামে অনুমোদিত একটি সনাতন কারবার পদ্ধতি। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে উপর্যুক্ত স্বাভাবিক কারবারে প্রচলিত নিয়মনীতির সাথে আরও কিছু নিয়মকানুন যুক্ত করে একে একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে নানাভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অনুসৃত ইজারাকে প্রধানত দু-প্রকারে ভাগ করা যায়—

ক. অপারেটিং ইজারা (الإجارة التشغيلية) ও

খ. ফিন্যান্সিয়াল ইজারা (الإجارة التمليكية أو التمويلية)

ক. অপারেটিং ইজারা

অপারেটিং ইজারা হলো—এমন কারবার, যেখানে ভাড়ার মেয়াদ সম্পূর্ণ হলে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করা হয় না। এ পদ্ধতিতে সম্পদের মালিকানা ইজারাদারেরই (অর্থাৎ ব্যাংকের) থাকে। ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের চুক্তিতে ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগদখল করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক নির্ধারিত সময়ে পণ্যের সূত্রে প্রাপ্ত ইজারার অর্থ থেকে তার মূলধন ব্যয় পূরণ করে মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিও অনেক কম।

মূলত অপারেটিং ইজারা হলো—একটি কোম্পানির জন্য একটি চুক্তি, যা একটি সম্পদ ব্যবহার করে এবং এটি ইজারাদাতার কাছে একই অবস্থায় ফেরত দেয়। ইজারাদাতা পুনরায় তা নতুন ব্যবহারকারীর নিকট ইজারা দিতে পারে। এভাবে ইজারার সম্পদটি নির্দিষ্ট সময়ের পরপর নিয়মিত ব্যবহার ও বিনিয়োগের অবস্থায় থাকে।

সাধারণত অপারেটিং ইজারার অধীনে ভাড়া দেওয়া সম্পদগুলোর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ও দামি মূল্যবান সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ সাফল্যের সাথে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পুঁজিনিবিড় মূলধনসামগ্রী ব্যবহার করার সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ—ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) পণ্যবাহী জাহাজ, তেলবাহী ট্যাংক, রেলওয়ে ওয়াগন, মাছ ধরার ট্রলার, দামি ও অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রভৃতি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের কাছে, ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের সরকারের কাছেও ইজারা দিচ্ছে। অপারেটিরং ইজারা দুটি ফর্মে বিভক্ত :

ক.১. ইজারা মুআইয়ানা (الإجارة المعينة)

ইজারা মুআইয়ানার আক্ষরিক অর্থ নির্দিষ্ট (বস্তুর) ইজারা। তা হলো—যে ইজারায় বর্তমানে বিদ্যমান কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্মত ভাড়ায় দেওয়া হয়। যেমন—বিদ্যমান বসতবাড়ি, ভবন ইত্যাদি।

ক.২. ইজারা মাওসূফা ফিয যিম্মাহ (الإجارة الموصوفة في الذمة)

'ইজারা মাওসুফা ফিয যিম্মাহ'-এর আক্ষরিক অর্থ দায়িত্ব নিয়ে ইজারা দেওয়া। এটি হলো এমন একধরনের ইজারা-চুক্তি, যেখানে এমন কোনো সম্পত্তি

(যেমন—গাড়ি, যন্ত্রপাতি)-এর ভোগ-ব্যবহার ভাড়া দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়, যা এখনও উৎপাদিত বা নির্মিত হয়নি; তবে তার গুণাগুণ উভয় পক্ষের সম্মতিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। কেউ কেউ একে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন—

..عقد على منفعة عين مباحة موصوفة، يمكن استيفاؤها، بعوض معلوم إلى مدة معلومة.

> ইজারা মাওসূফা ফিয যিম্মাহ হলো—এমন একধরনের চুক্তি, যেখানে এমন কোনো অনুমোদিত বস্তুর ভোগ-ব্যবহারের অধিকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বিনিময়ে দেওয়া হয়, যার গুণাগুণ বর্ণনা করা থাকে এবং যা সমর্পণ করা সম্ভব।[২৩১]

এটি মূলত ইসতিসনা ও ইজারার সমন্বয়ে তৈরি একটি নতুন ধরনের ইজারা। অর্থাৎ, ভাড়া-চুক্তির সময় চুক্তিকৃত সম্পদ বিদ্যমান না থাকলে এবং তার সেবা সরবরাহের দায় ভাড়াদাতার জিম্মাদারিতে থাকলে তাকে 'ইজারা মাওসূফা ফিয যিম্মাহ' বলা হয়। এ অর্থে এটি 'ফরওয়ার্ড ইজারা'-এর সমার্থক।

সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড সেল শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয; কিন্তু ফরওয়ার্ড ইজারা এ শর্তে জায়িয যে, ভাড়া ওই সময় পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে, যখন ইজারায় প্রদেয় সম্পদ ইজারাগ্রহীতার নিকট পূর্ণরূপে হস্তান্তর করা হবে।

খ. ফিন্যান্সিয়াল ইজারা

ফিন্যান্সিয়াল ইজারা এমন কারবার, যেখানে ভাড়ার মেয়াদ সম্পূর্ণ হলে সম্পত্তির মালিকানা ব্যাংকের নিকট থেকে ইজারাগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এটি তিনটি ফর্মে প্রচলিত রয়েছে। যথা—

খ.১. ইজারা বিল বাই (ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া)

'ইজারা বিল বাই' (الإجارة بالبيع) ইংরেজিতে 'হায়ার পারচেজ' নামে পরিচিত। এটি এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি, যেখানে একপক্ষ কোনো স্থায়ী প্রকৃতির

---

২৩১. https://www.aliftaa.jo/Research/203/ الإجارة-الموصوفة-في-الذمة

সম্পত্তি ক্রয় করে তা নির্ধারিত ভাড়া ও ক্রয়মূল্য নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে অন্য পক্ষের নিকট বিক্রি করে থাকে। এই বিনিয়োগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত সম্পদের মালিক হওয়া, ঝুঁকি বহন করা এবং সম্পদের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মালিক থাকা। একে ‘আল ইজারাহ ছুম্মা আল বাই’ (الإجارة ثم البيع)-ও বলা হয়।

এখানে পরিষ্কার যে, পদ্ধতিটিতে দুটি চুক্তি জড়িত। একটি ‘ইজারা’, যা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া নেওয়ার শর্তারোপ করে। অপরটি হলো ‘বাই’, যা ইজারার মেয়াদান্তে একটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করার অধিকার প্রদান করে।

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বা তার প্রতিনিধি সম্পূর্ণ নিজস্ব তহবিল দিয়ে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী কোনো সামগ্রী ক্রয় করে এবং তার নিকট এ শর্তে ভাড়া দেয় যে, গ্রাহক যদি কিস্তিতে সামগ্রীর মূল্য ও নির্ধারিত হারে ভাড়া নিয়মিত পরিশোধ করে, তাহলে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময় শেষে গ্রাহক সামগ্রীটির মালিক হয়ে যাবে। সম্পদের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক নির্ধারিত হারে ভাড়া পেতে থাকবে এবং এর পরিমাণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায়ই একই রকম হয়ে থাকে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্পদ গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু সম্পদটির মালিকানা থাকে ব্যাংকের হাতেই। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহার ক্ষমতা (حق التصرف) প্রতিষ্ঠিত হয়; মালিকানা (حق التملك) প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিক্রিত সম্পদের পূর্ণ মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ভাড়া-চুক্তি শেষে নামমাত্র মূল্যে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আসছে।

খ.২. ইজারা ওয়া ইকতিনা বা আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত তামলীক

‘ইজারা ওয়া ইকতিনা’ (الإجارة والاقتناء) আক্ষরিক অর্থে ইজারা ও মালিকানা। এটি ‘আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বিত তামলীক’ (الإجارة المنتهية بالتمليك) নামেও পরিচিত। এটি এমন একধরনের ইজারা, যেখানে ইজারা প্রদানকারী (ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক ইজারাগ্রহীতা (গ্রাহক)-কে পর্যায়ক্রমে বা চুক্তির মেয়াদান্তে ইজারায় প্রদত্ত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো ভাড়াযোগ্য সম্পদ (যেমন—কোনো রিয়েল অ্যাস্টেট বা স্থায়ী প্রকৃতির সম্পত্তি) বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়। ভাড়া (কিস্তি) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত মূলধন ও কাঙ্ক্ষিত মুনাফা বিবেচনায় রাখা হয়। গ্রাহক দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে ভাড়া পরিশোধ করেন। মেয়াদ শেষে ব্যাংক ভাড়াগ্রহীতার নিকট সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে চুক্তির সমাপ্তি ঘটে। ভাড়ার সব কিস্তি পরিশোধের পর নতুন হিবা চুক্তির মাধ্যমে বা প্রতীকী মূল্যে ও শেষ কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

এতে 'ইজারা বিল বাই'-এর মতো ইজারা-চুক্তি ও বিক্রয়-চুক্তি উভয়ই জড়িত থাকতে পারে অথবা ইজারা-চুক্তির সাথে হিবা অঙ্গীকারও থাকতে পারে। তাই এ পদ্ধতিতে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের পদ্ধতি/প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা ভাড়া-চুক্তি থেকে স্বতন্ত্র ডকুমেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। নিম্নে মালিকানা স্থানান্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহ উল্লেখ করা হলো :

ক. হিবা : এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক তার মালিকানাধীন সম্পদটি গ্রাহকের কাছে এ মর্মে ভাড়া প্রদানের চুক্তি করবে যে, গ্রাহক সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করলে সম্পদটি তাকে হিবা (هبة/দান) করা হবে। অতঃপর সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করা সম্পন্ন হলে একটি পৃথক হিবা চুক্তির মাধ্যমে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে ভাড়া-চুক্তিতে যদি উল্লেখ করা হয় যে, সম্পূর্ণ ভাড়া পরিশোধের পর সম্পদের মালিকানা হিবার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের বরাবর হস্তান্তরিত হবে, তাহলে পৃথক হিবা চুক্তির প্রয়োজন হয় না।

খ. নামমাত্র (টোকেন) মূল্য : এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক তার মালিকানাধীন সম্পদটি গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদান করে। মেয়াদ শেষে নামমাত্র মূল্যে (Token/رمزي) একটি স্বতন্ত্র বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করে গ্রাহকের কাছে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে।

গ. ভাড়া-চুক্তি শেষে নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ : এ প্রক্রিয়াটি ওপরের প্রক্রিয়ার মতোই। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, বিক্রয়মূল্যটি নামমাত্র হবে না; বরং উভয়ের সম্মতিক্রমে পূর্বনির্ধারিত হবে।

ঘ. চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ : এ প্রক্রিয়ায় ভাড়া-চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় গ্রাহক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে সম্পদের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।[২৩২]

এ পদ্ধতিটি মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক রিয়েল এস্টেটসহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

৪.৩. ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক (যৌথ মালিকানাভিত্তিক অংশীদারত্বের অধীনে ভাড়ায় ক্রয়)

'ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক' (الإجارة بالبيع تحت شركة الملك) ইসলামী ব্যাংকগুলোর অন্যতম জনপ্রিয় ফিন্যান্সিং মোড। এটি ইংরেজিতে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক', সংক্ষেপে 'এইচপিএসএম' নামে পরিচিত। এ নাম থেকেই বোঝা যায় যায় যে, এ কারবারে তিনটি বিষয় জড়িত। বিষয়গুলো হলো—শিরকাতুল মিলক, ইজারা ও বাই। এ কারণে কেউ কেউ একে 'হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতি' বলে থাকেন।

পরিভাষায় 'ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক' হলো—দুটি পক্ষ সম বা অসম অনুপাতে পুঁজি জোগান দিয়ে কোনো সম্পত্তির মালিকানা অর্জনপূর্বক পরস্পর সম্মতিতে ভাড়া ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট কিস্তিতে ভাড়া ও আসল পরিশোধের শর্তে একপক্ষের অংশ অন্য পক্ষের নিকট ভাড়া দেয় ও সম্পদটি বিক্রয় করে থাকে।

এ পদ্ধতির মধ্যে ইজারা বা ভাড়ার বিষয়টিই মুখ্য; বাকি বিষয় দুটি আনুষঙ্গিক। এ পদ্ধতিমতে—ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক কোনো সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে, সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে ইজারা প্রদান এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে।

---

২৩২. www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&ID=50

এ পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী তার নিকট বিক্রি করার চুক্তিতে অংশীদারি ভিত্তিতে পুঁজির জোগান দিয়ে যানবাহন, যন্ত্রপাতি, ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। এরপর নির্ধারিত কিস্তিতে বিক্রয়মূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহক পণ্যটি ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। একই সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের জন্যও অঙ্গীকার করে। এজন্য একে তিন চুক্তির সমাহার বলা হয়ে থাকে। যৌথভাবে পুঁজির জোগান দেওয়ার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া তাদের স্ব স্ব পুঁজির অংশ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সামগ্রীটির ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশের বিক্রয়মূল্য ও ভাড়ার অংশ কিস্তিতে পরিশোধ হয়ে গেলে চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক সামগ্রীটির নিরঙ্কুশ মালিকানা লাভ করে। উল্লেখ্য, প্রকল্পে ব্যাংকের মালিকানা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াও কমে যায়। কিন্তু গ্রাহকের সুবিধার্থে তাকে গড় ভাড়ার ভিত্তিতে প্রতিটি কিস্তি সমপরিমাণে পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিকে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি (Reducing Method)-ও বলা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিটি 'ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা' (المشاركة المتناقصة/ Diminishing Musharaka)-এর মতো দৃশ্যমান হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, মুশারাকা মুতানাকিসা বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা একটি অংশীদারি ব্যাবসা। এ পদ্ধতিতে অর্থায়নকৃত প্রকল্পের লাভ-লোকসান গ্রাহক ও ব্যাংক নির্ধারিত হারে বহন করে। ব্যবসায় লাভ হলে অংশীদারগণ সকলেই লাভবান হন, পক্ষান্তরে লোকসান হলে প্রত্যেক পক্ষ মূলধনে তার অংশের অনুপাতে ক্ষতি বহন করেন। পক্ষান্তরে 'ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক' পদ্ধতিটি কোনো ব্যাবসা নয় বা এখানে লাভ-লোকসানের কোনো প্রশ্ন নেই। কেননা, যৌথ মালিকানায় অর্জিত সম্পদটির ব্যাংকের অংশ গ্রাহককে ভাড়া দেওয়া হয়, সাথে সাথে তা বিক্রিও করা হয়। বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের অতিরিক্ত কোনো মুনাফা ধার্য করা হয় না। তবে ক্রয়মূল্যের সাথে নির্বাহী খরচও যোগ করা হয়। অতএব, এ পদ্ধটি ইজারা, শিরকাতুল মিলক ও বাই—এ তিন চুক্তির সমাহার হলেও এখানে ইজারা-চুক্তিই মুখ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়।[২৩৩]

---

২৩৩. রুহুল আমীন, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত হায়ার পারচেজ : একটি শরয়ী বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭ জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

নিম্নে পদ্ধতিটির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিশেষ দিক, বিধান ও শর্ত উল্লেখ করা হলো—

১. এই পদ্ধতিতে চুক্তিপত্রে ব্যাংক ও গ্রাহকের মূলধনের মালিকানার স্বীকৃতি থাকতে হবে। কারণ, চুক্তিপত্রের কোথাও গ্রাহকের আনুপাতিক মালিকানার স্বীকৃতি না থাকলে পরবর্তীকালে তার নিজের কিংবা তার ওয়ারিশদের প্রতারিত অথবা বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সম্পদের মালিকানা এককভাবে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেকোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে বা ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা একতরফাভাবে গ্রাহকের ওপর বর্তানোর আশঙ্কা থেকে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহকের মূলধনের আনুপাতিক মালিকানার স্বীকৃতি থাকা অপরিহার্য।

২. এই পদ্ধতিতে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভাড়া দেওয়া হয়।

৩. মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেও গ্রাহক ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা পরিশোধ করে সম্পদটির পূর্ণ মালিকানা পেতে পারে।

৪. ব্যাংক ও গ্রাহক পুঁজি অনুপাতে সম্পদের মালিকানা-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বহন করে।

৫. চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে সম্পদ বিক্রি করে না অথবা গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে সম্পদ ক্রয় করে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ পর্যায়ক্রমে/কিস্তিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার অঙ্গীকার করে এবং গ্রাহকও ওই সম্পদ নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করে নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

৬. চুক্তির শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানা অনুপাতে ভাড়া অব্যাহত থাকবে এবং অবস্থাভেদে ব্যাংক সম্পদটি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং তা বিক্রি ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় করতে পারে।

৭. ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে গ্রাহক সম্পদটির কোনো সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তর ইত্যাদি করতে পারে না।

৮. সম্পদটি অবশ্যই ভাড়াযোগ্য হতে হবে; পচনশীল বা ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়—এমন প্রকৃতি হবে না।

৯. ভাড়া মেয়াদের শুরুতে সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় এর দখল গ্রাহকের কাছে অর্পণ করতে হবে এবং যেদিন তা তার কাছে হস্তান্তর করা হবে, সেদিন থেকেই ভাড়া-চুক্তিটি কার্যকর হবে। তবে সম্পদ তৈরি, নির্মাণ বা ভাড়াযোগ্য হওয়ার পূর্বপর্যন্ত ব্যাংক গ্রাহককে অবকাশকাল (Gestation Period) দিতে পারবে। অবকাশকালে সম্পদের বিপরীতে ব্যাংক কোনো ভাড়া আরোপ করবে না। তবে অবকাশকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পদের ওপর মূল্য সংযোজন (Value Addition) করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সাধারণত এইচপিএসএম বিনিয়োগ হিসাব বিকলন করে উল্লিখিত বর্ধিত মূল্যকে অনার্জিত আয় (Un-earned Income) হিসাব শিরোনামে স্থানান্তর করে। উল্লেখ্য, এ আয় ভাড়া নয়; বরং সম্পদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য।

১০. সম্পদটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভাড়াসহ ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার থেকে স্বতন্ত্র। ভাড়া হচ্ছে সম্পদের সেবা বা সুবিধা ব্যবহারের মূল্য; তাই ভাড়ার পরিমাণকে দামের সাথে এক করা যাবে না।

১১. এ পদ্ধতিতে সম্পদ ক্রয়ের জন্য যেকোনো অংশীদারকে দায়িত্ব দেওয়া শরীয়তে বৈধ। তাই এ পদ্ধতিতে মঞ্জুরিকৃত টাকা সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে কিংবা তাকে নগদ প্রদান করা যাবে।

১২. ভাড়াগ্রহীতার কাছে সম্পদটি একটি ট্রাস্ট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই তার অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদির জন্য সম্পদটি কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হলে তার দায়ভার তাকে বহন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ নির্ণয়ে শরীয়তের আদল ও ইনসাফের নীতি অবলম্বনের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যদি সম্পদটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ক্ষতির সম্মুখীন হলে অথবা গ্রাহকের ইখতিয়ার-বহির্ভূত কোনোকিছু ঘটলে ব্যাংক ও গ্রাহক ইকুইটি অনুসারে ক্ষতির দায়ভার বহন করবে।

১৩. ভাড়া-চুক্তিটি একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি। কোনো পক্ষই এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

১৪. পরিশোধিত কিস্তি অনুসারে সম্পদে কিস্তির পরিমাণ মালিকানা হস্তান্তরিত হয় এবং ভাড়াও আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়।

১৫. ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে গ্রাহক ভাড়ার মেয়াদের ভেতরে—যদি সম্পদের কোনো ক্ষতি না হয়—তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে সম্পদটি পুনরায় ভাড়ায় দিতে পারে।

১৬. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগ আদায়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ গ্রাহকের যেকোনো সম্পদ জামানত হিসেবে নিতে পারে; তবে গ্রাহকের কাছ থেকে কোনো ক্যাশ সিকিউরিটি নেবে না।

ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক এবং ইজারা বিল বাই ও ইজারা ওয়া ইকতিনা-এর পার্থক্য

ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক	ইজারা বিল বাই ও ইজারা ওয়া ইকতিনা
বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের মূলধনের যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করেন, তিনি সম্পদের সেই পরিমাণ মালিকানা লাভ করেন।	বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পরই কেবল সম্পদের মালিক হন।
গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করার কারণে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায় মাসিক ভাড়ার পরিমাণও কমতে থাকে।	ব্যাংক সম্পদের মালিক বিধায় গ্রাহক যতদিন ব্যাংকের সমুদয় টাকা পরিশোধ না করবে, ততদিন ব্যাংক একই হারে ভাড়া আদায় করবে।
কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানা বেশি থেকে যায়। ফলে ব্যাংক মালিকানা অনুপাতে ভাড়া আদায় করতে পারে।	গ্রাহক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে সে ওই পরিমাণ টাকা পরবর্তী সময়ে পরিশোধ করতে পারে। তাতে ব্যাংক অতিরিক্ত কোনো ভাড়া দাবি করতে পারে না।
কিস্তির টাকা মূল বিনিয়োগ হিসাবেই জমা করা হয়।	কিস্তির টাকা আলাদাভাবে জমা করা হয়।

ইজারা (লিজিং)-কে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার : পর্যালোচনা

মুরাবাহার ন্যায় ইজারাও মূলগতভাবে অর্থায়ন-পদ্ধতি নয়; বরং এটি সাদাসিধে একটি ব্যাবসায়িক চুক্তি, কর্মকাণ্ড। এর বিধিবিধান ক্রয়-বিক্রয়ের বিধিবিধানের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রে কোনো জিনিস অপর ব্যক্তির নিকট মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়। পার্থক্য শুধু এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সম্পদ মূলগতভাবে ক্রেতার মালিকানায় চলে যায় আর ইজারায় সম্পদ স্বয়ং ভাড়া প্রদানকারীর মালিকানায় থাকে। ইজারাগ্রহীতার দিকে কেবল তা ভোগ-ব্যবহার করার অধিকার হস্তান্তর হয়।

এতৎসত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে তাতে কর থেকে নিষ্কৃতি/রেয়াত পাওয়ার যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেই সুযোগ-সুবিধা লাভের নিমিত্তে পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাকে অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্ভেজাল সুদি ঋণের পরিবর্তে কোনো কোনো পণ্য তাদের গ্রাহককে লিজের ভিত্তিতে দিচ্ছে। এসব পণ্যের ভাড়া নির্ধারণের সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ওই সামগ্রিক ব্যয়ের হিসাবও সংযোজন করে, যা উক্ত পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে তাদের বহন করতে হয়েছে এবং তাতে সেই নির্দিষ্ট সুদও সংযোজন করে দেওয়া হয়, যা লিজের সময়কালে ব্যাংক উক্ত অর্থ দ্বারা গ্রহণ করতে পারত। এ পদ্ধতিতে হিসাবকৃত সামগ্রিক অর্থকে লিজ চলাকালীন মাসের ওপর বণ্টন করা হয় এবং সেই অনুপাতে মাসিক ভাড়া ধার্য করে নেওয়া হয়। এ ধরনের ইজারাকে সাধারণত 'ফিন্যান্স লিজ' বলা হয়, যা 'অপারেটিং লিজ' থেকে ভিন্ন ধরনের এবং তাতে অপারেটিং ইজারার অনেক বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করা হয়।

সাম্প্রতিককালে যখন সুদবিহীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তখন তারা অনুভব করল যে, ইজারা বা লিজ সারা বিশ্বে সর্বস্বীকৃত একটি অতি লাভজনক অর্থায়ন-পদ্ধতি এবং এটি একটি সাশ্রয়ী অর্থায়ন হিসেবে অর্থনৈতিক মন্দার সময়ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারে। অপরদিকে তারা এ হাকীকতও অনুভব করল যে, লিজ শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি বৈধ চুক্তি, তাকে সুদবিহীন অর্থায়ন-পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ কারণে অনেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও লিজকে গ্রহণ করা শুরু করা দিয়েছে। কিন্তু খুব কম প্রতিষ্ঠানই এ দিকে লক্ষ রেখেছে যে, ইজারার

অর্থায়নে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যা অপারেটিং ইজারার পরিবর্তে একেবারে সুদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তারা এসব বৈশিষ্ট্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করা ব্যতীত লিজ চুক্তির সেই মডেলকেই ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে, যা আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবহৃত ছিল, অথচ তাদের অনেক কর্মকাণ্ড শরীয়াসম্মত নয়।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, মূলত একটি ব্যাবসায়িক চুক্তি; তবে নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তসাপেক্ষে শরীয়া অভিযোজনের মাধ্যমে এ চুক্তিকে অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের জন্য সুদের পরিবর্তে ভাড়া এবং বন্ধকের পরিবর্তে লিজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদের নাম ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়; বরং লিজিং ও সুদি ঋণের মাঝে সুস্পষ্ট প্রায়োগিক পার্থক্য হতে হবে। এ পার্থক্য তখনই সম্ভব যখন ইজারা-সংক্রান্ত সমুদয় শর্ত ও নীতিমালার অনুসরণ করা হবে (যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

বর্তমানে প্রায়োগিক দিক দিয়ে এ পদ্ধতিটি ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এটি এ দেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে দ্বিতীয় বৃহত্তর বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং মোট বিনিয়োগের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। একদিকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এ জাতীয় বিনিয়োগের প্রতি আলাদা আকর্ষণ থাকে, অন্যদিকে গ্রাহক পণ্যটি নিজের মালিকানা পাওয়ার আশায় এর পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন।

ইজারা-সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় : শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি

নিম্নে ইজারা-সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় এবং সেই সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হলো[২৩৪]—

১. একাধিক চুক্তির সমন্বয়

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট জানা যায়, মালিকানা প্রদানের শর্তে ভাড়া-বিষয়ক পদ্ধতিগুলো একক চুক্তিতে সম্পাদিত হয় না; বরং একাধিক চুক্তি

---

২৩৪. বিস্তারিত দেখুন, তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ১৫৮-১৭৩

একত্রিত হয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। যেমন 'ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক' ইজারা, বাই ও শিরকাতিল মিলক—এ তিনটি চুক্তির সমন্বিত রূপ; 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক' ইজারা ও বাই বা হিবার ভিত্তিতে গঠিত হয়; অনুরূপ 'ইজারা ছুম্মা বাই'ও ইজারা ও বাই ইত্যাদি চুক্তির সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়। এমনকি এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং জগতে অনুশীলিত 'ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতিটি মোট সাতটি চুক্তির সমাহার।[২৩৫]

উল্লেখ্য, এক লেনদেনে একাধিক চুক্তির একত্রিকরণ বৈধ কি না—এ প্রসঙ্গে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। চার মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, একই লেনদেনে একাধিক চুক্তির একত্রিকরণ বৈধ নয়। তারা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেন, যেখানে তিনি 'এক বেচাকেনায় দুই বেচাকেনা' ও 'এক লেনদেনে একাধিক লেনদেন' থেকে নিষেধ করেছেন।

অন্য মত অনুযায়ী, একই লেনদেনে একাধিক চুক্তির একত্রিকরণ বৈধ। ইমাম মালিক (৭১১-৭৯৫ খ্রি.)[২৩৬]-সহ প্রত্যেক মাযহাবের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

---

২৩৫. চুক্তি সাতটি হলো :

১. সম্পদের মালিক ও ব্যাংকের মধ্যকার ওকালা-চুক্তি,

২. সম্পদের মালিক ও ব্যাংকের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি,

৩. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার ভাড়া চুক্তি,

৪. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভাড়া দেওয়া সম্পদ মেয়াদ শেষে ক্রয় অথবা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার প্রদানের প্রতিশ্রুতি-সংবলিত চুক্তি,

৫. ভাড়ার কিস্তি প্রদানের জন্য মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার মুদারাবা চুক্তি,

৬. গ্রাহক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানির মধ্যকার ইন্সুরেন্স চুক্তি,

৭. ভাড়ার কিস্তি পরিশোধের পর গ্রাহক উক্ত সম্পদ ক্রয় করতে চাইলে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার মুরাবাহা চুক্তি।

(দ্র : মুস্তফা শামসুদ্দীন, *আকদুল ইজাবাহ ছুম্মাল বাই : দিরাসাহ নাকদিয়্যাহ*, পৃ. ২৯)

২৩৬. ইমাম মালিক বিন আনাস, *আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা*, বৈরুত : দারু সাদির, ২০০৫ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ১৬১৭

ফকীহ এ মত পোষণ করেন। এ ছাড়া হাম্বলী ফকীহগণের মধ্যে ইবন তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.)[২৩৭] ও ইবনুল কাইয়িম (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.)[২৩৮] একাধিক চুক্তির একত্রিকরণ অথবা এক চুক্তিতে অন্য চুক্তির শর্তারোপ বৈধ গণ্য করেছেন। তারা শর্ত ও চুক্তি পালন-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের ব্যাপকার্থ থেকে এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন।[২৩৯]

এ প্রসঙ্গে AAOIFI প্রণীত শরীয়া মানদণ্ডে উল্লিখিত ধারাটি প্রণিধানপ্রাপ্ত—

يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحد منها جائزا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع.

একই নথিতে একাধিক চুক্তির একত্রিকরণ বৈধ—যদি তন্মধ্যে প্রত্যেক চুক্তিই পৃথকভাবে বৈধ হয়—যে যাবৎ না তাতে এর প্রতিবন্ধক কোনো শারয়ী দলিল বিদ্যমান থাকে; তবে এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি পূরণের শর্তারোপ করা যাবে না।[২৪০]

---

২৩৭. ইবন তাইমিয়া, *মাজমূউল ফাতওয়া*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি., খ. ২৯, পৃ. ১৩২

২৩৮. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন*, রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ২০০২ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৮২

২৩৯. যেমন আল্লাহর বাণী—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করো।" (আল-কুরআন, ৫:১)

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .

"মুসলমানগণ তাদের শর্ত পালনে বদ্ধপরিকর শুধু ওই শর্ত ব্যতীত, যা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে।"

(দ্র. তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম আন রাসূলিল্লাহি সা., বাবু মা জুকিরা আন রাসূলিল্লাহি ফীস সুলহি বায়নান নাস, হা. নং : ১৩৫২)

২৪০. *আল-মাআঈর আশ শারঈয়্যাহ*, বাহরাইন : হাইয়াতুল মুহাসাবাহ ওয়াল মুরজাআহ লিল মুআসসাসাতিল মালিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০১৪, ধারা ৩, মানদণ্ড নং ২৫ (আল-জাময়ু বাইনাল উকূদ), পৃ. ৪২১

২. বিনিময় চুক্তিকে শর্তযুক্ত করা

'ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক', 'ইজারা মুনতাহিয়াহ বিত-তামলীক ও ইজারা ছুম্মা বাই'-এর প্রায়োগিক রূপ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলোর মূল চুক্তি তথা 'ইজারা' একটি বিনিময় চুক্তি (عقد معاوضة), তদুপরি এসব প্রোডাক্টের বাস্তবায়নের প্রয়োজনে এ বিনিময় চুক্তি তথা ইজারাকে বিভিন্ন শর্তযুক্ত করা হয়েছে, ফকীহগণ যেগুলোকে ইজারা-চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেননি। যেমন—ভাড়া প্রদত্ত সম্পদের ইন্স্যুরেন্স, ইজারা-চুক্তির মেয়াদের অন্তর্বর্তী সময়ে ভাড়াদানকারীর উক্ত সম্পদে বাড়তি হস্তক্ষেপ, ভাড়াপ্রদত্ত সম্পদের বিক্রয় ইত্যাদি। অতএব, বিনিময় চুক্তিকে এক বা একাধিক শর্তযুক্ত করার বিধান আলোচনার দাবি রাখে। এ বিষয়ে ফকীহগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

ক. হানাফীগণ বলেন—চুক্তির সাথে অপ্রাসঙ্গিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অকার্যকর শর্ত যুক্ত করা হলে তা ফাসিদ হিসেবে গণ্য।[২৪১] অতএব, তাদের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক শর্ত বিবেচ্য।

খ. মালিকীগণের মতে, শর্ত যুক্ত করা বৈধ, যদি তা কোনো শারয়ী নিষেধাজ্ঞায় লিপ্ত হওয়ার উপলক্ষ্যে পরিণত না হয় বা চুক্তির মূল দাবির বিরোধী না হয়।[২৪২]

গ. শাফিয়ীগণের দৃষ্টিতে চুক্তির সাথে চার প্রকার শর্ত সংযুক্ত করা বৈধ : যা চুক্তির মূল দাবির সাথে সংগতিপূর্ণ, যা এর প্রাসঙ্গিক, যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর নস রয়েছে এবং যার মধ্যে চুক্তির উদ্দেশ্য অর্জিতও হয় না বা লঙ্ঘিতও হয় না, আবার তাতে কোনো ক্ষতিও নেই।[২৪৩]

ঘ. হাম্বলীগণের মতে, চুক্তিতে শর্ত সংযুক্ত করা সহীহ; তবে যেসব শর্তে শরীয়া ও চুক্তির মূল উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয় তা ব্যতীত।[২৪৪]

---

২৪১. ইবনু আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররুল মুখতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০০ খ্রি., খ. ৭, পৃ. ২৮২

২৪২. ইবনু রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ৫, পৃ. ৩

২৪৩. ইবন হাজর আল-হায়তামী, *তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৭ হি./১৯৮৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৩

২৪৪. ইবন কুদামা, *আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল মুকনা*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি., খ. ১১, পৃ. ২৩

অতএব বলা যায়, কোনো বিনিময় চুক্তিতে বিশেষ কোনো শর্তারোপ করা মৌলিকভাবে বৈধ। তবে যেসব শর্তে শরীয়া লঙ্ঘিত হয় বা চুক্তিকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে—এ জাতীয় শর্ত সংযুক্ত করা হলে তা পরিত্যাজ্য হবে।

৩. বিক্রয় চুক্তিকে ভবিষৎ শর্তের সাথে সংযুক্ত করা

উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকৌশল থেকে এটাও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে সম্পদের বিক্রয় ভাড়ার কিস্তি পরিশোধের শর্তসাপেক্ষে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয়টি সম্পূর্ণভাবে কিস্তি পরিশোধের ওপর নির্ভরশীল। কিস্তি পরিশোধ সমাপ্ত হলেই কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উল্লেখ্য, বিক্রয়কে কোনো শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। চার মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় কোনো শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করা বৈধ নয়।[২৪৫] এরূপ শর্তারোপ চুক্তির মূল দাবির বিরোধী। কারণ, চুক্তির মূল চাহিদা তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হওয়া; ঝুলন্ত থাকা নয়। তবে ইমাম ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম রাহ. প্রমুখের মতে, ক্রয়-বিক্রয়কে বিশেষ শর্তের ওপর নির্ভরশীল করা বৈধ।[২৪৬] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন—

> ونحن بينا في غير هذا الموضع أنه يجوز تعليق العقود بالشروط، إذا كان في ذلك منفعة للناس، ولم يكن متضمنا ما نهى الله عنه ورسوله، فإن كل ما ينفع الناس، ولم يحرمه الله ورسوله هو من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه. وذكرنا عن أحمد جواز تعليق البيع بشرط، ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك، بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز، كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي.

---

২৪৫. আবূ বকর মুহাম্মদ আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে*, বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ২০০০খ্রি., খ. ৪, পৃ. ৩৮৫; শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৩৯৬; মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আশ শারবিনী, *মুগনী আল-মুহতাজ ইলা মারিফাতি মাআনী আলফাজিল মিনহাজ*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৪৭; ইবন কুদামাহ, *আশ শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ৬৬

২৪৬. ইবনু তাইমিয়া, *নজরিয়্যাতুল আকদ*, বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৯৬০ খ্রি., পৃ. ২২৭; ইবনুল কাইয়িম, *আলামুল মুয়াক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯

> আমরা একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছি যে, চুক্তিকে বিশেষ শর্তের ওপর নির্ভরশীল করা বৈধ, যদি তাতে মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত না হয়। কেননা, যা-কিছু মানবতার কল্যাণসাধন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা নিষিদ্ধও করেননি সেগুলো অবশ্যই বৈধতার অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম করার অধিকার কারও নেই। আমরা ইমাম আহমাদ রাহ. থেকে ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তের সাথে যুক্ত করার বৈধতা বর্ণনা করেছি। তাঁর বা পূর্বসূরি তাঁর কোনো সাথি থেকে এর বিরোধী কোনো উক্তিও আমি পাইনি। বরং উত্তরসূরি কেউ কেউ একে অবৈধ বলেছে, যেমন শাফিয়ী মাযহাবের অনেকে এমনটি বলে থাকেন।[২৪৭]

এ মাসআলায় দ্বিতীয় পক্ষের অভিমত তথা ক্রয়-বিক্রয়কে কোনো শর্ত বা শর্তাবলির সাথে যুক্ত করা বৈধ হওয়ার মতকে অধিকতর অগ্রগণ্য বিবেচনা করা যায়।

৪. হিবাকে শর্তযুক্ত করা

যারা 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক'-এর মালিকানা হস্তান্তরের পদ্ধতিকে হিবা দিয়ে অভিযোজন করেন, তাদের মতানুযায়ী হিবাকে কিস্তি পরিশোধের শর্তযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, এ শর্ত প্রদান করা হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তিসমূহ পরিশোধ করা হলেই কেবল হিবার মাধ্যমে সম্পদটির মালিকানা স্থানান্তর করা হবে।

ফকীহগণ হিবাকে শর্তযুক্ত করার বৈধতার প্রশ্নে মতভেদ করেছেন। হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, হিবাকে কোনো শর্তের আবর্তে যুক্ত করা বৈধ নয়। কেননা, হিবা একটি মালিকানা প্রদানকারী চুক্তি, যা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়। যদি একে ভবিষ্যতের কোনো শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ করা হয়, তবে তা উক্ত মালিকানাকে অস্পষ্টতা ও ঝুঁকির দিকে নিয়ে যায়।[২৪৮] কিছু কিছু হানাফী ফকীহ[২৪৯], মালিকী মাযহাব[২৫০], হাম্বলী

---

২৪৭. ইবন তাইমিয়া, *নাজরিয়্যাতুল আকদ*, পৃ. ২২৭

২৪৮. কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খ. ৫, পৃ. ১৬৮; রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৫, পৃ. ৪০৯; বুহুতী, *কাশশাফুল কি না*, খ. ৪, পৃ. ৩০৭

মাযহাবের ইমাম ইবন তাইমিয়া[২৫১] ও ইবনুল কাইয়্যিম রাহ.[২৫২]-এর মতে, এ ক্ষেত্রে পরিচিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংগত শর্তারোপ বৈধ, যদি তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত না হয়। কেননা, হিবা একটি দাক্ষিণ্য চুক্তি, যাতে অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও ঝুঁকি বিবেচ্য হয় না। তা ছাড়া দানকারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, তিনি তার দানকে যেকোনো শর্তের সাথে যুক্ত করতে পারেন, যে যাবৎ না হারাম কিছু হালালে এবং হালাল কিছু হারামে পরিণত হয়। এর প্রমাণ উম্মু কুলসুম বিনত আবি সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন উম্মে সালমাকে বিবাহ করেন তখন তাকে বলেন—

إني قد أهديت للنجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك.

আমি নাজ্জাশীর কাছে এক সেট কাপড় ও কয়েক উকিয়া মিশক উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছি। আমার ধারণা, নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেছে, আমার আরও মনে হয় যে, আমার উপঢৌকন আমার কাছেই ফিরে আসবে। যদি ফেরত আসে তবে তা তোমার।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর ধারণামতো উক্ত উপঢৌকন তাঁর কাছে ফেরত আসে। তখন তিনি তার প্রত্যেক স্ত্রীকে এক উকিয়া পরিমাণ মিশক প্রদান করেন এবং উম্মে সালমাকে বাকি মিশক ও কাপড় প্রদান করেন।[২৫৩]

৫. সম্পদ কবজের পূর্বে গ্রাহকের ওপর তার ভাড়া আরোপ

ফিন্যান্সিয়াল লিজের অনেক ক্ষেত্রে ইজারাদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অভীষ্ট পণ্যকে স্বয়ং ইজারাগ্রহীতার মাধ্যমে ক্রয় করে। ইজারাগ্রহীতা সেই পণ্য ইজারাদাতা

---

২৪৯. আফনাদী, *হাশিয়াতু কুররাতু উয়িনিল আখইয়ার তাকমিলাতু রাদ্দিল মুহতার*, করাচি : মাকতাবা মাজিদিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি., খ. ২, পৃ. ৩৩১

২৫০. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ২৪৭

২৫১. ইবন তাইমিয়া, *নাজরিয়্যাতুল আকদ*, পৃ. ২২৭

২৫২. ইবনুল কাইয়িম, *আলামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯

২৫৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল কাবাঈল, হাদীসু উম্মে কুলসুম বিনতে আকবাহ, খ. ১৪, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং : ২৭১৫১

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ক্রয় করে এবং তার মূল্য সরবরাহকারীকে প্রদান করে। কখনও কখনও মূল্য ইজারাদাতা সরাসরি পরিশোধ করে, আবার কখনও কখনও ইজারাগ্রহীতার মাধ্যমে পরিশোধ করে। লিজের কোনো কোনো চুক্তিতে লিজ ওই দিন থেকেই শুরু হয়ে যায়, যে দিন ইজারাদাতা মূল্য পরিশোধ করে। অথচ এ দিকে লক্ষ রাখা হয় না যে, ইজারাদার পণ্য সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করে তা কবজ করেছে কি না? এর অর্থ দাঁড়ায় যে, ইজারাদারের পণ্য কবজ করার পূর্বেই তার ওপর ভাড়ার দায় শুরু হয়ে যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে—এটা জায়িয নয়। কেননা, তা গ্রাহককে প্রদেয় অর্থের ওপর ভাড়া গ্রহণ করার সাথে মিলে যায়, যা নির্ভেজালভাবে সুদ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক পদ্ধতি হলো—ভাড়া ওই তারিখ থেকে গ্রহণ করা হবে, যেদিন থেকে ইজারাগ্রহীতা ইজারার সম্পদ কবজ করবে; যে তারিখে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সেই তারিখ থেকে নয়। সরবরাহকারী যদি মূল্য গ্রহণ করার পর পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে ইজারাগ্রহীতা বিলম্বের সময়ের ভাড়া প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে না।

উল্লেখ্য, যখন ইজারায় প্রদেয় সম্পদের ক্রয়ের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রাহককে দেওয়া হবে, তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের মাঝে পৃথক দুটি সম্পর্ক স্থাপন হবে, যা পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে। প্রথম ধাপে গ্রাহক ওই পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়াকিল হিসেবে নিযুক্ত হবে। এই ধাপে উভয়ের মাঝে ওয়াকিল ও মুওয়াক্কিলের চেয়ে অধিক কোনো সম্পর্ক হয় না। ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা হিসেবে সম্পর্ক এখনও কার্যকর হয়নি। দ্বিতীয় ধাপ ওই তারিখ থেকে শুরু হবে, যখন গ্রাহক সরবরাহকারী থেকে পণ্য কবজ করে নেবে। এ ধাপেই উভয়ের মাঝে ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার সম্পর্ক কার্যকর হবে।

দু-পক্ষের এই পৃথক দুদিককে পরস্পরে তালগোল পাকানো যাবে না। প্রথম ধাপ চলাকালীন গ্রাহকের ওপর ইজারাদাতার দায়িত্ব অর্পিত হবে না। এ ধাপে সে কেবল একজন ওয়াকিল হিসেবে দায়িত্বশীল হবে। তবে পণ্য যখন তার কবজায় দিয়ে দেওয়া হবে, তখন সে ইজারাগ্রহীতা হিসেবে তার দায়িত্বশীল হবে।

এ ক্ষেত্রে মুরাবাহা ও ইজারার একটি পার্থক্য রয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় তখনই সংঘটিত হয়, যখন গ্রাহক সরবরাহকারী

থেকে পণ্য কবজ করে নেয় এবং মুরাবাহার পূর্বচুক্তি ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং গ্রাহক ওয়াকিল হিসেবে পণ্যটি কবজ করার পর আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে অবশ্যই অবহিত করবে এবং তা ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবও পেশ করবে। ক্রয়-বিক্রয় তখনই সংঘটিত হবে যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে ইজারার মধ্যে উভয় পক্ষের কবজ করার প্রয়োজন নেই; বরং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি গ্রাহককে তার ওয়াকিল নিয়োগের সময় কবজের তারিখ থেকে ওই সম্পদ ইজারার ভিত্তিতে প্রদান করার ব্যাপারে একমত পোষণ করে নেয়, তাহলে ইজারা ওই তারিখ থেকে নিজে নিজেই শুরু হয়ে যাবে।

৬. অবকাশকালীন ভাড়া নেওয়া

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পদ তৈরি, নির্মাণ বা ভাড়াযোগ্য হওয়ার পূর্বপর্যন্ত ব্যাংক গ্রাহককে অবকাশকাল দিতে পারবে এবং এ সময়ে সম্পদের বিপরীতে ব্যাংক কোনো ভাড়া আরোপ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে যে বাড়ি, গাড়ি বা মেশিনপত্র ভাড়া দেওয়া হবে, তা ব্যবহারযোগ্য হওয়ার আগে গ্রাহক থেকে ভাড়া আদায় করা বৈধ নয়।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যাংক এ অবকাশকালে গ্রাহক থেকে ভাড়া আদায় করে নেয়।

৭. মালিকানার কারণে বহনকৃত ব্যয় গ্রাহকের ওপর চাপানো

ইজারাদার যেহেতু ইজারায় প্রদেয় সম্পদের মালিক এবং সে তার ওয়াকিলের মাধ্যমে তা ক্রয় করেছে, সেহেতু তার ক্রয় ও মালিকানা গ্রহণের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভারের দায়িত্বও সে বহন করবে। সুতরাং কাস্টম ডিউটি ও মালের ভাড়া ইত্যাদির ব্যয়ভারও সে-ই বহন করবে। সে এই ব্যয়সমূহকে খরচে সংযুক্ত করে ভাড়া নির্ধারণের ব্যাপারে সেগুলোর দিকেও লক্ষ রাখতে পারবে; কিন্তু মূলত সে মালিক হওয়ার সুবাদে ওইসব ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব তার ওপর।

কাজেই যেসব চুক্তি এর পরিপন্থি হবে—যেমন আধুনিক ফিন্যান্সিয়ালে লিজে হয়ে থাকে—তা শরীয়াসম্মত হবে না।

৮. সকল ক্ষয়ক্ষতির দায় গ্রাহকের ওপর চাপানো

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইজারাগ্রহীতার অন্যায় ব্যবহার কিংবা অবহেলার কারণে সম্পদে যেসব ক্ষয়ক্ষতি হবে, ইজারাগ্রহীতা সেসব ক্ষতির ব্যাপারে দায়িত্ব বহন করবে। সাধারণ ব্যবহারের কারণে যেসব ক্ষয়ক্ষতি হবে তার ব্যাপারেও ইজারাগ্রহীতাকে দায়ী বানানো যাবে; কিন্তু তার সামর্থ্যের বাইরের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে তাকে দায়ী করা যাবে না।

আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল লিজে সাধারণত দু-প্রকারের ক্ষতির মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয় না। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ইজারায় উভয় প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। অন্যথায় তা শরীয়াসম্মত হবে না।

৯. ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ প্রসঙ্গ

কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদের হারকে ভাড়া নির্ধারণের জন্য মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে। এ ব্যাংকগুলো ইজারার মাধ্যমে সেই পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে চায়, যে পরিমাণ আধুনিক ব্যাংকগুলো সুদি ঋণ প্রদান করে অর্জন করে। এজন্য তারা ভাড়ার হারকে সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত করে নেয় এবং ভাড়ার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করার পরিবর্তে তারা ইজারার ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় হিসাব করে এবং তারা চায়, সম্পদের ভাড়ার দ্বারা ওই পরিমাণ অর্থোপার্জন করবে, যা সুদের হারের সমান হবে কিংবা সুদের হারের চেয়ে সামান্য কমবেশি হবে। অধিকন্তু, এ হারের সাথে বাজারের কোনো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের ভাড়ার হার মেলে না।

সাধারণ দৃষ্টিতে এটি যেহেতু ব্যাবসা, ব্যাংক গ্রাহকের কাছে একটি সম্পদ ভাড়া দিচ্ছে এবং এর বিপরীতে ভাড়া তুলছে, তাই দৃশ্যত এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো কোনো শরীয়া আইন লঙ্ঘন করেছে। ইতঃপূর্বে মুরাবাহা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, হালাল মুনাফা নির্ধারণের জন্য সুদের হারকে ব্যবহার করা মোটের ওপর পছন্দনীয় নয় এবং এর দ্বারা এ লেনদেন ন্যূনপক্ষে বাহ্যিকভাবে হলেও সুদি ঋণের সাথে সাদৃশ্য তৈরি হয়ে যায়। আর সুদ কঠোরভাবে হারাম হওয়ার দাবি হলো—এই বাহ্যিক সাদৃশ্য থেকেও যথাসম্ভব বেঁচে থাকা উচিত। তদুপরি এ অবস্থায় দৃশ্যত লাভের দিক দিয়ে কনভেনশনাল ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে বড়ো কোনো পার্থক্য

দেখা যায় না। ফলে সাধারণ জনমনে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সংশয় তৈরি হয়। তারা মনে করে যে, ইসলামী ব্যাংক সরাসরি হয়তো সুদ খায় না; কিন্তু ঘুরিয়ে খায়।

১০. বিলম্বে ভাড়া পরিশোধের কারণে জরিমানা

ফিন্যান্সিয়াল লিজের কোনো কোনো চুক্তিতে ভাড়া পরিশোধে বিলম্বের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়। এ জরিমানা যদি ইজারাদাতার আয়-উপার্জনে সংযোজন হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নেই। কেননা, ভাড়া যখন পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তখন তা গ্রাহকের ওপর একটি দেনা হয়ে যায় এবং এর ওপর ঋণের সকল বিধান প্রযোজ্য হবে। ঋণ পরিশোধ বিলম্বের কারণে ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ সুদ। কাজেই ইজারাগ্রহীতা যদি ভাড়া পরিশোধে বিলম্বও করে, তাহলে ইজারাদাতা গ্রাহক থেকে দেনার ওপর অতিরিক্ত অর্থ দাবি করতে পারে না।

এই নিষিদ্ধতা দ্বারা অন্যায় স্বার্থ উদ্ধারের কারণে যে লোকসান হয় তা থেকে বাঁচার জন্য আরেকটি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তা হলো— গ্রাহককে এই অঙ্গীকারের কথা বলা হবে যে, সে যদি র্নিধারিত সময়ে ভাড়া পরিশোধে অপারগ হয়, তাহলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য দান করবে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করবে, যেখানে এ ধরনের অর্থ জমা করা হবে এবং তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।

গ্রাহকের পক্ষ থেকে এ ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণের বৈধতা প্রসঙ্গে ‘মুরাবাহা’-পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১১. ইজারা সমাপ্ত করা প্রসঙ্গ

ইজারাগ্রহীতা যদি কোনো শর্তের বিরোধিতা করে, তাহলে ইজারাদাতার এককভাবে ইজারাকে সমাপ্ত করে দেওয়ার অধিকার আছে। তবে গ্রহীতার পক্ষ থেকে যদি কোনো শর্তের বিরোধিতা পাওয়া না যায়, তাহলে ইজারাকে পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত সমাপ্ত করতে পারবে না। ফিন্যান্সিয়াল লিজের কোনো কোনো চুক্তিতে লক্ষ করা যায় যে, ইজারাদারকে তার ইচ্ছানুযায়ী একক সম্মতি ও সিদ্ধান্তে লিজ সমাপ্ত করার অসীম স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এটা শরীয়তের মূলনীতি পরিপন্থি।

ফিন্যান্সিয়াল লিজের কোনো কোনো চুক্তিতে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, লিজ সমাপ্তির ক্ষেত্রে লিজের অবশিষ্ট মেয়াদের ভাড়াও গ্রাহককে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, যদিও লিজ ইজারাদারের সম্মতিতে সমাপ্ত হয়। এ শর্তটিও স্পষ্টত শরীয়ত এবং ইনসাফ ও ন্যায়ের পরিপন্থি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে—লিজ সমাপ্তির পরিণত এমন হওয়া উচিত যে, ইজারাদাতা তার জিনিস ফেরত নিয়ে নেবে এবং গ্রাহক থেকে এ দাবি করতে পারবে যে, লিজ সমাপ্তির সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। যদি লিজ সমাপ্তি গ্রাহকের অন্যায় ব্যবহার কিংবা অসতর্কতার কারণে হয়, তবে এতে যে লোকসান হবে ইজারাদার তার বিনিময়ও দাবি করতে পারবে। কিন্তু তাকে অবশিষ্ট মেয়াদের ভাড়া পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

১২. পণ্যের বিমা

যদি ইজারার ভিত্তিতে প্রদেয় পণ্যের ইসলামী তাকাফুল পদ্ধতি অনুযায়ী বিমা করতে হয়, তাহলে তা ইজারাদাতার খরচে হতে হবে; গ্রাহকের খরচে নয়।

১৩. পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর

আধুনিক ইজারা অর্থায়ন-পদ্ধতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এতে লিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর লিজের ভিত্তিতে প্রদেয় পণ্যের মালিকানা গ্রাহকের দিকে অর্পণ হয়ে যায়। ইজারাদাতা যেহেতু তার ব্যয় মুনাফাসহ উসুল করে নেয় এবং এ মুনাফা সাধারণত ওই সুদের সমপরিমাণ হয়ে থাকে, যা লিজ চলাকালে এ অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করা যেত। এ কারণে ইজারাদাতার লিজের পণ্যে অতিরিক্ত আগ্রহ থাকে না। অপরদিকে গ্রাহক লিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পণ্যটি তার নিকট রাখতে চায়।

এসব কারণে লিজের পণ্য লিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণত ইজারাদারদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়। কখনও বিনিময় ছাড়া, কখনও নামমাত্র মূল্যে। পণ্যটি ইজারাগ্রহীতাকে দেওয়া হবে—এ কথা নিশ্চিতকল্পে এ শর্তটি লিজ চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। আবার কখনও এ শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ তো করা হয় না, কিন্তু এ কথা উভয় পক্ষের মাঝে প্রতিশ্রুত ও সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হয় যে, লিজের মেয়াদ সমাপ্তির পর সেই পণ্যের মালিকানা গ্রাহকের হয়ে যাবে।

এ শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকুক কিংবা বাহ্যিকভাবে সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হোক—উভয় অবস্থায় শরীয়তের মূলনীতি-বিরোধী। ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ সূত্র হলো—একটি চুক্তিকে অপর চুক্তির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যাবে না, একটি অপরটির জন্য পূর্বশর্ত হয়ে যায়। এখানে পণ্যের মালিকানা ইজারাগ্রহীতার দিকে অর্পণ হওয়াকে লিজ চুক্তির জন্য আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নেই।

শরীয়তের আসল দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এই পণ্য কেবল ইজারাদাতার মালিকানায় থাকবে। লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, হয়তো এ পণ্য ফেরত নিয়ে নেবে কিংবা লিজ নবায়ন করবে অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে লিজ প্রদান করবে কিংবা এ পণ্য ইজারাগ্রহীতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে দেবে। গ্রহীতা ইজারাদারকে নামমাত্র মূল্যে পণ্যটি তার নিকট বিক্রি করার ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না এবং এ ধরনের কোনো শর্তও লিজ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তবে লিজের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর ইজারাদাতা যদি সেই পণ্য ইজারাগ্রহীতাকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করতে চায় কিংবা তার নিকট বিক্রি করতে চায়, তাহলে সে স্বীয় সম্মতিতে তা করতে পারবে।

সমকালীন কোনো কোনো আলিম ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি লক্ষ রেখে একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছেন। তারা বলেন, যদিও ইজারা-চুক্তিকে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পণ্য বিক্রি বা উপঢৌকন হিসেবে প্রদানের সাথে শর্তারোপ করা যাবে না, তবে ইজারাদাতা এককভাবে অঙ্গীকার করতে পারে যে, লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উক্ত পণ্যটি সে ইজারাগ্রহীতার নিকট বিক্রি করে দেবে। এই অঙ্গীকার কেবল ইজারাদারের ওপর অপরিহার্য হবে।

তারা এ কথারও অনুমতি প্রদান করেন যে, ইজারাদাতা বিক্রির পরিবর্তে মেয়াদ শেষে পণ্যটি ইজারাগ্রহীতাকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদানেরও অঙ্গীকার করতে পারে; তবে শর্ত হলো—ইজারাগ্রহীতা ভাড়া পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

এই পদ্ধতিকে 'ইজারা ও ইকতিনা' বলা হয়। সমকালীন অনেক আলিম এ পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর ওপর ব্যাপকভাবে আমল করা হচ্ছে। পদ্ধতিটি দুটি মৌলিক শর্তসাপেক্ষে জায়িয :

ক. লিজ চুক্তি মৌলিকভাবে বিক্রির অঙ্গীকার বা উপঢৌকনের অঙ্গীকারের ওপর স্বাক্ষর করার সাথে শর্তযুক্ত না হতে হবে; বরং এ অঙ্গীকার পৃথক ডকুমেন্টের মাধ্যমে হতে হবে।

খ. অঙ্গীকার এক তরফা হতে হবে এবং তা কেবল অঙ্গীকারকারীর ওপর অপরিহার্য হতে হবে। দু-পক্ষীয় চুক্তি না হতে হবে, যা মেনে চলা দু-পক্ষের জন্য অপরিহার্য হয়। কেননা, এ অবস্থায় তা একটি পরিপূর্ণ চুক্তি হবে, যা ভবিষ্যতের কোনো একটি তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

১৪. প্রতিশ্রুতি পূরণ বাধ্যতামূলক

এসব পদ্ধতির প্রয়োগ প্রক্রিয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ ক্ষেত্রে একপক্ষ অন্য পক্ষের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যেমন 'ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিলক'-এ অংশীদারত্ব চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্বেই ব্যাংক গ্রাহককে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদের যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ তার কাছে ভাড়া প্রদান করবেন ও কিস্তিতে তা বিক্রি করবেন। 'ইজারা মুনতাহিয়্যাহ বিত তামলীক'-এ ব্যাংক গ্রাহককে ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদটি টোকেন মূল্যে বিক্রয় বা হিবা করার প্রতিশ্রুতি দেন। একইভাবে 'ইজারা ছুম্মা বাই' পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহককে উক্ত সম্পদ ক্রয় করার বা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এসব বদান্যতামূলক প্রতিশ্রুতি পূরণ বাধ্যতামূলক কি না সেই বিষয়ে ফকীহগণ থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম মত অনুযায়ী ওয়াদা পালন মুস্তাহাব। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন। তারা প্রমাণ হিসেবে সাইয়িদুনা যায়দ ইবনে আরকাম রা. বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ – وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ – فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

> যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে (কোনো বিষয়ে) ওয়াদা করে এবং তার নিয়ত থাকে যে, সে তার ওয়াদা পূরণ করবে, কিন্তু সে (কোনো কারণবশত) তার ওয়াদা পূরণ করেনি এবং নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে (তার সেই ওয়াদা পূরণের উদ্দেশ্যে) আসেনি, তাহলে তার কোনোরূপ পাপ হবে না।[২৫৪]

---

২৫৪. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল আদব, বাবুন ফিল উদ্দাহ, হা. নং : ৪৯৯৭

তারা এ জাতীয় প্রতিশ্রুতিকে হিবার সাথে তুলনা করেন। হিবা করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হয় না।[২৫৫]

দ্বিতীয় মতানুযায়ী সামগ্রিকভাবে সবধরনের প্রতিশ্রুতি পালন আবশ্যক। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন—কাযী ইবনুল আশওয়া আল হামদানী, ইবন শুবরামা (১৪৪ হি.), উমর ইবন আবদুল আযীয (৬৮১-৭২০ খ্রি.), আল হাসান আল বাসরী (৬৪২-৭২৮ খ্রি.), ইবনুশ শাত মালিকী (৬৪৩-৭২৩ হি.), ইবনুল আরাবী (১০৭৬-১১৪৮ খ্রি.), আবু বাকর আল জাসসাস (৯১৭-৯৮০ খ্রি.) রাহ. প্রমুখ।[২৫৬] তারা তাদের মতের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন।

তৃতীয় মতানুযায়ী ওয়াদা যদি কোনোকিছুর সাথে সংযুক্ত হয় তবেই তা রক্ষা করা ওয়াজিব (অপরিহার্য)। এটি ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত একটি মত। এ ছাড়াও এ মত পোষণকারীগণের মধ্যে রয়েছেন—ইবন নুজাইম (৯২৬-৯৭০

২৫৫. সারখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ২, পৃ. ১২৯; ইবনু আবিদীন, *আল-উকূদুদ দুররিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতওয়া আল-হামিদিয়্যাহ*, কায়রো : মাতবাআতুল মায়মানাহ, ১৩১০ হি., খ. ২, পৃ. ৩৫৩; মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন ঈল্লীশ, *ফাতহুল আলী আল-মালিক ফীল ফাতওয়া আলা মাজাহিবিল ইমাম মালিক*, বৈরুত : দারুল ফিকর, খ. ১, পৃ. ২৫৪; ইবন রুশদ আল-জাদ, *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল*, বৈরুত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি., খ. ৮, পৃ. ১৮; ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নববী, *আল-আযকার*, দাম্মাম : দারু ইবনুল জাওযী, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৮১-১৮২; আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী*, বৈরুত : মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ২৯০; *বুহুতী*, *কাশশাফুল কি না*, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩; ইবনুল মুফলিহ, *আল মুবদী ফী শারহিল মুকনি* বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ৩৪৬; ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০১ খ্রি., খ. ৮, পৃ. ২৮

২৫৬. ইবন রুশদ আল-জাদ, *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল*, খ. ৮, পৃ. ১৮; ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ৮, পৃ. ২৮; ইবনুশ শাত, *আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়াইল ফুরূক*, বৈরুত : আলিমুল কিতাব, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ২৪; ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ১৮২; জাসসাস, *আহকামুল কুরআন* বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ৪৪২

হি.), ইবনুল কাসিম (৭৫০-৮০৬ খ্রি.) রাহ. প্রমুখ।[২৫৭] তারা উপরিউক্ত ১ম ও ২য় মতের দলিলসমূহ উপস্থাপন করে বলেন—যেহেতু এ ব্যাপারে শরীয়তের পরস্পরবিরোধী দলিল রয়েছে, যার কিছু দ্বারা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূরণের ওজূব (আবশ্যকতা) প্রমাণিত হয় এবং কিছু দলিল দ্বারা এর ওজূব প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, ওয়াদা যদি চুক্তি বা অন্য কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব; অন্যথায় মুস্তাহাব।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওয়াদা পূরণ করা অপরিহার্য। কেননা, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুসলিম যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুনাফিক থেকে পৃথক হয় তন্মধ্যে ওয়াদা পূরণ অন্যতম। এ অপরিহার্যতা আরও জোরালো হয় যদি উক্ত প্রতিশ্রুতি কোনোকিছুর সংঘটক হয় এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এর ওপর ভিত্তি করে কোনো কাজে প্রবেশ করে। এ ক্ষেত্রে যদি উক্ত ওয়াদা পূরণ করা না হয় তবে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। ওআইসিভুক্ত ইসলামী ফিকহ অ্যাকাডেমি ও AAOIFI-এর শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডও এ মত ব্যক্ত করেছে।[২৫৮]

১৫. সাবলিজ প্রসঙ্গ

সাবলিজ হলো এমন একধরনের ইজারা-চুক্তি, যেখানে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ইজারায় প্রদত্ত সম্পদটি অন্য কারও কাছে পুনরায় ইজারা দেয়। যেমন—বাড়ির প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে ভাড়ায় গৃহীত বাড়িটি ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক পুনরায় অন্য কারও কাছে ভাড়া দেওয়া। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক প্রথমে বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত বাড়ির মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ প্রদান করে

---

২৫৭. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৬; ঈল্লীশ, *ফাতহুল আলী*, খ. ১, পৃ. ২৫৬; ইবনু নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজাঈর*, বৈরুত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩৪৪; আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ৩, পৃ. ২৫

২৫৮. ওআইসি অধিভুক্ত ইসলামী ফিকহ অ্যাকাডেমির পঞ্চম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নং : ৪০-৪১, কুয়েত, ডিসেম্বর ১৯৮৮; *আল-মাআঈর আশ-শরঈয়্যাহ*, শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড নং ৮, পৃ. ১২২

সংশ্লিষ্ট বাড়ি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লিজ নেবে। এরপর ব্যাংক উক্ত বাড়ি অতিরিক্ত ভাড়ায় গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাবলিজ প্রদান করতে পারে। বিনিয়োগ গ্রাহক শর্ত মোতাবেক ব্যাংকের ভাড়া কিস্তিতে বা এককালীন পরিশোধ করবে।

এ প্রসঙ্গে শরীয়তের বিধান হলো—ইজারার সম্পদটি যদি এমন হয় যে, যাকে এক একজন এক এক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে থাকে (অর্থাৎ, ব্যবহারকারীর ভিন্নতার কারণে ওই পণ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়ে), তাহলে ইজারাগ্রহীতা ইজারাদাতার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট তা ভাড়ায় প্রদান করতে পারবে না। যদি ইজারাদাতা তৃতীয় অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট ভাড়ায় প্রদানের অনুমতি প্রদান করে, তাহলেই সে তা করতে পারবে।

যদি দ্বিতীয় এই সাবলিজ থেকে অর্জিত ভাড়া সেই ভাড়ার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয়, যা মালিককে (আসল ইজারাদাতা) পরিশোধ করা হয়, তাহলে সকল প্রসিদ্ধ ফকীহের মতে—তা জায়িয। কিন্তু সাবলিজ থেকে অর্জিত ভাড়া মালিককে প্রদানকৃত ভাড়া অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী রাহ. এবং আরও অন্যান্য কতিপয় ফকীহের মতে—তা জায়িয আছে এবং সেই লিজ থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া ব্যবহার করাও জায়িয আছে। হাম্বলী ফকীহগণও এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর অভিমত হলো—সাবলিজ থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া তার নিকট রাখা জায়িয নেই এবং এই অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে দেওয়া জরুরি। কিন্তু যদি দ্বিতীয় ইজারাদাতা সেই পণ্যে কোনোকিছু সংযোজন করে তাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিংবা তাকে এমন মুদ্রার ভিত্তিতে ভাড়ায় প্রদান করে, যা মালিককে প্রদানকৃত ভাড়ার মুদ্রা থেকে ভিন্ন, তবেই এই সাবলিজ থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ করতে পারবে এবং তা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

যদিও ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর অভিমত অধিক সতর্কতাপূর্ণ এবং যথাসম্ভব এর ওপরই আমল করা উচিত; কিন্তু প্রয়োজনের সময় ফিকহে শাফিয়ী ও ফিকহে হাম্বলীর ওপরও আমল করা যাবে। কেননা, ওই অতিরিক্ত অর্থের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কোনো নিষিদ্ধতা বিদ্যমান নেই। ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. এই অতিরিক্ত পরিমাণের বৈধতার ব্যাপারে শক্তিশালী প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

১৬. মুরাবাহা/মুয়াজ্জালকে এইচপিএসএম বিনিয়োগে রূপান্তর

বাই মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে প্রদত্ত বিনিয়োগের বিপরীতে গ্রাহকের কাছে ব্যাংকের পাওনাকে অন্য কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তর করা শরীয়াসম্মত নয়। তবে গ্রাহক যদি ওই পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে তার মালিকানাধীন কোনো সম্পদ থেকে ব্যাংকের পাওনার সমপরিমাণ সম্পদ প্রচলিত বাজারদরে ব্যাংককে প্রদান করে, তা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে ব্যাংক যদি পাওনা আদায় করার জন্য গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত সম্পদ পুনরায় গ্রাহকের কাছে বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করে তখন তা 'কালবুদ দাইন' (ঋণকে বিনিয়োগে রূপান্তর) হওয়ার কারণে বৈধ হবে না এবং এ খাত থেকে প্রাপ্ত আয় সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লিখিত বাই মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ পাওনার বিপরীতে গ্রাহক প্রদত্ত সম্পদটি এইচপিএসএম-এ রূপান্তর করে তার ওপর বাজারে প্রচলিত প্রকৃত ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত ভাড়া আরোপ করা হলে লেনদেনটি 'কালবুদ দাইন' বা দায়কে বিনিয়োগে রূপান্তর বলে বিবেচিত হবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তবে সম্পদের ভাড়া যদি বাজারে প্রচলিত প্রকৃত ভাড়ার সমান হয় এবং গ্রাহক যদি সম্পদটির নির্ধারিত অংশ ইসলামী ব্যাংক থেকে বাজারমূল্যে ক্রয় করে নেয়, তাহলে এ জাতীয় লেনদেন দোষণীয় নয়। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো—বিক্রয় এবং ভাড়া-চুক্তি একটি অপরটির সাথে শর্তযুক্ত হতে পারবে না; বরং প্রতিটি চুক্তি স্বতন্ত্র হতে হবে।[২৫৯]

এইচপিএসএম-এ প্রয়োগগত শরীয়া লঙ্ঘন

এইচপিএসএম (Hire Purchase Under Shirkatul Meelk) পদ্ধতিতে প্রয়োগিকভাবে শরীয়ানীতি নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। যেমন—

ক. অবকাশকালে ভাড়া আদায় করা :

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এ সময়ে সম্পদটি ব্যবহারযোগ্য না হওয়ার কারণে ভাড়াগ্রহীতা তা থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারে না। ফলে অবকাশকালের আদায়কৃত ভাড়া সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

---

২৫৯. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৩৯

ক. সম্পদ বা মেশিনারিজ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে তা থেকে ভাড়া আদায় করা :

সম্পদ ব্যবহারযোগ্য না হলে তা থেকে ভাড়া আদায় করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে আদায়কৃত ভাড়া সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

খ. সম্পদ ক্রয়ে উভয় পক্ষের অংশগ্রহণ, মালিকানায় অংশীদারত্বের অনুপাত, সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা :

চুক্তিপত্র অপূরণকৃত থাকলে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা দেখা দেবে। তাই চুক্তিপত্র অপূরণকৃত রাখা বৈধ নয়।

গ. সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানা অর্জন ব্যতীত ভাড়া আদায় করা :

মালিকানা অর্জন ব্যতীত কোনো সম্পদের ওপর ভাড়া আদায় করা হলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ. ভাড়ার ওপর ভাড়া আরোপ করা :

এরূপ আদায়কৃত ভাড়া সুদ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ ব্যবহারযোগ্য সম্পদের ওপরই কেবল ভাড়া ধার্য করা যায়; অর্থের ওপর নয়।

ঙ. সম্পদ ক্রয়ের পূর্বে ভাড়া ও বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করা :

এরূপ চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়। কারণ অস্তিত্বহীন সম্পদের ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি করা বৈধ নয়। এরূপ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ. গ্রাহক কর্তৃক বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে নির্দিষ্ট সম্পদ তৈরি না করে তা অন্য খাতে স্থানান্তর করা :

এরূপ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সুদ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, অস্তিত্বহীন সম্পদের ওপর ভাড়া ধার্য করা যায় না।

ছ. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে প্রদত্ত বিনিয়োগকে এইচপিএসএম পদ্ধতিতে রূপান্তর করা :

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এরূপ করা বৈধ নয়।

জ. ভাড়া চলাকালে মালিকানার আনুপাতিক হারে সম্পদের রিস্ক ও দায় গ্রহণ না করা :

আবশ্যিক বিমাসহ যাবতীয় দায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংককে অংশগ্রহণ করতে হবে। তা না হলে দায় গ্রহণ না করে মুনাফা ভোগের নামান্তর হবে, যা স্পষ্ট সুদ।

কেস স্টাডি

একজন গ্রাহক তার শিল্পের জন্য মেশিন ক্রয় বাবদ ৫ বছর মেয়াদি ৫০,০০০/- টাকা বিনিয়োগ নেওয়ার জন্য ব্যাংকের কাছে আবেদন করল। আবেদন পত্রের সঙ্গে তিনি ৫০,০০০/- টাকার একটি কোটেশনও উপস্থাপন করলেন। ব্যাংক কর্মকর্তা উক্ত গ্রাহকের সঙ্গে এইচপিএসএম চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করলেন। চুক্তি অনুপাতে গ্রাহক যথারীতি কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন।

উপরিউক্ত চুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে শরীয়ানীতি লঙ্ঘিত হয়েছে :

এইচপিএসএম চুক্তিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের অংশীদারত্বের ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এখানে বিনিয়োগ প্রদানের দিন থেকে ভাড়াসহ কিস্তি হিসাবভুক্ত ও পরিশোধিত হয়েছে। অথচ মেশিন ক্রয়, পরিবহন ও মেশিনটি ব্যবহারযোগ্য হওয়ার জন্য গ্রাহককে জেস্টেশন পিরিয়ড না দিয়েই ভাড়া আরোপ করা হয়েছে, যা শরীয়াসম্মত হয়নি। ভাড়া প্রদানের হার, কিস্তি নির্ধারণ পদ্ধতি, বিনিয়োগের মেয়াদ, জেস্টেশন পিরিয়ড প্রভৃতি চুক্তিপত্রে বিশদভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; কিন্তু এখানে তা যথাযথভাবে পরিপালিত হয়নি।

৬. বাই সালাম

আরবী শব্দ 'সালাম' (سلم)-এর আভিধানিক অর্থ সমর্পণ করা। পরিভাষায় 'বাই সালাম' হলো এমন একটি ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি, যার আওতায় বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, সে ভবিষ্যতের কোনো একটি তারিখে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা উৎপাদিত বস্তু ক্রেতাকে সরবরাহ করবে এবং তার বিনিময়ে সম্মত পূর্ণ মূল্য বিক্রির সময়ই অগ্রিম নিয়ে নেয়। অন্য কথায়—ভবিষ্যতের নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মতমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে

নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়া-অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করাকে ‘বাই সালাম’ বলে। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে ‘বাই সালাম’ বলা হয়। এর অপর একটি নাম হলো ‘বাই সালাফ’ (بيع سلف)।

‘বাই সালাম’ অনেকটা বাই মুয়াজ্জালের বিপরীত। বাই মুয়াজ্জালে ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করে তাকে বাকিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু বাই সালামে পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয় এবং তার নিকট থেকে পণ্য নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে গ্রহণ করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সা. বিশেষ কতগুলো শর্তসাপেক্ষে বাই সালাম চুক্তির অনুমতি দিয়েছেন। এই ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রয়োজন পূরণ করা, যাদের ফসল উৎপাদন এবং ফসল কাটা পর্যন্ত তাদের পরিবার-পরিজনদের ভরণপোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সুদের নিষিদ্ধতার পর তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করতে পারছিল না। এজন্য তাদেরকে তাদের কৃষিজাত পণ্য অগ্রিম মূল্যে বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

এমনিভাবে স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ীগণ অন্য শহরে বিভিন্ন মালামাল রপ্তানি করত এবং সেখান থেকে নিজের শহরে বিভিন্ন মালামাল আমদানি করত। এ উদ্দেশ্যের জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন হতো, সুদের নিষিদ্ধতার পর তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করতে পারত না। এজন্য তাদের অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এতে নগদ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের কারবার সহজেই চালু রাখতে পারত।

বাই সালাম দ্বারা বিক্রেতারও উপকার হয়। কেননা, সে মূল্য অগ্রিম পেয়ে যায়। অনুরূপ ক্রেতারও উপকার হয়। কেননা, বাই সালামে মূল্য সাধারণত নগদ মূল্য অপেক্ষা কম হয়।

বাই সালামের শর্তাবলি

‘বাই সালাম’ একটি ব্যতিক্রমী ক্রয়-বিক্রয়; যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ে সামান্য ধরনের অস্পষ্টতা থাকলেও শরীয়তে তাকে নাজায়িয ঘোষণা করা হয়, সেখানে বাই সালামে পণ্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও তাকে একান্ত প্রয়োজনের দিক বিবেচনায় বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে এর বিধিবদ্ধতা

কয়েকটি কঠিন শর্তের সাথে শর্তযুক্ত। সেসব শর্ত নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো—

১. চুক্তির সময় পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। কেননা, চুক্তির সময় ক্রেতা যদি পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে তা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রির সাদৃশ্য হয়ে যাবে। এ ছাড়া সালামের বৈধতার মৌলিক রহস্যই হলো—বিক্রেতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করা। যদি অগ্রিম মূল্য তাকে পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হয়, তাহলে চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যই শেষ হয়ে যাবে। সকল ফিকহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, সালামে মূল্য পরিপূর্ণরূপে অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। তবে ইমাম মালিক রাহ.-এর মাযহাব হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে দুই বা তিন দিনের সুযোগ দিতে পারবে; কিন্তু এই সুযোগ চুক্তির নিয়মতান্ত্রিক অংশ হতে পারবে না।

২. বাই সালাম কেবল সেসব পণ্যে হতে পারে, যেসব পণ্যের কোয়ালিটি (গুণগত মান) এবং পরিমাণ পূর্বেই পরিপূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং এমন জিনিস যেগুলোর কোয়ালিটি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না, সেগুলো সালামের মাধ্যমে বিক্রি করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ মূল্যবান পাথর সালামের ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে না। কেননা, সেগুলোর প্রতিটি টুকরা সাধারণত অন্যটির তুলনায় গুণগতমান, সাইজ এবং ওজনের দিক থেকে ভিন্নরূপ হয় এবং সাধারণত তা বর্ণনার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

৩. কোনো নির্দিষ্ট জিনিস কিংবা নির্দিষ্ট খেত কিংবা ফার্মের উৎপাদনে বাই সালাম হবে না। যেমন, বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করল যে, সে নির্দিষ্ট খেতের গম কিংবা নির্দিষ্ট গাছের ফল সরবরাহ করবে, তাহলে এই বাই সালাম সঠিক হবে না। কেননা, পরিশোধের পূর্বেই সেই খেতের ফসল কিংবা সেই গাছের ফল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার কারণে বিক্রিত দ্রব্য পরিশোধ অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এই বিধান প্রত্যেক ওই দ্রব্যের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে, যার সরবরাহ অনিশ্চিত হবে।

৪. যে দ্রব্যে সালাম করার ইচ্ছা করবে, তার ধরন এবং গুণগত মান সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে নেওয়াও অপিরহার্য, যাতে সেই দ্রব্যে এমন

কোনো অস্পষ্টতা বিদ্যমান না থাকে, যা পরবর্তী সময়ে দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে সম্ভাব্য সকল বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ থাকা উচিত।

৫. কোনো রকম অস্পষ্টতা ব্যতীত বিক্রিতব্য দ্রব্যের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে নেওয়া অপরিহার্য। দ্রব্যের পরিমাণ যদি ব্যবসায়ীদের ওরফে ওজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয় (অর্থাৎ সে জিনিস পাল্লা দিয়ে মেপে বিক্রি করা হয়), তাহলে তার ওজন নির্দিষ্ট হওয়া অপরিহার্য। আর যদি তার পরিমাণ টুকরি দিয়ে মেপে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ টুকরি জানা থাকতে হবে। যে জিনিস সাধারণত পাল্লা দিয়ে মাপা হয়, তার পরিমাণ টুকরি দিয়ে নির্ধারণ করা যাবে না (সালামের ক্ষেত্রে)। এমনিভাবে টুকরি দিয়ে মাপার দ্রব্যের পরিমাণ পাল্লা দিয়ে নির্ধারণ না হতে হবে।

৬. বিক্রিত জিনিসের পরিশোধের তারিখ এবং স্থানও চুক্তিতে নির্ধারণ হতে হবে।

৭. বাই সালাম এমন দ্রব্যে করা যাবে না, যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ যদি রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়টি একই সময়ই পরিশোধ করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে বাই সালাম কার্যকরী হবে না। এটি 'বাই আদ দাইন বিদ দাইন' হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি যবের বিনিময়ে গম বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রি সঠিক হওয়ার জন্য উভয়টির কবজ একই সময় হওয়া অপরিহার্য। এ কারণে এ ক্ষেত্রে সালাম-চুক্তি জায়িয নেই।

সকল ফিকহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, বাই সালাম ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না, যতক্ষণ না এ শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে পূরণ করা হবে। কেননা, এই শর্তসমূহের ভিত্তি একটি সুস্পষ্ট হাদীসের ওপর। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

مَنْ أَسْلَفَ فِي شيءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

যে ব্যক্তি বাই সালাম করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপযন্ত্র এবং ওজনে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বাই সালাম করে।[২৬০]

---

২৬০. বুখারী, *আস সহীহ*, হা. নং : ২১২৪, ২১২৫; মুসলিম, *আস সহীহ*, হা. নং : ৪২০২

উপর্যুক্ত শর্তগুলো ব্যতীত আরও কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন ফকীহের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এগুলো হলো–

১. ফিকহ হানাফী অনুযায়ী যে জিনিসে বাই সালাম হচ্ছে, সে জিনিস চুক্তির তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত মার্কেটে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। সুতরাং বাই সালাম চুক্তির সময় যদি ওই জিনিস মার্কেটে না পাওয়া যায়, তাহলে তার বাই সালাম করা যাবে না। যদিও আশা করা যায় যে, পরিশোধের সময় তা মার্কেটে পাওয়া যাবে। কিন্তু ফিকহ শাফিয়ী, মালিকী এবং হাম্বলীর দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বাই সালাম সঠিক হওয়ার জন্য চুক্তির সময় সেই জিনিস পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। তাদের নিকট অপরিহার্য হলো, সেই জিনিস পরিশোধের সময় পাওয়া যেতে হবে। বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমল করা যেতে পারে।

২. ফিকহ হানাফী এবং ফিকহ হাম্বলীর দৃষ্টিতে কবজের মেয়াদ চুক্তির সময় থেকে কমপক্ষে এক মাস হওয়া অপরিহার্য। যদি কবজের সময় এক মাসের কম ধার্য করা হয়, তাহলে বাই সালাম সঠিক হবে না। তাদের যুক্তি হলো, সালামের অনুমতি ক্ষুদ্র কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দেওয়া হয়েছে, সুতরাং দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য তাদের উপযুক্ত সময় পেতে হবে। এক মাস সময়ের পূর্বে সেই দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না, এ ছাড়া সালামে নগদ সওদা অপেক্ষা মূল্য কম হয়, মূল্যে এই সুযোগ তখনই ন্যায়সংগত হবে যখন এই দ্রব্য এতদিন পরে পরিশোধ করা হবে, যত দিন পর পরিশোধ করলে মূল্যে যুক্তিসংগত প্রভাব পড়তে পারে। এক মাসের কম সময়ে সাধারণত মূল্যে তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না। সুতরাং দ্রব্য পরিশোধের সময় কমপক্ষে এক মাসের কম না হওয়া উচিত।

ইমাম মালিক রাহ. এতটুকুর ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, বাই সালাম চুক্তির জন্য কমপক্ষে একটি সময় হওয়া উচিত। কিন্তু তার মতে, এই সময় পনেরো দিনের কম না হতে হবে। কেননা, বাজারদর দু-সপ্তাহ পরপর পরিবর্তন হতে পারে। অবশ্যই এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্যান্য ফকীহ যেমন ইমাম শাফিয়ী রাহ. এবং কোনো কোনো হানাফী ফকীহ একমত পোষণ করেননি। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বাই সালাম সঠিক হওয়ার জন্য কমপক্ষে একটি সময় নির্দিষ্ট করেননি। হাদীস অনুযায়ী শর্ত শুধু

এতটুকু যে, কবজের সময় সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হতে হবে। সুতরাং ন্যূনতম কোনো সময় বর্ণনা করা যাবে না। উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে কবজের যেকোনো তারিখ নির্দিষ্ট করতে পারবে।

বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত মনে হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. ন্যূনতম কোনো সময় নির্দিষ্ট করেননি। ফকীহগণ বিভিন্ন সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা একদিন থেকে এক মাস পর্যন্ত রয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ফকীহগণ এই সময় গরিব বিক্রেতার সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী ধার্য করেছেন। কিন্তু এই প্রয়োজন সময় ও স্থানের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। কখনও কখনও একেবারে নিকটবর্তী তারিখ ধার্য করার দ্বারা বিক্রেতার বেশি সুবিধা হতে পারে। বিক্রেতাই তার সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে উত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বিক্রেতা যদি তার স্বাধীন সন্তুষ্টির দ্বারা এক মাসের পূর্বের কোনো তারিখ কবজ করানোর জন্য ধার্য করে, তাহলে তাকে এ ব্যাপারে বাধা দেওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। সমকালীন কোনো কোনো ফকীহ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক চুক্তির জন্য অধিক প্রযোজ্য।[২৬১]

বাই সালাম পদ্ধতিতে অর্থায়ন

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, শরীয়ত কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের একান্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য সালামের অনুমতি দিয়েছে। এ কারণে এটা মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের জন্য একটি অর্থায়ন-পদ্ধতি। এই অর্থায়ন-পদ্ধতি আধুনিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহেও ব্যবহার করা যেতে পারে; বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্যের অর্থায়নের জন্য বাই সালাম পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। এ কথা পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, বাই সালামে পরিশোধ্য পণ্য অপেক্ষা মূল্য কম হয়। এভাবে উভয় মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হবে, তা ব্যাংকের বৈধ মুনাফা হবে। অর্থাৎ ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করে তা অন্যত্র অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যে বিক্রি করে থাকে। এ বেশিটাই ব্যাংকের মুনাফা।

---

২৬১. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*..., পৃ. ১৮০-১৮৩

নিম্নে এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের কিছু দিক ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

ক. বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা এবং বিনিয়োগ গ্রাহক হচ্ছেন বিক্রেতা।

খ. বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণত কৃষি ও শিল্পপণ্য অগ্রিম ক্রয় করে।

গ. এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম প্রদান করে।

ঘ. চুক্তির সময় ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের দাম ঠিক করা হয়।

ঙ. চুক্তিতে পণ্যের ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ, গুণগত মান, মূল্য, সরবরাহের সময় ও স্থান উল্লেখ করা হয়।

চ. পণ্যের সরবরাহ কিস্তিতে বা এককালীন হতে পারে, তবে তা চুক্তিপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

ছ. পণ্য উৎপাদিত বা প্রস্তুত হওয়ার পর ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে তা বুঝে নেবে।

জ. বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে পণ্য বুঝে নেওয়ার মাধ্যমে ব্যাংক তার ওপর মালিকানা অর্জন করে তৃতীয় পক্ষের কাছে বাই মুরাবাহা কিংবা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে।

ঝ. বাই সালামের পণ্য বিক্রির জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে বিক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে।

ঞ. রপ্তানি এলসির শর্ত মোতাবেক বিনিয়োগ গ্রাহক বা বিক্রয়-প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য নির্ধারিত দামে রপ্তানি বা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন এবং এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইচ্ছাকৃত অপারগতা, অদক্ষতা ও অসুবিধার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

ট. বিনিয়োগ গ্রাহক পণ্য পুরো বা আংশিক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে অগ্রিম গৃহীত সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য ফেরত দেবেন।

ঠ. বাই সালাম পদ্ধতিতে নির্ধারিত পণ্য নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি নির্ণয়পূর্বক ক্ষতিপূরণ বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করা যাবে।

ড. কাঙ্ক্ষিত পণ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা নিশ্চিতকল্পে ক্রেতা (ব্যাংক) বিক্রেতার (গ্রাহকের) কাছ থেকে জামানত কিংবা বন্ধকির আকৃতিতে সিকিউরিটিরও দাবি করতে পারবে। অনাদায়ের ক্ষেত্রে জামিনদার থেকে ওই জিনিসই সরবরাহের দাবি করা যাবে। আর বন্ধকির ক্ষেত্রে ব্যাংক বন্ধকির দ্রব্য বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা কাঙ্ক্ষিত জিনিস বাজার থেকে ক্রয় করতে পারবে কিংবা অগ্রিম প্রদেয় মূল্য উসুল করতে পারবে।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বাই সালামের অনুশীলন

বাই সালাম—যা প্রধানত কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থায়নের জন্য নির্ধারিত—ক্ষুদ্র শিল্পকে সমর্থন করার জন্য মাইক্রো ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিন্যান্সিয়াল টুল হিসেবে কাজ করে। এটি প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কাজ করে :

ক. কৃষি অর্থায়ন (Agriculture financing);

খ. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং (Working Capital Financing);

গ. বাণিজ্যিক ও শিল্প অর্থায়ন (Commercial and industrial financing);

ঘ. রপ্তানি অর্থায়ন (Export Financing);

ঙ. অপারেশনস ও ক্যাপিটাল কস্ট ফাইন্যান্সিং (Operations and capital cost financing)

নিম্নে সালামের ভিত্তিতে অর্থায়নের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো—

ক. কৃষি অর্থায়নে সালামের উদাহরণ

একজন কৃষকের কথা বিবেচনা করুন, যার আসন্ন রোপণের মৌসুমের জন্য বীজ, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার উদ্দেশ্যে মূলধন প্রয়োজন। তবে কৃষকের তাৎক্ষণিক সম্পদের অভাব রয়েছে, তবে সে ছয় মাস পর ১০০ টন গম সরবরাহ করতে পারে।

১. চুক্তির সূচনা : কৃষক এবং ব্যাংক বাই সালামে প্রবেশ করে। ফসল কাটার মৌসুম শেষে ১০০ টন গম বিতরণের জন্য ব্যাংকটি কৃষককে ১,০০,০০০ অগ্রিম প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

২. সালাম লেনদেন : চুক্তির শুরুতে ব্যাংক কৃষককে সম্পূর্ণ ১,০০,০০০ টাকা প্রদান করে, যা তাকে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম করে।

৩. তহবিলের ব্যবহার : কৃষক বীজ, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে তহবিল ব্যবহার করে। পারস্পরিক চুক্তির নীতি কৃষককে সিদ্ধান্ত নিতে দেয় যে, এই মূলধনটি কীভাবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায়।

৪. সালাম ডেলিভারি : চুক্তির পরিপক্বতা এবং ফসল কাটা শেষ হলে কৃষক সালাম সরবরাহ-নীতি মেনে ব্যাংকে ১০০ টন গম সরবরাহ করে।

এভাবে ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা মেনে কৃষি কার্যক্রমের জন্য ব্যাংক কৃষককে প্রয়োজনীয় মূলধন প্রদান করে। পরবর্তীকালে ব্যাংক হয় বাজারে গম বিক্রি করতে পারে বা একটি সমান্তরাল সালাম চুক্তিতে অবতীর্ণ হতে পারে, যাতে গম তার চূড়ান্ত গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যায়।

খ. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিংয়ে সালামের উদাহরণ

এমন একটি উৎপাদনকারী সংস্থার কথা বিবেচনা করুন, যার কাঁচামাল, শ্রম এবং ওভারহেড খরচের মতো পরিচালন ব্যয়ের জন্য নগদ প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে নগদ-সংকুচিত। তবে কোম্পানিটি তিন মাস পর তার পণ্যের ১,০০০ ইউনিট সরবরাহ করতে সক্ষম।

১. চুক্তির সূচনা : কোম্পানি এবং ব্যাংক বাই সালামে প্রবেশ করে। তিন মাস শেষে তার পণ্যের ১,০০০ ইউনিট সরবরাহ করার জন্য ব্যাংক কোম্পানিকে ৫,০০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করতে সম্মত হয়।

২. সালাম লেনদেন : ব্যাংক চুক্তির শুরুতে সম্পূর্ণ ৫,০০,০০০ প্রদান করে, যা কোম্পানিকে তার অপারেশনাল খরচ পরিচালনা করতে সক্ষম করে।

৩. তহবিলের ব্যবহার : কোম্পানি কাঁচামাল সংগ্রহ করতে, শ্রমের খরচ পরিশোধ করতে এবং অন্যান্য ওভারহেড খরচগুলো কভার করতে তহবিল ব্যবহার করে। পারস্পরিক সম্মতির নীতি কোম্পানিকে তহবিল ব্যবহার করার সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়।

৪. সালাম ডেলিভারি : চুক্তির মেয়াদপূর্তির পর সালাম ডেলিভারি-নীতি পূরণ করে কোম্পানি তার পণ্যের ১,০০০ ইউনিট ব্যাংকে সরবরাহ করে।

এ ক্ষেত্রে ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং নীতিগুলো সমুন্নত রেখে কোম্পানির কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধন প্রদান করে। পরবর্তীকালে ব্যাংক হয় বাজারে পণ্যগুলো বিক্রি করতে পারে বা পণ্যগুলো তাদের চূড়ান্ত গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি সমান্তরাল সালাম চুক্তিতে অবতীর্ণ হতে পারে।

বাস্তব ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানিতেও বাই সালামের প্রাকটিস হয়। যেমন ধরুন, কোনো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ৫০ লক্ষ টাকার মোট ১০ হাজার পিস টি-শার্ট আগামী ৩ মাসের মধ্যে রপ্তানির অর্ডার গ্রহণ করল। এখন ইসলামী ব্যাংক ওই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিকে ১০ হাজার পিস টি-শার্টের জন্য অগ্রিম ৪৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করল এবং বলল—পণ্য ৩ মাসের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে অগ্রিম ৪৯ লক্ষ টাকার টি-শার্ট ক্রয় করে বিদেশি কোম্পানির নিকট ৫০ লক্ষ টাকায় রপ্তানি করে ১ লক্ষ টাকা মুনাফা করল।

অর্থায়নে জটিলতা ও সমাধান

বাই সালাম পদ্ধতিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে; তা হলো—তারা তাদের গ্রাহকদের থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্য গ্রহণ করবে, যেহেতু এই ব্যাংকসমূহ কেবল অর্থের লেনদেনে অভিজ্ঞ হয়, এই জন্য বিভিন্ন গ্রাহক থেকে বিভিন্ন পণ্য উসুল করে সেগুলো বাজারে বিক্রি করা বাহ্যিকভাবে তাদের কাছে ঝামেলা মনে হবে। এ ছাড়া তারা সেই পণ্যগুলো কার্যত কবজ না করেও বিক্রি করতে পারবে না; কেননা, তা শরীয়তে বৈধ নয়।

কিন্তু আমরা যখন ইসলামী অর্থায়ন-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি, তখন একটি মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয় মনে রাখা উচিত, তা হলো যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধু মুদ্রার (Money) লেনদেন করে তাদের পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের জন্য একটি নতুন বিষয়। এসব প্রতিষ্ঠান যদি হালাল মুনাফা অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কোনো না কোনোভাবে পণ্যের লেনদেন করতে হবে। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে কেবল ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা যায় না। এ

কারণে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান পণ্যের লেনদেনের জন্য বিশেষ সেল গঠন করতে পারে। যদি এমন সেল গঠন করা হয়, তাহলে বাই সালামের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা এবং সেগুলো নগদে বাজারে বিক্রি করা জটিল হবে না।

এ ছাড়া বাই সালাম চুক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার আরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে :

ক. কোনো জিনিস সালামের ভিত্তিতে ক্রয় করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাকে একটি প্যারালাল সালাম (Parallel Salam) চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করতে পারবে, যার পরিশোধের তারিখও প্রথম সালামের তারিখেই হবে। দ্বিতীয় (প্যারালাল) সালামে সময় যেহেতু স্বল্প হবে, সেজন্য মূল্য প্রথম চুক্তির তুলনায় কিছুটা বেশি হবে। এই উভয় মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য হবে তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা হবে। দ্বিতীয় সালামের সময় যত স্বল্প হবে, মূল্য ততই বেশি হবে এবং মুনাফাও সেই অনুপাতে বেশি হবে। এই পদ্ধতি দ্বারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার স্বীয় সংক্ষিপ্ত সময়ের অর্থায়ন বিভাগ পরিচালনা করতে পারে।

খ. যদি কোনো কারণবশত প্যারালাল সালাম চুক্তি কার্যকর না হয়, তাহলে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৃতীয় কোনো পার্টি থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পারবে। এই অঙ্গীকার সম্ভাব্য ক্রেতার পক্ষ হতে একতরফা হতে হবে। এটা যেহেতু শুধু একটি অঙ্গীকার; কার্যত ক্রয়-বিক্রয় নয়, সেজন্য ক্রেতা মূল্য অগ্রিম পরিশোধের ব্যাপারে বাধ্য নয়। ফলে তাতে বেশি মূল্য ধার্য করা যাবে। আর সংশ্লিষ্ট জিনিস যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকৃত হবে, সেহেতু অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃতীয় পার্টির নিকট পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত মূল্যে বিক্রি করে দেবে।

পণ্য বিনিয়োগ-গ্রাহক অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট বিক্রি করা

বাই সালামে উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যতীত কখনও কখনও তৃতীয় আরেকটি পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়; তা হলো—কবজের তারিখে সেই পণ্য বিক্রেতার নিকটই অধিক মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি শারয়ী বিধানের পরিপন্থি। কেননা, ক্রেতা পণ্য কবজ করার পূর্বে সেই জিনিস বিক্রেতার নিকট বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নেই। আর যদি এই চুক্তি বেশি মূল্যে

হয়, তাহলে তা সুদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি এই দ্বিতীয় বিক্রি ক্রেতার কবজের পরও হয়, তাহলেও আসল ক্রয়-বিক্রয় থাকাকালীন উক্ত দ্বিতীয় বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে না। সুতরাং এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হবে।

প্যারালাল (সমান্তরাল) সালামের কিছু নিয়মনীতি

আধুনিক ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেহেতু প্যারালাল সালামের পদ্ধতি ব্যবহার করছে, সেজন্য এই পদ্ধতি সঠিক হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত মনে রাখা অপরিহার্য। যেমন—

ক. প্যারালাল সালামে ব্যাংক ভিন্ন দুটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এক চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক ক্রেতা হয় এবং আরেকটি চুক্তি অনুযায়ী বিক্রেতা হয়। এই দু-চুক্তির প্রত্যেকটি অপরটি থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। চুক্তিদ্বয়কে এই হিসেবে পরস্পর মেলানো যাবে না যে, সেগুলোর একটির দায়দায়িত্ব ও জিম্মাদারী দ্বিতীয় চুক্তির দায়দায়িত্ব ও জিম্মাদারীর ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক চুক্তি স্বতন্ত্র হতে হবে এবং অপর চুক্তির ওপর নির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ না থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' 'খ' থেকে একশত বস্তা গম সালাম হিসেবে ক্রয় করছে, যার পরিশোধের তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। 'ক' 'গ'-এর সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করতে পারবে যে, সে তাকে ৩১ ডিসেম্বর একশত বস্তা গম সরবরাহ করবে, কিন্তু 'গ'-এর সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করার সময় তাকে গম সরবরাহ 'খ' থেকে গম গ্রহণের সাথে শর্তযুক্ত করতে পারবে না। 'খ' যদি ৩১ ডিসেম্বর গম সরবরাহ না করে, তাহলেও 'ক' একশত বস্তা গম 'গ'-কে সরবরাহ করতে হবে। সে 'খ'-এর বিরুদ্ধে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে; কিন্তু 'গ'-কে গম সরবরাহের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এমনিভাবে 'খ' যদি 'ক'-কে খারাপ জিনিস সরবরাহ করে, যা পূর্বনির্ধারিত গুণগত মানের নয়, সেই অবস্থায়ও 'ক'-এর দায়িত্ব হলো, 'গ'-এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী গুণগত মানের গম সরবরাহ করা।

খ. প্যারালাল সালাম (Parallel Salam) কেবল তৃতীয় পার্টির সাথে করা জায়িয। প্রথম চুক্তিতে যে ব্যক্তি বিক্রেতা হবে, তাকে দ্বিতীয় প্যারালাল চুক্তিতে ক্রেতা বানানো যাবে না। কেননা, তা বাই ব্যাক (Buy Back)

চুক্তি হয়ে যাবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমনকি দ্বিতীয় চুক্তিতে ক্রেতা যদি তার স্বয়ং স্বাতন্ত্রিক আইনগত বিধান রাখে, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ওই ব্যক্তির মালিকানায় থাকে, যে প্রথম চুক্তিতে বিক্রেতা ছিল, তাহলেও এই (দ্বিতীয় চুক্তি) বৈধ হবে না। কেননা, কার্যত তা বাই ব্যাকের সাদৃশ্য হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' 'খ' থেকে এক হাজার বস্তা গম সালাম হিসেবে ক্রয় করেছে। 'খ' একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, 'খ'-এর অধীনে একটি কোম্পানি 'গ' রয়েছে; যার নিজস্ব একটি পৃথক আইনগত বিধান রয়েছে, কিন্তু মালিকানা সম্পূর্ণভাবে 'খ'-এর। তাহলে এ ক্ষেত্রে 'ক' 'গ'-এর সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করতে পারবে না। তবে 'গ' যদি পরিপূর্ণভাবে 'খ'-এর মালিকানায় না থাকে, তাহলে 'ক' 'গ'-এর সাথে এই চুক্তি করতে পারবে, যদিও কোনো কোনো শেয়ারহোল্ডার উভয় ব্যবসায় শরীক থাকে।[২৬২]

বাই সালামে শরীয়া লঙ্ঘনের ধরন

ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক অনুশীলিত বাই সালামে নানাভাবে শরীয়া লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। যেমন—

ক. চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য পরিশোধের সময় ও স্থান ইত্যাদি উল্লেখ না থাকা :

এগুলোর অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয়টি ফাসিদ (অসিদ্ধ) বলে গণ্য হবে।

খ. চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ না করা :

চুক্তি সম্পাদনকালে মূল্য পরিশোধ করা না হলে সালাম চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, এ ধরনের চুক্তি ঋণ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত।

গ. মেয়াদান্তে গ্রাহক ব্যাংককে মালামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তার নিকট থেকে অগ্রিম প্রদত্ত মূল্যের অতিরিক্ত কিছু ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণ করা :

গ্রাহক মালামাল প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার নিকট থেকে মালামালের মূল্য ফেরত নিতে পারে কিংবা গ্রাহকের হাতে মালামাল আসা পর্যন্ত তাকে সময় দিতে পারে; কিন্তু ব্যাংক মূল্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারবে না; অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।

---

২৬২. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ১৮৬-৭

ঘ. সরবরাহকালীন সহজলভ্য নয়, এমন পণ্যের জন্য বাই সালাম করা :

সরবরাহকালীন মালামাল সহজলভ্য হওয়া বাই সালামের একটি শর্ত। শর্ত লঙ্ঘিত হলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত মালামাল বাস্তবে সরবরাহ করা যাবে না। ফলে ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

ঙ. বাই সালাম চুক্তিতে কোনো নির্দিষ্ট গাছের ফল বা কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেতের ফসল বিক্রির শর্ত করা :

বাই সালামে এরূপ শর্ত করা জায়িয হবে না। কারণ, যেকোনো কারণে নির্দিষ্ট গাছ বা খেতের ফসল সরবরাহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এরূপ অনিশ্চয়তাসহ চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়।

৭. ইসতিসনা

'ইসতিসনা' (استصناع) শব্দটি আরবি صَنْعٌ (সনউন) শব্দ থেকে উদ্ভূত। সনউন শব্দের অর্থ কাজ, নির্মাণ, কারিগরি ইত্যাদি। আর ইসতিসনা অর্থ কাউকে কোনোকিছু নির্মাণ করতে বলা (Asking Someone to Manufacture)।

শরীয়তের পরিভাষায় বাই ইসতিসনা হলো উৎপাদনের বা নির্মাণের এমন এক চুক্তি, যেখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোনো পণ্য তৈরি করে তা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দামে ক্রেতাকে সরবরাহ করতে সম্মত হয়। অন্য কথায়—ইসতিসনা হচ্ছে এমন একটি ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি, যেখানে ক্রেতার দেওয়া নমুনা ও আদেশ মতে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রেতা কোনো পণ্য তৈরি করে ক্রেতার কাছে বিক্রি করে।[২৬৩]

সমাজে ইসতিসনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রয়োজনীয়তার বিবেচনায় এ জাতীয় লেনদেনকে ইসলামী শরীয়তে জায়িয সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফকীহ আলাউদ্দীন আল-কাসানী রাহ. বলেন—এটি 'বাই মাদুম'[২৬৪] হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সহজতার জন্য এ বেচাকেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ফকীহগণের ঐকমত্য রয়েছে।

---

২৬৩. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ৩২৬

২৬৪. বাই মাদূম : যা এখনও অস্তিত্বে আসেনি-এরূপ বস্তুর বেচাকেনা।

ইমাম মালিক, শাফিয়ী, আহমাদ ইবন হাম্বল রাহ. প্রমুখের নিকট ইসতিসনা হলো বাই সালামের পর্যায়ের। তারা ইসতিসনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বাই সালামের শর্তগুলোকে শর্ত করেছেন। তবে ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর কাছে ইসতিসনা আর বাই সালাম অভিন্ন নয়। সুতরাং বাইয়ে সালামের সকল শর্ত ও বিধান এখানে প্রযোজ্য নয়। এর কতিপয় শারয়ী বিধান হলো—

১. ইসতিসনা চুক্তি পণ্যের অস্তিত্ব ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে থাকে। মালামাল প্রস্তুত করা থাকলে তা ইসতিসনার আওতায় কেনাবেচা বৈধ নয়। তখন বাই মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতি প্রযোজ্য।

২. চুক্তিতে ফরমায়েশকৃত পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ ও গুণাগুণ চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরি।

৩. চুক্তিতে পণ্যের সম্মত মূল্য এবং পরিশোধের ধরন উল্লেখ করতে হবে।

৪. চুক্তিতে পণ্য কোথায় এবং কার খরচে সরবরাহ করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে; তবে পণ্য সরবরাহের তারিখ নির্ধারণ করা অপরিহার্য নয়।

৫. ইসতিসনার ক্ষেত্রে বাই সালামের মতো পণ্যের মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধ করা জরুরি নয়। মূল্য—আংশিক বা পুরো—অগ্রিমও পরিশোধ করা যেতে পারে অথবা বাকিও রাখা যেতে পারে, কিস্তিতেও পরিশোধ করা যেতে পারে।

৬. প্রস্তুতকারক উৎপাদনের কাজ শুরু করার পূর্বপর্যন্ত উভয় পক্ষের যে-কেউ অপরকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করতে পারে। কিন্তু অর্ডারদাতা পণ্যের মূল্য সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করার পর অথবা প্রস্তুতকারক উৎপাদন কাজ শুরু করার পর চুক্তিকে একতরফা বাতিল করা যাবে না।

৭. পণ্য তৈরির যাবতীয় উপকরণ কারিগরের হতে হবে। অধিকাংশ উপকরণ অর্ডারদাতার হলে ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় এটিকে ইজারা বা কর্মচারী নিয়োগের মতো হয়ে যাবে। তখন কাজের ওপর উজরত তথা চাকরির বিধান প্রয়োগ হবে।

বাই সালাম ও বাই ইসতিসনার মধ্যে পার্থক্য

বাই সালাম ও বাই ইসতিসনার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

ক. ইসতিসনা সর্বদা এমন জিনিসের ওপর হয়, যা তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে (যেমন—শিল্পপণ্য)। পক্ষান্তরে বাই সালাম সকল জিনিসেই হতে পারে, চাই তা তৈরি করার প্রয়োজন হোক বা না হোক।

খ. বাই সালামের ক্ষেত্রে পণ্যের পুরো দাম চুক্তির সময় মজলিসেই পরিশোধ করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসতিসনার ক্ষেত্রে পণ্যের—আংশিক বা পুরো—দাম চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম কিংবা পণ্য সরবরাহের সময় অর্থাৎ বাকিতে পরিশোধ করা যায়।

গ. বাই সালাম চুক্তি যদি একবার সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে একতরফা বাতিল করা যায় না। পক্ষান্তরে ইসতিসনা চুক্তিতে দ্রব্য তৈরি শুরুর পূর্বপর্যন্ত একতরফা বাতিল করা যায়।

ঘ. বাই সালামে পণ্য সরবরাহের তারিখ নির্ধারণ করা ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যতম অংশ। পক্ষান্তরে ইসতিসনায় সরবরাহের তারিখ নির্ধারণ করা অপরিহার্য নয়; ধার্যও করা যেতে পারে, নাও করা যেতে পারে।[২৬৫]

ইসতিসনা পদ্ধতিতে অর্থায়ন

ইসতিসনা স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের জন্য একটি আদর্শ মোড। এর মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদাগুলো সহজে পূরণ করা যায়। একে ছোটো, মাঝারি ও কমার্শিয়াল ইন্টারপ্রাইজ এবং কর্পোরেট এনটিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে; বিশেষ করে হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে এটি সহজে প্রয়োগ করা যাবে।

ধরুন, যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমি থাকে এবং সে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থায়ন চায়, তাহলে অর্থায়নকারী সেই খালি জমিতে ইসতিসনার ভিত্তিতে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। আর যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমি না থাকে এবং সে জমিও ক্রয় করতে চায়, তাহলেও অর্থায়নকারী এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে যে, সে তাকে এতটুকু জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেবে, যা উভয়ের মাঝে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত থাকবে।

---

২৬৫. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ১৮৮

ইসতিসনায় যেহেতু মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা জরুরি নয় এবং পণ্য কবজ করার সময় পরিশোধ করাও জরুরি নয় (বরং উভয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেকোনো সময় পর্যন্ত মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করা যায়), এজন্য উভয় পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করা যাবে, মূল্য কিস্তিতেও পরিশোধ করা যাবে।

অর্থায়নকারীর জন্য নিজ হাতে গৃহ নির্মাণ করাও জরুরি নয়; বরং সে তৃতীয় কোনো পার্টির সাথে প্যারালাল ইসতিসনা চুক্তিতেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। কিন্তু (গ্রাহক ব্যতীত) অন্য কোনো ঠিকাদার থেকেও সেবা গ্রহণ করতে পারবে। উভয় ক্ষেত্রে সে ব্যয়ের হিসাব করে ইসতিসনা মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে পারবে, যার ফলে ব্যয়ের ওপর তার একটি যুক্তিসংগত মুনাফা অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের পক্ষ থেকে কিস্তি পরিশোধ ওই সময় থেকে শুরু করা যাবে, যখন উভয় পক্ষ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে এবং নির্মাণ চলাকালীন ও বাড়ি গ্রাহকের হস্তগত হওয়ার পরও চালু রাখতে পারবে। কিস্তি পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে জমি কিংবা বাড়ি অথবা অন্য কোনো সম্পদের মালিকানা সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ পর্যন্ত অর্থায়নকারীর নিকট গ্যারান্টি হিসেবে রাখা যাবে।

ইসতিসনা পদ্ধতিকে প্রজেক্ট অর্থায়নের জন্যও উপর্যুক্ত নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করা যাবে। যদি কোনো গ্রাহক তার ফ্যাক্টরিতে এয়ারকন্ডিশন প্লান্ট লাগাতে চায় এবং এজন্য অর্থায়নের প্রয়োজন হয়, তাহলে অর্থায়নকারী ইসতিসনা চুক্তির মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্লান্ট সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। এমনিভাবে ইসতিসনা চুক্তিকে কোনো সেতু কিংবা মহাসড়ক নির্মাণের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

আধুনিক BOT চুক্তি (ক্রয়কর, চালানো ও হস্তান্তর কর)-কেও ইসতিসনার ভিত্তিতে আঞ্জাম দেওয়া যায়। যদি কোনো দেশ একটি হাইওয়ে সড়ক নির্মাণ করতে চায়, তাহলে সেই সড়ক নির্মাণের কোনো কোম্পানির সাথে ইসতিসনা চুক্তি করতে পারবে এবং তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মূল্য হিসেবে হাইওয়ে সড়ক চালানো ও টুল (Toll) গ্রহণের অধিকারও দেওয়া যাবে।[২৬৬]

---

২৬৬. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ১৮৮

ব্যাংকিংয়ে অনুশীলিত বাই ইসতিসনার বৈশিষ্ট্য

ইসতিসনা পদ্ধতিতে ব্যাংক বাই সালামের মতোই বিনিয়োগের অর্থ গ্রাহককে সরাসরি প্রদান করে। বিনিয়োগ গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্য তৈরি বা সংগ্রহের পর ব্যাংককে সরবরাহ করেন। বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে পণ্য বুঝে নেওয়ার পর ব্যাংক উক্ত পণ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করে থাকে। ব্যাংকিং ইসতিসনার কিছু বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. বাই ইসতিসনা পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা এবং বিনিয়োগ গ্রাহক হচ্ছেন বিক্রেতা।

খ. বাই ইসতিসনা চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্যের মূল্য আংশিক, এককালীন কিংবা কিস্তির ভিত্তিতে প্রদান করে।

গ. চুক্তির সময় ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্য ও মজুরির দাম ঠিক করা হয়।

ঘ. চুক্তির সময় পণ্যের মান, শ্রেণি, পরিমাণ, সরবরাহের ধরন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়।

ঙ. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক তৈরি করে পণ্য ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করেন।

চ. ব্যাংক সমান্তরাল ইসতিসনার মাধ্যমে অন্য কারও সাথে পণ্য বিক্রির জন্য চুক্তি করতে পারে। তা ছাড়া সমান্তরাল ইসতিসনার মাধ্যমে ক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে বিক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবে।

ছ. চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচিত পণ্য যথাসময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে অথবা কোনো পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে দায়ী পক্ষের ওপর প্রকৃত ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে। কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে (Force Majeure) চুক্তি ভঙ্গ হলে সেজন্য কারও ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে না।

জ. ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত প্রকৃত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হবে।

ব্যাংকিং ইসতিসনার একটি উদাহরণ হলো—

বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান হবে নির্মাণকারী (সানি) এবং গ্রাহক হলো বাড়ির মালিক (মুস্তাসনি)। যদি অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান কোনো ডেভেলপার কোম্পানির সঙ্গে ইসতিসনা চুক্তি করলে সে ক্ষেত্রে ডেভেলপার কোম্পানি হবে নির্মাণকারী এবং অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান হবে গ্রাহক। অতঃপর ব্যাংক সেই প্রতিষ্ঠানে অর্থ ছাড় করবে এবং চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক বাড়িটি বুঝে নেবে। পরে ব্যাংক প্রথম চুক্তি অনুযায়ী বাড়িটি মূল গ্রাহককে বুঝিয়ে দেবে এবং সে কিস্তিতে বাড়িটির মূল্য পরিশোধ করবে।

প্যারালাল (সমান্তরাল) ইসতিসনা

ক. বাই ইসতিসনা প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী বিক্রেতা পণ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল ইসতিসনা চুক্তি করতে পারবে, যাতে বিক্রেতা প্রথম চুক্তির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

খ. প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে, সে পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল ইসতিসনা করা ক্রেতার জন্যও বৈধ, যাতে তিনি পণ্যটি বিক্রি করতে পারেন।

গ. উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই একটি ইসতিসনা চুক্তিকে আরেকটি ইসতিসনা চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয়; বরং উভয় চুক্তি স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও কর্তব্যও স্বতন্ত্র হবে। সুতরাং কোনো ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষ চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অপর পক্ষ তা সমান্তরাল ইসতিসনা চুক্তির পক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না।

ঘ. বাই ইসতিসনার অন্যান্য বিধান সমান্তরাল ইসতিসনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ইসতিসনা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় : শারয়ী পর্যালোচনা

ইসতিসনার ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—

ক. সরবরাহের সময়

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসতিসনায় পণ্য সরবরাহের সময় নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। তদুপরি ক্রেতা পণ্য সরবরাহের জন্য সর্বোচ্চ সময় ধার্য করতে পারবে। এর মানে হলো—প্রস্তুতকারক যদি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে ক্রেতা তা কবুল করার এবং মূল্য আদায়ের ব্যাপারে পাবন্দ হবে না।

পণ্য সময়মতো সরবরাহ করার নিশ্চিতকল্পে এ ধরনের আধুনিক চুক্তি একটি শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। প্রস্তুতকারক যদি যথাসময়ে সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে তার ওপর জরিমানা আরোপ হবে, যা দৈনিক হিসাবের ভিত্তিতে করা হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোনো শাস্তি আরোপ করা যাবে কি না? যদিও ফকীহদের ইসতিসনা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে এ প্রশ্নের ব্যাপারে চুপ থাকা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এ ধরনের শর্ত ইজারায় জায়িয বলেছেন। ফকীহগণ বলেন—যদি কোনো ব্যক্তি তার কাপড় সেলাইয়ের জন্য কোনো দর্জির সেবা গ্রহণ করে, তাহলে সরবরাহের মেয়াদ অনুযায়ী মজুরিতে কমবেশি হতে পারে। গ্রাহক (যিনি কাপড় সেলাই করতে চান) এ কথা বলতে পারেন যে, দর্জি যদি একদিনে কাপড় তৈরি করে দেয়, তাহলে তাকে ৫০০ টাকা মজুরি দেওয়া হবে, আর যদি দুই দিনে তৈরি করে দেয় তাহলে ৪০০টাকা দেওয়া হবে। এমনিভাবে ইসতিসনায় মূল্যকে সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করা যাবে। উভয় পক্ষ যদি এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায় যে, সরবরাহে বিলম্বের ক্ষেত্রে দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণে মূল্য কমতে থাকবে, তাহলে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয হবে।

খ. পণ্য প্রস্তুত হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার প্রসঙ্গ

ইসতিসনা কি বেচাকেনা নাকি ওয়াদামাত্র—তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফীগণের মধ্যে কারও কারও মতে, ইসতিসনা কোনো বেচাকেনা চুক্তি নয়; বরং ওয়াদামাত্র। অপর কারও মতে, এটি বেচাকেনা; তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যারা মনে করেন যে, ইসতিসনা ওয়াদামাত্র, তাদের মতে—পণ্য তৈরি করার পর ক্রেতার ওই পণ্য নেওয়া বা না নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। অনুরূপ বিক্রেতারও ক্রেতাকে দেওয়া বা না দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। তবে এ ইখতিয়ার হলো পণ্যটি তৈরি হওয়ার পর তা

দেখার আগে। দেখিয়ে ফেললে তাকেই দিতে হবে। অন্যকে দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। তবে অধিকাংশ ফকীহের মতে—ইসতিসনা একটি বেচাকেনা চুক্তিই। তাই এখানে ফিরে যাওয়ার ইখতিয়ার কারোই থাকবে না। ঈজাব-কবুল তথা প্রস্তাব ও সম্মতি হয়ে যাওয়ার পর চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। পরবর্তী ফকীহগণ এ অভিমতের ওপর ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

অধ্যায় : ৬

বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের অন্যান্য পদ্ধতি : পর্যালোচনা

ইসলামী ব্যাংকগুলো আরও নানাভাবে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। যেমন—

১. সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক কারও সাহায্য ছাড়াই নিজেই কোনো লাভজনক প্রকল্প বা আর্থসামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের প্রকল্প স্থাপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্কিম তৈরি থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগেই করে থাকে। প্রকল্পের মূলধন সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং স্থায়ী মালিকানা—সকল কিছুই ব্যাংকের নিজের হাতে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর লাভ হলে তার পুরোটাই ব্যাংকের। লোকসান হলে তারও পুরোটাই ব্যাংক বহন করে। পৃথিবীর বহু ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে। এসবের মধ্যে ডেইরি ফার্ম থেকে এলুমিনিয়াম ও ফাইবার গ্লাস ফ্যাক্টরি; মাছ ধরার ট্রলার থেকে গৃহায়ন প্রকল্প সবই রয়েছে।[২৬৭]

এসব খাতে ব্যাংকগুলো স্বল্প অথবা মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ করে। বিশেষ করে ব্যাংক গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় পণ্য, ব্যক্তিগত বাহন, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক কিস্তিতে বিক্রয় করে মুনাফাও অর্জন করতে পারে।

---

২৬৭. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, পৃ. ২৫-২৬

২. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

শেয়ার যেহেতু একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য, তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো শেয়ার স্টক মার্কেটে শেয়ার কেনাবেচায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে এবং কার্যত নিচ্ছেও। যথাযথভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে এটিও ব্যাংকের বিনিয়োগ ও আয়ের অন্যতম উৎস হওয়া সম্ভব। সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচালিত ও সন্তোষজনক হারে ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম—এমন সরকারি ও বেসরকারি যৌথ কারবারি প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা কোম্পানির স্টক ও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো তহবিল বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে—

ক. যেসব প্রতিষ্ঠান হালাল পণ্য ও সেবা উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত এবং সুদি কারবার বা সুদের লেনদেন করে না—এমন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয।

খ. যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি সুদি কারবারে জড়িত এবং যেসব কোম্পানি হারাম পণ্য উৎপাদন করে কিংবা হারাম পণ্য বা সেবার ব্যাবসা করে, সেসব প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয নয়।

গ. যেসব প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি মৌলিকভাবে হালাল পণ্য ও সেবার ব্যবসায় জড়িত; কিন্তু সুদি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে এবং তা থেকে সুদ অর্জন করে; অনেকের মতে—কিছু শর্তসাপেক্ষে সেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যেতে পারে। শর্তগুলো হলো—

১. কোম্পানির আয়ের সাথে সুদের সংমিশ্রণ ঘটলে তা যদি আলাদা করার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার বেচাকেনা করা যেতে পারে।

২. কোম্পানির এজিএমে বা অন্য কোনো আইনানুগ পন্থায় সুদি লেনদেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকার আহ্বান করতে হবে।

তবে অন্য অনেকের মতে—এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা করা জায়িয হবে না। তাদের মতে—কেবল ইসলামী ব্যাংকের

সাথেই লেনদেন করে—এরূপ কোম্পানির শেয়ারই কেনাবেচা করা জায়িয হবে।[২৬৮] আমরা মনে করি, এ মতটি অধিকতর সঠিক এবং ইসলামী ব্যাংকের চরিত্রের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ. যেসব প্রতিষ্ঠান হালাল পণ্য ও সেবা উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত এবং সুদি কারবার বা সুদের লেনদেন করে না—এমন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা বা ব্রোকারেজ সার্ভিস দেওয়া যেতে পারে।

ঙ. যেসব প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের কিয়দংশ সম্পদ অতরল (নন লিকুইড) থাকে, সেসব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ফেস ভ্যালুর চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

চ. শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাই মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতির চেয়ে মুশারাকা পদ্ধতিই উপযোগী। শেয়ার বাজারে প্রচলিত বর্তমান নীতির অধীনে ব্যাংক কর্তৃক শেয়ারের মালিকানা ও কবজ অর্জন এবং গ্রাহকের কাছে তা হস্তান্তর করা জটিল হওয়ায় এ ক্ষেত্রে বাই মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতি অনুশীলন করা দুরূহ। তাই এগুলোর পরিবর্তে মুদারাবা বা মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ দেওয়াই শ্রেয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাবে মঞ্জুরিকৃত অর্থ স্থানান্তর করবে। অতঃপর গ্রাহক উক্ত অর্থ দিয়ে নির্ধারিত কোডে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করবে। ব্যাংক দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে গ্রাহকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত বিবরণী যাচাই ও পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হবে এবং লাভ-লোকসান নির্ণয়ের মাধ্যমে হিসাবটি চূড়ান্ত করতে পারে।[২৬৯]

ছ. যেসব কোম্পানির পরিসম্পদ কেবল নগদ (—এটা সাবস্ক্রাইবের সময় হতে পারে অথবা তার পর কোম্পানির ব্যাবসা শুরুর আগে হতে পারে কিংবা তরলকরণের সময় হতে পারে—), তার শেয়ার কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয়

---

২৬৮. শামসুল আলম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ২৫

২৬৯. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ২৭-২৯

করা বৈধ হবে না। তবে শেয়ারের অভিহিত মূল্যে ও দখল বুঝিয়ে দেওয়ার শর্তে লেনদেন বৈধ হবে। একইভাবে কোম্পানির সম্পূর্ণ পরিসম্পদ কেবল ঋণ হলে ঋণের লেনদেনের বিধিমালা প্রয়োগ করা ব্যতিরেকে শেয়ারে লেনদেন বৈধ নয়।[২৭০]

৩. বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়

ইসলামী ব্যাংকগুলো খোলা বাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা কিনে আবার তা খোলা বাজারেই বিক্রয় করতে পারে। দুটি ভিন্ন মুদ্রায় লেনদেন হওয়ায় প্রাপ্ত Exchange Gain-এ শরীয়তে দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। এ থেকেও ব্যাংকের প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সেসব দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করছে এবং এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। কোনো কোনো ব্যাংকে মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্জিত হচ্ছে এই একটি মাত্র পদ্ধতি থেকেই।

ইসলামে মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়কে 'বাই আস সরফ' বলা হয়। শরীয়তে বাই আস সরফ' বৈধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো—

- ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বে মুদ্রা ও তার বিনিময়-মূল্য হস্তান্তর করতে হবে।
- সমজাতীয় মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান অর্থাৎ সমমূল্যমানের হতে হবে।
- মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খিয়ার বা অপশন না থাকা।
- কেনাবেচা নগদে হতে হবে; বাকিতে হতে পারবে না।
- মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ, জুয়া কিংবা অজ্ঞতার কোনো উপাদান থাকতে পারবে না।

---

২৭০. রহমতুল্লাহ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ৬৮

ইসলামী ব্যাংকগুলো 'বাই আস সরফ'-এর উপর্যুক্ত শর্তগুলো মেনেই নগদ মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচা করে থাকে। আওফি-এর শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে মুদ্রা কেনাবেচায় কতকগুলো বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে; সেগুলো হলো :

- চুক্তির পক্ষদ্বয় (কেনাবেচার মজলিস বা সময় থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাদের লেনদেনকৃত মুদ্রা ও এর বিনিময় (কাউন্টার ভেল্যু)-এর ওপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ দখল অর্জন করতে হবে।

- সমজাতের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য অবশ্যই সমান সমান হতে হবে, যদি এগুলোর একটি একই দেশের কাগুজে নোট ও অন্যটি ধাতব মুদ্রায় হয় তবুও।

- চুক্তিতে 'খিয়ারে শর্ত' (অর্থাৎ মুদ্রা লেনদেনের চুক্তিটি কার্যকর করা বা না করার অধিকার) কিংবা লেনদেনকৃত মুদ্রার কোনো একটি অথবা উভয়টি বিলম্বে পরিশোধের ধারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

- অগ্রিম (ফরওয়ার্ড) বা ভবিষ্যৎ মার্কেটে মুদ্রা লেনদেন না হওয়া।

- মুদ্রার অগ্রিম (ফরওয়ার্ড) লেনদেনের চুক্তি করা হারাম। এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে, ঋণ স্থানান্তর (হাওয়ালা) অথবা বিলম্বে কার্যকরযোগ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট লেনদেনে, যেখানে লেনদেনকৃত মুদ্রাদ্বয়ের কোনোটির ওপর দখল অর্জিত হয় না।[২৭১]

ফরেক্সের মাধ্যমে মুদ্রার ব্যাবসা

আধুনিক ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাবসা'-এর (Foreign Exchange Trade) ব্যাপকতা ঘটেছে। সংক্ষেপে এ ব্যাবসাকে (forex বা FX) নামে অভিহিত করা হয়। এর পূর্ণ রূপ হলো Foreign Currency Exchange। বর্তমানে ফরেক্স বলতে বিশেষ ধরনের মুদ্রা ব্যাবসাকে বোঝানো হয়। এ ব্যবসায় কেবল দুটি মুদ্রার মূল্যের ওঠানামার পার্থক্য বা মার্জিন আদান-প্রদান হয়। মূল চুক্তি হয় কারেন্সি রেটের ওপর; কারেন্সির ওপর নয়। মুদ্রা ব্যবসায় বাকি রাখা যাবে না; কিন্তু ফরেক্সের ক্ষেত্রে

এ শর্ত পরিপালিত হয় না। উল্লেখ্য, মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয় বিনিময় কবজের বিষয়টি পাওয়া যায় না। কারণ, শর্ট সেল নামক যে বিক্রয় পদ্ধতি রয়েছে, সেখানে চুক্তির সময় থেকে দু-দিনের আগে উভয় বিনিময় কবজের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ প্রসঙ্গে মুফতী তকী উসমানী বলেন—

> আমাদের প্রাধান্য দেওয়া মতানুযায়ী ভিন্ন জাতের মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসে কমপক্ষে একটি বিনিময় কবজ করা শর্ত। ফরেক্স বাজারে এ শর্তটিও পাওয়া যায় না; বরং এখানে সাধারণত কম্পিউটার স্ক্রিনেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়।
>
> এ ছাড়া ফরেক্স মার্কেটের অধিকাংশ লেনদেনে হস্তান্তর ও পণ্য বুঝে নেওয়া হয় না; বরং বিক্রেতা ও ক্রেতা তাদের কার্যক্রমের সময় বাজারমূল্যের পার্থক্যের মাধ্যমে সমন্বয় করে নেয়। আবার অনেক সময় এক্সচেঞ্জ মার্কেটের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবসায়ীকে এমন সুযোগ দেওয়া হয় যে, কম মুদ্রা জমা করে বেশি মুদ্রার ব্যাবসা করবে। তাদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত মুদ্রার দায়ভার বহন করা হয় এবং এ দায়ভারের বিনিময়ে বেশি মুদ্রার ব্যবসায়ী থেকে অর্থ নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিকে 'মার্জিনের ওপর বিক্রয় করা' (Sale of Margin) নামে অভিহিত করা হয়। বাস্তবিক অর্থে লেনদেনটি ঋণ দিয়ে সুদ নেওয়ার শামিল।
>
> তা ছাড়া এ বাজারের মাধ্যমে যারা মুদ্রা ক্রয় করে, তারা অনির্দিষ্ট মুদ্রা ক্রয় করে। কারণ, মুদ্রার ক্ষেত্রে কেবল কবজের মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট হয়। এ বাজারের অধিকাংশ লেনদেনে বিষয়টি পাওয়া যায়।[২৭২]

এসব কারণে শারয়ী দৃষ্টিতে ফরেক্স বাজারের মাধ্যমে মুদ্রার ব্যাবসা শরীয়াসম্মত নয়।[২৭৩]

রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে প্রাপ্ত 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'-এর বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়

রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে প্রাপ্ত বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়ের বিষয়টি পুরোপুরি 'বাই আস সরফ' বা মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এখানে

---

২৭২. তকী উসমানী, *ফিকহুল বুয়ূ*, পৃ. ৯৮৬

২৭৩. রহমতুল্লাহ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ৬২-৩

একটি বৈধ লেনদেনের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় বিল অব এক্সচেঞ্জ ড্র করা হয়, যা ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় হওয়া নিশ্চিত। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC) কর্তৃক প্রণীত ইউনিফর্ম কাস্টম অ্যান্ড প্র্যাকটিস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট (UCPDC), ইউনিফর্ম রুলস ফর রিইম্বাসমেন্ট (URR) ও ইউনিফর্ম রুলস ফর কালেকশন (URC)-এর অনুসরণে লেটার অব ক্রেডিট (L/C)-এর শর্ত পূরণসাপেক্ষে বিল অব এক্সচেঞ্জের মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

সুতরাং এখানে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে 'ইয়াদান বি ইয়াদিন' (অর্থাৎ বেচাকেনার মজলিসে উভয়ের কবজ)-এর যে শর্তটি আছে, তা লঙ্ঘিত হচ্ছে না এবং বৈদেশিক মুদ্রার হার পরিবর্তনের ফলে বা কিছুদিন বিলম্ব হলেও লাভ-লোকসানের ঝুঁকি থাকে; তবে গারারের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া এখানে একজাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে অন্য জাতীয় মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হচ্ছে, যা 'ইখতিলাফুল জিনস' (মুদ্রার জাত ভিন্ন হওয়া)-এর কারণে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রাহি.-সহ অনেক ফকীহের কাছে বৈধ। সর্বোপরি রপ্তানি বিল ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত বিষয় তথা 'উরফে আম' হিসেবে ইসলামী ব্যাংক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও এরূপ ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করে আসছে। উল্লেখ্য, 'উরফে আম' কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি না হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ এবং বাংলাদেশের ব্যাবসায়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বলা যায়—যেসব বিলের মূল্য আদায় হওয়া নিশ্চিত, তা হুকুমগতভাবে 'ইয়াদান বি ইয়াদিন' গণ্য করে সেসব বিলে উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রার কনস্ট্রাকটিভ ডেলিভারির ভিত্তিতে গ্রাহকের কাছ থেকে দু-পক্ষের সম্মত মূল্যে ব্যাংক ক্রয় করে নিতে পারে। তবে পরবর্তীকালে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার কমবেশি যা-ই হোক, ব্যাংক গ্রাহকের কাছে অতিরিক্ত কিছু দাবি করতে পারবে না এবং গ্রাহকও ব্যাংকের কাছে কিছু দাবি করতে পারবে না। ব্যাংকের যে হিসাব শিরোনাম বিকলন করে নগদে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা হয়, একই হিসাব শিরোনাম বিকলন করে বিল এক্সচেঞ্জে উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে হবে। তবে গ্রাহক কোনো ত্রুটিপূর্ণ বিল বিক্রয় করলে এবং এ কারণে যথাসময়ে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হলে তার দায়দায়িত্ব গ্রাহকের ওপর বর্তাবে। এ জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য মুদারাবা ফান্ড থেকে প্রদান করা হলে এ খাত থেকে অর্জিত আয় মুদারাবা আমানতকারীদের লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য

করতে হবে। এ মতামত কেবল রপ্তানিমূল্যের বিপরীতে বিল অব এক্সচেঞ্জের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বাই আস সরফের অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[২৭৪]

বর্তমানে বাই আস-সরফ পদ্ধতিতে গতানুগতিক FBN/FBP অর্থাৎ Foreign Bill Negotiation/ Foreign Bill Purchase পদ্ধতির পরিবর্তে Bai-as-Sarf-FDB (Foreign Documentary Bill) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। লক্ষণীয় হলো, এটি একটি বাই ম্যাকানিজমের বিনিয়োগ পদ্ধতি। সুতরাং এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাই আস-সরফ অ্যাগ্রিমেন্ট (Bai-as-Sarf Agreement) একটি আবশ্যকীয় দলিল। অন্যান্য চার্জ ডকুমেন্টসমূহও নিতে হবে।

বাই আস-সরফ FDB-এর ক্ষেত্রে গ্রাহক এবং ব্যাংকের সাথে প্রত্যেকটি বিলের জন্য আলাদা আলাদাভাবে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। এখানে গ্রাহক প্রথম পক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং ব্যাংক দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

গ্রাহক ব্যাংকের নিকট তার নির্দিষ্ট Export L/C-এর বিপরীত নির্দিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রামানের Export Document উপস্থাপন করে তার প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের জন্য আবেদন করে থাকে। আর ব্যাংক তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে। চুক্তিপত্রে অবশ্যই গ্রাহক যে Export L/C পেয়েছে তার বিবরণ প্রদান করতে হবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে এফএক্স ফরওয়ার্ড

বৈদেশিক বাণিজ্য এফএক্স ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াসম্মত নিম্নোক্ত দুটি বিকল্পের যেকোনো একটি অনুশীলন করতে পারে :

প্রথম বিকল্প : এফএক্স ফরওয়ার্ড বা ভবিষ্যৎ লেনদেনের উদ্দেশ্যে প্রথমে বৈদেশিক মুদ্রার আনুমানিক হার (Anticapted Rate) নির্ধারণপূর্বক ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি জেন্টলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হবে এবং পরবর্তী

---

২৭৪. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৭৭-৭৮

সময়ে মুদ্রা লেনদেনের দিন পূর্বোক্ত আনুমানিক হারের সাথে লেনদেনের দিনের হারকে গড় করে চূড়ান্ত হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে :

ক. শুরুতে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে একটি 'ওয়াদ বিল বাই' সম্পাদিত হবে, যা পরিপালন করা উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

খ. 'ওয়াদ' পর্যায়ে মুদ্রা লেনদেনের একটি আনুমানিক (Anticapted) বিনিময় হার নির্ধারণ করা হবে এবং লেনদেনের দিন উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে চূড়ান্ত হার নির্ধারণ করা হবে।

গ. আনুমানিক হার (Anticapted Rate) এবং লেনদেন দিবসে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারদর (Spot Rate) গড় করে ওই দিনের মুদ্রা লেনদেনের চূড়ান্ত হার নির্ধারণ করা হবে এবং এ সময় ইয়াদান বি ইয়াদিনের শর্ত পূরণ করে উভয় মুদ্রা নগদে হস্তান্তর সম্পন্ন করতে হবে।

ঘ. মূল লেনদেনের সময় কোনো ধরনের অজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা (গারার), ফটকাবাজারি ও শরীয়ার নিষিদ্ধ কোনো উপাদান থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয় বিকল্প : এ ক্ষেত্রে প্রথম বিকল্প প্রস্তাবনার 'গ' নং শর্তটি অর্থাৎ 'লেনদেন দিবসে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারদর (Spot Rate) ও আনুমানিক হার গড় করে ওই দিনের মুদ্রা লেনদেনের চূড়ান্ত হার নির্ধারণ করা হবে'—এর স্থলে 'লেনদেন দিবসের স্পট রেট যার অনুকূলে যাবে সে পক্ষ অপর পক্ষকে তার লাভ থেকে শতকরা ২৫ ভাগ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত প্রদান করবে বা ছাড় দেবে' শর্তটি প্রতিস্থাপিত হবে এবং নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে :

ক. গ্রাহক তার বৈদেশিক মুদ্রার ওঠানামায় উদ্ভূত প্রকৃত ঝুঁকি মোকাবিলায় ফরওয়ার্ড বুকিংয়ের জন্য ব্যাংকের কাছে আবেদন করবে।

খ. গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক আনুমানিক হারে ফরওয়ার্ড বুকিং করবে এবং নির্দিষ্ট তারিখে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের চুক্তি করবে।

গ. চুক্তি অনুযায়ী ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট মুদ্রা সরবরাহের তারিখে (Forward Maturity Date) সংশ্লিষ্ট মুদ্রার বাজারদরের সাথে আনুমানিক ফরওয়ার্ড বুকিং হারের তারতম্য হলে যেকোনো এক পক্ষ (ব্যাংক বা গ্রাহক) ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে অপর পক্ষ তার লাভ থেকে চুক্তি অনুযায়ী শতকরা ২৫ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ শেয়ার করবে।

ঘ. লাভ-লোকসান ভাগ করার ফলে লেনদেন তারিখে উভয় পক্ষ তাদের চুক্তিভুক্ত লেনদেন সম্পাদনের জন্য একটি নতুন হার (Adjusted Rate)-এ উপনীত হবে এবং হাতে হাতে লেনদেন সম্পন্ন হয়ে ফরওয়ার্ড হিসাব (Forward Deal) বন্ধ হবে।

ঙ. ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলে ফরওয়ার্ড লেনদেনের নির্দিষ্ট অংশ অন্যত্র ফরওয়ার্ডের ভিত্তিতে কাভারেজ রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার রপ্তানিকারক, রেমিটার অথবা অন্য কোনো ব্যাংকের সাথে ক, খ, গ ও ঘ নং দফায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী একইভাবে লেনদেন সম্পাদন করবে।

চ. বাস্তব প্রয়োজন ব্যতীত ফটকা ব্যাবসার জন্য কোনো ফরওয়ার্ড সার্ফ করা যাবে না।

ছ. চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কোনো পক্ষই চুক্তি বাতিল করতে পারবে না।[২৭৫]

বাণিজ্যিক পত্র বাট্টাকরণ

বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Papers) হলো বিনিময়যোগ্য এমন সনদ বা আর্থিক বিবরণী (Tradable Certificates), যা নগদ অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে। অবহিত করানো মাত্র বা স্বল্প মেয়াদান্তে যা পরিশোধযোগ্য (Payable)। উরফ বা প্রচলন হিসেবে এটা পাওনা আদায়ের মাধ্যম ও কারবারের ক্ষেত্রে মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাজ করে। প্রচলিত বিনিময় বিল (Bill of Exchange), প্রতিজ্ঞাপত্র (Promissory Note) ও চেক (Cheque) বাণিজ্যিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

বাণিজ্যিক বিল দু-ধরনের হয় : উপস্থাপনমাত্র পরিশোধযোগ্য বিল বা Demand Bills এবং মেয়াদি বিল। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত ডিমান্ড বিলের ক্ষেত্রে বিল ক্রয় বা Purchase of Bills পরিভাষা ব্যবহার করে; আর মেয়াদি

---

২৭৫. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৭৯-৮০

বিল বাট্টাকরণ (Discounting) থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই বিল বিক্রেতাগণ ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে বিলের অর্থ পেয়ে যায়, তাদেরকে ব্যাংক কর্তৃক বিলের অর্থ সংগ্রহ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না।

বিল বাট্টাকরণ হলো বাণিজ্যিক পত্রের ধারক মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই অনুমোদনের মাধ্যমে তার বিলের স্বত্ব তৃতীয় পক্ষ বা ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করে। আর তৃতীয় পক্ষ এর মূল্য থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কেটে রেখে বাকিটা তাকে তাৎক্ষণিক প্রদান করে।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বাণিজ্যিক দলিলপত্র বাট্টাকরণ বৈধ নয়। তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার (Date of Maturity) পর প্রথম স্বত্বভোগী (Beneficiary)-কে বিলের প্রকৃত মূল্য থেকে কম মূল্য পরিশোধ করা বৈধ।

মেয়াদপূর্তির পূর্বে বাণিজ্যিক দলিলপত্রকে তার সমমূল্যে বিক্রয় করা বৈধ নয় 'রিবা আন নাসিয়াহ'[২৭৬] হওয়ার কারণে। আর তার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করা বৈধ নয় 'রিবা আন নাসিয়াহ' ও 'রিবা আল ফদল'[২৭৭] হওয়ার কারণে। তবে ইসলামী ব্যাংকগুলো রিবা থেকে বাঁচার জন্য বিদেশি মুদ্রার বিল পারস্পরিক সম্মতিতে যেকোনো দামে দেশীয় মুদ্রায় ক্রয় করে নিতে পারে। বিল ও দেশীয় মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন জাতের হওয়ার কারণে রিবার আশঙ্কামুক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে মুদ্রা দুটির বিনিময় হার নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ঋণ ও সুদের দিকে না গিয়ে ব্যাংক পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিদেশি মুদ্রার দাম নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে পুরো মূল্য নগদ পরিশোধ করে দিতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে বিলের বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ করে তা উচ্চতর হারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।[২৭৮]

---

২৭৬. রিবা আন নাসিয়াহ : ঋণের ওপর চুক্তির শর্তানুসারে শরীয়াসম্মত কোনো বিনিময় ছাড়া যে অতিরিক্ত অর্থ বা মাল আদায় করা হয়, তাকে 'রিবা আন নাসিয়াহ' বা মেয়াদি ঋণের সুদ বলা হয়। এককথায়—সময়ের কারণে ঋণের আসলের অতিরিক্তই হচ্ছে 'রিবা আন নাসিয়াহ'।

২৭৭. রিবা আল ফদল : পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই রিবা আল ফদল। যেমন—এক টাকার বিনিময়ে দুই টাকা।

২৭৮. শরীফ হুসাইন, মুহাম্মদ, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, পৃ. ১৮০; রহমতুল্লাহ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ৬৬

উক্ত নিয়ম ডিমান্ড বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মেয়াদি বিলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে মুশারাকা অথবা মুদারাবা অনুশীলন করা যেতে পারে।

বেশি দামে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা

বিভিন্ন সময় Bangladesh Foreign Exchange Dealer's Association (BAFEDA) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দর ঘোষণা করে। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ব্যাংক এই ঘোষিত দরের চেয়ে উচ্চদরে বৈদেশিক মুদ্রা কিনছে। এ কারণে গত কয়েক বছরে দেশি-বিদেশি বহু ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাস্তির মুখে পড়েছে। এ অভিযোগও রয়েছে, সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশও বাফেদার ঘোষণার চেয়ে বেশি দামে বৈদেশিক মুদ্রা কিনেছে। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর কারণ জানতে চেয়ে ব্যাংকটিকে চিঠিও দিয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বাফেদা ঘোষিত দামের চেয়ে উচ্চদরে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা একদিকে পারস্পরিক চুক্তির লঙ্ঘন, রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করার নামান্তর, অপরদিকে এরূপ কাজের দ্বারা মুদ্রা বাজারকে ম্যানুপুলেট করা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত।

৪. নিলাম বিনিয়োগ

'নিলাম' ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিল্পখাতে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বিনিয়োগ বা সহযোগিতার জন্য এটি একটি কার্যকর পন্থা। নিলামকে আরবীতে مزايدة এবং ইংরেজিতে Auctioning বলা হয়। বাংলায় এর অর্থ হলো—পরস্পর মূল্য হাকা বা ডাকা। ব্যাংকিং পরিভাষায়—কোনো ব্যাংক অথবা কয়েকটি ব্যাংক নিয়ে গঠিত কোনো কনসোর্টিয়াম (Consortium) যখন কোনো প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, তখন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ জোগান দেওয়ার শর্তে উক্ত প্রকল্প পরিকল্পনা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে, তখন তাকে 'বিনিয়োগ নিলাম' বলা হয়।

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক একান্তই নিজের উদ্যোগে কিংবা অন্যের সাথে যৌথভাবে উৎপাদনমুখী ছোটো ও মাঝারি ধরনের শিল্পপ্রকল্প তৈরি করে এবং প্রয়োজনীয়

যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করে। অতঃপর ওই প্রকল্পগুলো লাভের ভিত্তিতে নিলামে বিক্রি করে। অবশ্যই প্রকল্পগুলো তৈরির কাজ পুরো সম্পন্ন করেও ব্যাংক নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। যুক্তিসংগত হারে লাভ ধরেই ব্যাংক প্রকল্পগুলোর বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যেকোনো দরপত্র বা নিলাম ডাক গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারও ব্যাংকের থাকে। কৃতকার্য ক্রেতার নিকট থেকে ব্যাংক সম্পূর্ণ মূল্য নগদ গ্রহণ করতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দিতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটি একটি লাভজনক বিনিয়োগ কৌশল। দ্রুত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও পুঁজি সংগঠনের জন্যও পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে সহায়ক। ব্যাংক নিজের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী ছোটো ও মাঝারি ধরনের শিল্প কারখানা তৈরি ও চালু করে ওইগুলো লাভের ভিত্তিতে নিলামে বিক্রি করতে পারে।[২৭৯]

৫. ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর মাধ্যম হতে পারে ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়নব্যবস্থা। বিভিন্ন গবেষণায় ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

ছোটোখাটো ব্যাবসা যেগুলোতে বার্ষিক ব্যালেন্সশিট হয় না, সেগুলোতে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য লাভের হারে ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে। সমাজে চায়ের দোকান, ফেরিওয়ালা, কামার, নাপিত, মুদিওয়ালা প্রভৃতি নানা ধরনের ছোটো ছোটো দোকানদার রয়েছে, যাদের পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এরা সহজেই সেই পুঁজি পায় না। উপরন্তু, তারা ব্যাবসার দৈনন্দিন হিসাবপত্র রাখে না বা রাখতে পারে না। এজন্য ৫ম অধ্যায়ে আলোচিত পদ্ধতিগুলোর কোনোটির মাধ্যমেই এদের আর্থিক সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। অথচ

---

২৭৯. শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জনসংযোগ বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৯০

এদেরকে পুঁজি দিয়ে সহযোগিতা করতে পারলে এরা কর্মসংস্থান ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দায় পরিশোধ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, বিশেষ করে বাংলাদেশের পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে দেখা গেছে যে, দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে ছোটো বিনিয়োগগ্রহীতারা এগিয়ে; তার পরে মাঝারি ও বড়ো বিনিয়োগগ্রহীতারা।

উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানকেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ, ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অধীনে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে উল্লিখিত জনগোষ্ঠী মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং নতুন ব্যাবসা শুরু ও বৃদ্ধি করতে পারে। যা-হোক, প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রচলিত ক্ষুদ্র অর্থায়নব্যবস্থা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিচালিত হচ্ছে। মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) তথ্য অনুসারে—গ্রামীণ ব্যাংক, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশে প্রায় ৭৩৯টি প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধীনে ৬ কোটি ৬৪ লাখ সদস্য ঋণ গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতার স্বাক্ষর রাখলে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হতো; কিন্তু তা হয়নি। বরং ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীরা ঋণগ্রহীতার ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে আসছে, দরিদ্র থেকে হতদরিদ্র হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে বেশির ভাগ।

কার্যত প্রচলিত ক্ষুদ্র অর্থায়নব্যবস্থা বা এনজিওগুলো সফল না হলেও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আরডিএস প্রকল্প সফল হওয়ায় ২০১২ সাল থেকে শহুরে দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এটি ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়নে বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে ক্রমবর্ধমান প্রকল্প। ২০১৮ সালে এ প্রকল্পের আওতায় সদস্য ছিল ১১ লাখ দরিদ্র মানুষ, যা ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬ লাখ, যাদের অনেকেই বিনিয়োগ নিয়ে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকটির ৪৬২টি শাখা, উপশাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং ইউনিটের

মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে বিনিয়োগ আদায়ের হার ৯৯.০৩ শতাংশ, যা ২০২১ সালে ছিল ৯৮.৯৩ শতাংশ; এত বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ আদায়ের হার দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সফলতা নির্দেশ করে।

ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়নব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়া প্রদত্ত মডেল যেমন ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান চুক্তির মধ্যে রয়েছে ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক ব্যবস্থা—বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইসতিসনা ইত্যাদি; ব্যাবসায়িক সহযোগিতাভিত্তিক চুক্তি মুশারাকা ও মুদারাবা; ইজারাভিত্তিক চুক্তি যেমন হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচপিএসএম)। ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়নব্যবস্থায় মুনাফার হারও তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রধান লক্ষ্য হলো—বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লি অঞ্চলের কৃষি ও অকৃষি খাত সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক খাতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনিয়োগ প্রদান, বিনিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলাদের সরাসরি উৎপাদনে সম্পৃক্তকরণ, শিক্ষার বিস্তার, দৈনন্দিন জীবনমান উন্নয়ন, প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন, দরিদ্র ও শ্রমজীবী নারী ও পুরুষকে ধীরে ধীরে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য অব্যাহত বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান এবং মহাজনি ও চড়া সুদে টাকা লগ্নি ইত্যাদি শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো।

ইসলামী ব্যাংকের আরডিএস নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ প্রকল্পের অধীনে গ্রাহকরা সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫০ হাজার (বিশেষ ক্ষেত্রে ৩ লাখ) টাকার বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। মৎস্য চাষ, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ যন্ত্রপাতি, প্রাণিসম্পদ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক বাণিজ্যিক উৎপাদন, গ্রামীণ পরিবহন, গ্রামীণ বেকার যুবক এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের আত্মকর্মসংস্থান এবং আয়ের উৎপাদক কার্যক্রমের জন্য বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। তা ছাড়া পল্লি আবাসনের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় এইচপিএসএমের মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষাসেবা এবং নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও মেডিকেয়ার সুবিধা প্রদান করা। পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন, শ্রমজীবী ও গরিব চাষিদের সংঘবদ্ধ করে তাদের মধ্যে পুঁজি বিনিয়োগ, নৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক

সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগ-সংশ্লিষ্ট কাজে প্রযুক্তিজ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সহায়তা বা উৎসাহিত করা। গ্রামীণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতে ইসলামী ব্যাংকের আরডিএস প্রকল্প সরাসরি ভূমিকা রাখছে। আরডিএসের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পল্লি অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। শহরাঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা এবং গ্রামাঞ্চলে বিপুল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে, যা দেশের দারিদ্র্যহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

মোটাদাগে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে—অল্প পুঁজি, দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীরা হচ্ছে এর প্রধান গ্রহীতা; ব্যক্তি বা সমিতি দুটোর মাধ্যমে লেনদেন হয়; সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ; আয় থেকে ঋণের দায় পরিশোধ; স্বকর্মসংস্থান বা মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় নির্দিষ্ট একটি স্থানে লেনদেন, যা 'আরডিএস কেন্দ্র' নামে অভিহিত করা হয়। সদস্য ও সদস্যদের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংকের ফিল্ড অফিসার তথা কর্মকর্তারা আরডিএস সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে সেবা নিশ্চিত করেন।

এই প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের জন্য কোনো জামানত প্রয়োজন নেই। সর্বমোট ঋণ (মূল পরিমাণ এবং মুনাফা) সাপ্তাহিক কিস্তিতে এক বছরে পরিশোধ করতে হয়। ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের অন্যতম একটি দিক হলো তদারকি কার্যক্রম। বিনিয়োগ দিয়ে শুধু আদায় নয়; বরং তার সফল ও সার্থক ব্যবহার হচ্ছে কি না তা তদারকি করা হয়। প্রায় শতভাগ বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ের অন্যতম রহস্য এটি। এই স্কিমের সব সদস্যকে ন্যূনতম পরিমাণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় করতে হয়। এ ছাড়াও ফিল্ড অফিসাররা সদস্যদের নিয়ে সততা, দায় পরিশোধের গুরুত্বসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ফলে বিনিয়োগ গ্রাহকরা দায় পরিশোধে অনীহা নয়; বরং সৎ ও নৈতিকতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা হয়ে বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধে তৎপর থাকেন।

ইসলামী ব্যাংকের এই প্রকল্পকে সারা বিশ্বে ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের জন্য মডেল হিসেবে গ্রহণ করে অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এজন্য বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগব্যবস্থার পথিকৃৎ বলা হয়। ইসলামী ক্ষুদ্র

বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো গত প্রায় তিন দশকে দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য এ ধরনের আর কোনো প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশে আরও ৯টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। এই ব্যাংকগুলো ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগব্যবস্থা চালু করলে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মতো ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব। এ ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলোও ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগব্যবস্থা চালু করতে পারে। এতে একদিকে সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে, অন্যদিকে অর্থনীতির প্রকৃত সুফল সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে; সম্ভব হবে সম্পদের সুষম বণ্টন।

এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুদারাবা ও মুশারাকার মতো আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর ওপর জোর দিতে হবে। একই সঙ্গে কিস্তি পরিশোধের শুরুর সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে পৃথক 'ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন মাত্রা নিয়ে আসবে।

আরডিএস প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও বৈষম্য

আরডিএস ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ৬৪টি জেলার ৩২ হাজার ৬৩৮টি গ্রামে ব্যাংকের ৩৩৭টি শাখা ও ১৭টি উপশাখা মিলিয়ে মোট ৪১ হাজার ৪৯২টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সদস্য সংগঠিত করে ক্ষুদ্র আর্থিক সেবায় এনেছে প্রায় ১৬ লাখ ৮৬ হাজার ৪৩ পরিবারকে, যার মধ্যে ৮ লাখ ৯৭ হাজার ৮৯২ জন সরাসরি আরডিএস বিনিয়োগ নিয়েছেন, যার মধ্যে ৯২ শতাংশ নারী। বর্তমানে এ প্রকল্পের বিনিয়োগ স্থিতি ৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত, জামানতবিহীন ঋণগ্রহীতাদের পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, দুর্নীতিমুক্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থার ফলে আদায়ের এ উচ্চহার বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের নতুন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আরডিএসের এ বিনিয়োগ কার্যক্রম আরও ১০-১২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে।

এত দ্রুত এই প্রকল্পটি এত বিস্তৃত ও বর্ধিত হবে সম্ভবত ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষও তা ভাবেননি। তাহলে এটাকে BRAC-এর মতো আলাদা সাবসিডিয়ারি সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে পারতেন। বাংলাদেশে যুগপৎ

ব্যাংক ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ একসাথে কারোই নেই এবং কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে না। কেননা, এর যে ব্যয় তা মুনাফা থেকে উঠে আসে না। সাবসিডিয়ারি সংগঠন হলে তার বেতন-কাঠামো, পদ সোপান ও প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া ভিন্ন হতো এবং তাতে কোনো আপত্তি উঠত না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে শুরু থেকেই এটি মূল ব্যাংকের সাথে একীভূত এবং মূল ব্যাংকের জনশক্তিরাই তা পরিচালনা করে।

তবে দুঃখের ব্যাপার হলো, আরডিএস প্রকল্পে নিয়োজিত জনশক্তি এখন সবচেয়ে বেশি অসহায় এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বৈষম্যের শিকার। এটি ব্যাংকের ভেতরে যেন আরেকটি ব্যাংক, যার বেতন-কাঠামো, পদ সোপান ও প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া ব্যাংকের চেয়ে আলাদা। একই যোগ্যতায় ব্যাংকের লেটারেল এন্ট্রির লোকেরা বেতন তুলেন ২৮,০০০/- টাকা এবং কনফারমেশন হলে তুলেন ৩৯,০০০/-, সেখানে আরডিএসের লোকেরা একই সময়ে পান যথাক্রমে ২০,০০০/- টাকা ও ২২,২০০/- টাকা।

এরপর তাদের সি.ফিল্ড অফিসার হলে মূলধারার ব্যাংকে সি. অফিসার হিসেবে আত্তীকরণের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি আরডিএস থেকে আরডিএসে প্রমোশনের হারও নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে এমন বহু অফিসার আছেন, যারা গত এক দশকেও প্রমোশনের মুখ দেখেননি। একসময় এরা গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ সুবিধা পেত। সেই সুবিধাও বিনা নোটিশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীন অনেক সামাজিক কল্যাণমুখী কার্যক্রম যেমন—বৃক্ষরোপণ, শিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি এখন হ্রাস করতে করতে প্রায় বন্ধই আছে।

একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেই নয় যে, বঞ্চিত লোকজন সুবিচার পাওয়ার আশায় উপায় না পেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়, রিট ফাইল হয় এবং নিয়ম মতে শুনানি শেষে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের বেঞ্চ আদালত গত ২২ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে আরডিএস জনবলের বেতন-কাঠামো বিআরপিডি-০২, তারিখ ২০ জানুয়ারি, ২০২২ অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করেন। সার্কুলার অনুযায়ী প্রবেশন পিরিয়ডে তাদের ন্যূনতম বেতন ২৮,০০০/- এবং কনফার্মেশনের পরে বেতন ৩৯,০০০/- দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে, অথচ তাদেরকে বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে প্রবেশন পিরিয়ডে ২০,০০০/- এবং কনফার্মেশনের পর ২২,২০০/-। এত দিনেও আদালতের এ

সিদ্ধান্ত ব্যাংক কার্যকর করতে পারেনি অথবা ইচ্ছা করেই করেনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় আশা করি ব্যাংক অবিলম্বে তা কার্যকর করতে বাধ্য হবে।[২৮০]

অদূর ভবিষ্যতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আরডিএসকে পৃথক সাবসিডিয়ারি করে পরিচালনা করলে এর বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনে আরও এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

স্বাভাবিক মুনাফার হার নির্ধারণ

ইসলামী ব্যাংকগুলো এ প্রকল্পে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হারে (যেমন—৬ বা ৭%) মুনাফা প্রদানের শর্তে এসব ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

স্বাভাবিক মুনাফার হার নির্ধারণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ ধরনের ব্যাবসাসমূহের কমপক্ষে তিন বছরের লেনদেনের হিসাব নেবে, লাভ-লোকসানের হিসাব করবে এবং এর গড় হারের ভিত্তিতেই মুনাফার স্বাভাবিক হার নির্ধারিত হবে। তবে সুদের হারের মতো এই হার স্থির বা সুনির্দিষ্ট নয়। অবশ্যই বিনিয়োগের সময় চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, যদি প্রকৃত লাভ নির্ধারিত স্বাভাবিক মুনাফার হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত লাভের অংশবিশেষ ব্যাংককে প্রদান করবে। পক্ষান্তরে যদি অর্জিত মুনাফা নির্ধারিত স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয় কিংবা লোকসান হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে ব্যাংক মুনাফার ওই নিম্নহার বা লোকসানই মেনে নেবে। সুতরাং মুনাফার স্বাভাবিক হার আসলে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশলমাত্র। সন্দেহ নেই, অর্থায়নের এ পদ্ধতি আকর্ষণীয় ও সহজ; কিন্তু এর সঠিক বাস্তবায়ন দুরূহ।

৬. মেয়াদি অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট

বহু ইসলামী ব্যাংক ৫ থেকে ১০ বছর মেয়াদি বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ইস্যু করছে, যাতে গৃহনির্মাণ, স্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, শিল্পকারখানা স্থাপন প্রভৃতি

---

২৮০. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের সংস্কার কোথায় কোথায় জরুরী—তৃতীয় পর্ব*, https://www.facebook.com/share/p/3sF3BNcgPVJFXmeG/?mibextid=oFDknk

কাজে অংশগ্রহণ করা যায়। একে 'মুদারাবা বন্ড' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ ধরনের সার্টিফিকেট ন্যূনতম এক বছরের পূর্বে ভাঙানো যায় না। লাভ-লোকসানের অংশীদারত্বে শর্ত থাকে বলেই ক্রেতারা যেমন মুনাফা আশা করে, তেমনি লোকসানের অংশ নিতেও প্রস্তুত থাকে। দেখা গেছে, এসব বিনিয়োগে মুনাফাই হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় আরও লক্ষ করা গেছে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ ধরনের সার্টিফিকেট ক্রেতাদের সরকারঘোষিত ন্যূনতম নিশ্চিত বা গ্যারান্টিযুক্ত সুদের চেয়েও বেশি হারে মুনাফা প্রদান করেছে। এ থেকে এ ধরনের বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ায় তো বটেই; বাংলাদেশেও পদ্ধতিটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৭. সুকূক

আরবী শব্দ 'সাক' (صك)-এর বহুবচন 'সুকূক' (صكوك) বা 'সিকাক' (صكاك)। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মৃদু আঘাত করা; তবে এটি 'প্রতিশ্রুতিপত্র' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শাসকবর্গের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের খাদ্য ও অন্যান্য অধিকারের স্বীকৃতি-সংবলিত রেশন কার্ডকে 'সিকাক' বলা হয়। কেননা, তা লিখিতভাবে প্রদান করা হয়।[২৮১]

শাব্দিক ও ব্যাবহারিক অর্থের মধ্যে এভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় যে, লিখিত ওই স্বীকৃতিপত্রকে সুকূক বলা হতো; কারণ, তাতে কলমের আঁচড় বা মৃদু আঘাত থাকত।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিভাষায় প্রচলিত সুদভিত্তিক আর্থিক সিকিউরিটি 'বন্ড'-এর ইসলামী বিকল্প হচ্ছে সুকূক, যা সমমূল্যমানের লিখিত আর্থিক সনদ বা সম্পদকে বুঝায়। সুদভিত্তিক বন্ডের বিকল্প হিসেবে সুদমুক্ত সুকূক ইসলামী শরীয়ার আলোকে গঠিত আর্থিক ও বাণিজ্যিক অর্থায়নের হাতিয়ার। ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) অন্তর্ভুক্ত ইসলামী ফিকহ বোর্ড (মাজমা আল ফিকহ আল ইসলামী)-এর চতুর্থ বৈঠকে সুকূকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে—

---

২৮১. মুহাম্মাদ ইবনু মুকরিম ইবনি মানযূর আফ্রিকী, *লিসানুল আরব*, কায়রো : দারুল মাআরিফ, খ. ৪, পৃ. ২৪৭৭

أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية، وذلك بإصدار صكوك مالية برأس المال على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس المال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه.

এমন এক বিনিয়োগ দলিল, যা মূলধনকে সমমূল্যের বিভিন্ন এককে পরিণত করে আর্থিক পরিপত্র ইস্যুর মাধ্যমে মূলধনকে সমানভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এবং যা এর ধারকগণের নামেই নিবন্ধিত করা হয় এ বিবেচনায় যে, তারা মূলধন ও মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে যা মূলধনের প্রতি প্রবর্তিত হয় তার নির্দিষ্ট অংশের মালিকানা বহন করেন।[২৮২]

বাহরাইনভিত্তিক Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)-এর শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে—

সুকূক সমমূল্যের এমন সব সনদ, যা কোনো বিদ্যমান নির্দিষ্ট সম্পত্তি (Tangible Assets) অথবা সম্পদের ব্যবহার (Usufruct) অথবা সেবা (Services) অথবা নির্দিষ্ট কোনো প্রকল্প বা বিশেষ বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধিভুক্ত সম্পত্তির অভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।”

মালয়েশিয়াভিত্তিক ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB)-এর মতে সুকূক হলো—

Certificate that represents the holder's proportionate ownership in an undivided part of an underlying asset where the holder assumes all rights and obligations to such asset.

এমন সনদ, যা তার বাহকের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পদের অবিভক্ত কোনো অংশের সম্পৃক্ত মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে, যদি বাহক উক্ত সম্পদের যাবতীয় অধিকার ও দায়িত্ব পরিগ্রহ করেন।[২৮৩]

---

২৮২. *মাজাল্লাতু মাজমাউল ফিকহীল ইসলামী*, জিদ্দা : ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইস্যু-৪, খ. ৩, ১৯৮৮ খ্রি. পৃ. ২১৪০

২৮৩. *Capital Adequacy Standard for institutions offering only Islamic financial services (IIFS),* Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2005, Standard No. 2, p. 47

বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ সুকূক গাইডলাইন-২০২০ অনুযায়ী, 'সুকূক অর্থ সমমূল্যের অনুমোদিত সম্পত্তি-নিদর্শনপত্র, যা কোনো শরীয়াসম্মত বিনিয়োগ-চুক্তির আওতায় নির্দিষ্ট প্রকল্পের অথবা বিশেষ বিনিয়োগের বা কোনো পরিষেবার বিদ্যমান সম্পদের (Tangible Assets, Usufruct এবং Services) ওপর অথবা/এবং ভবিষ্যতে উৎপাদন বা প্রস্তুতের মাধ্যমে উক্ত চুক্তির অধীনে অন্তর্ভুক্ত হবে এরূপ সম্পদের ওপর অথবা/এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে ক্রয় করা হবে বা ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এমন কোনো শরীয়াসম্মত পণ্য দ্রব্যের ওপর অবিভক্ত মালিকানা অথবা অংশীদারত্ব নির্দেশ করবে।'

অতএব বলা যায়, সুকূক ইসলামী শরীয়ার আলোকে গঠিত সমমূল্যের বিনিয়োগ সার্টিফিকেট, যা কোনো বস্তুগত সম্পদ, এর ব্যবহার এবং সেবা বা কোনো প্রকল্পের মালিকানা অথবা কোনো বিশেষ বিনিয়োগকে নির্দেশ করে।

উল্লেখ্য, কোনো একটি বৃহৎ প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংস্থানের বা মূলধন সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে সুদভিত্তিক ডেট ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যু করা। কিন্তু ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ। সে ক্ষেত্রে বড়ো বড়ো প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ এর শরীয়াসম্মত বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওআইসির ফিকহ অ্যাকাডেমি সুকূক বিষয়টি প্রবর্তন করে।

এ পদ্ধতিটি বড়ো কোনো প্রকল্পের শেয়ার কেনার পর উক্ত কোম্পানি কোনো বিনিয়োগকারীকে শেয়ারের বিপরীতে যেসব ফাইন্যান্সিয়াল সার্টিফিকেট প্রদান করে, সে সার্টিফিকেটগুলোই সুকূক। উদাহরণস্বরূপ—সরকার ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণ করতে যাচ্ছে; অর্থাৎ সেতুর মূল্য ১০০ কোটি টাকা। এই ১০০ কোটি টাকা মূল্যের সেতুর মালিকানাকে ১০০ টি শেয়ারে ভাগ করা হলো। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হবে ১ কোটি টাকা। মালিকানার প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ইস্যু করা হলো একটি করে ফাইন্যান্সিয়াল সার্টিফিকেট। আর তা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের (১০ বছরের) জন্য বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হলো। এই শেয়ারগুলোর বিপরীতে ইস্যু করা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টগুলোই হচ্ছে সুকূক। সুকূককে আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার চেকের সাথে তুলনা করা হয়। এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি, যেখানে ইস্যুকারী ও বিনিয়োগকারী যৌথভাবে কোনো একটি

বিনিয়োগ প্রকল্পের মালিক হন এবং প্রকল্প হতে উদ্ভূত মুনাফা বা ভাড়া তাদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করে নেন। সুদভিত্তিক বন্ডব্যবস্থার সুদমুক্ত একটি বিকল্প হিসেবে সুকূকব্যবস্থা খুবই কার্যকর একটি অর্থনৈতিক কৌশল।[২৮৪]

সুকূকের ইস্যু ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় কতিপয় পক্ষসমূহ জড়িত থাকে। মুখ্য পক্ষসমূহ হলো :

ক. অরিজিনেটর : নির্দিষ্ট কোনো প্রকল্প অর্থায়নের জন্য যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুকূক ইস্যু করা হয়ে থাকে, তা সুকূকের ক্ষেত্রে অরিজিনেটর নামে পরিচিত। অরিজিনেটর সরকারি, বেসরকারি, সমাজকল্যাণমূলক অথবা আন্তর্জাতিক যেকোনো ধরনের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে পারে।

খ. স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (এসপিভি) : যে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান অরিজিনেটর পক্ষে সুকূক ইস্যু করে থাকে। এসপিভি বিনিয়োগকারীদের নিকট সুকূক বিক্রয় করে অরিজিনেটরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। এসপিভি বিনিয়োগকারীদের মাঝে মুনাফা বণ্টন এবং মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকারীদের মূলধন ফেরত প্রদান করে।

গ. ইস্যু ম্যানেজার : যে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সুকূক ইস্যু ব্যবস্থাপনা ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করে থাকে।

ঘ. ট্রাস্টি : যে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সুকূকধারকগণের স্বার্থ দেখভাল করে থাকে, তা-ই ট্রাস্টি নামে পরিচিত। অনেক সময় একই প্রতিষ্ঠান স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যালও ট্রাস্টির কাজ করে থাকে।

ঙ. বিনিয়োগকারী : যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুকূক ক্রয় করে থাকে।

প্রচলিত সুদভিত্তিক বন্ড ও সুকূকের মধ্যে সাদৃশ্য হলো—উভয়ই আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে বাজার তথা জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল আহরণের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্যিক অর্থায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে নীতি, প্রায়োগিক ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

---

২৮৪. হায়দার আলী মিঞা, মুহাম্মদ, *তারল্য ব্যবস্থাপনায় শরীয়াভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ*, ঢাকা : আইবিসিএফ, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ৩১-৩৩

ইসলামী শরীয়ায় সুদ আরোপে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সুকূক সুদ পরিহার করে ইসলামী নীতিসমূহের সাথে মিল রেখে ইস্যু করা হয়। প্রচলিত বন্ড হচ্ছে একটি ঋণভিত্তিক আর্থিক হাতিয়ার, যাতে নির্দিষ্ট বা ফ্লোটিং সুদ হারে মুনাফা প্রদানের জন্য একটি চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা থাকে। আর সুকূক হচ্ছে মালিকানাভিত্তিক আর্থিক হাতিয়ার, যাতে কোনো সুদের উপার্জন বা ঋণের বাধ্যবাধকতা থাকে না। প্রচলিত বন্ড হোল্ডারগণ পূর্বনির্ধারিত তারিখে নির্দিষ্ট হারে লাভ এবং মূলধন ফেরত পেয়ে থাকে। যদি ইস্যুকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এই ধরনের বন্ড হোল্ডার কোনো ক্ষতি বহন করে না। বিপরীতভাবে, সুকূক হোল্ডারগণ অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির মালিকানা এবং অন্তর্নিহিত বস্তুগত বা বস্তুগত সম্পত্তি (অংশীদারত্ব, ইজারা বা বিক্রয়) থেকে আহরিত লাভের অধিকার লাভ পেয়ে থাকে এবং যদি কেনো ক্ষতিও হয়, তারা তা বহন করে থাকে। প্রচলিত বন্ড যেকোনো সম্পদ, ব্যাবসা বা প্রকল্পে দেশের আইন অনুসারে বিনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু সুকূক শুধু সেইসব সম্পদ, ব্যাবসা বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে, যেগুলো ইসলামিক শরীয়া এবং দেশের আইন উভয়ই অনুসরণ করে পরিচালিত হয়।

১৯৯০-এর দশকে মালয়েশিয়ায় সুদভিত্তিক বন্ডের বিকল্প হিসেবে ইসলামী শরীয়ার আলোকে আর্থিক ও বাণিজ্যিক অর্থায়নের হাতিয়ার হিসেবে সুকূকের ব্যবহার শুরু হয় এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিকতর স্থিতিশীল হওয়ার কারণে অর্থায়নের টেকসই বিকল্প হিসেবে বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী মুসলিম এবং অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় দেশগুলোর সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাজেট ঘাটতি ও তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প অর্থায়নে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। IFSB (2022)-এর উপাত্ত অনুসারে ২০২১ সালের শেষ নাগাদ বৈশ্বিক সুকূক স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭৫.৭ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালে সুকূক ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের অবদান যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ, ৪২ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ। IIFM-এর ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুসারে ২০২০ সালে বৈশ্বিক সুকূক বাজারের স্থিতিতে মালয়েশিয়ার অবদান সর্বোচ্চ (৪৩.৪৩%)। বৈশ্বিক সুকূক বাজারের স্থিতির আলোকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী অন্য দেশগুলো হচ্ছে সৌদি আরব (২২.০৩%), ইন্দোনেশিয়া (১৩.৮১%), তুরস্ক (৫.১০%), আরব আমিরাত (৭.৪৬%), কাতার (২.৩১%) এবং বাহরাইন (২.৪%)। অমুসলিম

সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ সুকূক ইস্যু করেছে তার মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, হল্যান্ড, সিংগাপুর উল্লেখযোগ্য। সুকূক ইস্যুকারী বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক ও আইএফসি। বৈশ্বিক সুকূক বাজারের স্থিতিতে বাংলাদেশের অবদান (০.০৬%)।

সুকূকের বৈশিষ্ট্যাবলি

সুকূকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

ক. ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সম্পদে মালিকানা : সুকূকধারকগণ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সম্পদে মালিকানা লাভ করে। সুকূক-সংশ্লিষ্ট সম্পদে বাহকের অংশীদারত্বের স্বীকৃতিসনদ; এটি প্রচলিত বন্ডের মতো ঋণপত্র নয়।

খ. মুনাফা প্রদানকারী ইসলামী বিনিয়োগপত্র : সুকূকধারকগণ মুনাফা লাভ করে। তবে মুনাফার পরিমাণ পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকে না। প্রকল্পের লভ্যাংশ থেকে সুকূকধারকগণের প্রাপ্য মুনাফার শতকরা হার সুকূক ইস্যুর প্রসপেকটাসের মধ্যে উল্লেখ থাকে।

গ. ঝুঁকি বহন : সুকূকধারক যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে। ফলে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বা মেয়াদান্তে কোনো প্রকার লোকসান হলে তার ভার বহন করতে হয়। উল্লেখ্য, সুকূক যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে সেগুলো হলো—সুকূকমূল্য ওঠানামাজনিত ঝুঁকি, প্রকৃত সম্পদের বাজারমূল্যজনিত ঝুঁকি, মুনাফার ঝুঁকি ও মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি।

ঘ. রাষ্ট্রীয় আইন ও শরীয়া পরিপালন : সুকূক ইস্যুকরণ ও লেনদেনসহ প্রতিটি পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় আইনের পাশাপাশি ইসলামী শরীয়া আইন পরিপালন করতে হয়। ইসলামী শরীয়া আইনে সুদ, জুয়া (gambling) এবং অতি ফটকা কারবার (excessive speculation) নিষিদ্ধ। মানবসমাজ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কাজে সুকূক ইস্যুও নিষিদ্ধ।

ঙ. আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি সহায়ক : মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকগণ সুকূকে বিনিয়োগ করতে পারেন। সরকার ক্ষুদ্র অভিহিত মূল্যের সুকূক

সুকূকের প্রকারভেদ

শরীয়াসম্মত চুক্তি অনুযায়ী সুকূক চার প্রকার হতে পারে : (১) অংশীদারি পদ্ধতির সুকূক, যেমন—মুশারাকা ও মুদারাবা সুকূক; (২) ইজারা পদ্ধতির সুকূক; (৩) ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সুকূক, যেমন—মুরাবাহা সুকূক, ইসতিসনা সুকূক ও সালাম সুকূক এবং (৪) এজেন্সিভিত্তিক সুকূক, যেমন—ওকালা সুকূক। একাধিক পদ্ধতির সুকূক নিয়ে মিশ্র সুকূকও গঠন করা হয়, যা 'হাইব্রিড সুকূক' নামে পরিচিত। ইস্যুকারীগণ প্রধানত বাস্তব চাহিদা, মেয়াদ ও প্রাপ্ত অন্তর্নিহিত সম্পদের আলোকে সুকূকের একটি শ্রেণি নির্বাচন করে থাকেন। উল্লেখ্য, সাধারণত প্রকল্প অর্থায়নে ইজারা ও অংশীদারি পদ্ধতির সুকূক এবং স্বল্পমেয়াদি তারল্য ব্যবস্থাপনায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সুকূক ব্যবহার করা হয়।

অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সুকূক দু-প্রকার হতে পারে। যেমন—অ্যাসেট ব্যাকড সুকূক এবং অ্যাসেট বেইজড সুকূক। স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (এসপিভি)-এর নিকট অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে সুকূক ইস্যু করা হলে অ্যাসেট ব্যাকড সুকূক এবং স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (এসপিভি)-এর নিকট অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকনা নয়; বরং অন্তর্নিহিত সম্পদ থেকে আহরিত আয়ের মালিকানা হস্তান্তর করে সুকূক ইস্যু করা হলে অ্যাসেট বেইজড সুকূক হিসেবে অভিহিত করা হয়।[২৮৫]

শরীয়া পরিপালনের নীতিমালা

ক. ইস্যুকরণের সময় করণীয়

১. সুকূক ইস্যুকরণের জন্য যে সম্পদ নির্দিষ্ট করা হয় উক্ত সম্পদ অবশ্যই ইসলামী শরীয়াসম্মত হতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট সম্পদ বা সম্পদের উপস্বত্ব/সেবা যার বিপরীতে সুকূক ইস্যু করা হয়, তাতে সুকূকধারীর জন্য নির্ধারিত অংশের অধিকার ও দায়সহ সুকূকের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।

---

২৮৫. গোলজারে নবী ও অন্যান্য, টেকসই উন্নয়ন অর্থায়নে সুকূকের ব্যবহার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪ ও ৭৫ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা), ২০২৩, পৃ. ৩৪-৩৬

৩. ক্রয়-বিক্রয় ও লিজের ভিত্তিতে ইস্যুকৃত সুকূকের ক্ষেত্রে ইস্যুকারী একপক্ষীয় শর্তারোপ করতে পারবে যে, এক বছর পরে নির্ধারিত একটি মূল্যে সে সংশ্লিষ্ট সম্পদ কিনে নিতে পারবে।

৪. বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভ ফান্ড, যেমন প্রফিট ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ (PER), তাকাফুল ফান্ড গঠন করা যাবে।

৫. যে শরীয়াচুক্তির ভিত্তিতে সুকূক ইস্যু করা হবে উক্ত চুক্তি-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নিয়মনীতি অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

৬. একটি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী শরীয়া বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ইস্যুকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে, যারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শরীয়া বিশ্লেষণ করবেন।

খ. সুকূক ক্রয়-বিক্রয় তথা লেনদেনের সময় করণীয়

১. সেকেন্ডারি মার্কেট সুকূক ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়া পরিপালনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা।

২. সাধারণ অবস্থায় ইস্যুকারী অবশ্যই সুকূক সার্টিফিকেটে উল্লিখিত মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না, তবে অবহেলা বা অমনোযোগিতার ক্ষেত্রে ইস্যুকারীকে অবশ্যই এর দায়ভার বহন করতে হবে।

৩. ওইসব সুকূক বাজারজাত করা যাবে যেগুলো প্রকৃত সম্পদ, সম্পদের উপস্বত্ব ও সেবায় অভিন্ন অংশীদারের ভিত্তিতে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ যেসব সুকূক উসুলযোগ্য বিলে (Receivables) মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলো বাজারজাত করা যাবে না।

৪. সুকূক ইস্যু, বাহকদের অন্তর্ভুক্তকরণ, বিতরণ ও প্রকল্প শুরু হওয়ার পরেই কেবল সুকূক বাজারজাত ও পরিসমাপ্তি বৈধ হবে।

৫. যে শরীয়াচুক্তির ভিত্তিতে সুকূক ইস্যু করা হয়েছে, সে চুক্তির অন্তর্বর্তীকালীন সব বিধিবিধান মেনে চলা।

৬. সুকূক ব্যবস্থাপক মুদারিব বা অংশীদার (Partner) বা প্রতিনিধি (وكيل) যাই হোন না কেন, সুকূকের প্রত্যাশিত মুনাফার তুলনায় বাস্তব মুনাফা কম

হলে সুকূকধারককে ঋণ দিতে বাধ্য থাকা বৈধ হবে না। তবে শরীয়া মানদণ্ড ১৩-এর ৮/৮ ধারার আলোকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যাশিত মুনাফা বণ্টন করা যেতে পারে।

৭. সুকূকের তারল্যের আধিক্য বা ঘাটতি ব্যবস্থাপনা কেবল শরীয়া অনুমোদিত ক্ষেত্রে ও শরীয়াভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

গ. মুনাফা বণ্টন ও সুকূকের পরিসমাপ্তি

১. সুকূক মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর এর পরিসমাপ্তির পদ্ধতি অবশ্যই শরীয়াসম্মত হতে হবে।

২. মুনাফা বণ্টন অবশ্যই লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট হারে প্রদান করা হবে। অর্থাৎ প্রকল্প শেষে পুঁজিপতি বা রব্বুল মাল হিসেবে সুকূকধারক ও মুদারিব হিসেবে ইস্যুকারীর মধ্যে লাভ-ক্ষতি নির্দিষ্ট হারে বণ্টিত হবে।

৩. সুকূকের মেয়াদান্তে সংশ্লিষ্ট সম্পদ যদি ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করা হয়, তবে তা ১.৩৩%-এর বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে যদি বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে ০.৬৭%-এর কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. সংশ্লিষ্ট সম্পদের বাজারদর নির্ধারণে জটিলতা দেখা গেলে একটি ন্যায়সংগত মূল্য যা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে কোনো অবস্থাতেই নিট দাপ্তরিক মূল্যকে (Net Book Value) পুনঃগ্রহণ কাম্য নয়।[২৮৬]

---

২৮৬. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : সাফিয়্যাহ আহমদ আবূ বকর, 'আস-সুকূক আল-ইসলামিয়্যাহ', আল-মাসারিফ আল-ইসলামিয়্যাহ বাইনাল ওয়াকি ওয়াল মামূল কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, দুবাই : দায়েরাতুস শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আমালিল খায়রী, ৩১ মে-৩ জুন, ২০০৯, পৃ. ২২-২৪; মুহাইসীন, *আস-সুকূক আল-ইসলামিয়্যাহ (আত-তাওরীক) ওয়া তাতবীকাতুহাল মুআসারাহ ওয়া তাদাউলুহু*, পৃ. ২৬-৪০; শরীয়া মানদণ্ড নং ১৭, পৃ. ২৯১-২৯৭; Securities Commission Malaysia, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*, p. 31; হাবীবুর রহমান ও রুহুল আমীন, সুকূক ইস্যুকরণ ও এতে বিনিয়োগের শরয়ী নীতিমালা : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৬, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

৮. তাওয়াররুক (নগদিকরণ)

'তাওয়াররুক' (تورق) শব্দটি আরবী ورق থেকে এসেছে। হাদীসে ورق শব্দটি রুপার মুদ্রা বা দিরহাম বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাওয়াররুক' প্রাথমিকভাবে মুরাবাহার মতো। পরিভাষায়, 'তাওয়াররুক' হলো এমন কেনাবেচা চুক্তি, যেখানে একজন ক্রেতা নগদ অর্থের চাহিদা পূরণে বাকিতে কোনো সম্পদ কিনে ক্রয়মূল্যের চেয়ে কমদামে পণ্যটি তৃতীয় পক্ষের কাছে নগদে বিক্রি করে। অর্থাৎ, তারল্য অর্জনের লক্ষ্যে বাকিতে কোনো পণ্য কিনে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তৃতীয় পক্ষের কাছে নগদে বিক্রি করা। এর ফলে ক্রেতার নগদ টাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়, যা সে মূল বিক্রেতাকে কিস্তিতে বা পরে এককালীন পরিশোধ করে। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় Hasan Zulkifli বলেন—

> Tawarruq is the types of transaction where a person buys a commodity with adeferred payment then sells it to a third party other than the original seller for animmediate cash price. It is generally used to describe a transaction in which a Islamic bank sells a commodity to a customer on deferred payment at cost plus profit, and the customer then sells the commodity on a spot basis to a third party for cash.[২৮৭]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে জানা যায়, তাওয়াররুক হচ্ছে মুরাবাহার মতো দুই দফা বিক্রয়ের একটি পদ্ধতি। যেমন—কোনো কাস্টমারের নগদ ১০,০০০/-টাকার প্রয়োজন। উক্ত টাকা সে এক বছর পর পরিশোধ করতে পারবে। সে ব্যাংকে গেল। ব্যাংক তার কাছে ১২,০০০/-টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি বিক্রয় করল এই শর্তে যে, সে কিস্তিতে কিংবা এক বছর পর ঘড়ির মূল্য পরিশোধ করবে। যেহেতু ক্রয়সূত্রে ঘড়িটির মালিক এখন গ্রাহক নিজেই, তাই সে ঘড়িটি অন্যের কাছে বিক্রয় করে দিতে পারে, তাহলে সে তার প্রয়োজনের টাকা পেয়ে যাবে। নগদ মূল্যে কেনার জন্য অন্য গ্রাহক অবশ্যই কম মূল্য দিতে চাইবে। কোনো ক্রেতা যদি নগদ ১০,০০০/-টাকায় ঘড়িটি কিনে নেয়, তবে গ্রাহকের হাতে নগদ ১০,০০০/- টাকা চলে আসে এবং গ্রাহকের প্রয়োজন মিটে যায়। এই পদ্ধতির নাম হলো তাওয়াররুক পদ্ধতি।

---

২৮৭. Hassan, Zulkifli, *Tawarruq: A Methodological Issue in Shariah Compliant Finance*, 2009

মালয়েশিয়ায় তাওয়াররুকের প্রচলন রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এ জাতীয় কেনাবেচা নিষিদ্ধ 'বাইউল ঈনা' থেকে ভিন্ন। কেননা, বাইউল ঈনা মূলত দুটি পক্ষের মধ্যে কেনাবেচা হয়। অর্থাৎ, যার নিকট থেকে প্রথমে পণ্য কেনা হয় পুনরায় তার নিকটই ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করা হয়। বিপরীতে 'তাওয়াররুক' লেনদেন হয় ত্রিপক্ষীয়। প্রথমে যার নিকট থেকে পণ্য কেনা হয়, পরবর্তী লেনদেনে তার কোনো ভূমিকা থাকে না; বরং তৃতীয় কেউ ওই পণ্য কেনেন। এ কারণে হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ পূর্বসূরি আলিম এ জাতীয় কেনাবেচাকে বৈধ মনে করেছেন।

বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ইসলামী আর্থিক লেনদেন বিশেষজ্ঞ ও ফিকহ কমিটিও এর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন, যদি ক্রেতার দ্বিতীয় বিক্রয় সাজানো না হয় এবং এটি যদি কোনোভাবেই প্রথম বিক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত পৌঁছানোর উদ্দেশ্য না হয়। যদি সাজানো হয় কিংবা প্রথম পক্ষের কাছে পণ্য ফেরত পৌঁছানো এবং নিছক ঋণের বিনিময় উদ্দেশ্য হয়, তবে অনেকেই একে ঈনার মতো নিষিদ্ধ গণ্য করেন।

অনেকের মতে, তাওয়াররুক একটি নিছক সাজানো ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। মুফতী তকী উসমানী তাঁর বিখ্যাত ফিকহী সংকলন *আহকামুত তাওয়াররুক*-এ দুঃখ করে বলেছেন যে, মুরাবাহা ও ইজারার মতো বিকল্প ব্যবস্থাগুলো ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয়েছিল খণ্ডকালীন অস্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে। যেহেতু তারা পুঁজিবাদী সুদি অর্থনীতির মোকাবিলায় সবেমাত্র কারবার শুরু করেছিল আর এ অবস্থায় মুদারাবা-মুশারাকা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ৩০ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তারা সে প্রাথমিক অবস্থার (হীলা) বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছে। মৌলিক বিনিয়োগ পদ্ধতি এখনও তারা অবলম্বন করছে না।'[২৮৮]

তাওয়াররুকের বিকল্প পদ্ধতি

মুফতী তকী উসমানী সাজানো তাওয়াররুককে 'তাওয়াররুক মালউন' (অভিশপ্ত তাওয়াররুক) বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো পণ্যের মালিকানা আদান-প্রদান হয় না; বরং আখেরে কিছু ঋণের বিনিময় হয়ে

২৮৮. তকী উসমানী, *বুহুছুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআছিরাহ*, খ. ২, পৃ. ১৪৫-১৪৭

থাকে কিছু অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে। তিনি এর বিকল্প হিসেবে একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন—

> বিভিন্ন ব্যাংক তাদের ফান্ড ও অ্যাসেটকে একত্রিত করে একটি ফান্ড গঠন করবে, এর ভিন্ন সত্তা থাকবে (শাখসিয়াহ ইতিবারিয়্যাহ)। এই ফান্ড ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকতে পারে, অথবা কোনো একক ব্যাংকও হতে পারে। ফান্ডটি প্রতিদিন মূল্যায়ন বা ভ্যালুয়েশন করা হবে। আর পুরো ফান্ড বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত থাকবে। কারও ক্যাশ টাকার প্রয়োজন হলে এখান থেকে নির্দিষ্ট কিছু ইউনিট ক্রয় করবে এবং ঘণ্টাকয়েক পরে এখানেই আবার বিক্রয় করবে। স্টক মার্কেট থেকে এর পার্থক্য হলো—স্টক মার্কেটে প্রায় সময়ই স্টকের মূল্য এর ফান্ডামেন্টাল বিষয়াদির ওপর নির্ভর করে ওঠানামা করে না। কাজেই সেখানে নানা ইস্যু তৈরি হয়, যা এখানে হবে না। গ্রাহক তার ক্যাশ পাবে শরীয়াসম্মত উপায়ে, আবার ব্যাংকগুলোও লাভবান হবে।

৯. বাই ঈনা

'ঈনা' নগদ অর্থকে বোঝায়। এ পদ্ধতিতে লেনদেনের মূল উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয় নয়; নগদ অর্থ। সেজন্য একে 'বাই ঈনা' বলা হয়। বলা হয়, এটির মূল শব্দ এসেছে 'আউন' (عون) থেকে, যার অর্থ সাহায্য; বিক্রেতা তার আসল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্রেতার সাহায্য-সহযোগিতা নেয়, সেজন্য একে বাইউল ঈনা বলে। কারও কারও মতে, এটি 'আনা' (عناء) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ কষ্ট স্বীকার করা।[২৮৯] অনেক কষ্টে এ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে একে বাই ঈনা বলা হয়। এর অর্থ ঋণও হয়।[২৯০] এর অর্থ চোখে দেখা যাচ্ছে এমন পণ্যও হয়।[২৯১]

শরীয়তের পরিভাষায় বাই ঈনা (Buy Back) হচ্ছে এমন দুটি ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের নাম, যার প্রথমটিতে যিনি বিক্রেতা থাকবেন, পরেরটিতে তিনি

---

২৮৯. খাত্তাব আইনী, *মাওয়াহিবুল জালীল*, বৈরুত, ১৪২৩ হি., খ. ৬, পৃ. ২৯৩

২৯০. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত, তাবি., খ. ১৩, পৃ. ২৯৮

২৯১. ইবন ফারিস, *মুজামু মাকায়িসুল লুগাহ*, দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি., খ. ৪, পৃ. ২০০

ক্রেতা হয়ে যান। একইভাবে প্রথমটিতে যিনি ক্রেতা থাকেন, পরেরটিতে তিনি বিক্রেতা হয়ে যান। আর পণ্যের মূল্যের দিক থেকে প্রথমটিতে বাকি মূল্যে বেশি দামে বিক্রয় হয় এবং দ্বিতীয়টিতে তা থেকে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। যেমন—প্রথম ক্রয়-বিক্রয় : ক্রেতা 'ক', বিক্রেতা 'খ', ও পণ্য 'গ' যার মূল্য বাকিতে এক হাজার টাকা; দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় : ক্রেতা 'খ', বিক্রেতা 'ক', ও পূর্বেরই 'গ' পণ্যকে নগদ আটশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করল। অর্থাৎ 'ক'-এর নিকট 'খ' প্রথম 'গ' (ধরুন) এক মন চাউল বিক্রয় করল বাকিতে এক হাজার টাকায়। পরে 'খ'-এর নিকট 'ক' ওই একই পণ্য নগদে বিক্রয় করল আটশত টাকায়। সুতরাং প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ে 'ক' পণ্যের মূল্য পরে পরিশোধ করবে বিধায় তা ক্রয় করল এক হাজার টাকায় আর দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ে 'খ' পণ্যের মূল্য নগদে পরিশোধ করার কারণে 'ক'-কে দিলো আটশত টাকা। বাস্তবে 'খ' প্রথম থেকেই পণ্যের মালিক ছিল, এখনও মালিকই থাকল। মাঝখানে টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন হলো মাত্র। সেখানে যে দুইশত টাকা বেশি নেওয়া হলো তা মূলত সুদ (ربا النسيئة)। এখানে 'খ' হলো সুদগ্রহীতা আর 'ক' হলো সুদদাতা।

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকট এই ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেনটি ফাসিদ; প্রথমটি শুদ্ধ। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ রাহ. প্রমুখের নিকট উভয় লেনদেনই বাতিল।[২৯২] তবে ইমাম শাফিয়ী রাহ. একে মাকরূহ বলেছেন।[২৯৩] ড. ওয়াহবা আয যুহাইলী রাহ. বলেছেন, ইমাম শাফিয়ী রাহ.-এর এ মত প্রত্যাখ্যাত। কেননা, এটি স্পষ্টত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণে ইমাম শাফিয়ী রাহ.-এর মতটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।[২৯৪] মোটকথা, বাই ঈনা ইসলামে নিষিদ্ধ একটি লেনদেন। অনেক সময় এ লেনদেন কেবল কাগুজে চুক্তি হয়। বাস্তবে ওই দ্রব্য ক্লায়েন্টের কাছেও থাকে না। কেবল কাগজপত্রে চুক্তি করে ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে কর্মচারী ইত্যাদির বিল পরিশোধ করা হয়। এটিও বৈধ হবে না।

---

২৯২. শাইবানী, আবূল মুযাফফার ইয়াহইয়া, *ইখতিলাফুল আইম্মাতিল উলামা*, বৈরুত, ১৪২৩ হি., খ. ১, পৃ. ৪০৪

২৯৩. যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, খ. ৫, পৃ. ১৪৮

২৯৪. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪০

> ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য বিমোচন করে না; বরং সামন্তসমাজের ভূমিদাসের মতো এ যুগের মানুষকে একধরনের ঋণদাসে পরিণত করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এ পথ অনুসরণ করার ফলে আমাদের উন্নতির কোনো দিশা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই সংখ্যালঘুর ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠের গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া নিহিত। এ গরিব করা ও গরিব রাখার ব্যবস্থা বহাল রেখে গরিবদের ঋণ দিয়ে ও উচ্চহারে সুদ নিয়ে কীভাবে গরিবি মোচন হবে? এ অস্বাভাবিক ও বিকৃত চিন্তাকেই আমরা সদলবলে লালন করে আসছি।[২৯৫]

এর বিপরীতে ইসলামে সব ধরনের বিনিময়ের আশা ছেড়ে ঋণ প্রদান করাই ইসলামের নির্দেশনা। এভাবে বিনিময়হীন ঋণ প্রদান যখন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়ে থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যকে সহযোগিতার নিয়তে হয়ে থাকে, তখন সেটি হয়ে ওঠে 'উত্তম ঋণ'—যা ইসলামী অর্থনীতিতে 'কর্জে হাসানা' নামে পরিচিত। একজন কর্জে হাসানা প্রদানকারী ব্যক্তি কেবল সওয়াবের নিয়তে ও গ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে তার অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে এবং কোনো রকম প্রত্যুপকারের বিন্দুমাত্র আশা না করে অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে। সুদনির্ভর ব্যাংকগুলো তো বটেই; বিত্তশালীরা পর্যন্ত এরকম ঋণ দিতে নারাজ। অথচ সচ্ছল ব্যক্তিরও অনেক সময় ঋণের প্রয়োজন পড়ে সাময়িক অভাব বা প্রয়োজন পূরণের জন্য। সেসময় যদি কর্জে হাসানার সুযোগ না থাকে তাহলে তাকে হয় সহায়সম্বল বিক্রি করতে হবে অথবা নিরুপায় হয়েই সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হবে। ইসলামী ব্যাংক এ সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যেই কর্জে হাসানা দিয়ে থাকে। সুদভিত্তিক ব্যাংকে এ ধরনের সহযোগিতা পাওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদের জরুরি ও স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম হারে সার্ভিস চার্জের বিপরীতে ঋণ দিয়ে থাকে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রদত্ত কর্জে হাসানার ক্ষেত্রে এই হার ০.৫০ হতে সর্বোচ্চ ২.০% পর্যন্ত। পাকিস্তানে প্রচলিত এই হার প্রায় ৩.%। কর্জে হাসানা মঞ্জুরের সময়েই ঋণগ্রহীতার সুবিধা অনুসারে ঋণ পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

---

২৯৫. https://bonikbarta.net/home/news_description/254072#

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কর্জে হাসানা প্রথার কনসেপ্টই প্রচলিত ছিল না। ৯ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রকাশিত ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইনে বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে এ বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কর্জে হাসানা নামে একধরনের সুদবিহীন ঋণের প্রচলন আছে। ব্যাংকে কোনো ব্যক্তির মেয়াদি জমা থাকলে গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই মেয়াদি জমার সর্বোচ্চ শতকরা আশি ভাগ এরূপ ঋণ প্রদান করা হয়। মেয়াদি জমার বিপরীতে যে পরিমাণ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়, ওই পরিমাণ মেয়াদি জমার ওপর ঋণ থাকাকালীন কোনো প্রফিট দেওয়া হয় না। এ বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনে বর্ণিত হয়েছে। তবে কোনো কোনো ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সীমিত আকারে কর্জে হাসানা প্রদান করে থাকে, যা ব্যাংকের বৈধ আয় নয়। এমন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্নভাবে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে।

কর্জে হাসানা ফান্ডে অর্থ জোগান

ব্যাংকগুলোতে কর্জে হাসানা ফান্ডে নিম্নোক্ত পন্থায় অর্থের জোগান হতে পারে—

ক. ব্যাংকের পরিচালকদের দান কিংবা ঋণ

ব্যাংকের পরিচালকরা আল্লাহর ওয়াস্তে পরকালীন সওয়াবপ্রাপ্তির আশায় কর্জে হাসানা ফান্ডে সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতে পারেন কিংবা বিনা লাভে এ ফান্ডে অর্থ কর্জ দেবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দুবাই ইসলামী ব্যাংকের কর্জে হাসানা তহবিল গঠিত হয়েছে ওই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ সাঈদ আহমাদ আলে লুতাহর ব্যক্তিগত অর্থ থেকে।

খ. শেয়ারহোল্ডারদের দান বা ঋণ

ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররাও কর্জে হাসানা ফান্ডে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতে পারেন, কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে পারেন। এর বিনিময়ে তারা কোনো পার্থিব লাভ পাবেন না। তবে যে মেয়াদ উল্লেখ করে তারা যে পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রদান করবেন, ওই মেয়াদ শেষে প্রদত্ত মূল অর্থ ফেরত পাবেন।

গ. সর্বস্তরের জনসাধারণের দান

যেকোনো শ্রেণি ও পেশার লোক কর্জে হাসানা ফান্ডে অর্থদান বা মেয়াদ উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বিনা লাভে ঋণ প্রদান করতে পারেন। এ ফান্ডে অর্থ জমা দিতে হলে তা বিরাট অঙ্কের হতে হবে বা প্রচুর সম্পদশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে হবে—এমনটি নয়; বরং যিনি যতটুকু সামর্থ্য রাখেন তিনি সেই পরিমাণ অর্থই এ ফান্ডে দান করতে পারেন বা ঋণ দিতে পারেন, অর্থের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন।

ঘ. সান্ড্রি অ্যাকাউন্টের অর্থ

এমন অনেক আমানতকারী আছেন যারা টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর আর কোনো যোগাযোগ করছেন না। হয়তো কোনোদিনও করবেন না। এ ধরনের বিপুল পরিমাণ দাবিদারবিহীন অর্থ ব্যাংকের সান্ড্রি অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে থাকে। এ ছাড়া ব্যাংকে আরও বিভিন্ন ধরনের মুনাফা প্রদান করতে হয় না—এমন অনেক জমা থাকে। এসব টাকা থেকে একটি নির্ধারিত অংশ কর্জে হাসানা ফান্ডের জন্য বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

ঙ. সমাজসেবার জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ

সরকারের সমাজসেবা, পল্লি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদি ধরনের প্রকল্প ও খাতে বিনা সুদে বা স্বল্পসুদে ঋণ (মাইক্রো ক্রেডিট) সুবিধার ব্যবস্থা আছে। এসব টাকা থেকে একটি নির্ধারিত অংশ কর্জে হাসানা ফান্ডে বরাদ্দের জন্য আবেদন করা যায়।

চ. সন্দেহজনক আয়

বিভিন্ন অনিবার্য কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এমন কিছু মুনাফা অর্জিত হয়, যেগুলোকে সরাসরি হালাল আয় হিসেবে গণ্য না করে সন্দেহজনক আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী তা ব্যয় করা হয়; এরূপ মুনাফা কোনোক্রমেই ব্যাংকের আয় হিসেবে গণ্য করে শেয়ারহোল্ডার ও ডিপোজিটরদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। এরূপ অর্থের একটি অংশও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের অনুমোদনসাপেক্ষে কর্জে হাসানা ফান্ডে প্রদান করা যেতে পারে।[২৯৬]

---

২৯৬. https://m.priyo.com/articles/ইসলামি-ব্যাংকগুলোর-অন্যতম-দায়িত্ব-কর্জে-হাসানা-প্রদান-করা

ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটের জন্য কর্জ প্রদান ও সার্ভিস চার্জ গ্রহণ

'ব্যাংক সলভেন্সি' হচ্ছে একজন গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা-সংক্রান্ত ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত প্রশংসাপত্র (Solvency Certificate)। অন্য কথায়, কোনো ব্যাংক তার গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে তার লেনদেনের পরিমাণ সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে আর্থিকভাবে সচ্ছল মর্মে প্রতিপাদন করে যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তা-ই 'ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট'।

সাধারণত যারা বিভিন্ন রকম কন্ট্রাক্ট কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে, টেন্ডার জমা করার ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। কারণ, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা যখন কাউকে কোনো কন্ট্রাক্ট মঞ্জুর করেন, তখন তারা দেখতে চান সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টর আর্থিকভাবে কতটুকু সংগতিসম্পন্ন। এ ছাড়া আদালত কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো বাদী বা বিবাদী পক্ষের কাছ থেকে চাইতে পারেন সলভেন্সি সার্টিফিকেট। অনেক সময় বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হতে পারে 'ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট'।

সলভেন্সি সার্টিফিকেটের জন্য ব্যাংকের নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রে নিজের পরিচয়পত্র, সলভেন্সি সার্টিফিকেট আবেদনের কারণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তথা বিবরণ, নিজের সম্পত্তির বিস্তৃত তথ্যাদি, আয়কর প্রদান-সম্পর্কিত তথ্যাবলি, আবেদনকারীর আর্থিক সঞ্চয় এবং ঋণের তথ্যসমূহ ইত্যাদি জমা করতে হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এসব তথ্য মূল্যায়ন করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সলভেন্সি সার্টিফিকেট ইস্যু করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ব্যাংক যদি কোনো গ্রাহককে কাঙ্ক্ষিত আর্থিক সংগতি না থাকা সত্ত্বেও এরূপ সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে, তা অবশ্যই স্পষ্ট মিথ্যাচারের পর্যায়ে পড়বে। সম্প্রতি নানা সূত্র থেকে জানা যায়, বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার সুযোগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের ভিসা প্রসেসিং, টিউশন ফি ও অন্যান্য খরচ বহন করার সক্ষমতা যাচাই করার জন্য 'ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট' তলব করে। কখনও কখনও আবেদনকারী/অভিভাবক উক্ত ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফান্ড তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক হিসাবে জমা করতে সক্ষম হন না বা আগে থেকে সেই পরিমাণ ফান্ড তার হিসাবে জমা নেই। এ অবস্থায় কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক বিদেশের

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়ার সুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের নামে হিসাব খুলে এবং সেই হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফান্ড কর্জরূপে জমা করে সলভেন্সি সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। ব্যাংকগুলো ছাত্রদের এ ঋণ-সুবিধা দানের জন্য সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কারও কারও অভিমত হলো, এটা একান্তই ভালো কাজে সহায়তা এবং এ সহায়তা করার জন্য ব্যাংক At Actual Service Charge গ্রহণ করতে পারে।

আমরা মনে করি, প্রথমত, এটি বাহ্যত ভালো কাজে সহায়তা মনে হলেও মূলত তা একটি মিথ্যাচার ও কৌশলবাজি, যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাহ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এ সহায়তার জন্য সার্ভিস চার্জ নেওয়া বৈধ হবে না। কারণ, এ সহায়তা কর্জের পর্যায়ভুক্ত নয়। এ ফান্ডের ওপর ঋণগ্রহীতার না কবজ সাব্যস্ত হয়, না সে ওই ফান্ড ব্যবহারের অধিকার লাভ করে। উপরন্তু, ব্যাংক ওই অবস্থায় সেই ফান্ড তার কাজে নানাভাবে ব্যবহারও করতে পারে। উল্লেখ্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে, কর্জ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কর্জরূপে প্রদত্ত অর্থসম্পদের মধ্যে কর্জগ্রহীতার কবজ সাব্যস্ত হতে হবে এবং তার হাতে তা সঁপে দিতে হবে। এর আগে ঋণচুক্তি কার্যকর হবে না।[২৯৭]

এ ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারেন যে, যেহেতু এ ফান্ডটি গ্রাহকের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়, তাই ধরে নেওয়া যায় যে, ফান্ডটির ওপর ঋণগ্রহীতার কবজ পাওয়া গেছে। আমাদের কথা হলো—এ কবজ কৌশলমাত্র; এ কবজের পর ঋণগ্রহীতা ওই ফান্ডকে তার প্রয়োজনে ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করতে পারে না।

২. ক্রেডিট কার্ড

ক্রেডিট কার্ড মূলত ঋণগ্রহণের কার্ড। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক তার গ্রাহককে এ কার্ডের মাধ্যমে একটি নির্ধারিত পরিমাণ ঋণগ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে ক্রেডিট কার্ডের গুরুত্ব অনেক। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষ

২৯৭. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১২১-১২৩

তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা বিল পরিশোধ করতে পারে, অধিকন্তু নিজেদের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে খুব দ্রুত ঋণ নিতে পারে এবং সহজেই নিজেদের চাহিদাসমূহ মেটাতে পারে। বিভিন্ন দোকান থেকে এর মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা যায় এবং অনলাইন জগতে অত্যন্ত সহজেই এর মাধ্যমে কেনাকাটা করা যায়, যার মূল্য ব্যাংক পরিশোধ করে থাকে। এখানে কার্ডধারী হলো ঋণগ্রহীতা আর কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক হলো ঋণদাতা।

ব্যাংকগুলো ক্রেডিট কার্ড প্রোভাইড করে মূলত বিভিন্ন রকম ডিজিটাল পেমেন্ট ট্রানজাকশন করার সময় বা পয়েন্ট অব সেল (POS) টার্মিনালে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাল ট্রানজাকশন বা কার্ড ট্রানজাকশন করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনে কখনও কখনও ক্যাশের দরকার পড়েই। তাই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ক্যাশ উইথড্র করার সুবিধাও বেশির ভাগ কার্ডেই দেওয়া হয়। এই সুবিধার টেকনিক্যাল টার্ম হচ্ছে 'ক্রেডিট কার্ড ক্যাশ অ্যাডভান্স'। এ কার্ড ব্যবহার করে যেকোনো এটিএম (Automated Teller Machines) থেকে টাকা তোলা যায়।

এ কার্ডের ধারণাটি বিশ্বে বহু পুরোনো হলেও ইসলামী ব্যাংকিং খাত ২০০১ সাল পর্যন্ত বাজারে কোনো ক্রেডিট কার্ড আনেনি। ওই সালে মালয়েশিয়ায় প্রথম ইসলামী ক্রেডিট কার্ড উন্মুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে এর বাজার খুব বেশি দিনের নয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোও এখানে শুরুর দিকে এ কার্ড সেবাটি চালু কিংবা জনপ্রিয় করে তুলতে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। এ কারণে কার্ড সেবার দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।

তবে গত কয়েক বছর থেকে ব্যাংকগুলো নানা প্রকারের কার্ড (যেমন—সিলভার কার্ড, গোল্ড কার্ড ও প্লাটিনাম কার্ড) চালু করেছে এবং উত্তরোত্তর এর সংখ্যা ও সেবা বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এ কার্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—এটি সুদমুক্ত; উজরা (নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ/ফি) মোডে পরিচালিত হয়। গ্রাহক পেমেন্ট প্রদান একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (যেমন ৪৫-৫০ দিন) মুনাফা ফ্রি সময় পান। এ সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হলে কোনো ধরনের মুনাফা চার্জ ধার্য করা হয় না।

এ কার্ডের লেনদেন প্রক্রিয়া সাধারণত নিম্নরূপ :

১. ব্যাংক প্রথমে কার্ড ইস্যু করে নির্ধারিত মূল্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে।

২. নির্দিষ্ট সময় শেষে কার্ডটি নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে নবায়ন করা যায়।

৩. ব্যাংক প্রতিটি লেনদেনে প্রসেসিং বাবদ নির্ধারিত ফি আদায় করে।

৪. কোনো গ্রাহক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করলে তার হিসাব সংরক্ষণ করার প্রয়োজন না হওয়ায় ব্যাংক তার থেকে হিসাব মেইনটেনেন্স বাবদ কোনো চার্জ আদায় করে না। তবে তিনি যদি পরিশোধ না করেন, তাহলে তার জন্য একটি আলাদা হিসাব খোলা হয় এবং এর হিসাব সংরক্ষণ ও মাসিক বিবরণী প্রেরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ড লাইসেন্স, নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি, পিওএস এবং এটিএম টার্মিনাল, একসেপ্টেন্স ডেভেলপমেন্ট, প্রসেসিং ইত্যাদি কাজের বিপরীতে যতটা সম্ভব At actual ভিত্তিতে ফি চার্জ করে থাকে।

৫. নগদায়ন সেবার বিপরীতে নির্ধারিত ফি চার্জ করে থাকে।

৬. কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর বিক্রেতার নিকট থেকে ব্যাংক একটি সুনির্দিষ্ট হারে কমিশন আদায় করে থাকে।[২৯৮]

৭. ব্যাংক গ্রাহককে বিভিন্নমুখী সুবিধা প্রদানের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তন করে, যেমন : সিলভার, গোল্ড, প্লাটিনাম ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কার্ডগুলোর সুযোগ-সুবিধা ও সেবার তারতম্যের কারণে সার্ভিস চার্জ/কমিশন/ফি কমবেশি করে থাকে। তবে একটি কার্ডের বিদ্যমান লিমিটের মধ্যে টাকার পরিমাণের তারতম্যের কারণে সার্ভিস চার্জ/কমিশন/ফি-এর মধ্যে কোনো তারতম্য করে না।

ক্রেডিট কার্ড-সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় : শারয়ী দৃষ্টিকোণ

নিম্নে ক্রেডিট কার্ড-সংক্রান্ত কিছু বিষয় শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হলো :

ক. POS লেনদেনের ক্ষেত্রে মুরাবাহার নীতির অনুসরণ প্রসঙ্গ

কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক মুরাবাহা নীতিমালা অনুসরণ করে ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের POS লেনদেন করার সুবিধা প্রদান করে থাকে। প্রশ্ন হলো, ব্যাংকে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী POS লেনদেনের ক্ষেত্রে মুরাবাহার নীতির অনুসরণ কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

---

২৯৮. রহমতুল্লাহ, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা*, পৃ. ১০২

যতটুকু জানা যায়, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে POS লেনদেনের ক্ষেত্রে মুরাবাহা নীতির অনুসরণ যথার্থ নয়। এর কারণ হলো :

১. মুরাবাহা পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি শর্ত হলো—ব্যাংক কর্তৃক পণ্যের মালিকানা অর্জন এবং লাভসহ মূল্যে গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা। কিন্তু POS-এর মাধ্যমে লেনদেন প্রক্রিয়ায় উক্ত নীতি/শর্ত পরিপালন করা হয় না।

২. বেচাকেনার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ শর্ত হলো—ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজন পৃথক হতে হয়। POS লেনদেনের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি ব্যাংকের ক্রয়-প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয় করছে, আবার সেই একই ব্যক্তি ব্যাংকের বিক্রয়-প্রতিনিধি হিসেবে লভ্যাংশসহ নিজের কাছে পণ্যটি বিক্রি করছে। এখানে যিনিই ক্রয়-প্রতিনিধি, তিনি আবার বিক্রয়-প্রতিনিধি, আবার তিনিই মূল ক্রেতা।

৩. বেচাকেনার ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায়; তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো—বিক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে আগে পণ্যের ওপর প্রতিনিধি-নিয়োগকর্তার মালিকানা স্বত্ব থাকতে হবে। POS লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক পণ্যের মালিকানা অর্জন না করেই পণ্য বিক্রয় করার জন্য বিক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

৪. POS-এর মাধ্যমে লেনদেন প্রক্রিয়ায় বেচাকেনা মূলত এক বিক্রির ভেতর দুই বিক্রির নামান্তর। কারণ, এ প্রক্রিয়ায় বেচাকেনাটা যেন এভাবে সম্পন্ন হয় যে, এ জিনিসটি তুমি আমার পক্ষ থেকে কিনে নাও এ শর্তে যে, তুমি আবার আমার থেকে এটি বেশি দামে কিনে নেবে। হাদীসে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ এসেছে।

৫. POS-এর মাধ্যমে লেনদেন প্রক্রিয়াটি পদ্ধতিগত ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে বাইউল ঈনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বাইউল ঈনা হলো—ব্যক্তি তার পণ্যটি বাকিতে অন্যের কাছে বিক্রির পর আবার ওই ব্যক্তির নিকট থেকে তা কমমূল্যে নগদে ক্রয় করা। এরূপ বেচাকেনা শরীয়তে নিষিদ্ধ। কারণ, এটি একটি কৌশল; এর মাধ্যমে গ্রাহক মূলত নগদ টাকা লাভ করে। বাইউল ঈনার আরও কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। সব প্রক্রিয়ার পেছনে উদ্দেশ্য একটাই। তা হলো—ব্যাবসার সুরতে ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত অংশটা হালাল করা (قَرْضٌ فِي صُورَةِ بَيْعٍ ، لِاسْتِحْلَالِ الْفَضْلِ)। POS-

এর মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রেও ব্যাংকের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো— গ্রাহককে ঋণ দিয়ে কিছু মুনাফা অর্জন করা। এটি একধরনের প্রকাশ্য কৌশল; সরাসরি সুদের সাথে জড়িত না হয়ে ঘুরেফিরে সুদের সাথে জড়িত হওয়ার নামান্তর।

সুতরাং, এ কথা বলা যায় যে, POS লেনদেনের ক্ষেত্রে মুরাবাহা নীতির অনুসরণ শরীয়াসম্মত নয়। এর পরিবর্তে এ ক্ষেত্রেও ATM লেনদের মতো উজরা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

খ. POS লেনদেনের ক্ষেত্রে বকেয়ার ওপর বাৎসরিক ২০% লভ্যাংশ ধার্য প্রসঙ্গ

POS লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকে প্রচলিত নিয়ম হলো, গ্রাহক যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আংশিক পরিশোধ করে, তাহলে কার্ডের সফটওয়্যার ওই অপরিশোধিত বকেয়ার ওপর বাৎসরিক ২০% হারে লভ্যাংশ (Profit) ধার্য করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ নিয়মও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, মুরাবাহার ক্ষেত্রে লাভসহ পণ্যের মূল্য যা ধার্য করা হয় তা ক্রয়-বিক্রয়ের শুরুতেই ধার্য করতে হয়। সময়মতো সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করার কারণে বকেয়ার ওপর আবার লভ্যাংশ ধার্য করার নিয়ম শরীয়াসম্মত নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুরাবাহার ক্ষেত্রে সময়মতো সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করার কারণে বকেয়ার ওপর পুনরায় লভ্যাংশ ধার্য করার পরিবর্তে গ্রাহকদের নিকট থেকে ক্ষেত্রবিশেষে জরিমানা কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে, অথবা গ্রাহক ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি জনকল্যাণমূলক ফান্ডে একটি নির্দিষ্ট অর্থের ফান্ড প্রদান করবে।

গ. নির্দিষ্ট মার্চেন্ট আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়

কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের POS লেনদেন করার ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের জন্য কতিপয় মার্চেন্ট আউট লেট নির্দিষ্ট করে দেয়। এ প্রসঙ্গে শারয়ী বিধান স্পষ্ট করার আগে দুটি প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন :

১. ব্যাংক কি POS-এর মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ রয়েছে—এমন সকল মার্চেন্ট আউলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ অবারিত রাখে?

২. নাকি তন্মধ্যে বাছাইকৃত কতিপয় নির্দিষ্ট মার্চেন্ট আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের শর্তারোপ করে?

যদি ব্যাংক দেশে POS-এর মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ রয়েছে—এমন সকল মার্চেন্ট আউলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ অবারিত রাখে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু ব্যাংক যদি তন্মধ্যে বাছাইকৃত কতিপয় নির্দিষ্ট মার্চেন্ট আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের শর্ত আরোপ করে, তাহলে এরূপ শর্তারোপ শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু আবিদীন রাহ. উল্লেখ করেন, الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ.-"শর্ত দিয়ে ঋণ দেওয়া হারাম। শর্ত দিয়ে ঋণ দিলেও শর্ত অকার্যকর হবে।"[২৯৯] এর কারণ হলো :

১. শরীয়ার সাধারণ বিধান হলো—ঋণের সাথে এমন কোনো শর্তারোপ করা শরীয়াসম্মত নয়, যাতে ঋণদাতা কোনোভাবে উপকৃত হয়। যেমন—ঋণচুক্তিতে শর্ত করা হলো যে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে কিছু বিক্রি করবে অথবা গ্রহীতার নিকট থেকে কিছু কিনবে অথবা গ্রহীতার কাছে কিছু ভাড়া দেবে বা নেবে ইত্যাদি। সকল মাযহাবের প্রায় সকল ফকীহই এ ব্যাপারে একমত।[৩০০] যেহেতু বাছাইকৃত মার্চেন্ট আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের শর্তারোপের মধ্যে ঋণদাতা উপকৃত হচ্ছে, তাই তা বৈধ বলে গণ্য হবে না।

২. হাদীসে ঋণের সাথে কোনো ধরনের বেচাকেনার শর্ত জড়াতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ-"ঋণের সাথে ব্যাবসা একত্র করা বৈধ নয়।"[৩০১]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন—

وَحَرَّمَ الْجَمْعَ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْبَيْعِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الذَّرِيعَةِ إِلَى الرِّبْحِ فِي السَّلَفِ بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، وَالتَّوَسُّلِ إِلَى ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوِ الْإِجَارَةِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ

---

২৯৯. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২০, পৃ. ৮৯

৩০০. ইবনু জাযযী আল কালবী, *আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ২৯৩, রমলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৪. পৃ. ২২৫; বুহূতী, *কাশশাফুল কি না*, খ.৩, পৃ. ৩০৫

৩০১. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, হা. নং : ৩৫০৬; তিরমিযী, *আস সুনান*, হা. নং : ১২৩৪

ঋণের সাথে ব্যাবসা একত্র করা হারাম। কারণ, এরূপ প্রক্রিয়ার মধ্যে মূলত ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা করার কৌশল নিহিত থাকে। আর ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়ার মাধ্যমে তা অর্জনের উপায় তৈরি হয়।[৩০২]

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, যেমন ঋণগ্রহীতাকে একশত (টাকা) এক বছরের জন্য ধার দেওয়া হলো, এরপর পঞ্চাশ (টাকা) সমমানের কোনো জিনিস তার কাছে একশত (টাকা)য় বিক্রি করল। ফলে এই ক্রয়-বিক্রয় ঋণের মধ্য থেকে অতিরিক্ত অর্জনের সুযোগ করে দিলো। অথচ ঋণ শুধু সমপরিমাণ পরিশোধকেই আবশ্যক করে থাকে। এখানে অবস্থা হলো—যদি এ বিক্রয়ের সুযোগ না থাকত তাহলে ঋণদাতা ঋণ দিতো না এবং যদি এ ঋণচুক্তি না থাকত তাহলে ঋণগ্রহীতা ওই পণ্য তার নিকট থেকে ক্রয় করত না। এরপর তিনি বলেন, এটিই সুদের তাৎপর্য।[৩০৩]

সুতরাং ঋণের চুক্তিতে বিক্রয়ের শর্ত আরোপ করার ফলে মূলত ঋণের মধ্যেই অতিরিক্ত আরোপ করা হয়। কেননা, এতে ঋণের সুবাদে হয়তো অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয়। ফলে এ ঋণটি শর্তযুক্ত বাড়তি মুনাফায় পরিণত হয়, যা হলো সুদ।

উল্লেখ্য যে, POS-এর মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডের লেনদেন মূলত কার্ডহোল্ডারকে পণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ দেওয়ার পর্যায়ভুক্ত; এটা ব্যাংকের সাথে কার্ডহোল্ডারের ব্যাবসার পর্যায়ভুক্ত নয়, তাই এরূপ ঋণের সাথে ঋণদাতার পক্ষ থেকে বেচাকেনা জাতীয় কোনো শর্তারোপ করা বৈধ হবে না।

৩. তৃতীয়ত, এরূপ শর্তারোপ একটি চুক্তির ভেতরে আরেকটি চুক্তি করার নামান্তর, যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. ঋণ একান্তই সেবামূলক চুক্তি। এ ক্ষেত্রে যেকোনো প্রক্রিয়ায় কোনোরূপ বিনিময়ের আশা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত।

---

৩০২. ইবনুল কাইয়িম, *ইগাছাতুল লাহফান*, খ. ১, পৃ. ৩৬৩

৩০৩. ইবনুল কাইয়িম, *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন...*, খ. ৩, পৃ. ১৫৩

ঘ. নির্দিষ্ট মার্চেন্ট আউটলেট থেকে কমিশন গ্রহণ

কোনো কোনো ব্যাংক POS লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট আউটলেট থেকে নির্দিষ্ট কমিশন বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যাংক চুক্তি করে মার্চেন্ট আউটলেট থেকে নির্দিষ্ট কমিশন বা লভ্যাংশ গ্রহণ করতে পারে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হলো :

ক. যদি ব্যাংক ঋণদাতা হিসেবে বাছাইকৃত কতিপয় নির্দিষ্ট মার্চেন্ট আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের শর্ত আরোপ করে সেসব আউটলেট থেকে কমিশন বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে, তবে তা বৈধ হবে না; যদিও এতে গ্রাহক কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্তও না হয়। কারণ, বাস্তবতা হলো—ব্যাংক ঋণ দিয়ে ঠিকই প্রক্রিয়া করে ও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে লাভ অর্জন করছে, যা শরীয়াসম্মত নয়।

খ. যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যাংক ঋণদানের প্রক্রিয়ায় ঋণদাতা (মুকরিয)-এর ভূমিকায় নয়; বরং ব্যবস্থাপক (ওয়াকিল) হিসেবে একদিকে কার্ডহোল্ডারদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে, অপরদিকে মার্চেন্ট আউটলেটগুলোর জন্য পণ্যবিক্রির ব্যবস্থা করে, তাহলেই মার্চেন্ট আউটলেট থেকে ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যায্য কমিশন গ্রহণ করার একটা সুযোগ ব্যাংকের রয়েছে, যেমন ব্যাংকের জন্য ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ন্যায্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। ফকীহদের কারও কারও কথা থেকে তা বোঝা যায়; যেমন—বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু কুদামা রাহ. বলেন, لَوْ قَالَ : اقْتَرِضْ لِي مِنْ فُلَانٍ مِائَةً ، وَلَكَ عَشَرَةٌ ، فَلَا بَأْسَ-"যদি কেউ বলে যে, তুমি অমুক থেকে আমার জন্য একশত (টাকার) ঋণ সংগ্রহ করে দাও এবং তোমার এ সহযোগিতার জন্য তুমি দশ (টাকা) পাবে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।"[৩০৪]

এ প্রসঙ্গে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দাহ-এর সিদ্ধান্ত হলো—

> ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করার প্রেক্ষিতে বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য বিক্রয়ের কমিশন আদায় করতে পারবে এ শর্তে যে, বিক্রেতা কার্ডধারী ক্রেতার নিকট একই মূল্যে পণ্য বিক্রয় করবে, চাই সে নগদ মূল্যে ক্রয় করুক অথবা কার্ডের মাধ্যমে ক্রয় করুক।[৩০৫]

---

৩০৪. ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৫

৩০৫. *আল কারারাতু ওয়াত তাওসিয়াতু হাওলাল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল মালিয়্যাহ, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী*, জিদ্দা, সিদ্ধান্ত নং : ১০৮ [২/১২] ২৫৮

আমরা মনে করি, যদি ব্যাংক বাছাইকৃত কতিপয় মার্চেন্ট আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের শর্তারোপ করে কমিশন বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে এবং এরূপ শর্তারোপ করা যেহেতু শরীয়াসম্মত নয়, তাই এরূপ নীতি পরিহার করা প্রয়োজন। তবে ব্যাংক কোনো শর্তারোপ ছাড়া নির্দিষ্ট মার্চেন্ট আউটলেট থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য কার্ডহোল্ডারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক নির্দিষ্ট মার্চেন্ট আউটলেটসমূহের সাথে এ মর্মে একটি চুক্তিতে আসতে পারে যে, আউটলেট কার্ডহোল্ডারদেরকে পণ্যের মূল্যে বাজার দর থেকে কিছু কনসেশন দেবে অথবা ব্যাংক কার্ডের সার্ভিজ চার্জ কিছু হ্রাস করতে পারে এবং এর বিপরীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপক হিসেবে আউটলেট থেকে তার লাভের একটি অংশ বা কমিশন নিতে পারে।

আমরা মনে করি, এ ব্যবস্থাটি ব্যাংক ও কার্ডহোল্ডার দু-পক্ষের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। কারণ, এ ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতা বাজারদরের চেয়ে কিছুমাত্র কমমূল্যে পণ্য ক্রয়ের সুবিধার কারণে অথবা সার্ভিস চার্জ কিছুমাত্র হ্রাস করার কারণে লাভবান হবে। অপরদিকে এ ব্যবস্থায় ব্যাংকও উপকৃত হবে যে, গ্রাহকদের মধ্যে তার কার্ডের সমাদর বৃদ্ধি পাবে। তদুপরি এরূপ ব্যবস্থাও শরীয়তের বিধানের পরিপন্থি নয়।

ঙ. ATM লেনদেনের ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধের বেলায় Monthly Maintenance Fee নির্ধারণে তারতম্য

ব্যাংকে প্রচলিত নিয়ম হলো—গ্রাহক যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করে, বরং আংশিক পরিশোধ করে, তাহলে ব্যাংক তার খরচ বাবদ প্রোডাক্ট অনুযায়ী নির্ধারিত (Fixed) ৫০০ টাকা বা ৭৫০ টাকা অথবা ১৫০০ টাকা এবং VAT মাসিক ভিত্তিতে Monthly Maintenance Fee হিসেবে ধার্য করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, বকেয়া—কম হোক বা বেশি—সকল অবস্থায় Monthly Maintenance Fee-এর পরিমাণ যদি এক হয়, তাহলে যাদের বকেয়ার পরিমাণ অতি অল্প, তাদের জন্য এ ফি অন্যায্য হতে পারে। তবে যেহেতু সকলের জন্য একইরূপ সার্ভিস দেওয়া হয়, তাই এ ব্যবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিগতভাবে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু এ অবস্থায় যেহেতু কারও কারও প্রতি অবিচারের আশঙ্কা থাকে, তাই বকেয়ার পরিমাণ অনুসারে Monthly Maintenance Fee-এর মধ্যে তারতম্য করা যায় কি না—তা বিবেচনা করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত হলো—বকেয়ার পরিমাণগুলোকে কাছাকাছি কয়েকটি ধাপে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি ধাপের জন্য আলাদা আলাদা Monthly Maintenance Fee নির্ধারণ করা, যাতে কেউ অবিচারের সম্মুখীন না হয়। কারণ,

ক. এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের আরোপিত সার্ভিস চার্জ/মেইন্টেনেন্স ফি যেমন প্রত্যেক কার্ডহোল্ডারগণের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা দেওয়া যেতে পারে, তেমনি ঋণের পরিমাণ অনুসারেও সার্ভিস চার্জে/মেইন্টেনেন্স ফিতে তারতম্য করা যেতে পারে। শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো- الغرم بالغنم অর্থাৎ যে যতটুকু সুবিধা ও লাভ ভোগ করবে, তাকে সে-ই পরিমাণে দায় ও ক্ষতি বহন করতে হবে।[৩০৬] সুতরাং যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সময়মতো অধিকাংশ পরিশোধ না করে বেশি সুবিধা অর্জন করছে, আর যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সময়মতো যৌক্তিক কোনো কারণে অল্প বাকি রাখে এবং অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা অর্জন করছে, তাদের উভয়ের দায় এক হবে না।

খ. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ঋণের ব্যবস্থাপকদের জন্য ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে কমিশন নেওয়ার একটা সুযোগ আছে এবং এ কমিশন ব্যবস্থাপক ও ঋণগ্রহীতার সম্মতিক্রমে যেকোনো অঙ্কে হতে পারে। কাজেই ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থাপক হিসেবে ঝুঁকি বিবেচনায় কম অঙ্কের ঋণগ্রহীতাদের তুলনায় মোটা অঙ্কের ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে অধিক কমিশন নিতে পারে এবং এ বিষয়ে ব্যাংক কার্ডহোল্ডারগণের সাথে একটি নির্দিষ্ট চুক্তিতে আসতে পারে।

গ. শরীয়তের অপর একটি মূলনীতি হলো—কল্যাণসাধনের তুলনায় ক্ষতি দূরীভূত করাকে প্রাধান্য দান। অর্থাৎ, যখন কোনো ক্ষেত্রে একই সাথে কল্যাণসাধন ও ক্ষতি দূরীকরণের বিষয় একত্রিত হয়, তখন সে ক্ষেত্রে ক্ষতি দূরীকরণের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হয়। কাজেই যাদের বকেয়ার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অতি অল্প, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আরোপ যেহেতু তাদের ক্ষতিসাধনের পর্যায়ভুক্ত, তাই এ বিষয়ে ক্ষতি দূরীভূতকরণ প্রাধান্য পাবে।

---

৩০৬. ইবনু আমীরিল হাজ, *আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর*, খ. ২, পৃ. ২৬৯; আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ*, পৃ. ৯৪

চ. কিস্তি সুবিধা দান প্রসঙ্গ

কার্ডহোল্ডারদেরকে তাদের প্রদেয় টাকা পরিশোধের জন্য কিস্তি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে এবং এজন্য তাদের থেকে At actual সার্ভিস চার্জ নিতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কিস্তির টাকার পরিমাণ ও মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে সার্ভিস চার্জে তারতম্য করা যাবে কি না?—এ প্রসঙ্গে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

ছ. মিনিমাম ডিউয়ের আগে বিল পরিশোধের নিয়তে সুদি ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার

ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কার্ডধারী যা কেনাকাটা করে থাকে তা গ্রাহকের পক্ষে তার ব্যাংক বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেয়। পরে গ্রাহক সে বিল ব্যাংককে পরিশোধ করে। এখানে বিল পরিশোধের দুটি সময় থাকে। একটি হলো, মিনিমাম ডিউ। এ সময়ের মধ্যে বিল পরিশোধ করলে গ্রাহককে অতিরিক্ত কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হয় না। ওই সময় পার হলে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো—একজন মুসলিম ক্রেডিট কার্ডধারী ওই শর্তে বা চুক্তিতে ক্রেডিট কার্ড নেওয়ার সময় যদি নিয়তে রাখে যে, মিনিমাম ডিউয়ের আগেই বিল পরিশোধ করে দেবে, তবে কি ওই নিয়তে তা নেওয়া জায়িয হবে? এ প্রশ্নটি ক্রেডিট কার্ড বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য অভিমত হলো—ওই চুক্তিতে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণও জায়িয নয়। কারণ, ওই শর্ত মেনে দস্তখত করার অর্থ একটি সুদি চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। চুক্তিটিই হারাম ও সুদি চুক্তি। কোনো লেনদেন হালাল-হারাম হওয়ার মূল বুনিয়াদ হলো—মূল চুক্তিনামা, যা উভয় পক্ষের মাঝে আলোচনা হয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ক্রেডিট কার্ডধারী পরে নিজেকে সুদ থেকে বাঁচালেও সে এমন এক চুক্তির সঙ্গে একমত হয়েছে, যা একান্তই সুদি লেনদেন।

তা ছাড়া এটিও একটি বাস্তবতা যে, বর্তমানে ৯৫ শতাংশ বা তারও বেশি ক্রেডিট কার্ডধারী সুদি কারবারে লিপ্ত। তাই এ চুক্তিতে জড়ানো যাবে না, যদিও উক্ত সুদি শর্ত নিজের ওপর বাস্তবায়নের নিয়ত না থাকে। যদি বাস্তবায়ন করা হয় তবে তো দ্বিগুণ পাপ। আর বাস্তবায়ন না হলেও সুদি চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পাপ তো আছেই। বর্তমান ফকীহদের অধিকাংশের রায় এটিই। প্রায় সবকটি আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমির বক্তব্য :

জেদ্দার ১২তম ফিকহ সেমিনারে এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, 'ক্রেডিট কার্ডের মূলে যেহেতু সুদ প্রদানের শর্ত থাকে তাই এ ধরনের ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা যেমন নাজায়িয, তেমনি ব্যবহারও নাজায়িয, যদিও ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকের দৃঢ় ইচ্ছা থাকে যে, মিনিমাম ডিউয়ের আগেই বিল পরিশোধ করে দেবে।'

AAOIFI তাদের এতৎসংক্রান্ত শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ৩.৩-এ বলা হয়েছে, 'কোনো প্রতিষ্ঠানের এমন ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা বৈধ নয়, যার মূল চুক্তিতে এ শর্তারোপ থাকে যে, কার্ডধারী কিস্তিতে অতিরিক্ত সুদ প্রদানের শর্তে বিল পরিশোধ করতে পারবে।'

ইসলামী ফিকহ অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার ব্যাংকিং কার্ডবিষয়ক ১৫তম ফিকহ সেমিনারের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, 'ক্রেডিট কার্ডের প্রচলিত পদ্ধতি যেহেতু সুদি লেনদেননির্ভর, তাই ক্রেডিট কার্ড বা এ ধরনের কোনো কার্ড গ্রহণ করা বা ব্যবহার করা বৈধ নয়।'

সৌদি আরবের গবেষণা-ফাতওয়ার স্থায়ী বোর্ডের বক্তব্য :

সৌদি আরবের গবেষণা ও ফাতওয়ার স্থায়ী বোর্ড (আল লাজনাতুত দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা) তাদের এক ফাতওয়ায় লিখেছে, (প্রশ্ন ছিল, মিনিমাম ডিউয়ের আগে বিল পরিশোধ করে দিলে কোনো ফি নেই, আর না হয় অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে হয়)—

> বিষয়টি বাস্তবে এমনি হয়ে থাকলে সেটা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাসের নামান্তর। এটি জাহিলী রিবা, যা শরীয়তে হারামের অধীনে পড়ে যায়। জাহিলী রিবা হলো—এখন আদায় করো; নতুবা অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে সময় নাও। সুতরাং এ ধরনের ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা বা ব্যবহার করা জায়িয নয়।

ওই ফাতওয়ায় যারা সম্মতি প্রকাশ করেছেন তারা হলেন, সদস্য : বকর আবু যায়দ, আবদুল আযীয আলে শাইখ, সালিহ ফাওযান, আবদুল্লাহ ইবনে গাদইয়ান। প্রধান : আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে বায রাহ.।[৩০৭]

---

৩০৭. *ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়িমা*, প্রকাশ : ৪র্থ প্রকাশ, ২০০২ ইং, ফাতওয়া নং : ১৭৬১১

মুফতি তকী উসমানীর ভাষ্য—

> ডেবিট কার্ডের যদি ব্যবস্থা না হয়, ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি এ চুক্তিতে একমত না হওয়া যায় যে, ক্রেডিট কার্ড বিল সরাসরি কার্ডধারীর অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে রাখা হবে, আবার এদিকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের তীব্র প্রয়োজনও দেখা দেয়, তাহলে আশা করা যায়, মিনিমাম ডিউতে বিল শোধ করে দেবে এ নিয়তে ওই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করলে আল্লাহর কাছে সে মাজুর হিসেবে গণ্য হবে। এটিও তখনই হবে যখন সবধরনের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে, যেন সুদ দিতে না হয়।[৩০৮]

মোটকথা, মিনিমাম ডিউতে পরিশোধের নিয়ত থাকলেও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার জায়িয নয়। কারণ, এখানে চুক্তিটিই সুদি চুক্তি। আর কোনো চুক্তি সুদি চুক্তি হওয়াটাই একটি স্বতন্ত্র পাপ। এজন্যই জেনারেল ব্যাংকের প্রাপ্ত সুদ সদকা করে দেবে—এ নিয়তেও তাতে অ্যাকাউন্ট খোলা বৈধ নয়। অবশ্য কখনও এমন হয় যে, ক্রেডিট কার্ড ছাড়া কাজ হয় না। যেমন, অনলাইনে পেমেন্ট করা। এসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বৈধ হবে :

১. বৈধ কোনো প্রয়োজন থাকা, যা ক্রেডিট কার্ড ছাড়া সমাধা করা সম্ভব নয়।

২. ডেবিট কার্ডে সমাধা না হওয়া।

৩. ক্রেডিট কার্ডে ডাইরেক্ট ডেবিটের ব্যবস্থা করতে না পারা।

৪. মিনিমাম ডিউতে বিল পরিশোধ করতে হবে।

৫. মিনিমাম ডিউর মধ্যেই যেন বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়—এজন্য সর্বদিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৬. প্রয়োজন পরিমাণ কাজেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা।

এই ৬টি শর্তে তীব্র প্রয়োজনের সময় সাময়িকভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে।[৩০৯]

---

৩০৮. তকী উসমানী, *ফিকহুল বুয়ূ*, পৃ. ৪৬৩

৩০৯. https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/734516.details

অধ্যায় : ৮

সেবামূলক অর্থায়ন

ইসলামী ব্যাংকগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শরীয়ার আলোকে সামাজিক ও সেবামূলক নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে থাকে। কেবল মুনাফা অর্জনই লক্ষ্য নয়; বরং জনগণের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতিও ব্যাংকগুলোকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির লক্ষ্যেও ইসলামী ব্যাংকগুলো কাজ করে থাকে। ব্যাংকগুলোর সামাজিক ও সেবাধর্মী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্থায়ন-পদ্ধতি হলো :

১. যাকাত তহবিল

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকের একটি প্রধান বিশেষত্ব হলো—যাকাতব্যবস্থার বাস্তবায়ন। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্‌বৃত্ত তহবিল ও অব্যবহৃত অর্থের ওপর যাকাত আদায় করে থাকে। তা ছাড়া ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট থেকেও তাদের সম্মতিক্রমে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। যাকাত তহবিলের এ অর্থ শরীয়াসম্মত খাতেই ব্যয় করা হয়।

আজকের সমাজে মুসলিমরা প্রায়ই বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। এতে সমাজের স্থায়ী কল্যাণসাধন হয় না। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। তাই ইসলামী ব্যাংক চেষ্টা করে—যাকাত তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানমুখী উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করতে। এভাবে যাকাতের অর্থ ব্যয় করে একইসাথে কর্মসংস্থান ও নিয়মিত আয়ের একটা নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে

ইসলামী ব্যাংক বদ্ধপরিকর। সমাজে ধনী-দরিদ্রের শ্রেণি-বৈষম্য হ্রাস করার জন্য এটি একটি কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।[৩১০]

ব্যাংকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ

ব্যাংকের কাছে রক্ষিত বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভ ও প্রভিশন যদি 'নিসাব' পরিমাণ হয়, তাহলে প্রতি চান্দ্রবর্ষের ওপর ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হবে, তবে শর্ত হলো—শেয়ারহোল্ডারগণ, যারা প্রকৃতপক্ষে এসব সম্পদের মালিক, তাদের কাছ থেকে ব্যাংক সম্পদের যাকাত প্রদানের অনুমতি নিয়ে রাখবে।[৩১১]

১৯৮৪ সালের ৩০ এপ্রিল 'যাকাত'-বিষয়ক প্রথম কনফারেন্সে সকল পাবলিক, প্রাইভেট লিমিটেড ও যৌথ মূলধনি বৃহদায়তনের কারবার প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে সর্বসম্মতিক্রমে 'আইনগত সত্তা'[৩১২] (Legal Entity)-রূপে

---

৩১০. হাবীবুর রহমান, শাহ মুহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ১১-১৩

৩১১. *আল ফাতাওয়া আশ শরীয়া ফিল মাসায়িলিল ইকতিসাদিয়্যাহ*, কুয়েত : কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, খ. ১, পৃ. ১৯৯

৩১২. ক্লাসিকাল ফিকহে 'আইনানুগ ব্যক্তি' পরিভাষার উল্লেখ নেই। কিন্তু আধুনিক ফকীহগণ আইনানুগ ব্যক্তির ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলামী আইন এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আবদুল কাদির আওদা শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেছেন যে, ইসলামী আইন তার শুরু থেকে আইনানুগ ব্যক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। ফকীহগণ বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও ওয়াকফকে আইনানুগ ব্যক্তির উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করেছেন। একইভাবে তারা বিদ্যালয়, এতিমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ করতে সক্ষম বলে এগুলোকে আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। (আওদাহ, আবদুল কাদির, *আত তাশরীউল জিনায়ী আল ইসলামী বিল কানুনিন ওয়াদয়ী*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, পৃ. ৩৯৩)

মুস্তাফা যারকার দৃষ্টিতে ইসলামী শরীয়ার রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা নীতি-সম্পর্কিত ধারণা আইনানুগ ব্যক্তির আধুনিক ধারণার চেয়েও উন্নত। (যারকা, আহমদ, *মাদখাল আল-ফিকহ আল-আম*, ১৯৫৯, খ. ৩, পৃ. ২৫৮)

আধুনিক ফকিহগণের নিকট আইনানুগ ব্যক্তির ধারণাটি স্বীকৃত। তারা আইনানুগ ব্যক্তির জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকার কথা উল্লেখ করেছেন :

ক. আইনানুগ ব্যক্তি প্রকৃত ব্যক্তি থেকে স্বাধীনভাবে তার আইনি অবস্থা স্থায়ী করতে পারে;

চিহ্নিত করা হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রিজার্ভ ও প্রভিশনের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে বলে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।[৩১৩] অনুরূপভাবে পশ্চিম সুমাত্রার পাদাং পাঞ্জাং-এ ২০০৯ সালের তৃতীয় ইন্দোনেশিয়ান ফাতওয়া কমিশনের ইন্দোনেশিয়ান উলামা কাউন্সিলের ফাতওয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনি সত্তা হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠান যাকাতের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করলে তাকে হয় 'শাখসিয়্যাহ ইতিবারিয়্যাহ' (আইনগত সত্তা) হিসেবে অথবা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি (ওয়াকিল) হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে।[৩১৪]

মোটকথা, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এখানে পুঁজির ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। কাজেই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আইনগত ব্যক্তি হিসেবে যাকাত প্রদান করবে। এ অভিমত অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'শাখসিয়্যাহ ইতিবারিয়্যাহ'-এর প্রকৃতি গ্রহণ করে। কাজেই একজন ব্যক্তি বা প্রকৃত ব্যক্তি প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ হলে যেমন যাকাত দেয়, তেমনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাকাত প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বিবেচনা করা হবে না। এই অভিমত ডা. শাওকী ইসমাইল শেহাতাহর।[৩১৫] শাইখ আলী আল

খ. এর আইনগত অধিকার আছে এবং সম্পত্তির মালিক হতে পারে;

গ. এটি আইনি বাধ্যবাধকতার জন্য দায়ী এবং ধার নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

(Hassan, Syed Riazul. *The Reconstruction of Legal Thought in Islam*. Lahore: Iman Abu Hanifa Academy, 1983, P. 389-398)

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বাইতুল মাল, ওয়াকফ, মসজিদ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, এতিমখানা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন, 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত মূল্যায়ন ও হিসাবায়ন পদ্ধতি', *ইসলামী আইন ও বিচার*, সংখ্যা : ৭৪ ও ৭৫ (ইসলামিক ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)।

৩১৩. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৯০ (সূত্র : ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক হিসাব রক্ষণের দর্শন, কায়রো : আয যাহরা লিল ইলামিল আরবী, খ. ১, পৃ. ৩২)

৩১৪. Zakat_on_Legal_Entities_Towards_Concept_Perfection.pdf, https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/734

৩১৫. Shawki Ismail Shahatah, *Muhasabat Zakat al-Mal, 'Iman wa Amalan*, 1/e, 1970, 92.

খফীফ, মুস্তাফা আয যারকা, আহমাদ মুহাম্মাদ আল খুলী এবং আলী মুহীউদ্দীন আল কারাদাগীর মতো আইনবিদগণের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।[৩১৬]

কোম্পানি কর্তৃক যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে 'খুলতাহ'-সম্পর্কিত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়, যেখানে রাসূল সা. বলেছেন—

وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

যাকাতের (পরিমাণ কমবেশি করার) আশঙ্কায় পৃথক (প্রাণী)-গুলোকে একত্র করা যাবে না এবং একত্রগুলো পৃথক করা যাবে না।[৩১৭]

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

পশুপালের শরীকদের মধ্যে হলে ন্যায্যভাবে যাকাত আদায়ের হিসাব আপসে মিল করে নেবে।[৩১৮]

উক্ত হাদীসদ্বয়ের ভিত্তিতে কোম্পানিকে খুলতাহ বা মিশ্রিত সম্পদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেসব ব্যক্তি একটি কোম্পানি গঠন করে তারা একে অপরের থেকে আলাদা না থেকে একক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যখনই কোম্পানি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরিষেবা সংস্থা, ল ফার্ম, হোটেল, সালিশি, চিকিৎসা, বিনোদন, গবেষণা যা-ই হোক না কেন তাকে যাকাত দিতে হবে।

সাধারণত 'মুকাল্লাফ বিয যাকাত' (অর্থাৎ, যাকাতের হুকুম যার ওপর প্রযোজ্য এমন ব্যক্তি)-এর সম্পদের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। অনুরূপভাবে ক্ষেত্রবিশেষে 'গাইরে মুকাল্লাফ বিয যাকাত' (অর্থাৎ, যাকাতের হুকুম যার ওপর প্রযোজ্য নয় এমন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কোম্পানি)-এর নিজস্ব তহবিলের ওপর আইনগত সত্তা হিসেবে শরীয়া মোতাবেক অলী বা অভিভাবকরূপে প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক।[৩১৯]

---

৩১৬. Bouheraoua, S. Zakat Obligations on Islamic Financial Institutions. International Shariah Research Academy (ISRA) Research Paper, 2012, No. 3

৩১৭. বুখারী, *আস সহীহ*, হা. নং : ১৩৮২

৩১৮. বুখারী, *আস সহীহ*, হা. নং : ১৩৮৩

৩১৯. *আল ফাতাওয়া আশ শরীয়া ফিল আমালিল মাসরাফিয়্যাহ*, দুবাই : ইসলামী ব্যাংক, সংখ্যা : অক্টোবর ৮৫

উল্লেখ্য, নিম্নে বর্ণিত অবস্থা পাওয়া গেলে লিমিটেড কোম্পানিগুলো কৃত্রিম ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে এবং যথানিয়মে যাকাত প্রদান করবে :

ক. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যাকাত প্রদানের জন্য বাধ্যতামূলক আইনগত বিধান থাকলে;

খ. প্রতিষ্ঠানের মূল গঠনতন্ত্রে (মেমোরেন্ডাম ও আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশন) যাকাত প্রদানের আইনগত কোনো ধারার উল্লেখ থাকলে;

গ. বার্ষিক সাধারণ সভায় এ মর্মে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে;

ঘ. শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে সম্মতি দিলে।[৩২০]

সুতরাং কোনো ইসলামী ব্যাংকের মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়শনে যাকাত প্রদান-সংক্রান্ত কোনো ধারা বিদ্যমান থাকলে সে ইসলামী ব্যাংককে 'আইনগত সত্তা' হিসেবে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে।[৩২১]

ব্যাংকের যেসব সম্পদ বা তহবিলের ওপর যাকাত দিতে হবে

জর্দান ইসলামী ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক ও কুয়েত ফিন্যান্স হাউজসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক অনুসৃত কর্মপন্থা পর্যালোচনা করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর শরীয়া কাউন্সিল নিম্নোক্ত তহবিল ও মুনাফার ওপর যাকাত প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয় :

ক. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Statutory Reserve);

খ. বিনিয়োগ ক্ষতি সমন্বয় তহবিল (Investment Loss Off-setting Reserve);

গ. শেয়ার প্রিমিয়াম (Share Premium);

ঘ. সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve);

ঙ. বিনিময় সমতাকরণ হিসাব (Exchange Equalization A/C।

---

৩২০. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৯০ (সূত্র : ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক হিসাবরক্ষণের দর্শন, কায়রো : আয যাহরা লিল ইলামিল আরবী, খ. ১, পৃ. ৩২)

৩২১. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৯০-১

শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের শেয়ারের মূল্য ও লভ্যাংশের ওপর যাকাত দিতে হবে। উক্ত যাকাতের টাকা ব্যাংকের সদাকা তহবিলে দান করার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে আবেদন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে জমাকারীগণের কাছেও আবেদন করা যেতে পারে।[৩২২]

যাকাতের অর্থ থেকে কর্জ প্রদান

যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোনো প্রতিষ্ঠান সংগৃহীত যাকাতের অর্থ থেকে কারও একান্ত প্রয়োজনে তাকে কর্জে হাসানা দিতে পারবে কি না?

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহগণের অভিমত হলো—যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান তো দূরের কথা; স্বয়ং যাকাতদাতার জন্যও জায়িয নয় যে, সে তার যাকাতের অর্থ অপর কাউকে ধার দেবে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করবে। কারণ, যাকাত তো যাকাতদাতার এমন মালিকানাধীন সম্পদ নয় যে, সে তা কাউকে ঋণ দেবে বা অন্য কাজে ব্যবহার করবে; বরং যাকাতদাতার কর্তব্য হলো—সে তার যাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট খাতগুলোতে মালিকানা সমর্পণপূর্বক বিতরণ করে দেবে। তদুপরি যাকাতের একটি সাধারণ বিধান হলো—তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা; অর্থাৎ, ফরয হওয়ার পর বিলম্ব না করে পরিশোধ করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, বিলম্বে যাকাত আদায় করা জায়িয নয়। সুতরাং যাকাতের অর্থ থেকে কর্জ দেওয়ার মানেই হলো বিলম্বে যাকাত আদায়ের সুযোগ করে দেওয়া, যা তাৎক্ষণিকভাবে যাকাত আদায় করার পরিপন্থি।

তবে আধুনিককালের কতিপয় ফকীহের মতে, যাকাতের অর্থ থেকে যাকাতের হকদারদেরকে কর্জে হাসানা প্রদান করা জায়িয হবে। কিন্তু কোনো যাকাতদাতা কিংবা যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কাউকে তা কর্জ হিসেবে দেওয়া যাবে না। তাদের মতে, যাকাতের অর্থ থেকে কর্জে হাসানা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট তহবিলও গড়ে তুলতে পারে।

কারও কারও মতে, যাকাতের অর্থ একান্ত প্রয়োজনের খাতিরে অন্য ফান্ডেও ঋণ হিসেবে নেওয়া জায়িয আছে। তবে সে ক্ষেত্রে নিয়্যাত হতে হবে, যখনই ওই ফান্ডে টাকা আসবে সাথে সাথে যাকাত ফান্ডের টাকা নিজস্ব ফান্ডে ফিরিয়ে

---

৩২২. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৮৯

দেওয়া হবে। শর্ত হলো—যাকাত ফান্ডের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার মতো সামর্থ্য অর্জনের প্রবল সম্ভাবনা থাকতে হবে। যদি এ সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে যাকাত ফান্ডের টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া যাবে না।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী রাহ.-এর মতে, (যাকাতের অন্যতম খাত) ঋণগ্রস্তদের অংশ থেকে অভাবী লোকদের কর্জ দেওয়া জায়িয এবং এতদুদ্দেশ্যে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে একটি বিশেষ তহবিলও গঠন করা যাবে। তিনি মনে করেন, এ উপায়ে যাকাত সুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং সুদ নির্মূলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আবু যাহরা, খল্লাফ ও হাসান রাহ. প্রমুখ উসুলবিদও এরূপ মত পোষণ করেন। তাদের যুক্তি হলো—যদি যাকাতের অর্থ থেকে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে তা থেকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা আরও অধিক উত্তমভাবে জায়িয হবে, এভাবে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার 'বাইতুল মাল'-এ ফেরত যাবে।[৩২৩] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের ২৮ মে ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত শরীয়া কাউন্সিলে ৬৪তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো :

> যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোনো প্রতিষ্ঠান সংগৃহীত যাকাতের অর্থ থেকে কেবল যাকাতের হকদারদেরকেই গ্যারান্টি দেওয়ার শর্তে কর্জ বা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারবে, তবে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য যাকাতের অর্থ কর্জ বা বিনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। উল্লেখ্য, গ্যারান্টি প্রদান না করলে যাকাতের অর্থ থেকে কর্জ প্রদান বা বিনিয়োগ করা যাবে না।[৩২৪]

শেয়ারহোল্ডার ও ডিপোজিটরদের থেকে যাকাতের অর্থ কেটে রাখা

শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে সেখান থেকে যাকাতের টাকা কেটে রাখা বৈধ হবে না। কারণ, যাকাত প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের নিজস্ব সম্পদের হিসাবের ওপর নির্ভর করে। যে শেয়ারহোল্ডার থেকে যাকাত কেটে রাখা হবে, তার অন্যান্য সম্পদ ও ঋণ হিসাব করলে হতে পারে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ হবে না। এমতাবস্থায় যাকাত ফরয না হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে যাকাত কেটে নিলে তার ওপর জুলুম হবে।

---

৩২৩. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/460276/ حكم-إعطاء-القروض-الحسنة-من-الزكاة#

৩২৪. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৯৪

অনুরূপভাবে মুদারাবা ডিপোজিটরদের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাকাত কেটে রাখা ঠিক হবে না। অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলেই যে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটদের ওপর যাকাত ফরয হবে তা বলা যায় না।

তবে কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ডিপোজিটর যদি ব্যাংককে তার পক্ষে যাকাত প্রদানের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তবেই ব্যাংক তা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার বা ডিপোজিটর তার যাকাত হিসাব করার সময় ব্যাংকের শেয়ার বা ডিপোজিট স্বভাবতই তার হিসাবের বাইরে রাখবেন। শেয়ারহোল্ডার ও ডিপোজিটরদের অনুমতিসাপেক্ষে তাদের থেকে আদায়কৃত যাকাতের মাধ্যমে আলাদা ফান্ড গঠন করা যেতে পারে, তবে তা যাকাতের সকল খাতে ব্যয় করার সুযোগ থাকবে।[৩২৫]

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত হিসাবায়ন পদ্ধতি

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আওফি (AAOIFI) দুটি পদ্ধতির কথা বলেছে। নিট সম্পদ পদ্ধতি এবং নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতি। দুটি পদ্ধতিতে মূল্যায়নের নীতি ভিন্ন। তবে উভয় নীতির পার্থক্য বিবেচনায় নেওয়া হলে ফলাফল একই হবে। এ ছাড়া আওফি স্ট্যান্ডার্ডের বাইরে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধু আইনগত সত্তা হিসেবে ব্যাংকের বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, শেয়ার প্রিমিয়াম, অন্যান্য সঞ্চিতি, রিটেইনড আর্নিং ইত্যাদির ওপর যাকাত আদায় করে থাকে। পরিশোধিত মূলধনের ওপর ব্যাংক যাকাত আদায় করে না। ব্যাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরিশোধিত মূলধনের যাকাত আদায়ের বিষয়টি শেয়ারহোল্ডারগণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত হিসাবায়নের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনিটি পদ্ধতি রয়েছে।[৩২৬] পদ্ধতি তিনটি হলো :

ক. নিট সম্পদ পদ্ধতি (Net Assets Method)

নিট সম্পদ পদ্ধতি অনুসারে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যালাসশিট থেকে যাকাত ভিত্তি নির্ণয় করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় নগদ অর্থ, নিট পাওনা, ব্যবসায়ের

---

৩২৫. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৯৭

৩২৬. দ্র. মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ খন্দকার, 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত মূল্যায়ন ও হিসাবায়ন পদ্ধতি', *ইসলামী আইন ও বিচার*, সংখ্যা : ৭৪ ও ৭৫ (ইসলামিক ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)

জন্য প্রস্তুতকৃত সম্পদ (যেমন—পণ্য, আর্থিক দলিল ও রিয়েল অ্যাস্টেট) এবং নিট বিনিয়োগকে (প্রভিশন বাদ দিয়ে মুরাবাহা, মুদারাবা, মুশারাকা, সালাম, ইসতিসনা বিনিয়োগ) যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদকে বাদ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে পরিশোধযোগ্য দায়, আর্থিক বছরের দায়ের মোট কিস্তি, যা পরবর্তী আর্থিক হিসাবের মেয়াদকালে পরিশোধ করতে হবে, সকল প্রকার ডিপোজিট, মাইনোরিটি অধিকার, সরকারের অধিকার, ওয়াকফ দায়, দাতব্য দায়, অলাভজনক সংস্থার দায় ইত্যাদি বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তি নির্ণয় করা হয়। তবে পরিশোধিত মূলধন ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটিকে দায় হিসেবে গণ্য করে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হয় না।

নিট সম্পদ পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
ব্যাংকের সম্পদ	টাকা	টাকা (যাকাতযোগ্য সম্পদ)
নগদ অর্থ	১,০০,০০০	১,০০,০০০
অন্য ব্যাংকে জমা	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বাই মুরাবাহা (বাদ-প্রভিশন-যদি থাকে)	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
বাই মুয়াজ্জাল (বাদ-প্রভিশন-যদি থাকে)	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
মুশারাকা (বাদ-প্রভিশন ও স্থায়ী সম্পদ, যদি থাকে)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ইসতিসনা ও সালাম (বাদ- প্রভিশন-যদি থাকে)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিপণনযোগ্য সিকিউরিটিজ (বাজারমূল্য)	১,০০,০০০	১,০০,০০০

বিক্রির জন্য রিয়েল অ্যাস্টেট	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিক্রিযোগ্য অন্যান্য বিনিয়োগ	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ (Assets for rent)	২,০০,০০০	০০০
নিট স্থায়ী সম্পদ (Fixed assets net)	২,০০,০০০	০০০
মোট সম্পদ	**১৮,০০,০০০**	**১৪,০০,০০০**
ব্যাংকের দায়	**টাকা**	**টাকা** (বিকলনযোগ্য)
আল ওয়াদীয়াহ চলতি হিসাব	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
প্রদেয় বিল	১,০০,০০০	১,০০,০০০
অন্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ	১,০০,০০০	১,০০,০০০
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন (Paid-up Share Capital)	৪,০০,০০০	০০০
রিজার্ভ (Reserves)	১,০০,০০০	০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ (Investment Risk Reserve)	৫০,০০০	০০০
রিটেইনড আর্নিং (Retained Earnings)	৫০,০০০	০০০
মোট দায়	**১৮,০০,০০০**	**১২,০০,০০০**
যাকাত ভিত্তি (যাকাতযোগ্য সম্পদ-বাদযোগ্য দায়)		**২,০০,০০০**
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% =৫,১৫৪

খ. নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতি (Net Invested Funds Method)

নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতিতে পরিশোধিত মূলধন, রিজার্ভ, অবণ্টিত মুনাফা, দীর্ঘমেয়াদি দায় (long term liabilities) থেকে নিট স্থায়ী সম্পদ এবং এমন বিনিয়োগ যা ব্যবসায়ের জন্য নয় (যেমন—ইজারার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পদ), স্থানান্তরিত লোকসান ইত্যাদি বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তি নির্ণয় করা হয়।

নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
সম্পদ	টাকা	টাকা (যাকাতযোগ্য সম্পদ)
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন (Paid-up Share Capital)	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
রিজার্ভ (Reserves)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ (Investment Risk Reserve)	৫০,০০০	৫০,০০০
রিটেইনড আর্নিং (Retained Earnings)	৫০,০০০	৫০,০০০
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	৬,০০,০০০	৬,০০,০০০
বাদ	টাকা	টাকা (বিকলনযোগ্য)
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ (Assets for Rent)	২,০০,০০০	২,০০,০০০
নিট স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets Net)	২,০০,০০০	২,০০,০০০
মোট	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
যাকাত ভিত্তি		২,০০,০০০
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% =৫,১৫৪

গ. নিট ইক্যুইটি পদ্ধতি (Net Equity Based Method)

নিট ইক্যুইটিভিত্তিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, অন্যান্য সঞ্চিতি, শেয়ার প্রিমিয়াম, অবণ্টিত মুনাফা, নিট আয় ইত্যাদিকে যাকাত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে পরিশোধিত মূলধনের ওপর ব্যাংক যাকাত দেয় না। পরিশোধিত মূলধনে যাকাতের দায়িত্ব শেয়ারহোল্ডারগণের।

নিট বিনিয়োগ সম্পদ পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
সম্পদ	টাকা	টাকা (যাকাতযোগ্য সম্পদ)
রিজার্ভ (Reserves)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ (Investment Risk Reserve)	৫০,০০০	৫০,০০০
রিটেইনড আর্নিং (Retained Earnings)	৫০,০০০	৫০,০০০
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	২,০০,০০০	২,০০,০০০
বাদ	টাকা	টাকা (বিকলনযোগ্য)
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ (Assets for rent)	২,০০,০০০	০০০
নিট স্থায়ী সম্পদ (Fixed assets net)	২,০০,০০০	০০০
মোট		০০০
যাকাত ভিত্তি	২,০০,০০০	২,০০,০০০
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% =৫,১৫৪

নিট ইক্যুইটিভিত্তিক পদ্ধতি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অনুশীলন করে থাকে। ব্যাংকের শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটি নিম্নোক্ত তহবিল ও মুনাফার ওপর যাকাত প্রদানের সিদ্ধান্ত দিয়েছে :

ক. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Statutory Reserve),

খ. শেয়ার প্রিমিয়াম (Share Premium),

গ. সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve)।

শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের শেয়ারের মূল্য ও লভ্যাংশের ওপর যাকাত দিতে হবে। উক্ত যাকাতের টাকা ব্যাংকের সদাকা তহবিলে দান করার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের কাছে আবেদন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে জমাকারীগণের কাছেও আবেদন করা যেতে পারে।[৩২৭]

এ পদ্ধতিতে আনুপাতিক হারে নিট স্থায়ী সম্পদ, ইজারার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পদ ইত্যাদি বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না; তবে এটা করাই ন্যায়সংগত। নিট ইক্যুইটি তহবিল পদ্ধতি ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার এবং ব্যাংকের জন্য যাকাত প্রদানের পৃথক অনুপাত নির্ধারণ করা যায়।

নিট বিনিয়োগ তহবিল পদ্ধতিতে যাকাত ভিত্তি নির্ণয়		
সম্পদ	টাকা	টাকা
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন (Paid-up Share Capital)	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
রিজার্ভ (Reserves)	১,০০,০০০	১,০০,০০০
বিনিয়োগ ঝুঁকি রিজার্ভ (Investment Risk Reserve)	৫০,০০০	৫০,০০০
রিটেইনড আর্নিং (Retained Earnings)	৫০,০০০	৫০,০০০
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	**৬,০০,০০০**	**৬,০০,০০০**
বাদ		
ভাড়ায় দেওয়া সম্পদ (Assets for Rent)	২,০০,০০০	২,০০,০০০

৩২৭. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্ত, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড,* ২০১৭, পৃ. ১৩০

নিট স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets Net)	২,০০,০০০	২,০০,০০০
মোট	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০
যাকাত ভিত্তি		২,০০,০০০
নির্ণেয় যাকাত		২,০০,০০০×২.৫৭৭% =৫,১৫৪
পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে যাকাতযোগ্য সম্পদ	(২,০০,০০০÷৬,০০,০০০)×৪,০০,০০০ =১,৩৩,৩৩৩	
শেয়ারপ্রতি যাকাতযোগ্য সম্পদ (শেয়ার সংখ্যা ৪০,০০০টি, ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	১,৩৩,৩৩৩÷৪০,০০০ =৩.৩৩ টাকা	
ব্যাংকের রিজার্ভসমূহের মধ্যে যাকাতযোগ্য সম্পদ	(২,০০,০০০÷৬,০০,০০০)×২,০০,০০০ =৬৬,৬৬৭	
রিজার্ভের ওপর যাকাত	৬৬,৬৬৭×২.৫৭৭% =১,৭১৮ টাকা	

এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাংক তার বিভিন্ন রিজার্ভের ওপর ১৭১৮ টাকা যাকাত প্রদান করবে এবং শেয়ারহোল্ডাগণের জন্য শেয়ারপ্রতি পরিশোধযোগ্য সম্পদের পরিমাণ হবে ৩.৩৩ টাকা ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করবে।

২. সিএসআর ও শরীয়া পরিপালন

Corporate social responsibility (সংক্ষেপে CSR) তথা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা টেকসই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বে ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি হলো একধরনের ব্যাবসায়িক শিষ্টাচার বা রীতি, যা সমাজের প্রতি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যাবসার নিয়মের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করে। একটি ব্যাবসা নৈতিক ও

আইনগতভাবে পরিচালিত হলেই এর সমস্ত দায়মুক্তি হয়েছে—তা বলা যায় না। যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। একটি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলো সেটাই, যার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ বহুবিধ অংশীদারদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখে। একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের অংশীদারদের লাভের জন্যই কাজ করে না, সে তার কর্মচারী, সরবরাহকারী, বিক্রেতা, স্থানীয় জনগণ ও সর্বোপরি দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্যও কাজ করে। সিএসআরের পেছনে মূল ধারণা হচ্ছে, কেবল অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয়; ব্যাবসা হবে সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ বড়ো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানই সিএসআরের অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের কিছু অংশ এই খাতে বরাদ্দ রাখছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা পূরণের নামে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম, প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে এবং নিয়ম প্রতিপালনের ঊর্ধ্বে চলে যায়। সে ক্ষেত্রে সরকার আইন করে সেখানে সিএসআর নিয়ন্ত্রণ করে।[৩২৮]

এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রথম জুন ১, ২০০৮ তারিখে (ডিওএস সার্কুলার নং ০১ : Mainstreaming CSR in Banks and Financial Institutions in Bangladesh) দেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সিএসআর মূলধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে সিএসআর কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ডিসেম্বর ২২, ২০১৪ তারিখে জারিকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০৭ (Indicative guidelines for CSR expenditure allocation and end use oversight)-এর মাধ্যমে দেশের তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় স্বেচ্ছামূলকভাবে বিভিন্ন খাতে তাদের গৃহীত সিএসআর-সংক্রান্ত ব্যয়ের বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

---

৩২৮. *কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) : সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ [বিলস], ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭

তাদের কর-পরবর্তী নিট মুনাফার অংশ হতে সিএসআর হিসেবে ব্যয় করতে পারবে। সিএসআর ব্যয়ের প্রায় ৩০% শিক্ষা খাতে এবং ২০% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়া জুলাই ৯, ২০১৫ তারিখে জারিকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০৪-এর মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর ব্যয়ের ১০% জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল খাতে ব্যয়ের পরামর্শ প্রদান করা হয়। জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৬/২০১৫-এর মাধ্যমে Social Projects I Community Investment-এর আওতায় আলাদাভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক কল্যাণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আয়ের উৎস সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম এবং অন্যান্যসহ মোট ৮টি খাতে সিএসআর ব্যয় হিসেবে প্রদর্শন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৩২৯]

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ২০২২ সালের ৯ জানুয়ারি জারি করা সিএসআরের নতুন নীতিমালা অনুযায়ী একটি ব্যাংক তার নিট মুনাফার ১ শতাংশ সিএসআর খাতে ব্যয় করবে। এর মধ্যে মোট সিএসআর বাজেটের মধ্যে শিক্ষা খাতে ৩০ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে ৩০ শতাংশ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন ও অভিযোজন খাতে ২০ শতাংশ ব্যয় করতে পারে। এ ছাড়া অবশিষ্ট ২০ শতাংশ আয়-উৎসারী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য খাতের আওতায় ব্যয়ের সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া একই বছরের ২৯ নভেম্বরে আরেক সার্কুলারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট তহবিলের আকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিএসআর খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৫ শতাংশ হারে অনুদান প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, সিএসআর ব্যয়ের লক্ষ্য পূরণে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, অবহেলিত প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ, অসহায়, হতদরিদ্র, পথশিশুদের জন্য ব্যয় করার ওপর জোর দিতে হবে। বাছাই প্রক্রিয়া কী হবে—তা বলে দেওয়া হয়েছে এবারের নীতিমালায়। এ ক্ষেত্রে যে খাতে ব্যয় হচ্ছে প্রথমে তার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে হবে; এরপর যাদের মাঝে দেওয়া হবে

---

৩২৯. *তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রমের ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন [জানুয়ারি-জুন ২০১৯]*, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃ. ১

তাদের বাছাই করতে হবে; কোন এলাকায় দেওয়া হবে সেটা ঠিক করতে হবে, কী পরিমাণ বিতরণ করা হবে—তাও ঠিক করতে হবে। আর এসব কিছুর তথ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখতে হবে।

আরও বলা হয়, সিএসআরের অর্থ সঠিক খাতে ব্যয় না হলে দায়বদ্ধ থাকবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এজন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করতে হবে। একইসঙ্গে যথাযথ খাতে ব্যয় হয়েছে কি না তা পরিদর্শন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। কোনো ব্যয়ে সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা বা দেশের বাইরে বিনোদনমূলক কাজে সিএসআরের টাকায় স্পন্সর হওয়া যাবে না। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাবসায়িক উন্নয়ন খরচ এখান থেকে করা যাবে না। আবার দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজে সামাজিক দায়বদ্ধতার টাকা খরচ করা যাবে না। এ ছাড়া পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, শিশুশ্রম, সামাজিক মূল্যবোধের জন্য হুমকি তৈরি করে—এমন খাতে সিএসআর করা যাবে না। এ ধরনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই মানি লন্ডারিং-সংক্রান্ত আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

দেশের ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) খাতে ব্যয়ের বড়ো অংশজুড়েই ছিল শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হতো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানে। সিএসআর ব্যয়ের ধরনে এখন বেশ পরিবর্তন এসেছে। বেশির ভাগই ব্যয় হচ্ছে 'অন্যান্য' খাতে; যার মধ্যে রয়েছে আয়-উৎসারী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ আরও বেশকিছু কর্মকাণ্ড। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, মোট সিএসআর ব্যয়ের প্রায় ৯৭ শতাংশই করেছে বেসরকারি ব্যাংকগুলো। এ খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ ১ শতাংশেরও অনেক কম। আর বিদেশি ব্যাংকগুলোর ব্যয়ও নামমাত্র। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো বরাবরই প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো ২০২১ সালের কর-পরবর্তী নিট মুনাফা থেকে ৬৩ কোটি টাকা এবং নিট মুনাফা ছাড়া কম্পেনসেশন রিয়েলাইজড এ/সি, যাকাত ফান্ড ও অন্যান্য উৎস থেকে খরচ করেছে ১৯২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, ২০২২ সালের শেষ ছয় মাসে সব ব্যাংক মিলে সিএসআর খাতে ব্যয় করেছে মোট ৫১৪ কোটি টাকা।

এর মধ্যে ইসলামী ধারার ১০ ব্যাংক মিলেই খরচ করেছে ২৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ, বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ৬১টি ব্যাংক মিলে সিএসআর খাতে ২০২২ সালের জুন-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে যে পরিমাণ খরচ করেছে, তার অর্ধেকই করেছে ইসলামী ধারার ১০ ব্যাংক। ২০২৩ সালে সিএসআর ব্যয়ের দিক থেকে শীর্ষস্থানে ছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। দেশের বৃহত্তম এ ব্যাংকটি গত বছর ৯৯ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয় করেছে এ খাতে। উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সিএসআর খাতে সর্বোচ্চ অর্থ ব্যয় করে আসছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেখানো ব্যয়ের বাইরেও এ খাতে ব্যাংকটি নিট মুনাফা ছাড়াও অন্য বিভিন্ন উৎস থেকেও অনেক অর্থ ব্যয় করে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের আওতায় সারা দেশে হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

সিএসআর খাতের টাকা ব্যয়ের ব্যাপারে অভিযোগ

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যাপারে একটা জোরালো অভিযোগ হলো, তারা এ খাতের অনেক অর্থ এমন বহু ক্ষেত্রে ব্যয় করছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর। এসব ক্ষেত্রে না কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা, না শরীয়তের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে সিএসআর খাতের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, অবহেলিত প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ, অসহায়, হতদরিদ্র, পথশিশুদের জন্য ব্যয় করার ওপর জোর দিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় এর একটি বড়ো অংশ কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশিমতো ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে এ খাতের লক্ষ্য স্পষ্ট ব্যাহত হয়।

যেমন—২০১১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. জাতীয় ক্রিকেট দলের অফিসিয়াল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত হয়েছিল দশ কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ অর্থ দিয়ে। ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসে এত বড়ো অঙ্কের অর্থ দিয়ে স্পন্সর হওয়ার ঘটনা এটিই ছিল প্রথম। এই দশ কোটি টাকা দিয়ে ঢাকার সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করেছে ক্রিকেট বোর্ড। শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব ক্ষেত্রে অর্থব্যয় যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। তদুপরি এতে সমাজের অসহায়-দরিদ্র মানুষের কোনো কল্যাণ নিহিত নেই।

আমরা মনে করি, এ খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার পাশাপাশি শরীয়া বোর্ডেরও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও বিধিবদ্ধ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এ খাতের বড়ো একটা অংশ অনেক সময় শরীয়ার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ও উৎপাদনশীল খাতের তুলনায় অপ্রয়োজনীয় ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং এ নিয়ে জনমনেও নানা প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে এবং হচ্ছেও।

৩. সুদি ও সন্দেহজনক আয়

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশি-বিদেশি বহু বিশেষজ্ঞ আলিম মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের বিপরীতে বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ক্ষতিপূরণ আরোপের পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোও মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় করে থাকে। তবে এ বাবদ গৃহীত অর্থ সুদের সংশয় থেকে মুক্ত নয় বলে তা সাধারণত ব্যাংকের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন উৎস থেকেও কিছু সুদ অর্জিত হয়ে থাকে, যা ব্যাংকের বৈধ আয় হিসেবে গণ্য করা হয় না।

সুদি আয়

আমাদের এ কথা বোঝা দরকার যে, দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি ইসলামী না হয়, তবে ব্যাংকব্যবস্থা শতভাগ ইসলামীকরণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আইন ও শাসন, বিচারব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান চালু থাকতে হবে, তবেই পুরোপুরি ইসলামী ব্যাংকিং আশা করা যায়। সুতরাং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা পুরোপুরি সুদমুক্ত করা সম্ভব নয়; আংশিক সম্ভব। পুরোপুরি ইসলামীকরণ করতে গেলে ব্যাংকব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেইসঙ্গে আইন ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের জানামতে, পরিপূর্ণ সুদমুক্ত এবং ইসলামী নিয়মানুসারে পরিচালিত কোনো ব্যাংক বর্তমান বিশ্বে নেই। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে যেসব হিসাবে সুদের লেনদেন হয়ে থাকে তা হলো—

ক. NOSTRO A/C[৩৩০]

বিদেশি ব্যাংকগুলোর সাথে ইসলামী ব্যাংকগুলোর যে Nostro Account থাকে সেখান থেকে চলতি হিসাব হলেও Overnight Lending-এর ভিত্তিতে তারা সুদ লাভ করে থাকে।

খ. FC (Foreign Currency) Clearing A/C

FC Clearing Account-এ জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রার ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদ দেয়।

গ. CRR (Cash Reserve Requirement) A/C[৩৩১]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাধ্যতামূলক সঞ্চিতি (CRR) ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদ দেয়।

সুদ ও সন্দেহজনক অর্থ ব্যয়ের খাত

সুদি ও সন্দেহজনক অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে শরীয়ার নীতিগত দৃষ্টি হচ্ছে, সন্দেহজনক অর্থ যদি স্টেট ব্যাংক/কেন্দ্রীয় ব্যাংক/সরকারি কোষাগার থেকে পাওয়া যায় এবং কোনো বাধ্যতামূলক উপায়ে সংশ্লিষ্ট উৎসকে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তা সংশ্লিষ্ট আয়ের বিপরীতে ইনকাম ট্যাক্স কিংবা

---

৩৩০. ইসলামী ব্যাংকগুলো যখন এলসি খোলে, এর বিপরীতে বিদেশি ব্যাংকের একাউন্টে ডলার ডিপোজিট দেখাতে হয়। সাধারণত আমেরিকার বড়ো ব্যাংকগুলোতে এ একাউন্টগুলো খোলা হয় (যেমন—জেপি মরগ্যান)। এ একাউন্টগুলোকে ইংরেজিতে নস্ট্রো (NOSTRO) একাউন্ট বলে। সাধারণত দেশি ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংক উভয়েরই নস্ট্রো একাউন্ট থাকে। নস্ট্রো একাউন্টে যেই ব্যাংকের ডলার ডিপোজিট যত বেশি, সেই ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোও নস্ট্রো একাউন্টে বড়ো অ্যামাউন্টের ডলার রাখে। স্বভাবতই নস্ট্রো একাউন্টে নিয়মিত সুদ আসে। কারণ, বিদেশি ব্যাংকগুলো ১০০% সুদি। সেই হিসেবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে হলে সুদের সাথে হাত মেলাতেই হয়।

৩৩১. Cash Reserve Requirement (CRR) হলো, কোনো একটি দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত একটি শতাংশ, যা মোট মেয়াদি ও তলবি বা চাহিবামাত্র দায়ের সমন্বয়ে গঠিত মোট আমানতের

সিভিল ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ পুনরায় উক্ত তহবিল পৌঁছে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাতে যেখানকার অর্থ সেখানে আবার চলে যেতে পারে। ট্যাক্স পরিশোধের পরও যদি কিছু অর্থ অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

অন্য যেসব উৎস থেকে সংশয়পূর্ণ উৎস ব্যাংকের হাতে এসে থাকে, তা কেবল দায়িত্বমুক্তির প্রত্যাশায় সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিম্নে সুদ ও সন্দেহজনক অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে এবং কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না—তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

❖ সুদ ও সন্দেহজনক অর্থ ব্যয়ের খাত

সুদ ও সন্দেহজনকভাবে অর্জিত আয়সমূহ নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে ব্যয়/ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই :

- প্রয়োজনীয় বৈদেশিক লেনদেনের বিপরীতে বিদেশি ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে সুদ প্রদান।
- জনকল্যাণমূলক কাজ।
- অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ।
- দরিদ্র মুসলিমদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন।
- স্থানীয় ও বিদেশি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে (ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে) চাঁদা প্রদান। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক হয় এবং ব্যাংককে বাধ্য হয়েই এটা প্রদান করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে এ জাতীয় আয় থেকে চাঁদা প্রদান করা যেতে পারে।
- কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় চাঁদা প্রদান। কেবল বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রেই এ খাত থেকে চাঁদা প্রদান করা যেতে পারে। একান্ত বাধ্য না হলে ব্যাংকের পক্ষে এরূপ চাঁদা প্রদান করাও জায়িয নয়।
- ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা ও অর্থনীতি প্রচারকল্পে বইপুস্তক/জার্নাল প্রকাশনার জন্য অনুদান প্রদান।

- সেমিনার/কনফারেন্স অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে চাঁদা প্রদান।
- ওইসব অর্থের ওপর ধার্যকৃত আয়কর ওইসব অর্থ থেকে প্রদান করা যাবে।

❖ সুদ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ যেসব খাতে বা কাজে ব্যয়/ব্যবহার করা যাবে না :

- মূলধনের পর্যাপ্ততা মেটানো।
- এসএলআর (স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিডি রিজার্ভ) সংরক্ষণ করা।
- ওইসব অর্থের ওপর ধার্যকৃত আয়কর ব্যতীত অন্যান্য আয়কর পরিশোধ করা। কারণ, হালাল আয়ের কর হারাম উপাদান দিয়ে পরিশোধ করা শরীয়াসম্মত নয়।
- ইসলামী ব্যাংকের প্রচারকাজ। উল্লেখ্য, এ কাজে হালাল ও পবিত্র অর্থ ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। শরীয়া লঙ্ঘনজনিত কারণে সন্দেহযুক্ত অর্থ দিয়ে বিজ্ঞাপন দান এবং একটি আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা চালানো শরীয়াসম্মত নয়।
- ব্যাংকের ব্যাবসায়িক জালিয়াতির ক্ষতিপূরণ করা।
- ব্যাংকের প্রশাসনিক খরচ মেটানো।[৩৩২]

সন্দেহযুক্ত আয় দিয়ে প্রভিশন করা

বিনিয়োগের বিপরীতে আদায়যোগ্য ও আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ (কম্পেনসেশন) দিয়ে প্রভিশন[৩৩৩] করা শরীয়া অনুমোদন করে না। উল্লেখ্য, ওয়াদীয়াহ চলতি

৩৩২. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল, পৃ. ৮৬-৮৮

৩৩৩. প্রভিশন : আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের একটি কার্যক্রম, যেখানে লাভের কিছু অংশ সরিয়ে রাখা হয়, যেন ভবিষ্যতে অর্থ বা সম্পদ খরচ হবে—এমন কোনো দায় পরিশোধ করা যায়। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে যে অর্থ বা সম্পদ খরচ হবে—তার সঠিক পরিমাণ অথবা সঠিক সময়কাল সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান ধারণা করতে পারে না; তবে খরচ যে হবে—এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান মোটামুটি নিশ্চিত থাকে।

ব্যাংকিং প্রভিশন হলো—ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতি। ব্যাংকের মুনাফা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত হারে দীর্ঘমেয়াদি কোনো বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়, যা গ্রাহকের আমানতের রক্ষাকবজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খেলাপি ঋণের ধরনভেদে প্রভিশন রাখা হয়।

হিসাব থেকে যে বিনিয়োগ করা হয় তার বিপরীতে ক্ষতিপূরণের অর্থের সাহায্যে প্রভিশন করা যাবে না। কেননা, ব্যাংক জমাকারীকে চাহিবামাত্র তার চলতি হিসাবের টাকা প্রদান করতে গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। মুদারাবা নীতিতে গৃহীত মূলধনের গ্যারান্টি দেওয়া শরীয়তে জায়িয নেই। সেজন্য সংশয়পূর্ণ আয় দিয়ে এ অবৈধ কাজের প্রভিশন করা যেতে পারে।

তবে ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার গাফলতি, ত্রুটি বা অব্যবস্থাপনা না থাকা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যেসব বিনিয়োগ শ্রেণিবিন্যাসিত হয়, শুধু ক্ষতিপূরণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সেসব বিনিয়োগের বিপরীতে প্রভিশন করা বৈধ। শ্রেণিবিন্যাসিত বিনিয়োগের বিপরীতে শরীয়া লঙ্ঘনজনিত কারণে সন্দেহযুক্ত আয় ও ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়ে প্রভিশন করা নীতিগতভাবে অনুমোদিত নয়। তাই ব্যাংকের বৈধ আয় দিয়েই শ্রেণিবিন্যাসিত বিনিয়োগের বিপরীতে প্রভিশন করতে হবে।

শরীয়া লঙ্ঘনজনিত কারণে গুরুতর সন্দেহযুক্ত আয় ও আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ দিয়ে প্রভিশন করা যাবে না। তবে ব্যাংকের বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে এ অর্থ দিয়ে প্রভিশন করা যেতে পারে। প্রয়োজন শেষে এ অর্থ যথাশীঘ্র সম্ভব তা জনকল্যাণে ব্যয় করতে হবে।[৩৩৪]

---

৩৩৪. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল, পৃ. ৮৫-৮৬

অধ্যায় : ৯

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় ব্যবস্থাপনা

ইসলামী ব্যাংকের আয়-উপার্জনের অন্যতম উৎস হলো বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়। এ উৎস থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্জন করে। বৈদেশিক বাণিজ্যকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— আমদানি ও রপ্তানি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এজন্য মানুষ বহু দূর দেশে ভ্রমণ করত। আধুনিককালে মানুষ নিজস্ব স্থানে বসেই বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় সক্ষম। আর তা সম্ভব হয়েছে মূলত ব্যাংকিং সেবার বদৌলতে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোও দেশের আমদানি-রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা নীতির অধীনে বৈদেশিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে, যেমন : আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন সেবা ও মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়। নিম্নে এসব ব্যবসায় ও সেবা সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকের অনুসৃত রীতি ও শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত করা হলো।

১. আমদানি বাণিজ্য (Import)

আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক তিনটি পদ্ধতিতে শরীয়াসম্মতভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে। যেমন—

ক. অংশীদারত্বের ভিত্তিতে আমদানি;

খ. নিজেই আমদানি করে গ্রাহকের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় ও

গ. গ্রাহককে আমদানিতে সহযোগিতা করে বা সেবা দিয়ে আয় অর্জন।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলোতেই কাজ করে থাকে।

নিজে আমদানি করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয়

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদানুসারে নিজে আমদানিকারক হিসেবে গ্রাহকের জন্য পণ্য আমদানি করে উক্ত পণ্যের আমদানি মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে এলসি[৩৩৫] খোলার পূর্বেই ব্যাংকের 'ওয়াদ বিশ শিরা' (ক্রয়-চুক্তি) সম্পন্ন হয়। উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে গ্রাহক পণ্য সরবরাহ নেওয়ার নিশ্চয়তা হিসেবে কিছু নগদ অর্থ জামানতস্বরূপ ব্যাংকের কাছে জমা রাখে। উক্ত জামানত এলসি মার্জিন হিসেবে পরিচিত। উক্ত জামানতপ্রাপ্তির পর এবং চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারীকে ফরমায়েশ তথা এলসি ইস্যু করে, পরবর্তী সময়ে পণ্য সরবরাহকারীগণ পণ্য সরবরাহ করলে ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে এবং জাহাজি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে মালের সরবরাহ গ্রহণ করে নিজস্ব দখলে এনে পরবর্তী সময়ে পূর্ব চুক্তি মোতাবেক গ্রাহকের নিকট তা বিক্রয় করে এবং এর মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তর করে। তবে পণ্যমূল্য গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পণ্যের দখলি-স্বত্ব ব্যাংক ধরে রাখতে পারে, আবার উপযুক্ত জামানত রেখে টিআর (Trust Receipt)-এর মাধ্যমে পণ্যের মালিকানার সাথে দখলও গ্রাহককে বুঝিয়ে দিতে পারে। যে ক্ষেত্রে পণ্যের দখলি-স্বত্ব ব্যাংক ধরে রাখে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক পণ্যমূল্য পরিশোধ করে পণ্য

---

৩৩৫. এলসি (Letter of Credit) : ক্রেতার (আবেদনকারী বা আদেশদাতা) অনুরোধে অথবা ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে কোনো ব্যাংক তথা ইস্যুকারী ব্যাংক বিক্রেতাকে তথা বেনিফিসিয়ারিকে লিখিতভাবে যে অঙ্গীকার দেয় তাকে দলিলসংবলিত ঋণপত্র বলেন। এ লিখিত অঙ্গীকারের উদ্দেশ্যে নির্দেশানুযায়ী দলিলপত্র দাখিলসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মালামালের মূল্য হিসেবে সীমিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নগদে অথবা স্বীকৃতি কিংবা বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে পরিশোধ করে। সংক্ষেপে, চুক্তির শর্তানুযায়ী দলিলপত্রের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকারকে Letter of Credit (দলিলসংবলিত ঋণপত্র) বলা হয়। একে Documentary Credit বলেও আখ্যায়িত করা হয়। এটি বিক্রেতার জন্য মূল্যপ্রাপ্তির একটি নিশ্চয়তাপত্র আর ক্রেতার জন্য একটি ঋণপত্র। মূলত এলসি হচ্ছে একটি নন ফান্ডেড ঋণব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ব্যাংক আপাতত কোনো ঋণ প্রদান করে না; তবে ভবিষ্যতে এলসির বিপরীতে দাবি উত্থাপন হলে তার মূল্য পরিশোধের জন্য সম্ভাব্য দায় বা কনটিনজেন্ট লায়াবিলিটি গ্রহণ করে এবং প্রকৃত দাবি উত্থাপন হলে তখন ঋণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

সরবরাহ গ্রহণ করে। আর যে ক্ষেত্রে টিআরের মাধ্যমে মালের দখল গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য বিক্রয় করে পণ্যমূল্য পরিশোধের সুযোগ পায়। এ পদ্ধতিটি 'মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট' (এমপিআই) হিসেবে পরিচিত।

এই পদ্ধতিতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়ে গ্রাহক নিজেও ব্যাংককে সহযোগিতা করতে পারে। যেমন : পণ্যের উৎস নির্বাচন, দর নির্ধারণ, পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে রপ্তানিকারকের সাথে সমঝোতায় পৌঁছে তার কাছ থেকে ব্যাংকের জন্য কোটেশন সংগ্রহ করে ব্যাংককে সরবরাহ করতে পারে। ব্যাংক গ্রাহকের দেওয়া তথ্যানুসারে উক্ত রপ্তানিকারক হতে পণ্য আমদানি করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যাবসা করার ক্ষেত্রে ব্যাংককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ব্যাংক হলো রপ্তানিকারকের পণ্যের প্রত্যক্ষ ক্রেতা এবং আমদানি-পরবর্তী সময়ে স্থানীয় গ্রহীতার কাছে পণ্যের বিক্রেতা।

উল্লেখ্য, এলসির অধীনে মুরাবাহা চুক্তিতে পণ্য আমদানি করা হলে প্রকৃত আমদানিকারক কত সময়ের মধ্যে পণ্যের ডেলিভারি নেবেন বা পণ্যের মূল্য প্রদান করবেন, তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে মুনাফা আদায় করা যেতে পারে। তবে একবার এই হার নির্ধারিত হয়ে গেলে তা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাবে না।

এলসিকৃত মালামাল দেশে আসার পর আমদানিকারক নগদে মালামাল ডেলিভারি নিতে ব্যর্থ হয়ে আবেদন করলে ব্যাংক আমদানিকারকের এ আবেদন মঞ্জুরসহ আমদানিকৃত পণ্য পোর্ট থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসবে। এ ক্ষেত্রে যা খরচাদি হয় তা পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করে তার ওপর প্রফিট মার্ক আপ করে মালামালের চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণপূর্বক ব্যাংক তা আমদানিকারকের নিকট বিক্রয় করবে। আমদানিকারক তার সুবিধামতো যথার্থ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বা পরবর্তী সময়ে পরিশোধের শর্তে ব্যাংক থেকে মালামাল ডেলিভারি নেবে।

যদি আমদানিকারক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যের ডেলিভারি নিতে বা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং সে ক্ষেত্রে ব্যাংক জামানত বাজেয়াপ্ত ও আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। জামানত ও পণ্যের

বিক্রয়মূল্য যদি ব্যাংকের পাওনা মেটানোর জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে চুক্তিতে থাকলে পাওনার অবশিষ্টাংশ আদায়ের জন্য ব্যাংক আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

আমদানিকৃত পণ্য শিপমেন্ট হলে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ব্যাংকে এসে পৌঁছালে আমদানিকারক কর্তৃক উক্ত পণ্য বিক্রয় করা জায়িয। কিন্তু পণ্যের কবজ সম্পন্ন হওয়ার আগে পরবর্তী ক্রেতা কারও কাছে উক্ত পণ্য বিক্রয় করতে পারবে না।

পণ্য আমদানির জন্য গ্রাহককে সেবা প্রদান

ব্যাংক স্থানীয় আমদানিকারকদেরকে আমদানির ক্ষেত্রে সেবাদানের মাধ্যমেও আয় করতে পারে। সাধারণত আমদানিকারকগণ দেশে থেকেই বৈদেশিক পণ্য আমদানি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সব থেকে বড়ো তা হলো—আমদানিকারকের পণ্যমূল্য পরিশোধ করার পর যথাযথভাবে পণ্য পাওয়ার অনিশ্চয়তা এবং রপ্তানিকারকের ঝুঁকি হলো—মূল্যপ্রাপ্তির পূর্বে পণ্য রপ্তানি করে তার মূল্যপ্রাপ্তির বিষয়ে অনিশ্চয়তা। উভয় পক্ষের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উভয় পক্ষই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংকের ওপর আস্থা স্থাপন করে এবং আমদানিকারকের পক্ষে পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য তার দেশীয় ব্যাংক রপ্তানিকারককে নিশ্চয়তাস্বরূপ এলসি প্রদান করে এবং রপ্তানিকারকের দেশীয় ব্যাংক উক্ত পণ্যমূল্য আদায়ে মধ্যস্থতা করে। সুতরাং পণ্য আমদানিকারকগণ নিজেরা পণ্য আমদানি করলেও ব্যাংকের সেবা তাদের গ্রহণ করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে এলসি খুলে থাকে।

উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সাধারণত দুটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। যথা—

ক. কফালাহ। ব্যাংক আমদানিকারককে এলসি প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে ব্যাংক বিক্রেতাকে ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যের বিনিময় পরিশোধের ব্যাপারে গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। শরীয়তের পরিভাষায় এটি 'কফালাহ' বলে গণ্য হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে 'কফীল' হিসেবে কোনো চার্জ/বিনিময় গ্রহণ করা সাধারণত বৈধ নয়।

খ. ওকালাহ। আমদানিকারকের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে এবং এ বাবদ সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। শরীয়তের পরিভাষায় এটি 'ওকালাহ' বলে গণ্য হয়। ওকালাহর দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ।

এলসি খোলার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কিছু বিষয় মেনে চলে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

ক. এলসি খোলার জন্য গ্রাহকের পক্ষ থেকে আবেদন করতে হয়। গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক নির্দিষ্ট পণ্য আমদানির জন্য এলসি খুলে। ইসলামী ব্যাংকে যা গ্রাহকের জন্য 'ওয়াদ বিল বাই' (পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার) হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

খ. যদি আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ব্যাংক পরিশোধ করে অর্থাৎ গ্রাহক যদি আমদানিকৃত মালের বিপরীতে বিনিয়োগ গ্রহণ করে তবে এলসি খোলার আগেই MPI (Murabaha Post Import)/ HPSM বা প্রযোজ্য কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত ফরমে গ্রাহক আবেদন করে। যেহেতু ব্যাংক নিজের নামে এলসি করতে পারে না, সেহেতু গ্রাহকের IRC (Import Registration Certificate) ব্যবহার করেই উক্ত গ্রাহকের জন্য পণ্য আমদানি করতে হয়। তাই ব্যাংক গ্রাহক থেকে Letter of Authorization নিয়ে এলসি পণ্য আমদানি করে।

গ. এলসিকৃত পণ্যের ব্যয়ভার গ্রাহক সম্পূর্ণ বহন করার চুক্তি করলে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ/উজরা বিল ওয়াকালাহ (ওকালাহ ফি) গ্রহণ করে।[৩৩৬]

ঘ. এলসির মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনো ফি/কমিশন নেবে না। তবে এ ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচ নেবে। এ ক্ষেত্রে এটি নির্দিষ্ট অংকের আকারে হবে; শতাংশে নয়।

এ পদ্ধতিতে এলসি খোলার প্রাক্কালে আমদানিকারক পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য ব্যাংকের নিকট জমা রাখে। এরূপ এলসিকে ফুল মার্জিন[৩৩৭] সমেত এলসি

---

৩৩৬. এ বিষয়ে AAOIFI-এর শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড-৩/৩/১ এ বলা হয়েছে :

"ঋণপত্র স্থাপনের (Issuing Documentary Credit) ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকৃত খরচ আদায় করা বৈধ। তা ছাড়া ঋণপত্র স্থাপনের (Issuing Documentary Credit) ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সেবাদানের জন্য ফি ধার্য করা যাবে এবং এ ধরনের ফি এককালীন থোক (Lump Sum) কিংবা ঋণের পরিমাণের (Credit Amount) একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হারেও হতে পারে; তবে শর্ত থাকে যে, সার্ভিস চার্জ/কমিশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রেডিটের সময়কে বিবেচনা করা যাবে না।

৩৩৭. অর্থাৎ, আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে এলসি খোলা।

বলা হয়। আমদানিকৃত পণ্য জাহাজিকরণের পর বা দেশে পৌঁছার পর অর্থাৎ পূর্বশর্ত মোতাবেক রপ্তানিকারক পণ্য সরবরাহের পর ব্যাংক গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ দ্বারা পণ্যমূল্য পরিশোধ করে। এখানে উল্লেখ্য, নিজস্ব পণ্য আমদানির জন্য গ্রাহককে পূর্বেই ১০০% মূল্য পরিশোধ করা নাও লাগতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এলসি খোলার প্রাক্কালে আংশিক মূল্য এবং অবশিষ্ট অংশ পণ্যমূল্য পরিশোধের পূর্বে ব্যাংকে জমা দিতে পারে।

উল্লেখ্য, গ্রাহক কর্তৃক পণ্য আমদানি করা হলে যেক্ষেত্রে গ্রাহক পণ্যমূল্য পরিশোধের পূর্বে অবশিষ্ট অংশ পরিশোধে ব্যর্থ হয় এবং ব্যাংক হতে ঋণ করে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত অর্থের ওপর কোনো অতিরিক্ত চার্জ বা মুনাফা চার্জ করতে পারে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে গ্রাহকই হলো মূল ক্রেতা এবং রপ্তানিকারক হলো বিক্রেতা আর ব্যাংক হলো সেবাদানকারী এবং পরবর্তী সময়ে গ্যারান্টর হিসেবে অর্থায়নকারী। ফলে এইরূপ অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক অতিরিক্ত চার্জ করতে পারে না। অবশ্য বর্তমানে অনেক ইসলামী ব্যাংকই গ্রাহক কর্তৃক আমদানিকৃত অর্থাৎ ক্যাশ রিটায়ারমেন্ট ভিত্তিতে ইস্যুকৃত এলসির বিপরীত আমদানিকৃত মালের ক্ষেত্রেও মুরাবাহা পদ্ধতিতে (এমপিআই) বাকিতে বিক্রয় করে থাকে। অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণত আমদানি বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও মধ্যস্থতা 'মুরাবাহা'-এর ভিত্তিতে করে থাকে। আমদানিকারক যে পণ্য আমদানি করার জন্য এলসি করতে আসে, ব্যাংক তার সাথে এই মর্মে চুক্তি করে যে, দ্রব্যটির ক্রেতা হিসেবে আমাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হোক। আমরা আপনার নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করে শতকরা ৫ টাকা বা ১০ টাকা লাভে আপনাকে সরবরাহ করব। আর এলসি প্রদান, প্রতিনিধিত্বকরণ, পুঁজি সরবরাহ ইত্যাদি যা-কিছুর প্রয়োজন হবে আমরা আমাদের দায়িত্বে তা সম্পাদন করব।

উল্লেখ্য, যদি মুরাবাহার শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রেখে এ ধরনের লেনদেন করা হয়, তাহলে আইনগত এতে কোনো সমস্যা থাকে না। তবে অনেক ফকীহ বিভিন্ন কারণে এ পদ্ধতিটি উত্তম মনে করেন না। যেমন—

ক. অনেক ক্ষেত্রে মুরাবাহার সব শর্ত পূর্ণ করে লেনদেন করা সম্ভব হয় না। আর কার্যত অনেক শর্ত পূর্ণও হয় না।

খ. এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের খরিদদার হওয়ার বিষয়টি নিছক সাজানো লৌকিকতা হয় মাত্র। কারণ, বাস্তবে আমদানিকারকের সাথে রপ্তানিকারকের চুক্তি

পূর্বাহ্নেই সম্পাদিত হয়ে যায় এবং সরকারি কাগজপত্রে খরিদদার হিসেবে আমদানিকারকই থাকেন। বিক্রেতাও ব্যাংককে খরিদদার মনে করে না; বরং আমদানিকারকেই খরিদদার মনে করে।

গ. মুরাবাহা চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য ব্যাংককে প্রথমে দ্রব্যটি হস্তগত করতে হবে। অতঃপর তা ক্রেতা অর্থাৎ আমদানিকারককে সমর্পণ করতে হবে। কার্যত অনেক ক্ষেত্রে এ শর্তটি মেনে চলা হয় না।

অনেক ফকীহই মনে করেন, এরূপ ক্যাশ এলসির মালামাল মুরাবাহার ভিত্তিতে বাকিতে বিক্রয় করা সঠিক নয়। কেননা, ক্যাশ এলসির ভিত্তিতে পণ্য আমদানি করে পরবর্তী সময়ে গ্রহীতা কর্তৃক পণ্যমূল্য পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে এমপিআই করা হলে দুটি যুক্তি প্রদর্শন করা হতে পারে—

ক. উক্ত পণ্যের রপ্তানিকারককে ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করে বিধায় উক্ত পণ্যের মালিকানা ব্যাংকের হয়। সুতরাং ব্যাংক তা গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করতে পারে। অথবা

খ. গ্রাহক আমদানিকারক হিসেবে আমদানি করে তার মালিকানা-স্বত্ব লাভ করে। সুতরাং ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করতে পারে। অপরদিকে কোনো পণ্যের বিক্রেতা পরবর্তী সময়ে ওই পণ্য ক্রেতার নিকট হতে ক্রয় করতে পারে। সুতরাং গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে উক্ত পণ্য বাকিতে ক্রয় করতে পারে।

অতএব, তাদের মতে নগদ এলসির মালও এমপিআই করা যায়। কিন্তু ফকীহগণ মনে করেন, উল্লিখিত কারণে মেয়াদের ভিত্তিতে মুরাবাহার মালামাল ওই গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করা যায় না। কারণ,

ক. মুরাবাহার ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুনাফার হার পূর্বেই নির্ধারণ করে চুক্তি করা হয় এবং বিক্রেতা তদপেক্ষা বেশি মুনাফা গ্রহণ করতে পারে না। আর যে ক্ষেত্রে মূল মূল্যের ওপরে বিক্রয় করার চুক্তি করা হয় অর্থাৎ ক্রয়মূল্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করার চুক্তি করা হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয়কে বলা হয় 'তাওলিয়া'। যেহেতু গ্রহীতা নগদে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে জাহাজ হতে পণ্য সরাসরি খালাস করার জন্য এলসি করে, সেহেতু এলসি খোলার প্রাক্কালে মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয় না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংককে আমদানিকারক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তা মুরাবাহার

পরিবর্তে 'তাওলিয়া' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, পরবর্তী সময়ে গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করে মাল খালাস নেওয়ার ব্যর্থতার কারণে মুনাফা প্রযুক্ত করে মুরাবাহা করার কোনো সুযোগ নেই।

খ. যখন ধরে নেওয়া হয়, ব্যাংক এলসি খোলার সুবাদে পণ্যমূল্য পরিশোধের বিষয়ে গ্যারান্টর, সে ক্ষেত্রে গ্রাহকই হলো পণ্যের প্রকৃত আমদানিকারক। সেহেতু আমদানিকারকের পক্ষে ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করলে তা ব্যাংকের নিকট আমদানিকারকের ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। ঋণের ওপর অতিরিক্ত গ্রহণ করা হলে তা সুদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। অপরদিকে যদি ধরে নেওয়া হয়, ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে নেবে এবং গ্রাহককে পরিশোধিত পণ্যমূল্য দ্বারা রপ্তানিকারকের পাওনা পরিশোধ করবে এবং ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে ক্রয়কৃত পণ্য পুনরায় গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করবে তবে তাও সঠিক হবে না। কেননা, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় 'বাই-এ ফাসিদ' হিসেবে গণ্য হবে। শরীয়তের মূলনীতি হলো, বেচাকেনায় এমন কোনো শর্তারোপ জায়িয নেই, যা মূল বেচাকেনার পরিপন্থি। ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে যদি এ শর্তে পণ্য ক্রয় করে যে, গ্রাহক পুনরায় তা ব্যাংকের নিকট হতে অধিক মূল্যে ক্রয় করে নেবে, তবে পুনঃবিক্রির এই শর্ত একটি ফাসিদ বা হারাম শর্ত। সুতরাং এ জাতীয় বেচাকেনা বৈধ নয়।

সুতরাং নগদভিত্তিক এলসির ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গ্রহীতাই আমদানিকারক বা ক্রেতা হিসেবে পণ্য আমদানি করে অথবা ব্যাংক আমদানিকারক হলেও প্রথম হতে মুনাফা ধরা হয় না, সেহেতু আমদানির পর গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের ব্যর্থতার কারণে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক হতে পণ্য ক্রয় করে পুনঃবিক্রয় বা তাওলিয়ার পরিবর্তে মুরাবাহা করা সঠিক নয়।

কোনো কোনো ফকীহের মত হলো—এ ক্ষেত্রে মুরাবাহার বিকল্প হিসেবে শিরকত কিংবা মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যদি এলসি জিরো মার্জিনে[৩৩৮] করা হয়, তাহলে মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হবে পুঁজির মালিক আর আমদানিকারক হবেন কারবারি। যদি

---

৩৩৮. অর্থাৎ, আমদানিকারক এলসি খোলার সময় কোনো টাকা পরিশোধ না করে পণ্য হাতে আসার পর কিংবা পূর্বনির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর টাকা পরিশোধ করে।

ফুল মার্জিন এলসি হয়, তাহলে আমদানিকারক হবেন পুঁজির জোগানদাতা আর ব্যাংক হবে কারবারি। যদি আংশিক মার্জিনে[৩৩৯] এলসি হয়, তাহলে মুশারাকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। আমদানির পর পণ্য বিক্রি করে যে লভ্যাংশ আসবে তা পূর্ণ নির্ধারিত হারে বণ্টন করে নেওয়া হবে। এই চুক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেমন ৬ মাস বা এক বছরের জন্যও করা যেতে পারে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব পণ্য বিক্রি না হয়, তাহলে ব্যাংক তার কারবারের অংশ আমদানিকারকের কাছে বিক্রি করে দেবে। উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে দরদাম নির্ধারণ করা হবে।

২. রপ্তানি বাণিজ্য (Export)

রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাংকের ভূমিকা অপরিহার্য। কেননা, রপ্তানিকারকের পণ্যের মূল্য এলসি প্রদানকারী ব্যাংক থেকে আদায় করার জন্য স্থানীয় ব্যাংকের ওপর নির্ভর করতে হয়। ব্যাংক এ ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন করে রপ্তানিকারকের পণ্য মূল্য আদায়ে সহযোগিতা করে। তা ছাড়া বৈদেশিক পত্র যোগাযোগসহ বিভিন্ন শর্তের পরিপালনও ব্যাংক নিশ্চিত করে সঠিকভাবে পণ্য রপ্তানিতে সহযোগিতা করে। এভাবে সেবাদানের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানি বাণিজ্য হতেও আয় করে থাকে।

রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত দুটি দায়িত্ব পালন করে। যথা—

ক. রপ্তানিকারকের পক্ষে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে এবং এজন্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে ওকালতের দায়িত্ব পালনের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ, তাই এতে কোনো অসুবিধা নেই।

খ. রপ্তানিকারককে ঋণ দিয়ে ঋণের বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করে। এই ঋণ সাধারণত দু-ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

খ.১. রপ্তানিকারককে পণ্য ক্রয় করে আমদানিকারকের বরাবরে প্রেরণের জন্য ঋণদান, যাকে ব্যাংকিং পরিভাষায় Pre Shipment Financing বলা হয়।

---

৩৩৯. অর্থাৎ, আংশিক মার্জিন এলসি খোলার সময় আংশিক মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া; বাকি টাকা পণ্য পৌঁছার পর পরিশোধ করা।

খ.২. পণ্য প্রেরণের পর আমদানিকারক থেকে পাওনা আদায় হয়ে আসার পূর্বে রপ্তানিকারকের টাকার প্রয়োজন হলে তাকে ঋণ দান, যাকে ব্যাংকিং পরিভাষায় Post Shipment Financing বলা হয়।

প্রথম প্রকার ঋণদানের ক্ষেত্রে রপ্তানি দ্রব্যের প্যাকিং ও শিপমেন্টের বিপরীতে Export L/C মূল্যের ১০%-১৫% নগদ অর্থ প্রদানের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক নগদ অর্থ প্রদান করে তার বিপরীতে কোনো লভ্যাংশ আদায় করতে পারে না। তাই ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিবদ্ধ হওয়ায় এ ক্ষেত্রে মুশারাকা/বাইয়ে সালাম/বাইয়ে ইসতিসনা পদ্ধতিতে রপ্তানি গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ঋণদানের প্রক্রিয়া সাধারণত এভাবে হয়ে থাকে যে, রপ্তানিকারক চুক্তি মোতাবেক পণ্যের মূল্যের যে বিল তৈরি করে সেটি ডিসকাউন্টে ব্যাংককে দিয়ে দেয়। ব্যাংক ডিসকাউন্ট করার পর যত টাকা অবশিষ্ট থাকে তত টাকা রপ্তানিকারককে দিয়ে দেয়। পরে যথাসময়ে ব্যাংক আমদানিকারক থেকে বিলের পূর্ণ টাকা আদায় করে নেয়। ফলে ব্যাংকের লাভ হয়। তবে ডিসকাউন্টের পরিমাণ কত হবে—তা বিলের মেয়াদ পূর্ণ হতে যতদিন বিলম্ব থাকে তার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

প্রি-শিপমেন্ট ফিন্যান্সিং : শরীয়া নীতি

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রি-শিপমেন্ট বিনিয়োগের দুটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা—

ক. অনেক ইসলামী ব্যাংক এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত রপ্তানির জন্য যে দ্রব্য প্রস্তুত করা হবে তা আগাম ক্রয় (সালাম/ইসতিসনা) করে ফেলে। রপ্তানিকারক আমদানিকারককে যে মূল্যে দ্রব্য সরবরাহ করবে বলে চুক্তি হয়েছে তার চেয়ে কিছু কম মূল্যে ব্যাংক তা ক্রয় করে নেয়। অতঃপর ব্যাংক ওই দ্রব্য আমদানিকারককে পূর্বনির্ধারিত মূল্যে (যা রপ্তানিকারকের সাথে ধার্য হয়েছিল) সরবরাহ করে। এতে ব্যাংকের লাভ হয়। এ পদ্ধতিতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। যথা—

ক.১. অনেক ক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয়ের যেসব শর্ত শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপ করা হয়েছে তা পূর্ণ করা হয় না বা করা সম্ভব হয় না।

ক.২. ব্যাংক ও রপ্তানিকারকের মাঝে যে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তা অনেকটা সাজানো ও লৌকিকতার মতো। কারণ, সরকারি কাগজপত্রে ব্যাংককে মূল রপ্তানিকারক হিসেবে গণ্য করা হয় না। তা ছাড়া রপ্তানি বাণিজ্যের যেসব সুযোগ-সুবিধা সরকারিভাবে প্রদান করা হয় তা ব্যাংক পায় না; মূল রপ্তানিকারকই লাভ করে। আমদানিকারক ও মূল রপ্তানিকারককে বিক্রেতা বলে গণ্য করে; ব্যাংককে নয়।

এজন্য সরবরাহকৃত পণ্যে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবি মূল রপ্তানিকারকের কাছেই জানানো হয়; ব্যাংকের কাছে জানানো হয় না। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, রপ্তানিকারক ও ব্যাংকের মাঝে যে বেচাকেনা হয় তা অনেকটা লৌকিক পর্যায়ের; বাস্তবভিত্তিক নয়। এজন্যই অনেক ফকীহ এটি পছন্দনীয় নয় বলে মনে করেন।

খ. এ ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হলো—মুদারাবা কিংবা শিরকতের পদ্ধতি অবলম্বন করা। যদি রপ্তানিকারক নিজে কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে, তাহলে মুশারাকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। যদি সে কোনো পুঁজিই বিনিয়োগ না করে থাকে তাহলে মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি সমস্যা এই থাকে যে, আমদানিকারকের প্রার্থিত গুণ ও মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ না করার কারণে যদি আমদানিকারক পণ্য গ্রহণ না করে ফেরত পাঠায়, তাহলে যে ক্ষতি হবে রব্বুল মাল হিসেবে তার দায়ভার ব্যাংককেও বহন করতে হবে। এ সমস্যা নিরসনের জন্য মুদারাবার যে চুক্তি ব্যাংক ও রপ্তানিকারককে অবশ্যই আমদানিকারকের কাঙ্ক্ষিত গুণ ও মানসম্পন্ন পণ্য প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় ব্যাংক এর দায়ভার বহন করবে না। এ শর্ত আরোপ করার কারণে ব্যাংক এরূপ ক্ষতির দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে মুদারাবা কিংবা শিরকতের পদ্ধতি অবলম্বন করে ঝুঁকিহীন লাভ করা যায় এবং লভ্যাংশ কত হতে পারে—তা পূর্বাহ্নেই অনুমান করা যায়।

পোস্ট শিপমেন্ট ফিন্যান্সিং : শরীয়ানীতি

ইসলামী ব্যাংকগুলো পোস্ট শিপমেন্টে অর্থায়ন দুভাবে করে থাকে। যথা—

ক. IBP (Inland Bill Purchase)

১. Bill-টি বিদেশি মুদ্রায় হলে At sight/Usanse Rate অনুযায়ী ক্রয় করে বিলের বিপরীতে ক্রয়মূল্য হিসাবে টাকা দেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে Exchange Gain-ই লভ্যাংশ হিসেবে ধর্তব্য হবে।

২. Inland Bill-টি দেশীয় মুদ্রায় হলে তা টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বিলটি লিয়েন করে তার বিপরীতে কর্জ দিতে হবে। আর বিলটি কালেকশন করে ওয়াকিল হিসাবে ওকালাত ফি (উজরাত বিল ওকালাহ্) নিতে পারবে। তবে ওকালাত ফি গ্রাহক ও ব্যাংকের উভয়ের সম্মতিতে হতে হবে। এ প্রসঙ্গে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. কর্জের বিপরীতে At Actual Service Charge নেওয়া যাবে।

খ. FBP/FBN (Foreign Bill Purchase/Negotiation)

১. Foreign Bill ক্রয় করে তার বিপরীতে নগদ টাকা প্রদান করা যাবে। কেননা, দুটি ভিন্ন মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই।

২. Foreign Bill Purchase-এ Spot Buying OD (On-Demand) Sight Export Bill Rate অনুযায়ী বিল ক্রয় করে গ্রাহককে ক্রয়মূল্য হিসাবে টাকা দেওয়া যাবে।

৩. বৈদেশিক মুদ্রা/ডলারের মূল্য হ্রাসে বিলের বিপরীতে লোকসান হলে ব্যাংককেই তা বহন করতে হবে। কেননা, পূর্বেই মূল্য নির্ধারণ করে বিলটি ক্রয় করা হয়েছে। গ্রাহক থেকে তা আদায় করা যাবে না।

৪. প্রয়োজনে গ্রাহকের সম্মতিতে অন্য বিল কম রেটে ক্রয় করে ব্যাংকের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে এটি প্রশ্নসাপেক্ষ।

উল্লেখ্য, শিপমেন্টের পর রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ বাবদ অর্থ বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়ার সর্বসম্মত বৈধ কোনো বিকল্প পদ্ধতি অদ্যাবধি বের হয়ে আসেনি। কেননা, এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে রপ্তানিকারকের যে লেনদেন হয় তা মূলত মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার লেনদেন, যাতে সমতা রক্ষা করা

অপরিহার্য এবং নগদানগদি লেনদেন করতে হয়। অথচ ডিসকাউন্ট করে বিলের পরিবর্তে টাকা নিয়ে নিলে দুটি শর্তই লঙ্ঘিত হয়। অবশ্য অনেক ফকীহ এটিকে বৈধ করার জন্য এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, ব্যাংককে যদি আমদানিকারক থেকে বিলের টাকা আদায় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় এবং সেই বাবদ তাকে মজুরি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় আর অবশিষ্ট টাকা রপ্তানিকারক ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নেয়, পরে যখন ব্যাংক আমদানিকারক থেকে বিলের টাকা আদায় করে আনবে, তখন তার পারিশ্রমিক বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা কেটে রেখে অবশিষ্ট টাকা রপ্তানিকারককে হস্তান্তর করে তৎক্ষণাৎ তার কাছে থেকে ঋণের টাকা আদায় করে নেওয়া হলে তা বৈধ হবে।

কিন্তু এই পদ্ধতিটি প্রশ্নাতীত নয়। কেননা, রপ্তানিকারকের ব্যাংকে Negotiating Bank হিসেবে আমদানিকারক থেকে টাকা আদায় করার দায়িত্ব পূর্ব থেকেই দেওয়া আছে এবং এ বাবদ তাকে সার্ভিস চার্জও প্রদান করা হয়েছে। ঋণ নেওয়ার পর পুনরায় আমদানিকারক থেকে পাওনা টাকা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়ার কোনো মানে হয় না এবং এ বাবদ প্রদত্ত টাকাকে পারিশ্রমিক হিসেবে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি বরং সুদকে বৈধ করার জন্য অহেতুক একটি চালবাজি মাত্র, যা কোনোভাবেই বৈধ হবে না।

মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল (এমডিবি)

বর্তমানে কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের ইনল্যান্ড বিল পারচেজ (IBP) পদ্ধতির পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্টারি বিল পদ্ধতি অনুশীলন করে, যা রপ্তানি-পরবর্তী অর্থায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়। ইস্যুকারী ব্যাংকের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পর শাখা গ্রাহকের অনুকূলে মুশারাকা বিনিয়োগ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুশারাকা ডিলে গ্রাহকের আনুপাতিক অংশীদারত্ব ও লভ্যাংশের অনুপাত চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

রপ্তানি পণ্য জাহাজিকরণ-পরবর্তী (পোস্ট শিপমেন্ট) পর্যায়ে যখন গ্রাহক (রপ্তানিকারক) মালামাল তৈরি করে জাহাজিকরণ সম্পন্ন করার পর ব্যাংকে এক্সপোর্ট বিলের অর্থ পাওয়ার জন্য বিল জমা দেবেন, তখন ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিলের পরিবহন ব্যয়, জাহাজ ভাড়া, ফ্যাক্টরি ভাড়া ও শ্রমিকের বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন ব্যাবসায়িক দেনা মেটানোর উদ্দেশ্যে গ্রাহক বিনিয়োগের জন্য আবেদন

করেন। তিনি তার ব্যাবসার শেষ প্রান্তে এসে ব্যাংককে তাতে শরীক হওয়ার প্রস্তাব করলে ব্যাংক তাতে শরীক হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মুশারাকা ডিল/চুক্তিতে গ্রাহকের অংশীদারত্ব ও লভ্যাংশের অনুপাত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এটি কারও চলমান ব্যবসায়ে কাউকে শরীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে তুলনীয়। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পালন করতে হবে :

১. বিল আদায়ের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি থাকে অংশীদার হিসেবে ব্যাংক তা বহন করতে সম্মত হবে।

২. ব্যাংকের ইক্যুইটি রপ্তানিকৃত মালামাল তৈরি ও রপ্তানি করতে যেসব খরচ হয় সংশ্লিষ্ট ব্যাবসার সেসব খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৩. মুশারাকার অন্যান্য সাধারণ নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই অর্থাৎ এলসিপ্রাপ্তির সময়েই মুশারাকা চুক্তি করে নেওয়া সর্বোত্তম এবং মুশারাকার শারয়ী নীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাংক প্রথমেই গ্রাহকের সাথে মুশারাকা চুক্তি করে রাখার চেষ্টা করবে এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন তা কার্যকর করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ব্যাবসার শেষ প্রান্তে গিয়ে ব্যাংক যখন তহবিল (ইক্যুইটি) দেয়, তখন মুশারাকা চুক্তি করলেও চলবে। তবে ব্যাংক প্রথম থেকে চুক্তি করার বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে।[৩৪০]

আমদানি ও রপ্তানি-সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় : পর্যালোচনা

ক. এলসি-সংক্রান্ত

১. এলসি ও এলটমেন্টের বেলায় অথরাইজেশন না নেওয়া

এলসি খোলার জন্য আইআরসি (Import Registration Certificate) ও এলটমেন্টপত্র থাকে গ্রাহকের নামে। এ ক্ষেত্রে মাল আমদানি করলে বা এলটমেন্টের বিপরীতে মালামাল ক্রয় করলে মালের মালিক হন গ্রাহক নিজে। এ অবস্থায় মালামাল আবার গ্রাহকের কাছেই বিক্রি করা শরীয়াসম্মত নয়।

---

৩৪০. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল, পৃ. ৬৬-৬৭

এসব ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে অথরাইজেশন নিয়ে ব্যাংক মালামাল নিজে আমদানি করবে এবং এলটমেন্টের মালের মালিক হবে এবং পরবর্তীকালে তা বিক্রি করবে, তা না হলে শরীয়াসম্মত হবে না।

২. এলসির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে মুনাফা ধার্য করা

ক্রয়-বিক্রয় শরীয়াসম্মত হওয়ার জন্য মালের ওপর মুনাফা একবারই ধার্য করা যেতে পারে। সময় বা অন্য কিছুর কারণে তার বিক্রয়মূল্য পরিবর্তন করা যাবে না। এলসির ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় একবার এবং পরবর্তী সময় কাস্টমস ডিউটি বা অন্যান্য খরচের সময় পুনরায় মুনাফা ধার্য করলে তা শরীয়াসম্মত হবে না। কারণ, দ্রব্যমূল্য একবার নির্ধারণ করার পর তা পুনরায় বাড়ানো যায় না।

খ. রপ্তানির বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় Export Development Fund (EDF) গ্রহণ

রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল আমদানির জন্য রপ্তানিকারক যে Back to Back L/C খোলে, সে ক্ষেত্রে অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় রপ্তানিকারকদের Export Development Fund (EDF) প্রদান করে থাকে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যে প্রক্রিয়ায় Export Development Fund গ্রহণ করে, তা শরীয়া নীতিমালার পরিপন্থি। এ ক্ষেত্রে শরীয়াসম্মত পন্থা হলো—ইসলামী ব্যাংকসমূহ Mudaraba নীতিমালায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে Export Development Fund গ্রহণ করতে পারবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের পারস্পরিক সম্মতিতে লাভ ভাগাভাগির অংশীদারত্বে Restricted Mudaraba নীতিমালায় Export Development Fund গ্রহণ করতে পারে।

গ. রপ্তানির বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় ক্যাশ ইনসেনটিভ (নগদ উৎসাহ)-এর বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান

কোনো কোনো সরকার কতিপয় নির্দিষ্ট পণ্য যেমন—তৈরি পোশাক, হিমায়িত মাছ, কৃষিভিত্তিক পণ্য ইত্যাদি সামগ্রীর রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়

প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনকারীর প্রাপ্য ক্যাশ ইনসেনটিভের পরিমাণের ৭৫% পর্যন্ত নগদ সুবিধা অগ্রিম সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক গ্রাহককে প্রচলিত মুনাফার হারে তার প্রাপ্য পরিমাণের ৭৫% পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করে আসছে। ইসলামী ব্যাংক ক্যাশ ইনসেনটিভের বিপরীতে নিম্নোক্ত শারয়ী নীতিমালায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে :

১. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দেয় ক্যাশ ইনসেনটিভ-এর বিপরীতে মুশারাকা অথবা মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যাবে।

২. ক্যাশ ইনসেনটিভকে জামানত হিসেবে রেখে কেস টু কেস পর্যালোচনাপূর্বক বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি প্রযোজ্য বিনিয়োগ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ নীতিমালা অনুসরণ করে বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দেয় ক্যাশ ইনসেনটিভ-এর বিপরীতে কর্জ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বছরে কর্জের জন্য প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জ আরোপ করতে পারবে।[৩৪১]

উল্লেখ্য, রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকগুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে থাকে, যাতে সাধারণ ব্যাংকগুলোও রপ্তানিকারকদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ দিতে পারে। এটি অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কোনো কোনো রাষ্ট্রের স্টেট ব্যাংক সরাসরি ঋণ না দিয়ে ব্যাংকের নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে দেয় এবং ট্রেজারি বিলের হিসাবে এ টাকা সাধারণ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা থাকে। এর বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংককে ১৩% বা ১৪% লাভ দিয়ে থাকে। এই লভ্যাংশ সাধারণ ব্যাংকগুলোর জন্য বৈধ হয়ে যাবে। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে ঋণ বলে উল্লেখ করলেও বাস্তবে এখানে ঋণের কোনো লেনদেন হয়নি। সুতরাং ১৩% অথবা ১৪% হারে প্রদত্ত টাকাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে এই লভ্যাংশ অর্জনের জন্য সাধারণ ব্যাংকগুলোকে ৫% হারে

---

৩৪১. *শরীয়া ম্যানুয়াল*, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

বা এ ধরনের অন্য কোনো হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুদ দিতে হয়। এটিও বাহ্যিকভাবে অতিরিক্ত প্রদানজনিত সুদ বলে গণ্য হবে।

এ ক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংককে প্রদেয় লভ্যাংশ থেকে ওই ৫% কর্তন করে রেখে বাকি অংশ প্রদান করে, তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংককে যে পরিমাণ ঋণ দেয়, তাকে রপ্তানি বাণিজ্য গতিশীল করার লক্ষ্যে পুরস্কার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। আর যে টাকা পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে তার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার অধিকার পুরস্কারদাতার রয়েছে। সুতরাং ১৩% লাভ না দিয়ে ওই ৫% কমিয়ে যদি ৮% সাধারণ ব্যাংককে দেওয়া হয়, তাহলে তা সাধারণ ব্যাংকের জন্য বৈধ হয়ে যাবে।

তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো—রপ্তানি খাতের ঋণ সাধারণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান না করে সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রদান করা। কেননা, রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে দেশের সব অঞ্চলের মানুষ জড়িত থাকে না। সাধারণত রাজধানী, কেন্দ্রীয় নগরী ও বন্দর নগরীসমূহে অবস্থানরত লোকেরাই রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকে। আর এ ধরনের নগরগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা থাকে। তা না থাকলে একটি করে শাখা অফিস খুলে নিলেই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হবে।

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক FC Clearing A/C ও Nostro A/C-এ প্রাপ্ত সুদ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ব্যাংক বিদেশি ব্যাংকে যে Foreign Currency অ্যাকাউন্ট খোলে তাকে Nostro A/C বলে।

ইসলামী ব্যাংকগুলো বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় Nostro A/C পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে FC Clearing A/C পরিচালনা করছে। যাবতীয় বৈদেশিক Payment-এর জন্য এসব Nostro A/C-এ সর্বদা নির্দিষ্ট ক্রেডিট ব্যালেন্স রাখতে হয়। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হিসাবসমূহে ক্রেডিট ব্যালেন্সের ওপর মাসিক ভিত্তিতে Overnight বিনিয়োগের বিপরীতে Daily Product অনুযায়ী সুদ (Interest) প্রদান করা হয়, তেমনি বাংলাদেশ ব্যাংক FC Clearing A/C-এ ক্রেডিট ব্যালেন্সের

ওপর সুদ প্রদান করে। এ দুটি খাত হতে প্রাপ্ত সুদ ব্যাংকের আয় খাতে না নিয়ে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া শরীয়া নির্ধারিত খাতে খরচের জন্য ব্যাংকের সাদাকা তহবিল/ব্যাংক ফাউন্ডেশন A/C-এ প্রেরণ করা হয়।

আবার উক্ত হিসাবসমূহে সর্বদা পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকলেও অনেক সময় জরুরি প্রয়োজনে ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটকালে কখনও ডেবিট ব্যালেন্স হয়ে পড়ে। তখন এ ডেবিট ব্যালেন্সের বিপরীতে চার্জকৃত সুদ (Charged Interest) দিতে হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে Nostro A/C কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক FC Clearing A/C-এ ডেবিট ব্যালেন্সের বিপরীতে বাধ্য হয়ে সুদ দিতে হলে ব্যাংকের ইনকাম থেকেই দেওয়া উচিত। যেহেতু সুদ গ্রহণ হারাম; কিন্তু অপারগতাবশত এমন অবস্থায় ক্রেডিট ব্যালেন্স থেকে প্রাপ্ত সুদ দ্বারা ডেবিট ব্যালেন্সের কারণে সৃষ্ট সুদ পরিশোধ করা যায়।

ঙ. Baim Wes Bill ক্রিয়েট করে Back to Back L/C-এর টাকা পরিশোধ

ব্যাংক Master L/C-এর বিপরীতে Back to Back L/C করে থাকে। Master L/C-Gi Payment proceed আসতে দেরি হলে এবং ইতোমধ্যে Back to Back L/C-এর বিপরীতে স্বীকৃত বিলের Maturity হয়ে গেলে ব্যাংক Baim Wes Bill ক্রিয়েট করে Back to Back L/C-এর টাকা পরিশোধ করে। এটা বৈধ নয়। কারণ, Baim Wes Bill হলো বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ পদ্ধতি। তাই পণ্য ক্রয়বিহীন Baim Wes Bill ক্রিয়েট করে Back to Back L/C-এর টাকা পরিশোধ করা যাবে না। প্রয়োজনে কর্জ (QBB-Quard against Back to Back L/C) দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কর্জের বিপরীতে শুধু সার্ভিস চার্জ নেওয়া যাবে।

চ. Bill of exchange-এর ক্ষেত্রে discount (ছাড়) দেওয়া

ব্যাংকগুলো বিল বাট্টাকরণ ও মুদ্রা বিনিময়ের কাজও আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এজন্য যদি সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে। কিন্তু আজকাল সাধারণত ক্রেতা কর্তৃক এনডোর্সমেন্টের পর বিলগুলো ডিসকাউন্টে বিক্রি করা হয়। ব্যাংক পরে নির্ধারিত তারিখে ক্রেতা থেকে পূর্ণ টাকা আদায় করে নেয়, এটি যেহেতু মুদ্রার লেনদেন তাই এ পদ্ধতিতে বেচাকেনা বৈধ হবে না। তবে এনডোর্সমেন্টকৃত বিলের টাকা যথাসময়ে ক্রেতা থেকে আদায় করে দেওয়ার

দায়িত্ব যদি ব্যাংক নিয়ে নেয় এবং এ বাবদ যদি ব্যাংক সার্ভিস চার্জ দাবি করে আর বিলের মালিককে সার্ভিস চার্জ বাদে অবশিষ্ট টাকা ঋণ দিয়ে দেয় এবং ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে যদি নির্ধারিত তারিখ আসার পূর্ব পর্যন্ত বিলটি বন্ধকি হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয়; অতঃপর নির্ধারিত তারিখ আসলে ক্রেতার কাছ থেকে টাকা আদায় করে বিলের মালিককে তা হস্তান্তর করার পর তৎক্ষণাৎ যদি ঋণের টাকা আদায় করে নেয়, তাহলে তা বৈধ হবে।

Bill of exchange-এর ক্ষেত্রে discount (ছাড়) দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের জন্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে AAOIFI শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড-এ বলা হয়েছে—

> It is not permissible for the institution to discount accepted bills of exchange, i.e. to purchase these bills before maturity at less than their nominal value.[৩৪২]
>
> Bill of exchange-এর ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূল্যে গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানের জন্য বৈধ নয়; অর্থাৎ বিলগুলো মেয়াদপূর্তির আগে nominal value-এর চেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করা বৈধ নয়।

৩৪২. AAOIFI, *Shariah Standard*, 14

অধ্যায় : ১০

বিবিধ ফি ও চার্জ

ব্যাংক গ্রাহকদের নানা ধরনের সেবা প্রদান করে এবং এ সেবাগুলোর জন্য সাধারণত কিছু চার্জ/ফি/কমিশন প্রযোজ্য করে। এটি ব্যাংকের আয়ের একটি বড়ো উৎস। ব্যাংকের এ সকল সেবার মধ্যে টিটি, ডিডি ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈদেশিক অর্থ স্থানান্তর, পে-অর্ডার, ব্যাংক গ্যারান্টি, স্থানীয় লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকের পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান, গ্রাহকের পক্ষে তার পাওনাদার, কর্মচারীদের পাওনা/বেতন প্রদান, গ্রাহকের পক্ষে তার পাওনাদারদের হতে পাওনা আদায়, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়, সরকারি সেবাদানকারী সংস্থা যেমন : বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ওয়াসা ইত্যাদির পাওনা আদায়, লকার ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে গ্রাহকের মূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১০ জুন ২০২১ একটি নির্দেশনা জারি করে। এখানে ব্যাংক কর্তৃক নানা সেবার[৩৪৩] জন্য আরোপিতব্য চার্জ/ফি/কমিশন এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ব্যাংকগুলো এ নির্দেশনা অনুসারে গ্রাহকদের থেকে চার্জ/ফি/কমিশন গ্রহণ করে থাকে।[৩৪৪] ইসলামী ব্যাংকগুলোও তাদের নানা সেবার জন্য উপর্যুক্ত নিয়মে বিভিন্ন চার্জ/ফি/কমিশন আদায় করে।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু গ্রাহকদের থেকে বকেয়া পাওনার ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করতে পারে না, তাই উপর্যুক্ত নির্দেশনার বাইরেও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনে নানা চার্জ/ফি আরোপ করতে হয়। যেমন—বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল ও ঋণ প্রভৃতিতে দায় বিলম্বে পরিশোধের জন্য সার্ভিস চার্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

৩৪৩. যেমন—আমানত-সংক্রান্ত, ঋণপ্রদান-সংক্রান্ত, স্থানীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য/রেমিট্যান্স-সংক্রান্ত, হিসাব-সংক্রান্ত ও বিবিধ।

৩৪৪. দ্র. https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/jun102021brpd11.pdf

১. দেনা বিলম্বে পরিশোধের জন্য সার্ভিস চার্জ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দেনা বা ঋণ বিলম্বে পরিশোধের জন্য গ্রাহকদের নিকট থেকে শরীয়তে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা বৈধ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে যদি ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো খরচের ব্যাপার থাকে, তাহলে ব্যাংক গ্রাহকদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারবে; তবে তা প্রকৃত প্রত্যক্ষ ব্যয়ের (At Actual) ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

উল্লেখ্য, মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে ঋণ প্রদান ও আদায় করে থাকে, সেজন্য সাধারণত কোনো খরচের প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, ভবনের ভাড়া, ইকুইপমেন্ট লাগে না।

অপরদিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কিছু খরচের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে কিছু খরচ প্রত্যক্ষ বা সরাসরি, আর কিছু খরচ পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে রয়েছে—একান্ত ঋণ প্রদান ও আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, ব্যবহৃত ভবনের ভাড়া এবং নানা ডিভাইস, আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদির মূল্য; দাপ্তরিক কার্যনির্বাহের সরঞ্জামাদি; সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ খরচ, অনলাইন নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ ব্যয়, অন্যান্য অপারেশনাল খরচ ইত্যাদি। আর পরোক্ষ খরচের মধ্যে রয়েছে—ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট নয়-এমন সাধারণ ব্যয়, যেমন পুরো ভবনের ভাড়া, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সর্বসাকুল্য বেতন, পরিবহন চার্জ ইত্যাদি।

ঋণ-সংক্রান্ত খরচ গ্রহণ : শারয়ী ভিত্তি

ঋণের ক্ষেত্রে যেকোনো শর্তসাপেক্ষ বৃদ্ধির জন্য শরীয়তের স্পষ্ট বিধান হলো, এটি সুদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

> তাই তোমাদের মূলধন বহাল থাকবে। তোমরাও অবিচার করবে না, তোমাদের প্রতিও অবিচার করা হবে না।[৩৪৫]

---

৩৪৫. আল কুরআন, ২ (সূরা আল বাকারাহ) : ২৭৯

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঋণদাতার জন্য তার মূলধন পরিপূর্ণরূপে বজায় থাকবে, কোনোরূপ হ্রাস করা হবে না। এ থেকে বোঝা যায়, ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান এবং তার কাছ থেকে তা আদায় করার জন্য ঋণদাতার যে খরচাদি হয় তা সে এমনভাবে আদায় করতে পারবে, যাতে তার মূলধন যথাযথ সংরক্ষিত থাকে। এ কারণে মূল পরিমাণের সাথে এতৎসংশ্লিষ্ট খরচের পরিমাণ যোগ করা বৈধ হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ঋণপ্রদান ও আদায় বাবদ প্রকৃত খরচ গ্রহণের অনুমতি বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি ফাতওয়া উল্লেখ করা হলো—

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমির তৃতীয় অধিবেশনের ১৩ নং সিদ্ধান্তে ঋণের প্রকৃত খরচ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا.
>
> ঋণ পরিষেবার জন্য চার্জ নেওয়া জায়িয, তবে শর্ত থাকে যে, এটি প্রকৃত ব্যয়ের সীমার মধ্যে থাকে। প্রকৃত সেবার ওপর যেকোনোরূপ বাড়তি আদায় হারাম। কারণ, এটি শরীয়তে নিষিদ্ধ সুদের অন্তর্ভুক্ত।[৩৪৬]

আওফির শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড-এ ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে—

> يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة .
>
> لا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية.

---

৩৪৬. যুহাইলী, ড. ওয়াহবাহ, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, খ. ৭, প. ১১২

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তার প্রকৃত প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমতুল্য ঋণ পরিষেবার জন্য চার্জ নিতে পারে, তবে এটি তার প্রত্যক্ষ ব্যয়ের ওপর বাড়তে পারে না। প্রকৃত ব্যয়ের ওপর যেকোনো বৃদ্ধি নিষিদ্ধ। তাই প্রকৃত ব্যয় নির্ধারণের ব্যাপারে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে এমন কোনো বৃদ্ধি না ঘটে, যা অবশেষে অতিরিক্ত মুনাফার দিকে নিয়ে যায়।

ঋণ পরিষেবার প্রকৃত খরচের মধ্যে পরোক্ষ খরচ (যেমন—প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন; অফিস ভাড়া ও আসবাবপত্রের মূল্য, পরিবহন ব্যয় এবং অন্যান্য সাধারণ ও ব্যবস্থাপনা খরচ) অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৪৭]

ঋণের ওপর সার্ভিস চার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করে শাইখ আহমাদ বাযী ইয়াসীন বলেছেন—

যদি ঋণের ওপর খরচ বা মজুরি গ্রহণ জায়িয হওয়ার পক্ষে ফাতওয়া আসে তাহলে এ আশঙ্কা রয়েছে যে, এটিও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করবে। তারা বলবে, এটিই তো আমরা চাই। অন্যদের সাথে একমত হয়ে বলবে, ঋণের বিপরীতে মজুরি ৫%, ১০%।[৩৪৮]

ঋণের খরচাদি গ্রহণ : শরীয়া নীতিমালা

ক. এ খরচাদি একান্তই ব্যবস্থাপনাগত সেবার বিপরীতে হতে হবে; ঋণের বিপরীতে নয়। কেননা, ঋণের বিপরীতে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, এটি ঋণের ওপর শর্তসাপেক্ষ বৃদ্ধি, যা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে, চাই পরিমাণ কম বা বেশি হোক।

খ. এ খরচাদির পরিমাণ ঋণের শুরুতেই নির্ধারিত হতে হবে এবং তা ঋণের পরিমাণের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারবে না, যা ঋণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ হ্রাসের সাথে হ্রাস পায়। কারণ, ঋণের পরিমাণের সাথে

---

৩৪৭. আওফি, শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড নং : ১৯

৩৪৮. রহমতুল্লাহ খন্দকার, মুহাম্মদ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ২০২৪, পৃ. ৬০ [ড. আলাউদ্দীন জাতারী, *আল খিদমাতুল মাসরাফিয়্যাহ ওয়া মাওকিফুশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, ২০০২ পৃ. ২৪৬-সূত্রে উদ্বৃত]

এগুলোর সংযোগ থাকাটা এ কথার জোরালো প্রমাণ বহন করে যে, এগুলো ঋণের বিপরীতে নেওয়া হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনাগত পরিষেবার বিপরীতে নয়। এভাবে তা সুদে পরিণত হবে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহগণের অভিমত হলো—

> فالفائدة الربوية على القرض محرمة، وأما أخذ النفقات الإدارية الفعلية فلا حرج فيها، وشتان ما بينهما، فالمبلغ المقتطع للمصاريف لا يزيد بزيادة القرض.وعلى كل، فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة. وإن سميت بغير اسمها، فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني.

> ঋণের ওপর ইন্টারেস্ট গ্রহণ নিষিদ্ধ। তবে ব্যবস্থাপনাগত প্রকৃত খরচ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, খরচের অ্যামাউন্ট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় না। সর্বাবস্থায় ব্যবস্থাপনাগত খরচ কিংবা প্রকৃত সার্ভিস চার্জকে 'উজরাহ' হিসেবে গণ্য করা হয়। আর উজরাহর ক্ষেত্রে শর্ত হলো—কাজের শুরুতেই তা নির্ধারণ করা। এজন্য ঋণের পরিমাণ অনুপাতে তা নির্ধারণ করা বিশুদ্ধ নয়। যদি তা ঋণের অনুপাতে নির্ধারণ করা হয়, তবে তা এ কথার প্রমাণ যে, এটি ইন্টারেস্ট, উজরাহ নয়; যদিও তাকে অন্য নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, বিবেচনার বিষয় হলো—নিগূঢ় মর্ম ও অন্তর্নিহিত অবস্থা; শব্দ ও বাহ্য অবস্থা নয়।[৩৪৯]

গ. ঋণগ্রহীতাদের অবশ্যই এতৎসংশ্লিষ্ট খরচগুলো নেওয়ার কারণ এবং এগুলো ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অধিকন্তু, ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তিনি ঋণের চুক্তিটি দেখেছেন, এর বিষয়বস্তু ও মর্ম বুঝতে পেরেছেন, সজ্ঞানে ও সন্তুষ্টচিত্তে এতে সম্মত

৩৪৯. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/133503/حكم-الفائدة-إذا-أخذت-مرة-واحدة-على-اعتبار-أنها-نفقات-إدارية#

হয়েছেন এবং তিনি ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়গুলো স্বেচ্ছায় পরিশোধ করতে রাজি হয়েছেন—এই উদ্দেশ্যে যে, ঋণের মূলধনে যাতে কোনোরূপ ঘাটতি তৈরি না হয়।

ঘ. ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণ পরিষেবার খরচ হিসেবে গৃহীত অর্থসমূহ একটি বিশেষ অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করতে হবে এবং এগুলো ঋণের অ্যাকাউন্টে বা ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

ঙ. ব্যাংক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে লোন সার্ভিসেস এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স থেকে প্রতি বছর ঋণগুলোর অ্যাকাউন্টের প্রকৃত খরচের মূল্যের সমান পরিমাণ নিতে হবে।

চ. যেকোনো বছরে ঋণ পরিষেবার খরচের জন্য নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে অর্জিত ঘাটতি অবশ্যই ঋণের অ্যাকাউন্ট থেকে ঋণের আকারে পূরণ করতে হবে, যা পরবর্তী বছরে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণ পরিষেবার খরচ হিসেবে গৃহীত অর্থ থেকে ফেরত দেওয়া হবে।

ছ. ব্যাংকের শরীয়া বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ঋণ চুক্তির মর্মানুসারে ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করতে হবে।

জ. এই খরচগুলোর জন্য শারয়ী বিধিবিধানগুলো অবশ্যই ব্যাংকের শরীয়া বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

ঋণের পরিষেবাগুলোর প্রকৃত খরচ নির্ধারণের মানদণ্ড এবং নীতিমালা

ক. এ খরচগুলো অবশ্যই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বা সরাসরি ব্যয়ের সীমার মধ্যে হতে হবে, যা এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত একান্ত সার্ভিস এবং ঋণ আদান-প্রদানে ব্যয়গুলোর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ খরচের মধ্যে পরোক্ষ সাধারণ ব্যয় (যেমন—সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা, ভবন ভাড়া, আসবাবপত্রের মূল্য, পরিবহন খরচ প্রভৃতি সাধারণ খরচাদি) অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

খ. প্রকৃত ব্যয়গুলো অবশ্যই অর্থনীতিবিদদের দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত, যারা ব্যাংকের প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য আলাদা ব্যয় ও আনুষঙ্গিক খরচাদি নিরূপণ করতে দক্ষ এবং তাদের সংখ্যা অবশ্যই তিনজনের কম হওয়া

উচিত নয়। আর এ নির্ধারণটি অবশ্যই প্রকৃত ব্যয়ের সাথে মিল রেখে পরিবর্তন, বৃদ্ধি বা হ্রাস সাপেক্ষে হতে হবে।

গ. খরচের যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় তা ঋণের পুরো সময়কাল ধরে নিতে হবে; কেবল এক বছরের ভিত্তিতে নয়।

ঘ. ঋণের পরিমাণের মূল্য যা হোক—প্রতিটি লেনদেনের জন্য খরচের পরিমাণ সাধারণত একটিই হওয়া উচিত। কারণ, লেনদেনগুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যয়িত প্রচেষ্টা প্রায়ই একই রকম এবং তা ঋণের পরিমাণের মূল্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এ পরিমাণ যেন ক্ষেত্রবিশেষে কারও জন্য জুলুমের পর্যায়ে না পৌঁছে। ইতঃপূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

ঙ. ঋণ পরিষেবাগুলোর মোট প্রত্যক্ষ খরচ আর্থিক বছরের শেষে পুনঃগণনা করা উচিত এবং যে অনুমানমূলক খরচ নেওয়া হয়েছিল তার সাথে তুলনা করা উচিত, যাতে কেবল প্রকৃত খরচগুলো নেওয়া যায়, কম হোক বা বেশি। এ জাতীয় খরচের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন কোনো সীমা নেই। এটি প্রতিটি দেশের প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. ওয়াকালাহ ফি

ওয়াকালাহ 'وَكَالَةٌ' বলতে এমন একটি চুক্তিকে বোঝায়, যেখানে একজন ব্যক্তি (মুওয়াক্কিল) অপর এক ব্যক্তিকে তার প্রতিনিধি (এজেন্ট) হিসেবে তার পক্ষে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুমোদন দেন বা নিয়োগ করেন। মূলত ওয়াকালা অর্থ হলো 'প্রতিনিধিত্বের চুক্তি'। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : পরিষেবা, প্রতিনিধিত্ব এবং মূল ব্যক্তির (মুওয়াক্কিলের) আইনি অবস্থানকে ব্যবহার করার ক্ষমতা।

ওয়াকিল তার কাজের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত ফি/পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রাখেন এবং তা চুক্তির শুরুতেই পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করে নিতে হয়। *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*-তে এ প্রসঙ্গে এসেছে—

اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقا .

> ফকীহগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ওয়াকালাহ কখনও কোনোরূপ পারিশ্রমিক/ফি ব্যতীতও হতে পারে, কখনও পারিশ্রমিক/ফি-এর ভিত্তিতেও হতে পারে।...যদি মুওয়াক্কিল ও ওয়াকিল দুজন কোনো পারিশ্রমিক/ফি-এর ব্যাপারে একমত হন, তবে সর্বসম্মতিক্রমে পারিশ্রমিক/ফি বাধ্যতামূলক হবে।[৩৫০]

শাইখ ইবনু বায রাহ. এ বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

> .. প্রতিনিধি হিসেবে ঘড়িটি কেনার শ্রমের জন্য তিন শতাংশ পারিশ্রমিক নিয়ে যদি সে তার সাথে একমত হয়, তবে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে সে তাকে তিন শতাংশ বা পাঁচ শতাংশ দেয়, এতে কোনো অসুবিধা নেই। .. কারণ, সে এ কাজের ওয়াকিল মাত্র, যে তার জন্য ঘড়ি ক্রয় করে তাকে হস্তান্তর করে। এ কারণে ওয়াকালার ভিত্তিতে তার পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। ..[৩৫১]

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ওয়াকালাহ বলতে এমন একটি চুক্তিকে বোঝায়, যেখানে একজন আমানতকারী তার পক্ষে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যাংককে নিয়োগ করে। ইসলামী ব্যাংকের প্রেক্ষাপটে ব্যাংককে সাধারণত ওয়াকিল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ব্যাংক, ওয়াকিল হিসেবে কাজ করে, তাকে মুওয়াক্কিল (আমানতকারী)-এর পক্ষে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর মধ্যে অর্থ ধার দেওয়া, দেনা পরিশোধ করা, বিনিয়োগ পরিচালনা করা এবং কেনাকাটা সহজতর করা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকিং ওয়াকালার একটি উদাহরণ হলো, একজন গ্রাহক ব্যাংককে প্রস্তাব দেয় একজন ব্যক্তিকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অর্থ পরিশোধ করার জন্য। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক এই আর্থিক লেনদেনটি সম্পাদন করার প্রতিনিধি এবং ব্যাংক এ কাজের জন্য ফি নিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ থেকে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি প্রভৃতির বিল পরিশোধ করতে পারে।

---

৩৫০. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৪৫, পৃ. ৯০

৩৫১. ইবনু বায, নূরুন আলাদ দারব, https://binbaz.org.sa/fatwas/4479/حكم-اخذ-الاجرة-على-الوكالة-في-البيع#

উল্লেখ্য, ব্যাংক তার ওয়াকালাহর জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে যেকোনো পরিমাণে ফি নেওয়ার অধিকার রাখে; তবে তা অবশ্যই ন্যায্য হওয়া উচিত, যা দেশীয় রীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং তা চুক্তির শুরুতেই নির্ধারিত হতে হবে।

৩. কফালাহ (গ্যারান্টি) ফি

'কফালাহ' অর্থ গ্যারান্টি, জামিন হওয়া। 'ব্যাংক গ্যারান্টি' (ব্যাংকিং কফালাহ) বলতে বোঝায় একটি ঋণ প্রদানকারী সংস্থার একধরনের গ্যারান্টি। অর্থাৎ, ব্যাংক নিশ্চিত করে যে, দেনাদারের দায় মেটানো হবে।

এর ব্যাখ্যা হলো—দেনাদার যদি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে তা কভারে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই গ্যারান্টির মাধ্যমে গ্রাহক বা ঋণগ্রহীতা কোনো জিনিস কিনতে পারে বা ঋণ নিতে সক্ষম হয়, যা এমনি সময়ে সম্ভব হতো না। ফলে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে ব্যাবসা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, কোনো ব্যাবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রেও ব্যাংক গ্যারান্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ব্যাংক গ্যারান্টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুই ধরনের হতে পারে। ব্যাংক বিদেশি বা দেশীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। এর ফলে উপভোক্তা সরাসরি এর সুবিধা পান। ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বা অন্য দেশের সঙ্গে আর্থিক লেনেদেনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গ্যারান্টির সুবিধা নিয়ে থাকেন। পরোক্ষ গ্যারান্টির সুবিধা মূলত রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়ে থাকে। যখন এর উপভোক্তা কোনো সরকারি এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠান হয়। আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে অনেক দেশই পরোক্ষ ব্যাংক গ্যারান্টির ওপরে ভরসা করে না। ফলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এমন এক বিদেশি ব্যাংকের শাখাকে নির্বাচন করা হয়, যাদের একটি সদর দফতর উপভোক্তার দেশেও রয়েছে।

ব্যাংক গ্যারান্টির একটি উদাহরণ—

ধরা যাক, কোম্পানি 'ক' একটি নতুন রেস্তোরাঁ দেবে। এবার তারা নিজেদের জন্য ৩ লক্ষ টাকার রান্নাঘরের সরঞ্জাম কিনতে চায়। কিন্তু সরবরাহকারী সংস্থা ওই রেস্তোরাঁকে রান্নাঘরের সরঞ্জাম দেওয়ার আগে ব্যাংক গ্যারান্টি চায়। তখন ওই রেস্তোরাঁ নিজের নগদ অর্থের অ্যাকাউন্ট ব্যাংকের কাছে জমা রেখে ব্যাংক গ্যারান্টির অনুরোধ করতে পারে।

শরীয়া আইন অনুসারে সাধারণত দায় বা ঋণ পরিশোধের কফালতের জন্য কোনো ধরনের চার্জ/ফি নেওয়া বিধেয় নয়; তবে এ কাজে যদি ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো খরচের ব্যাপার থাকে, তাহলে ব্যাংক গ্রাহকদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করতে পারবে। তবে তা ব্যাংকে প্রচলিত অন্যান্য সাধারণ চার্জ/ফির মতোই হতে হবে।

ফকীহগণের মতে, এ ধরনের চার্জ/ফি কফালাহ চুক্তিকে সুদি চুক্তিতে পরিণত করে। এর ব্যাখ্যা হলো, জামিনদার বা গ্যারান্টার স্পন্সরকৃত (মাকফূল) ব্যক্তির পক্ষ থেকে আইনত ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য, যদি স্পন্সরকৃত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে। কাজেই জামিনদার যদি তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে এটি স্পন্সরকৃত ব্যক্তির ওপর তার ঋণরূপে সাব্যস্ত হবে, যা সে (স্পন্সরকৃত ব্যক্তি) তাকে (অর্থাৎ জামিনদারকে) পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। এমতাবস্থায় গ্যারান্টির বিপরীতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে ঋণের ওপর যে চার্জ/ফি যোগ করবে, তা ঋণের ওপর অতিরিক্ত দেয়রূপে সাব্যস্ত হবে, যা একান্ত সুদ।[৩৫২]

ফকীহ ইবনু কুদামাহ রাহ. বলেন—

> ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز؛ لأن الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز .
>
> যদি সে বলে—তুমি আমার জামিনদার হও, বিনিময়ে তোমাকে একহাজার (টাকা) দেওয়া হবে। এটা জায়িয হবে না। কারণ, জামিনদার ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য। যদি সে তা পরিশোধ করে দেয়, তাহলে এটি স্পন্সরকৃত ব্যক্তির ওপর তার দেয় হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এটি প্রকারান্তরে ঋণের মতোই হয়ে গেল। এমতাবস্থায় যদি সে কোনো বিনিময় নেয়, তাহলে ঋণটি (একপ্রকার) মুনাফাকেই টেনে নিয়ে এলো। কাজেই তা জায়িয নয়।[৩৫৩]

---

৩৫২. শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ, *আল ইসলাম : সওয়াল ও জওয়াব*, নং : ৯৭২৬৮, https://islamqa.info/ar/answers/97268/الكفالة-على-الاجرة-اخذ-يجوز-#

৩৫৩. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ৪৪১

ইমাম ইবনে জারীর আত তাবারী রাহ. বলেন—

ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل.

যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে প্রদেয় অর্থের জন্য (তৃতীয়) কোনো ব্যক্তিকে জামিনদার বানায় এ শর্তে যে, জামিনদার স্পন্সরকৃত ব্যক্তিকে তার গ্যারান্টির জন্য চার্জ/ফি দেবে, তাহলে এ শর্তে গ্যারান্টি অবৈধ হবে।[৩৫৪]

ফকীহ আবু মুহাম্মাদ আল বাগদাদী আল হানাফী রাহ. বলেন—

ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة .

যদি সে এই শর্তে কোনো দেয় অর্থের জামানত গ্রহণ করে যে, আবেদনকারী তাকে একটি ফি দেবে, তবে এ ফি যদি গ্যারান্টিতে শর্তারোপ করা নাও হয়, তাহলেও এরূপ শর্তারোপ করা বাতিল হবে এবং যদি এটি গ্যারান্টিতে শর্তযুক্ত করা হয়, তাহলে গ্যারান্টিটিই বাতিল হবে।[৩৫৫]

গ্যারান্টিপত্র বিষয়ে ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে :

প্রথমত, গ্যারান্টি পত্রটি—তার বিভিন্ন প্রকারে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত অবস্থায়—হয় কাভারেজ[৩৫৬] সম্পন্ন হবে অথবা কাভারেজসম্পন্ন হবে না। যদি তা কাভারেজসম্পন্ন না হয়, তবে তা হলো, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যা করা বাধ্যতামূলক হয়—সে ক্ষেত্রে গ্যারান্টারের দায়িত্বকে অপরের দায়িত্বের সাথে সংযুক্ত করা। ইসলামিক আইনশাস্ত্রে এটাই হলো 'জামানত' বা 'কফালত'।

---

৩৫৪. তাবারী, *ইখতিলাফুল ফুকাহা*, পৃ. ৯

৩৫৫. আবু মুহাম্মদ আল বাগদাদী, *মাজমাউদ দামানাত*, পৃ. ২৮২

৩৫৬. ব্যাংক যদি নগদ বা সহায়ক জামানত [কোলেটারাল সিকিউরিটি] রেখে গ্রাহকের অনুকূলে গ্যারান্টিপত্র ইস্যু করে তবে তা শরীয়া অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কাভারেজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

যদি গ্যারান্টিপত্রটি কাভারেজসম্পন্ন হয় তাহলে গ্যারান্টিপত্রের আবেদনকারী ও তার ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক হবে ওকালতের (প্রতিনিধিত্বের)। আর ওকালত ফি-সহও হতে পারে, ফি ব্যতীতও হতে পারে। এ অবস্থায় স্পন্সরকৃত ব্যক্তির কল্যাণে কফালতের সম্পর্কও বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়ত, কফালাহ (গ্যারান্টি) হলো একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক চুক্তি, এর উদ্দেশ্য দয়া প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহার। ফকীহদের মতে, কফালতের জন্য যেকোনোরূপ বিনিময় নেওয়া জায়িয নয়। কারণ, কফীল বা গ্যারান্টার তার গ্যারান্টির জন্য বিনিময় নিলে তা একটি ঋণের এত হয়ে যায়, যা ঋণদাতার জন্য মুনাফা নিয়ে আসে। এটি শরীয়তে নিষিদ্ধ।

এর ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

প্রথম : গ্যারান্টিপত্রের ওপর গ্যারান্টির বিপরীতে চার্জ/ফি নেওয়া বৈধ নয়, চাই পত্রটি কাভারেজসম্পন্ন হোক বা না হোক।

দ্বিতীয় : উভয় প্রকারের গ্যারান্টিপত্র ইস্যু করার জন্য ব্যবস্থাপনাগত ব্যয়গুলো শরীয়া আইনে অনুমোদিত, তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে তা তৎসদৃশ অন্যান্য চার্জ/ফির অতিরিক্ত না হয় এবং তা পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক কাভারেজ প্রদান—উভয় ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। গ্যারান্টিপত্র ইস্যুর জন্য খরচাদি নিরূপণের ক্ষেত্রে কাভারেজের জন্য বাস্তবিক কাজের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি লক্ষ রাখা বৈধ হবে।[৩৫৭]

উপর্যুক্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,

ক. ব্যাংক শতভাগ নগদ জামানত রেখে গ্রাহকের পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানকে কাউন্টার গ্যারান্টি প্রদান করলে ব্যাংক ওয়াকিল হিসেবে চুক্তি অনুসারে ওয়াকালাহ ফি আদায় করতে পারবে।

খ. গ্রাহক আংশিক নগদ জামানত রাখলে ব্যাংক জামানত অংশের ওয়াকিল হিসেবে ওয়াকালাহ ফি এবং বাকি অংশের কফীল (গ্যারান্টার) হিসেবে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করতে পারবে।

---

৩৫৭. *কারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ২৫

গ. দীর্ঘমেয়াদি গ্যারান্টি হলে চুক্তি মোতাবেক জামানত অংশের ওয়াকিল হিসেবে ওয়াকালাহ ফি আদায় করা যেতে পারে।

ঘ. ওয়াকিল ও কফীল একত্র অবস্থায়ও ওয়াকালাহ ফি না নিয়ে কেবল সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করাই উত্তম।

ব্যাংক গ্যারান্টির দাবি আদায়

ব্যাংক কখনও নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক তৃতীয় পক্ষের দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক Forced Investment A/C সৃষ্টি করে তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। এমতাবস্থায় ব্যাংক গ্যারান্টির দাবি পরিশোধে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে পারে—

ক. ব্যাংক গ্যারান্টির দাবি পরিশোধের সময় গ্রাহক প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংকে জমাদানে ব্যর্থ হলে গ্রাহকের নামে কর্জে হাসানা হিসাব খুলে দাবি পরিশোধ করা যেতে পারে। এর বিপরীতে প্রকৃত সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে।

খ. উক্ত কর্জে হাসানা হিসাবটি যেহেতু গ্রাহকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে কাউন্টার গ্যারান্টির বিপরীতে খোলা হয়, তাই তা সমন্বয়ের জন্য তাকে সুযোগ দেওয়া হবে এবং তিনি ব্যর্থ হলে সহায়ক জামানত বিক্রয় করে বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যাংকের পাওনা আদায় করা যাবে।

গ. চুক্তি পরিপালনে ব্যর্থতা তথা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে ব্যাংক কর্তৃক দাবি পরিশোধের তারিখ থেকে আদায় পর্যন্ত সময়ের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ/জরিমানা আদায় করা যাবে; তবে তা সন্দেহযুক্ত আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, কর্জে হাসানার বিপরীতে এরূপ অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।[৩৫৮]

---

৩৫৮. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইআইবিএল, পৃ. ৮২

অধ্যায় : ১১

জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ : পর্যালোচনা[৩৫৯]

১. তাভীদ (Compensation)

'তাভীদ' (التعويض) অর্থ বিনিময় প্রদান। কেউ কারও সম্পদে ক্ষতিসাধন কিংবা ধ্বংস করলে অথবা কারও শারীরিক ক্ষতি করলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হয়। পরিভাষায় একে 'তাভীদ' (التعويض) বলে। নজীহ হাম্মাদ এর পারিভাষিক পরিচয় দিয়েছেন এভাবে— التعويض هو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق الضرر بالغير-'তাভীদ (ক্ষতিপূরণ) হলো, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপরীতে প্রদেয় আবশ্যক আর্থিক বিনিময়'।[৩৬০]

ইংরেজিতে 'তাভীদ'-কে Compensation বলা হয়। *Oxford Advanced Learner's Dictionary*-তে Compensation-এর মূল অর্থ লেখা হয়েছে—

> Something, especially money that some body gives you because they have hurt you, or damaged something that you own
>
> কেউ তোমাকে কোনো আঘাত করলে অথবা তোমার মালিকানাধীন কোনোকিছু নষ্ট করলে তার বিনিময়স্বরূপ তোমাকে যে অর্থ বা অন্য কিছু দেওয়া হয় তা-ই 'কম্পেনসেশন'।[৩৬১]

---

৩৫৯. আবদুল্লাহ মাসুম, ইসলামী ব্যাংকিং-এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল ও তা ব্যবহারের শরীয়া নীতিমালা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, সংখ্যা : ৬২-৬৩ থেকে সংকলিত (সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)।

৩৬০. হাম্মাদ, ড. নজীহ, *মুজামুল মুস্তালাহাতিল মালিয়্যাহ ওয়াল ইকতিসাদিয়্যাহ ফী লুগাতিল ফুকাহা*, ২০০৮, পৃ. ১৪২

৩৬১. Oxford advanced learner's dictionary, 2010 New 8th Edition.

মোটকথা, কম্পেনসেশন মূলত একটি 'তাভীদ', যা পূর্বনির্ধারিত হয় না; বরং ক্ষতিসাধন ও সীমালঙ্ঘনের পর বাস্তব ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করতে হয়।

আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় একেই 'কম্পেনসেশন' বলা হয়। যেমন : বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইনে' এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে—

> Compensation means such financial penalty as is imposed by a Islamic Banking Company over and above the amount of installment when a client fails to repay Bank's investment on due dates as per the agreement executed by him.[৩৬২]

এ গাইডলাইনে 'কম্পেনসেশন' দ্বারা বোঝানো হয়েছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ। চুক্তি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক যথাসময়ে ব্যাংকের নির্ধারিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ইসলামী ব্যাংক তার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে পারে। এটি নির্ধারিত পাওনার ওপর অতিরিক্ত প্রদেয় হয়।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় এ অতিরিক্ত অর্থ পূর্ব থেকে ধার্যকৃত হয়। সীমালঙ্ঘন ও বাস্তব ক্ষতির সঙ্গে অনেক সময় এর কোনো সম্পর্ক থাকে না। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহক বাস্তবেই তা আদায়ে অক্ষম হন। তখন তিনি সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না। সুতরাং একে 'ফিন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশন' বা 'তাভীদী মালী' বলা অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু সঠিক তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

শরীয়তে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত তিনটি রয়েছে। যথা—

ক. সীমালঙ্ঘন বা ত্রুটি নীতি ও শর্তের পরিপন্থি প্রমাণিত হওয়া। চাই সেই নীতি স্পষ্ট উল্লেখ করা হোক বা প্রথাগত হোক।[৩৬৩]

খ. ক্ষতি হওয়া[৩৬৪]; সেটি আর্থিক বা শারীরিক হতে পারে।

---

৩৬২. *GUIDELINES FOR CONDUCTING ISLAMIC BANKING*, 2009, P.2

৩৬৩. যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, ২০০০, খ. ১, পৃ. ২২০

৩৬৪. AAOIFI, *Shariyah Standarde*, 5, Section 2/2/1

গ. ক্ষতিটা বাস্তবধর্মী হওয়া; সম্ভাব্য না হওয়া।[৩৬৫]

উল্লেখ্য, আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্যাবসায়িক ক্ষতি, সে হিসেবে ব্যাবসায়িক ক্ষতি ও লোকসান দু-ধরনের হয়ে থাকে—

১. বাস্তব খরচ বা লোকসান (Actual cost/ loss),

২. সম্ভাব্য খরচ বা লোকসান (Opportunity cost/ loss)।

অপরচুনেটি কস্ট বা লস বলতে এমন একটি খরচ বা ক্ষতি বোঝায়, যা নিশ্চিত নয়; বরং সম্ভাব্য। পাওয়া বা না পাওয়া দুটিরই সম্ভাবনা রয়েছে। মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

'ব্যাংক যদি এই টাকা এত দিন বিনিয়োগ করত, তাহলে এই পরিমাণ মুনাফা লাভ হতো। এই সম্ভাব্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত হওয়াই Opportunity loss। আরবীতে বলে 'আল-ফুরসাতুদ দায়িয়াহ' (الفرصة الضائعة)'।[৩৬৬]

ইসলামে এ ধরনের Opportunity cost/ loss গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই কেউ কারও টাকা জোর করে ছিনতাই বা চুরি করে নিলে, কেবল সেই টাকাই ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য শাস্তি আরোপ করা যাবে। তবে উক্ত টাকার Opportunity loss আরোপ করা যাবে না।[৩৬৭]

ঠিক তেমনিভাবে মুরাবাহা গ্রাহক যদি তার ওয়াদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে ব্যাংক থেকে মুরাবাহা পণ্য ক্রয় না করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে Actual loss নেওয়া যাবে। তা এভাবে যে, ব্যাংক যে মূল্যে পণ্যটি খরিদ করেছে, যদি এর কম মূল্যে তাকে বিক্রয় করতে হয়, তাহলে সেই কম অংশটি পূর্ব গ্রাহক থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নেওয়া যাবে।

যেমন : পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছে এক লক্ষ টাকা দিয়ে। মুরাবাহা ভিত্তিতে বিক্রয়ের কথা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার দিয়ে। কিন্তু গ্রাহক সেটা ক্রয়

---

৩৬৫. AAOIFI, *Shariyah Standarde* 8, Section 6/8/2

৩৬৬. উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ তকী, *গায়র সুদি ব্যাংকারি*, করাচি : মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন, ২০০৯, পৃ. ২২৬

৩৬৭. উসমানী, *গায়র সুদি ব্যাংকারি*, পৃ. ১৪৩-১৪৪

করেনি। ব্যাংক বাধ্য হয়ে অন্যত্র বিক্রয় করেছে। বিক্রয় করেছে ৯০ হাজার টাকা; এক লক্ষ টাকা দাম পাওয়া যায়নি। তাহলে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রকৃত লস দশ হাজার টাকা। এটি প্রথম গ্রাহক থেকে নেওয়া যাবে। কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকা নেওয়া যাবে না। কারণ, এটি Opportunity loss।[৩৬৮]

তদ্রূপ এই এক লক্ষ টাকা পণ্য বিক্রয়ে ব্যয় না হলে এতে আমার এই এই মুনাফা হতো, এটিও Opportunity cost, যা নেওয়া যাবে না।

২. গরামাহ (Penalty)

'গরামাহ' (الغرامة) শব্দের মূল অর্থ 'যা আদায় করা আবশ্যক'। যেমন : ঋণ, পাওনা বা ক্ষতিপূরণ। পরিভাষায়—কোনোরূপ সীমালঙ্ঘন বা আইন ভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিংবা ক্ষতিপূরণ হিসেবে সীমালঙ্ঘনকারীর ওপর যে দেয় আরোপ করা হয় তাকে 'গরামাহ' বলে। ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'مال يجب أداؤه تعزيرا أو تعويضا' অর্থাৎ, এমন আর্থিক দায়, যা দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করা আবশ্যক হয়।[৩৬৯]

'গরামাহ' দুই প্রকার। যথা—

ক. শাস্তিমূলক দণ্ড (الغرامة التعزيرية) : যা কোনো আইন ভঙ্গের কারণে আরোপ করা হয়। এর সঙ্গে বাস্তব কোনো ক্ষতির সম্পর্ক নেই। এটি সাধারণত সরকার বা প্রশাসন আরোপ করে থাকে। তা ছাড়া এটি পূর্বঘোষিত থাকে। যেমন : ট্রাফিক আইন ভঙ্গের কারণে দণ্ড আরোপিত হয়। ইংরেজিতে একে Penalty বা Fine বলে।

অক্সফোর্ড অভিধানে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে, A punishment for breaking a law, rule, or contract. অর্থাৎ কোনো আইন, নীতি বা চুক্তি ভঙ্গের কারণে যে শাস্তি আরোপ করা হয় সেটি 'প্যানাল্টি'।[৩৭০]

---

৩৬৮. AAOIFI, Shariyah Standarde 8,Section 4/2

৩৬৯. *আল মাওসূআতিল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩১, পৃ. ১৪৭

৩৭০. *Oxford advanced learner's dictionary*, New 8th Edition.2010

২. আর্থিক দণ্ড (التعزير بالمال) : এটি এমন 'ক্ষতিপূরণ', যা বাস্তব ক্ষতির বিপরীতে আসে। এটি মূলত কম্পেনসেশন। এই ক্ষতিপূরণ পূর্বনির্ধারিত থাকে না।[৩৭১] পরিভাষায় এটি 'তাযীর বিল মাল' বা 'আর্থিক দণ্ড' নামে পরিচিত।

আর্থিক দণ্ডের বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন অনেক ফকীহ একে অনুমোদন করেননি। কারণ, এর মাধ্যমে অত্যাচারী শাসকরা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে। এরপর নিজেরাই সেটা ভক্ষণ করে। অবশ্য ইমাম আহমাদ রাহ. (৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. (৭৩৮-৮৯৮ খ্রি.) একে অনুমোদন করেছেন। বর্তমান সময়ের বহুসংখ্যক ফকীহ একে সমর্থন করেন।[৩৭২] তবে এটি আদালতের মাধ্যমে আরোপ করা হবে, রাষ্ট্রীয় আইনে উসুল করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। আদালতের রায় ব্যতীত নিজেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য আর্থিক দণ্ড আরোপ করা কারও নিকটই বৈধ নয়।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে আলোচিত ক্ষতিপূরণকে 'গরামাহ' বা 'প্যানাল্টি'-ও বলা যায় না। কারণ, 'গরামাহ' বা 'প্যানাল্টি' এমন দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ, যা 'তাভীদ'-এর মতো পূর্বনির্ধারিত থাকে না। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষতিপূরণ পূর্বনির্ধারিত থাকে। তা ছাড়া প্যানাল্টি ধারণাটি কনভেনশনাল। এটি গ্রহণ করা যায়, ব্যবহার করা যায়; কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিংয়ে অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হয়, সেটি ইসলামী ব্যাংক নিজে ব্যবহার করতে পারে না।

৩. আশ-শরতুল জাযাঈ (Penalty Clause)

'আশ-শরতুল জাযাঈ' (الشرط الجزائي) হলো, মূল চুক্তির শুরুতেই চুক্তিকারী পক্ষগণ নির্ধারিত কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

এরপর সেটি লঙ্ঘন হলে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ইংরেজিতে একে Penalty Clause বলে।[৩৭৩]

---

৩৭১. যুহাইলী, দিরাসাতুল মাসাইল, ২০০০, খ.১, পৃ. ২৪৩

৩৭২. যারকা, মুস্তাফা আহমাদ, আল-মাদখালুল ফিকহিল আম, দারুল কলম, ২০০৪, খ.২, পৃ.৫০

৩৭৩. AAOIFI, *Shariyah Standard*, 5/2/1/2

এই পরিভাষাটি পূর্ববর্তী ফকীহগণের সময়ে ছিল না। ব্যাবসা-বাণিজ্যের আধুনিক বিস্তার লাভের পর উক্ত পরিভাষার সৃষ্টি হয়। তবে মূল শর্তারোপের বিষয়টি প্রাচীন ফিকহেও ছিল।

বনদার বিন ফাহাদ তাঁর 'গরামাহ'-বিষয়ক প্রবন্ধে এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

> وهو شرط في عقد يقتضي بذل مال على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ التزامه في حينه دون عذر شرعي
>
> মূল চুক্তিতে এরকম কোনো শর্ত করা যে, যথাসময়ে চুক্তির কোনো এক পক্ষ তার দায়িত্ব ও কাজ শরীয়াসম্মত কোনো ওযর ছাড়া সম্পন্ন করতে না পারলে তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৩৭৪]

সিদ্দীক আদ-দারীর এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

> اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له، عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .
>
> চুক্তির উভয় পক্ষের এ ব্যাপারে একমত হওয়া যে, যার দায়িত্বে কাজ রয়েছে, সে তার নির্ধারিত কাজ আঞ্জাম না দিলে অথবা বিলম্ব করার কারণে যে ক্ষতি হবে, এর বিপরীতে অপর পক্ষের নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার সৃষ্টি হবে।[৩৭৫]

মৌলিকভাবে আশ-শরতুল জাযাঈ দুভাবে হয়। যথা—

ক. ঋণ বা কোনো আর্থিক দেনা যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তারোপ। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই চুক্তির উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে একমত হবে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যথা সময়ে ঋণ বা পাওনা পরিশোধ না করলে, মূল ঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

---

৩৭৪. ইবনু ফাহাদ, বন্দার, আল গরামাহ আত তাযীরিয়্যাহ, *Arab Journal of Security Studies and Training,* খ. ২৫, পৃ. ১২

৩৭৫. সাওয়া, ড. আলী মুহাম্মদ, *আশ শরতুল জাযাঈ ফিদ দুয়ূন*, পৃ. ২৫

খ. সাধারণত বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়, সেবা, সার্ভিস চুক্তিতে উপর্যুক্ত শর্তারোপ। যেমন : নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করে না দিতে পারলে এই পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।[৩৭৬]

আজকাল বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের শুরুতেই যথাসময়ে লেনদেন সম্পন্ন না হওয়ার ক্ষেত্রে 'আশ-শরতুল জাযাঈ' বা Penalty Clause শর্তারোপ করা হয়। এর মূল লক্ষ্য থাকে, যথাসময়ে কাজটি যেন সম্পন্ন হয়।

কোনো প্রকার মামলা-মুকদ্দমায় যাওয়া ছাড়াই যেন অপর পক্ষ তার ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে নিতে পারে। যেমন : একটি জামা সেলাই করতে দেওয়া হয়েছে। শর্ত করা হয়েছে, ঈদের চাঁদরাতেই জামা দিতে হবে। না দিতে পারলে মজুরি থেকে একশত টাকা বিয়োগ করা হবে।

এই ধরনের 'প্যানাল্টি ক্লজ' প্রয়োগের দুটি ক্ষেত্র। যথা—

ক. এমন লেনদেন, যেখানে বস্তু, সেবা, পণ্য লাভ করা উদ্দেশ্য থাকে। যেমন : ঠিকাদারি চুক্তি, ইসতিসনা চুক্তি, সালাম চুক্তি, ইজারা-চুক্তি। এসব ক্ষেত্রে Penalty clause বৈধ। যেমন : চুক্তি করা হলো, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না করতে পারলে পারিশ্রমিক থেকে এই পরিমাণ টাকা কর্তন করা হবে। তবে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হতে হবে, যা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত সম্ভব নয়। আর যে প্যানাল্টি নির্ধারণ করা হবে, সেটি পূর্বনির্ধারিত পারিশ্রমিক বা মূল্য থেকেও বিয়োগ করা যাবে।[৩৭৭]

খ. সরাসরি ঋণ বা অন্য কোনো পাওনা পরিশোধের বিপরীতে। যেমন : যথাসময়ে পাওনা পরিশোধ না করলে এই পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা বা অন্য কিছু প্যানাল্টি হিসেবে প্রদান করতে হবে। এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বৈধ নয়।[৩৭৮] জেদ্দাস্থ ইসলামী ফিকহ অ্যাকাডেমির এক রেজুলেশনে এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এটি বৈধ নয়। চাই তা মুদ্রায় হোক বা মুদ্রা ছাড়া

---

৩৭৬. AAOIFI, *Shariyah Standard,* 3/2/3

৩৭৭. AAOIFI, *Shariyah Standard*, 3, Section 2/3
আরও দেখুন : Abhasu Kibaril Ulama, *Shariah Standard,* Makkah.V.1P. 105

৩৭৮. AAOIFI, *Shariyah Standard*, 3,Section 2/1/2

অন্যভাবে কিছু হোক।[৩৭৯] এভাবে চুক্তি করে প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ দান করে দিলেও চুক্তির গুনাহ থেকে যাবে।[৩৮০]

ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাপকভাবে যে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়, সেটি মূলত 'আশ-শরতুল জাযাঈ' বা 'প্যানালটি ক্লজ'-এর প্রথম প্রকারের সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্য রাখে। তবে বাস্তবিক অর্থে একে প্যানাল্টি ক্লজ বলা যায় না। কারণ, ঋণের ক্ষেত্রে এভাবে প্যানাল্টি ক্লজ আরোপ করা বৈধ নয়। এটি মূলত কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ে সুদ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ ঋণের ওপর শর্ত করে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা যে নামেই হোক তা সুদ বলে বিবেচিত হয়।

৪. ইলতিযাম বিত-তাবাররু
(Undertaking by the debtor to donate)

'ইলতিযাম বিত তাবাররু-এর অর্থ হলো—নিজের ওপর দান-অনুদান আবশ্যক করে নেওয়া। যেমন : মানতের মাধ্যমে দান করা আবশ্যক করা হয়।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতিতে একটি জটিল সমস্যা হলো, যথাসময়ে গ্রাহক যদি ব্যাংকের পাওনা শোধ না করে, তাহলে সরাসরি সুদি ব্যাংকের এত সময়ের বিপরীতে ব্যাংকের পাওনার ওপর অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা যায় না। কারণ, এটি স্পষ্ট সুদ। এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে একটি বিকল্প কৌশল হিসেবে সময়ের বিজ্ঞ ফকীহগণের একটি

---

৩৭৯. Resolution No.51, International Islamic Fiqh Academy, Jeddah, 6/1/193, (*মুজামুল মুস্তালাহাতিল মালিয়্যাহ ওয়াল ইকতিসাদিয়্যাহ ফী লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ১১০; যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, ২০০০, পৃ. ২৪৭)
এটি ইসলামী ফিকহ অ্যাকাডেমি, মক্কারও সিদ্ধান্ত। প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯। মনে রাখতে হবে, এটি আশ-শরতুল জাযাঈর প্রয়োগক্ষেত্র নয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট দেখুন : *মায়ায়িরুশ শারইয়্যাহ*, খ.১, পৃ.১০২।

৩৮০. অবশ্য নাদওয়াতুল বারাকাহ তাদের একটি সিদ্ধান্তে প্যানাল্টিকে বৈধ বলেছে। তবে শর্ত হলো, তা দান করে দিতে হবে। এটি সমর্থনযোগ্য নয়। তা ছাড়া পুরো রেজুলেশনটিও দেখার সুযোগ হয়নি। দেখুন : যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৫২

অংশ এই প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, 'মুরাবাহা চুক্তির সময়ই গ্রাহক একপক্ষীয়ভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের চ্যারিটি ফান্ডে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দান করতে বাধ্য থাকবে।'[৩৮১]

এভাবে মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রাহক যথাসময়ে পাওনা শোধ না করলে এবং এর পেছনে তার গাফলতি থাকলে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার ওপর ব্যাংক বরাবর নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দান করা আবশ্যক হবে। এর হার সুদি ব্যাংকের সুদের হারের এত হতে পারে[৩৮২]।

উক্ত বিকল্পটি-ই মূলত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' নামে পরিচিত। আওফির ইংরেজি ভাষ্যমতে, এর নাম Undertaking by the debtor to donate.[৩৮৩]

এ পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহক যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। নতুবা তার প্রদেয় বেড়ে যাবে, যা সে চাইবে না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিংয়ে খেলাপি গ্রাহক থেকে যা গ্রহণ করা হয়, সেটি মূলত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' বা Undertaking by the debtor to donate।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি মূলত কতিপয় মালিকী ফকীহ থেকে বর্ণিত একটি ফিকহী মূলনীতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত। তবে এর পেছনে বিভিন্ন পরিবর্তন ও ধাপ অতিক্রান্ত হয়েছে। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

প্রথম দিকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এই কৌশল ছিল না। কারণ, ব্যাংকিং সেক্টরে অন্যায়ভাবে যে গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা শোধ করে না, সে ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হলো, সম্মিলিত শাস্তির ব্যবস্থা করা। সরকার প্রধান বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ

---

৩৮১. উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকারি কী বুনিয়াদি*, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা আল আরিফী, ২০১১

৩৮২. তবে সুদি ব্যাংকের সাথে এর মৌলিক তিনটি পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো হলো, ক. এটি সুদি চুক্তি নয়; খ. এ অর্থ ব্যাংকের ইনকাম হিসাবে গণ্য হবে না, বরং ফাউন্ডেশনে দান করে দিতে হবে। গ. এটি একপক্ষীয় ওয়াদা চুক্তি, যা রক্ষা করা আবশ্যক। সুদের মতো দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তি নয়।

৩৮৩. AAOIFI, *Shariyah Standard*, 3, Section 2/1/8

ধরনের আইন তৈরি করবে যে, অন্যায় ঋণখেলাপিরা একটা নির্ধারিত সময়ের পর কোনো ব্যাংকের সঙ্গেই কোনো আর্থিক লেনদেন করতে পারবে না, কোনো ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটি পাবে না।

এ পদ্ধতি একটি সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে; ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হ্রাস করবে নিঃসন্দেহে। তবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বত্র ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অনুশীলন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটি এখনও সহজ নয়। খেলাপি গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক থেকে বঞ্চিত হলে, কনভেনশনাল ব্যাংকে চলে যাবে। এ চিন্তা থেকেই পরবর্তী ধাপে সাময়িক বিকল্প চিন্তা করা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মুরাবাহা গ্রাহকদের কূটকৌশলের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু আলিম 'প্যানাল্টি ক্লজ'-এর প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ যে গ্রাহক অক্ষম হওয়ার কারণে নয় বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে না, তার ওপর ব্যাংক কর্তৃক একটি আর্থিক ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে। যে কয়দিন পাওনা আদায় করেনি, ওই সময় ব্যাংক কোনো লাভ করে থাকলে, যে হারে প্রফিট বণ্টন করা হয়েছে, ওই হারে জরিমানাস্বরূপ অর্থ খেলাপি গ্রাহক থেকে নেওয়া হবে।

এ প্রস্তাবটি চরম বিতর্ক তৈরি করে। ব্যাপকভাবে উলামায়ে কিরাম এর বিরোধিতা করেন। ফলে ফিকহ অ্যাকাডেমিগুলোতে তা কার্যকর হয়নি। কারণ, এটি প্রকারান্তরে সুদি চুক্তিই হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে আলোচিত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' বা একপক্ষীয় অনুদান প্রদানের আবশ্যক ওয়াদা'-এর প্রস্তাব করা হয়। যা বাস্তবায়নের জন্য মৌলিকভাবে দুটি শর্তারোপ করা হয়। যথা—

১. আর্থিক অক্ষমতা বা সামর্থ্যহীনতার কারণে যদি যথাসময়ে পাওনা আদায়ে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে সুযোগ দিতে হবে। কোনোরূপ আর্থিক চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

২. এভাবে যে অর্থ সংগ্রহ হবে, সেটি শরীয়া বোর্ডের পরামর্শক্রমে চ্যারিটি ফান্ডে খরচ করা হবে। ব্যাংকের কোনো কাজে ব্যবহার করা হবে না।[৩৮৪]

---

৩৮৪. উসমানী, *গায়র সুদি ব্যাংকারি*, পৃ. ২৮০-২৮১

পরে উপর্যুক্ত শর্ত দুটির প্রথমটি তুলে দেওয়া হয়। ব্যাপকভাবে সকলের কাছ থেকেই মুরাবাহা চুক্তির সময় 'আন্ডারটেকিং টু ডোনেট'-এর চুক্তি করা হয়। এরপর সামর্থ্যবান বা অক্ষম সকলের কাছ থেকেই তা নেওয়া হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্যাপকভাবে সকল গ্রাহক থেকেই 'বাধ্যতামূলক অনুদান' গ্রহণ করা, মূলত ইসলামী ব্যাংকের স্বপ্নদ্রষ্টা স্কলারগণের মতামতের পরিপন্থি। একে শরীয়া পরিপূর্ণ সমর্থন করে না।

অবশ্য কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংক অনেক সময় অক্ষম ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের কম্পেনসেশন মাফ (Waive) করে থাকে। এটি অবশ্যই ইতিবাচক। তবে এর জন্য গ্রাহককে আবেদন করতে হয়। ব্যাংক নিজ থেকে গ্রাহকের অক্ষমতার বিষয়টি অনুসন্ধান করে না। সর্বোপরি পূর্ণরূপে শরীয়া বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

দুঃখজনকভাবে, বর্তমান সময়ে দ্বিতীয় শর্তটিও উঠিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ শরীয়া পরিপন্থি। এমনটি হলে এটি হবে ইসলামী ব্যাংকিং বিরোধী স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে বড়ো ধরনের ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে হারাম ইনকাম ঢুকে যাবে অবলীলায়।

'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' বিকল্পটি যারা অনুমোদন করেছেন :

- 'মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা' ('যুগের জটিল মাসআলার গবেষণা বোর্ড বা কাউন্সিল'/The Councilof present issues)-এর অনুমোদন।

  ১৪১২ হি. মোতাবেক ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের তৎকালীন বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও বিশিষ্ট ব্যাংকারদের সমন্বয়ে উপরিউক্ত শরীয়া কাউন্সিলের অধীনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার রূপরেখা ও মডিউল প্রস্তাবনা'। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এ বিষয়ে সম্মিলিত রেজুলেশন পাশ হয়। সেই রেজুলেশনের ১৮ নং ধারায় আলোচিত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' বিকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়।[৩৮৫]

---

৩৮৫. লুদয়ানাভী, মুফতী রশীদ আহমাদ, *আহসানুল ফাতওয়া*, করাচি : এইচএম সাঈদ, ২০০৩, খ.৭, পৃ. ১১১

- কুয়েত ফিন্যান্স হাউসের শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের অনুমোদন। কুয়েত ফিন্যান্স হাউসের Fatwa and Shari'a Supervisory Board একে অনুমোদন করেছে।[৩৮৬]

- ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ষষ্ঠতম Al Baraka Symposium (নাদওয়াতুল বারাকাহ)-এর সিদ্ধান্ত। তাতেও একে অনুমোদন করা হয়েছে।[৩৮৭]

- আওফির অনুমোদন। আওফি তার বিভিন্ন শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে একে অনুমোদন করেছেন।[৩৮৮]

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক অনুদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

আমাদের দেশে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ফাউন্ডেশন' রয়েছে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে যে 'কম্পেনসেশন' (শব্দটি বহুল প্রচলন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে) জমা হয়, সেটি হেড অফিসে পাঠানো হয়। হেড অফিস সেটি ফাউন্ডেশন বরাবর পাঠিয়ে দেয়। ফাউন্ডেশন সেটি বিভিন্ন চ্যারিটি খাতে ব্যয় করে। সাধারণত আমাদের দেশে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের অধীনে হাসপাতাল থাকে। যতটুকু জানা যায়, এসব হাসপাতালসহ বিভিন্ন দাতব্য কাজে এই টাকা ব্যয় করা হয়।

কম্পেনসেশন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের মূল ইনকাম অ্যাকাউন্টে অ্যাড করা : পর্যালোচনা

১. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কম্পেনসেশন ফান্ড গ্রহণ অনুমোদনের একটি মৌলিক শর্ত হলো, সেটি ব্যাংকের মূল ইনকাম অ্যাকাউন্টে যুক্ত করা হবে না। এমনটি হলে সেটি আর সুদের মাঝে কোনো তফাতই থাকবে না; স্পষ্ট সুদ গ্রহণ করা হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

---

৩৮৬. *আল ফাতাওয়া আশ শারইয়্যাহ*, কুয়েত ফিন্যান্স হাউস, খ. ১, পৃ. ৫০০, ফাতওয়া নং : ৫২০ (যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৫১)

৩৮৭. *নাদওয়াতুল বারাকাহ আসসাদিসাহ লিল ইকতিসাদিল ইসলামী*, পৃ. ৯১ (যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৫২)

৩৮৮. AAOIFI, Shariyah Standard, Section 2/1/8

২. একটি চুক্তি যখন ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তখন সেটা পূর্ণ হয়ে যায়; এর বিধান শেষ হয়ে যায়। অবশ্য তাবাররুভিত্তিক চুক্তিসমূহে (যেমন : হিবা, সাদাকা, ওসিয়ত ইত্যাদি) কবজ বা হস্তগত করাও শর্ত। এ ক্ষেত্রে হস্তগত করার মাধ্যমে কৃতচুক্তি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ফিকহী মূলনীতি হলো— لا يتم التبرع إلا بالقبض 'হস্তগত করার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায়'।[৩৮৯]

৩. চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পর এখন চুক্তি অনুযায়ী উক্ত অর্থ চ্যারিটি ফান্ডে ব্যয় করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। এই টাকার মালিক না ব্যাংক, না ক্লায়েন্ট। ব্যাংক কেবল যথাস্থানে টাকা ব্যয়ের প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং প্রতিনিধি কর্তৃক টাকা গ্রহণ ও মূল্য ইনকামে এ্যাড করা অন্যায় তসররুফ ও গসবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কম্পেনসেশন ফান্ডের টাকা ব্যাংক নিজে তার দরিদ্র গ্রাহকদের প্রদান করা

কম্পেনসেশন ফান্ডের টাকা ব্যাংক নিজে সরাসরি তার দরিদ্র গ্রাহকদের প্রদান করাও সঠিক নয়। কারণ, এ ফান্ডের টাকা সম্পূর্ণ দান করে দিতে হবে। দানটিও এমনভাবে হতে হবে, যার সঙ্গে ব্যাংকের কোনো স্বার্থ বা ফায়দার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন—

من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه، وتصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك جميعا، ثم قذف به في نار جهنم

"যে ব্যক্তি অন্যায় পথে কোনো সম্পদ অর্জন করল, অতঃপর সে তা দিয়ে নিজের আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল, সদকা করল অথবা তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করল, তার এসব কিছু একত্র করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"[৩৯০]

---

৩৮৯. যারকা, *মাদখালুল ফিকহিল আম*, Section 30/13

৩৯০. ইবনু রজব আল হাম্বলী, *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম*, পৃ. ১০২, শাইখ আলবানী রাহ.-এর মতে, হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি, (আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৪৮, হা. নং : ১৭২১)

সাইয়িদুনা আবুদ দারদা ও ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা রা. থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, "অবৈধ পথে যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ অর্জন করে সদকা করল তার উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি, যে অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ নিয়ে তা দিয়ে বিধবাদের কাপড়ের সংস্থান করে।"[৩৯১]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যায়, এ ফান্ডের টাকা এমনভাবে কাউকে দান করা বা এমন কোনো কাজে খাটানো জায়িয নয়, যে ব্যক্তি বা কাজের সাথে নিজের কোনো স্বার্থ বা ফায়দার সম্পর্ক রয়েছে।

খেলাপি গ্রাহক থেকে ব্যাংকের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ

গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করায়, ব্যাংকের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা খেলাপি গ্রাহক থেকে নেওয়ার বিষয়টি নতুন নয়। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে যখন ইসলামী ব্যাংকিংয়ে খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়—এ বিষয়ে আলোচনা হয়, তখনই এ প্রস্তাবটি আলোচনায় আসে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ব্যাপারে কনভেনশনাল ব্যাংকের অনুশীলন হলো মেয়াদান্তে সময় বৃদ্ধির বিনিময়ে সুদ-হার বৃদ্ধি করা। এভাবে যত বিলম্ব হবে, সুদ হার সেই হারে বৃদ্ধি হতে থাকবে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এমনটি করা যাবে না। কারণ, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ধারার প্রতিষ্ঠাই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

এই সুযোগে ইসলামী ব্যাংকের কিছু গ্রাহক মুরাবাহা লেনদেনে ইচ্ছা করে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করতে শুরু করে। যে দেশের পুরো ব্যাংকিং সেক্টর ইসলামী পন্থায় পরিচালিত হয়, সে দেশে এটি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। কারণ, সেখানে সহজেই এই আইন করা যায় যে, এমন খেলাপি গ্রাহকের সঙ্গে সকল ব্যাংক তাদের লেনদেন বন্ধ রাখবে। এটি সেই খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে কনভেনশনাল ব্যাংকের হার অধিক, সেখানে এমন আইন করা যায় না। এমনটি করা হলে খেলাপি গ্রাহক সহজেই সুদি ব্যাংকে চলে যাবে।

---

৩৯১. ইবনু রজব আল হাম্বলী, *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম*, পৃ. ১০২

চলমান এই সংকট নিরসনের জন্য যুগের ফকীহগণ দুটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। যথা—ক. শর্তসাপেক্ষে বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ; খ. একপক্ষীয় আবশ্যকীয় অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি।

নিম্নে মতামত দুটি দলিল-প্রমাণের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ক. শর্তসাপেক্ষে বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ

প্রথম মত হলো, বিলম্বে পাওনা পরিশোধের কারণে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার খেলাপি গ্রাহক থেকে বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে। এ মতাবলম্বীদের কথা হলো—খেলাপি গ্রাহক পাওনা আদায়ে বিলম্ব করার কারণে ইসলামী ব্যাংকের যে ক্ষতি হয়েছে, তা দূর করার একমাত্র উপায় 'বাস্তব আর্থিক ক্ষতিপূরণ' ধার্য করা। আর্থিক ক্ষতি আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমেই দূর হবে। অন্যভাবে নয়।[৩৯২]

প্রথমত, এ মতটি উলামায়ে কিরামের বিশাল জামাতের মাঝে উল্লেখযোগ্য মাত্র ৫-৬ জন আলিমের[৩৯৩] বিচ্ছিন্ন একটি মত।

দ্বিতীয়ত, এ মতটি বাস্তবায়ন সহজ নয়। তাদের দৃষ্টিতে এটি বাস্তবায়নের জন্য অনেক কঠিন কঠিন শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ক. গ্রাহক অক্ষম না হওয়া; বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ করছে না—এটি প্রমাণিত হতে হবে। এটি প্রমাণের বিভিন্ন পন্থা হতে পারে। যেমন : নিজ স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার বিনিয়োগ, পর্যাপ্ত সম্পদের মালিকানা থাকা ইত্যাদি।

খ. বিলম্ব আদায়ের পেছনে শারয়ী কোনো ওজর না থাকতে হবে। যেমন : সে অক্ষম/দরিদ্র প্রমাণিত হওয়া। এমনটি হলে তার ওপর কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে না।

---

৩৯২. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৭৪

৩৯৩. যেমন : শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমান মানিঈ, ড. আবদুল হামীদ আল-বালী, ড. মুহাম্মাদ আকরাম লাদীন, শাইখ মুস্তফা আয যারকা, ড. মুস্তফা যুহাইলী। (দেখুন : Zuhaira Nadiah Binti Zulkipli, Late Payment Penalty: Ta'widh and Gharamah Imposed to Debtor from the Shariah Perspective, P.194)

গ. পাওনা পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পর আরও এক মাস সুযোগ দেওয়া হবে। এ সময় তাকে পাওনা পরিশোধের বিভিন্ন চিঠি ও নোটিশ পাঠানো হবে। এতে তাকে সতর্ক করা হবে, নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধ না করা হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৩৯৪]

ঘ. ঋণ বিলম্বে আদায়ের কারণে ব্যাংকের বাস্তব ক্ষতি সাধিত হতে হবে; অমূলক বা সম্ভাব্য ক্ষতি ধর্তব্য নয়।

ঙ. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল তরল সম্পদ বিনিয়োগ করার পর তা থেকে মুনাফা অর্জিত হতে হবে। তবেই প্রমাণিত হবে, খেলাপি গ্রাহকের অংশ না থাকায় ওই পরিমাণ মুনাফা হয়নি, যা ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে বাস্তবেই যদি ওই সময় মুনাফা না হয়, বরং তরল সম্পদ জমা পড়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ক্ষতি হয়নি বলে বিবেচিত হবে।[৩৯৫]

চ. ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে ক্ষতির সমপরিমাণ; এর অধিক নয়।

ছ. আর্থিক ক্ষতিপূরণ পূর্ব থেকে ধার্যকৃত হতে পারবে না। যেমন : নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধ না করা হলে এই পরিমাণ অর্থ আর্থিক দণ্ড হিসেবে প্রদান করতে হবে।

জ. ঋণ উসুলের জন্য কোনো প্রকার বন্ধক সম্পদ ব্যাংকের কাছে না থাকা; গ্যারান্টি না থাকা, যার মাধ্যমে ঋণ উসুল করা যাবে।[৩৯৬]

মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বোচ্চ শরীয়া রেগুলেটরি বডি SAC BNM (Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia) ২০১০ সালের ২০শে মে এ বিষয়ে একটি শরীয়া রেজুলেশন পাশ করে। তাতে এভাবে শর্তসাপেক্ষে Actual loss গ্রহণকে অনুমোদন করা হয়েছে[৩৯৭]। মূলত এ ক্ষেত্রে তারা উপরিউক্ত কতিপয় আলিমদের মতামতকেই গ্রহণ করেছেন।

---

৩৯৪. উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকারি*, পৃ, ১৪০

৩৯৫. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৬৩-২৬৬, উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকারি*, পৃ, ১৪০

৩৯৬. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৮৭

৩৯৭. Zuhaira Nadiah, Late Payment Penalty: Ta'widh and Gharamah Imposed to Debtor from the Shariah Perspective, P.188

খ. ক্ষতির পরিমাণ কীভাবে নির্ধারণ হবে

এ ব্যাপারে তাদের একাধিক মত রয়েছে। কিছু মত নিম্নে প্রদত্ত হলো—

একটি মত হলো, কার্যত যে পরিমাণ ক্ষতি হবে সে পরিমাণ অর্থ নেওয়া যাবে। এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে—যে কয়দিন খেলাপি গ্রহীতা পাওনা আদায় করেনি, ওই কয়দিন ব্যাংক যে হারে ডিপোজিটরদেরকে মুনাফা দিয়েছে, ঠিক সেই হারে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। যেমন : ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে তিন মাস বিলম্ব করেছে। তাহলে এই তিন মাসে ব্যাংক যদি তার ডিপোজিটরদেরকে ৫% প্রফিট দিয়ে থাকে, তাহলে খেলাপি গ্রহীতা থেকেও তার মূল পাওনার ওপর আরও অতিরিক্ত ৫% নেওয়া হবে।[৩৯৮] শাইখ সিদ্দীক আদ-দারীর এরূপ মতামত দিয়েছেন।[৩৯৯]

কেউ কেউ বলেছেন, আদালত বিচার-বিশ্লেষণ করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে। জর্ডানের দেওয়ানী আইনে এমনটিই বলা হয়েছে।[৪০০] ডক্টর মুহাম্মাদ মুস্তফা যুহাইলী আওফি-এর জন্য এ বিষয়ে যে প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছেন, তাতে বিস্তারিত আলোচনার পর এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪০১]

শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মানিঈ বলেছেন, মুদ্রার ভ্যালু দিয়ে নির্ধারণ করা হবে। যেমন : ধরুন, খালিদের কাছে রাশিদের এক লক্ষ ডলার পাওনা আছে। পরিশোধের শেষ তারিখ ১লা মে। যেদিন ঋণ দেওয়া হয়েছিল, সেদিন পার ডলার টাকা ছিল ৮০ টাকা। পরিশোধের শেষ তারিখ ১লা মে দাম হয়েছে ৭৫ টাকা। পরিশোধের শেষ তারিখ ১লা মে টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও টালবাহানা করে আদায় করেনি। এর মধ্যে দাম পড়ে পার ডলার দাম হয়ে গেছে ৭০ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঋণগ্রহীতা খালেদ বিলম্বে আদায়ের কারণে ঋণদাতা রাশেদের লোকসান হলো পার ডলার ৫ টাকা। সুতরাং এটি খালিদ বহন করবে। এটিই বাস্তব ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে।[৪০২]

---

৩৯৮. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৬৪-২৮০

৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; ড. আলী আহমদ সালূসও তা-ই বলেছেন।

৪০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১;

৪০১. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ৩৪১

৪০২. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

মালয়েশিয়ার SAC BNM তাদের আরেকটি রেজুলেশনে ঋণের সর্বোচ্চ ১% নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মত

বিশেষজ্ঞ আলিমগণের স্বাভাবিক, স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত মতামত হলো, খেলাপি গ্রাহক থেকে মেয়াদান্তে আর্থিক কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুফতী তকী উসমানী এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে লিখেছেন, 'অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম প্রথম মতটি গ্রহণ করেননি। তারা মনে করেন, এ প্রস্তাবনা না শরীয়ার মূলনীতির সঙ্গে যায়, না এর মাধ্যমে ঋণখেলাপিদের কোনো প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।'[৪০৩]

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের কথা হলো—ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে সময়ের বিপরীতে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণের পূর্ব শর্তারোপ করা-ই রিবা। ইমাম আবু বকর আল জাসসাস (৯১৭-৯৮০ খ্রি.) রাহ. 'রিবার' পরিচয়ে বলেছেন—

هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض.

> এমন ঋণ, যাতে মেয়াদ এবং গ্রহীতাকে অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত করা হয়।[৪০৪]

অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে কাউকে মেয়াদি ঋণ দেওয়া। একে 'রিবা আল-কর্জ'-ও বলা হয়। জাহিলী যুগে প্রচলিত রিবার আরেক প্রকার হলো, 'রিবা আদ-দাইন'। তা হলো—কারও থেকে কোনো পণ্যের বিক্রয়লব্ধ বকেয়া-মূল্য পরিশোধের সময় হলে তখন অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অর্থাৎ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শর্তে সময় বাড়িয়ে নেওয়া। জাহিলী যুগে রিবার উভয় প্রকারের প্রচলন ছিল খুব বেশি।

সাধারণত জাহিলী যুগে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন নির্ধারিত তারিখে ঋণ বা পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হতো, তখন ঋণদাতা তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করত। এ সময় বলা হতো— إما أن تقضى وإما ان تربى-'হয় এখন আদায় করো,

---

৪০৩. উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকারি কী বুনিয়াদি*, পৃ. ১৪১

৪০৪. জাসসাস, ইমাম আবূ বাকর, *আহকামুল কুরআন*, লাহোর : সোহাইল অ্যাকাডেমি, পাকিস্তান, ১৯৮০, খ. ১, পৃ. ৫৫৭

অন্যথায় সময় বৃদ্ধি করলে অতিরিক্ত আদায় করতে হবে'।[৪০৫] ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. (১২৬৩-১২২৮ খ্রি.) স্পষ্ট বলেছেন—

أما المعاملة التي يزاد فيها الدين والأجل فهي معاملة ربوية .

যে আর্থিক লেনদেনে ঋণ/দায়ের পরিমাণ ও পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটিই মূলত সুদি লেনদেন'।[৪০৬]

লক্ষণীয় যে, বকেয়া মূল্য বা দায়ের বিপরীতে 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ' মূলত জাহিলী যুগের 'রিবাদ দাইন'-এর সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায়। কারণ, এখানেও মেয়াদান্তে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শর্তে সময় বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই অতিরিক্ত ক্ষতির বিপরীতে নেওয়া হলো কি না-তা বিবেচ্য নয়। মূল বিবেচ্য বিষয় হলো, মেয়াদান্তে মূল পাওনার ওপর বিনিময়হীন অতিরিক্ত চার্জ করা।

কিন্তু প্রথম মতের সমর্থকদের কথা হলো—ইচ্ছা করে পাওনা পরিশোধ না করলেই কেবল বাস্তব ক্ষতিপূরণ ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। এজন্যই দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে আরও এক মাস সময় অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেন এটি প্রমাণিত হয়, লোকটি কোনো কারণ ছাড়াই ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করছে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাস্তবে এসব শর্ত পূরণ করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক খেলাপি গ্রাহকই এ দাবি করবে যে, সে আসলে ঋণ আদায়ে অক্ষম। এদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক গ্রাহকের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়াও সহজ নয়। সাধারণত ব্যাংক এটিই ধরে নেয়, গ্রাহক ইচ্ছা করেই পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করছে। হ্যাঁ, কেবল আইনগতভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করা হলে তাকে অক্ষম বিবেচনা করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, কাউকে দেউলিয়া ঘোষণা করাও দুর্লভ ব্যাপার। আর এমন হলে সাধারণ সুদি ব্যাংকও তার থেকে সুদ নেয় না। ফলে কার্যত দেখা যাবে, সকল গ্রাহক থেকেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে। এতে সুদি ব্যাংকিংব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোনো তফাত থাকবে না।[৪০৭]

---

৪০৫. মালিক, ইমাম, আল মুওয়াত্তা, ২০১৭, ১৩৮০

৪০৬. ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া, বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৯৭, খ. ২৯, পৃ. ৪৩৯

৪০৭. উসমানী, ইসলামী ব্যাংকারি কী বুনিয়াদি, পৃ. ১৪২

আরও বলা হয়, জাহিলী রিবায় অতিরিক্ত অংশটি পূর্ব থেকেই ধার্য থাকে। এর সঙ্গে বাস্তব ক্ষতির কোনো সম্পর্ক থাকে না। অন্যদিকে আমাদের প্রস্তাবনায় অতিরিক্ত অংশটি পূর্ব থেকেই ধার্য হবে না। এর সঙ্গে বাস্তব ক্ষতির সম্পর্ক থাকে।

বস্তুত, ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণ ও দায় যথাসময়ে পরিশোধ না করার কারণে যে 'ক্ষতি' হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, এটি মৌলিকভাবেই স্বীকৃত নয়। কারণ, রিবা বা সুদ মূলত দাতার ক্ষতির বিপরীতেই ধার্য হয়ে থাকে। সুদের পক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় তাতে মূলত 'ক্ষতিপূরণ'-এর কথাই বলা হয়। ফলে সুদ ও প্রস্তাবিত 'আর্থিক ক্ষতিপূরণে'র মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য থাকে না।

এ ছাড়া আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, 'ক্ষতিপূরণ'-এর জন্য 'ক্ষতি হওয়াটা নিশ্চিত হতে হবে। এখানে তা অনুপস্থিত। যথাসময়ে টাকা আদায় হলে পাওনাদার লাভবান হয়ে যেত বিষয়টি এমন নয়।[৪০৮]

উল্লেখ্য, ধার, ঋণ বা পাওনার বিপরীতে কোনো প্রকার ক্ষতিই ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার পাওনা যথাসময়ে আদায় না হওয়ার কারণে আপনার ফিক্সড কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে—এমন ধারণার মূলেই রয়েছে গলদ। এর কারণ এই যে, ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ (Money)-এর কেবল উপকার স্বীকৃত নয়; বরং তা সবসময়ই লাভ-লোকসানের মধ্য দিয়ে যায়। লোকসান আছে বলেই তার থেকে লাভ আসে। এমন অবস্থা হয় না যে, শুধু লাভ বা প্রফিটই নির্দিষ্ট। এজন্যই ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ। কাউকে টাকা ধার দিয়ে এ কথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই, প্রদেয় টাকা থেকে কেবল লাভই হচ্ছে। অথবা আমার কাছে থাকলে কেবল লাভ-ই হতো। তাই আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে। এ ধারণা গোড়াতেই গলদ। এজন্যই ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ।[৪০৯]

মোটকথা, এভাবে ক্ষতিপূরণের নামে মেয়াদান্তে অতিরিক্ত গ্রহণ মূলত 'রিবাল জাহিলিয়্যা'-এর মধ্যে পড়ে যায়।

---

৪০৮. হাম্মাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

৪০৯. *তদেক*

আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামের সিদ্ধান্তসমূহ

বিশ্বের একাধিক আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামে প্রস্তাবিত 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ' ব্যাপকভাবে পরিত্যাজ্য হয়েছে। সংক্ষেপে শুধু ফোরাম ও রেজুলেশন নাম্বার উল্লেখ করা হলো—

- International Islamic Fiqh Academy, Jeddah, resolution No. 53[৪১০]
- Kuwait Finance House Fatawa No. 932[৪১১]
- AAOIFI Sharia Standards No. 3, Section 2/1/2[৪১২]

অগ্রগণ্য অভিমত

এ ক্ষেত্রে দালিলিক বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বিতীয় মতই অগ্রগণ্য। এর কারণ :

▪ প্রথম অভিমতটি রিবার সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়।

▪ ঋণ ও দায়ের বিপরীতে 'ক্ষতি' হয়েছে, এ কথা বলে অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যেখানে Cost বা ক্ষতিই স্বীকৃত নয়, সেখানে বাস্তব বা অবাস্তব ক্ষতির আলোচনাই অপ্রাসঙ্গিক।

▪ এভাবে নানা অজুহাতে ঋণ ও দায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত গ্রহণ অনুমোদন করা হলে এক সময় সকল রিবাই এই অজুহাতে বৈধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে আলাদা করে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি শাইখ ড. রফীক ইউনূস মিশরী অত্যন্ত চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

إن هذه الاقتراحات أخشى أن تتخذ ذريعة في التطبيق العملي إلى الربا، فتصبح الفائدة الممنوعة نظرياً تمارس عملياً باسم العقوبة "جزاء التأخير"، وينتهى الفرق إلى فرق في الصور والتخريجات فحسب، وأرى أن هذا الاقتراح من جنس اقتراحات أخرى عصرية مماثلة تحوم حول الحمى، وربما تؤول إلى الدخول من النوافذ بعد أن أقفل الباب.

৪১০. তদেক

৪১১. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৭২

৪১২. AAOIFI, Sharia Standards No. 3, Section 2/1/2

> এসব হালকা প্রস্তাবনা থেকে আমি দৃঢ়ভাবে আশঙ্কা করছি, এগুলো বাস্তব জীবনে রিবা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। নিষিদ্ধ সুদ বাস্তবে 'বিলম্ব জরিমানা' নামে প্রচলিত হয়ে যাবে। সবশেষে সুদ ও বিলম্ব জরিমানার মাঝে পার্থক্য থাকবে শুধু নাম ও বাহ্যিকতায়, বাস্তবতায় নয়। আমি মনে করি, এসব প্রস্তাবনা সমকালীন এমন প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত মূল আশ্রয়কেন্দ্রকেই উত্তপ্ত ও অনিরাপদ করে দেয়। কখনও এমন হয়, মূল ফটক তো বন্ধ করা হলো; কিন্তু জানালা দিয়ে নিষিদ্ধ বিষয় ঢুকে যায়।[৪১৩]

তিনি অত্যন্ত বাস্তসম্মত মন্তব্য করেছেন। সাবলীল ভাষায় অল্প কথায় মূল বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

সারকথা, ওই প্রস্তাবটিও দালিলিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য। তর্কের খাতিরে প্রস্তাবটি যদি মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে সাময়িক নানা সংকটে ইসলামী ব্যাংকগুলো কি এর আলোকে গৃহীত কম্পেনসেশন ফান্ড ব্যবহার করতে পারবে?

এর উত্তর হলো—না, তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, ইতোমধ্যে যে তহবিল তৈরি হয়েছে, এটি দানের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। দানের চুক্তি এতে পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক কেবল সেই দান বিতরণের প্রতিনিধি মাত্র। এর বাইরে সে কিছু করতে পারবে না। কিছু করতে হলে ভবিষ্যতে চিন্তা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতেও কি আলোচিত বিচ্ছিন্ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা যাবে? গবেষকদের মতে, এটিও সম্ভব হবে না। কারণ,

- এটি কেবলই একটি বিচ্ছিন্ন (শায) মত। বিশুদ্ধ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মতামতের বিপরীতে তা বাস্তবায়নের সুযোগ নেই।
- এটি বাস্তবায়নের জন্য যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। যেমন : খেলাপি অক্ষম/অসমর্থ প্রমাণিত না হওয়া।

- বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়া পরিপালন আইনি অবকাঠামো দ্বারা সুদৃঢ় নয়। এখন পর্যন্ত দেশে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে স্বতন্ত্র আইন নেই। এ পরিস্থিতিতে কোনো খেলাপি গ্রাহককে শরীয়া সমর্থিত 'সামর্থ্যবান' সাব্যস্ত করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।
- ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের মানদণ্ড কী হবে, এটি খোদ প্রথম মতের প্রবক্তাদের মধ্যেই বিতর্কিত বিষয়। একেকজন একেকরকম মানদণ্ড পেশ করেছেন। কোনো একটি মানদণ্ডের ব্যাপারে সকলে একমত হতে পারেননি। তাই যেটাই গ্রহণ করা হবে, সেটাই সমালোচনার শিকার হবে।

মোটকথা, যে বিষয়ে সুদের সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতাই প্রবল, সেখানে একটি বিচ্ছিন্ন মত গ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরকে কলুষিত করা নিতান্তই বোকামি হবে বলে মনে করি।

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খেলাপিকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা

কারও কারও মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে খেলাপিকে বাধ্য করবে; সরাসরি ব্যাংকই তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য করবে না।

এ কথাটিও গ্রহণযোগ্য নয়। খেলাপিকে তৃতীয় পক্ষ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করার কে?! এটি তখনও অনুদান বলে বিবেচিত হবে। অনুদান দিতে তো কাউকে বাধ্য করা যায় না! তা ছাড়া ঘুরেফিরে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক তো ব্যাংক বা ঋণদাতার পক্ষেই ওয়াকিল হয়ে কাজ করছে। আর ওয়াকিলের কাজ তো মূলের কাজ বলেই বিবেচিত হবে।

তা ছাড়া আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি, ঋণ বা পাওনার বিপরীতে কোনো প্রকার ক্ষতিই স্বীকৃত নয়। সেখানে জরিমানা আরোপের চিন্তাই অবান্তর।

সঠিক শরীয়া বিকল্প নির্দেশনা

এ ক্ষেত্রে বিকল্প কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা যায়—

১. তারল্য সংকট নিরসন ও ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংকের ব্যয় সংকোচন করা।

২. যেসব মর্টগেজ সম্পদ আছে, সেগুলো বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া। তবে এর আগে অবশ্যই গ্রাহককে অবহিত করতে হবে।

৩. তারল্য বৃদ্ধির জন্য বৈধ অন্য উপায় তালাশ করা। এর জন্য ব্যাংকার ও শরীয়া টিম যৌথভাবে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট কর্জে হাসানার প্রস্তাব করা।

৫. প্রণোদনা থেকে খেলাপি গ্রাহকদেরকে নতুন বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের আগে, পূর্বের পাওনা প্রদানের কথা বলা।

৬. খেলাপি গ্রাহকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে কনসালটেন্সির ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে কনসালটেন্সি প্রদানে শরীয়া-বিশেষজ্ঞ আলিমদেরকেও সম্পৃক্ত করা। তারা পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে ধর্মীয় নির্দেশনা ও অবস্থান স্পষ্ট করে দেবেন।

৭. খেলাপি গ্রাহকরা যেন ঋণ আদায়ে বাধ্য হয়, ব্লক চেইন টেকনোলজি ব্যবহার করে সেই ব্যবস্থা নেওয়া। এর মাধ্যমে খেলাপি গ্রাহকের যাবতীয় সম্পদের ডাটা সংরক্ষিত থাকবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপি হলে সেই সম্পদ দিয়ে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা হবে। এর মাধ্যমে তার বাস্তব অক্ষমতা বা সক্ষমতাও বিচার করা সহজ হবে।

৮. ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিয়ে যৌথ বৈঠক করা। ব্যাংকের এই কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে ব্যাংকের প্রতি সহমর্মী হতে উদ্‌বুদ্ধ করা। তাদেরকে পাওনা আদায়ে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা।

৯. যারা অসচ্ছল ও ঋণী ইসলামে কেবল তাদেরকে অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে; সচ্ছলদেরকে নয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে সকল গ্রাহককেই অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গলদ সিদ্ধান্ত। এতে ব্যাংক তার সচ্ছল গ্রাহকের পাওনা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে এর আশু সমাধান করা। সচ্ছলদেরকে পাওনা আদায়ের কথা বলা, আর কেবল অসচ্ছলদের জন্য ঋণ আদায় শিথিল করা।

১০. মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি কমিয়ে নিয়ে আসা। এর পাশাপাশি বাইউল ইসতিজরার (Supply contract), মুশারাকা ও মুদারাবার অনুশীলন করা; বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি খাতে, যেখানে বিনিয়োগ-ঝুঁকি তুলনামূলক কম। এ ছাড়া ইসতিসনা, সালাম, ইজারা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

এসব ক্ষেত্রে 'প্যানাল্টি ক্লজ' শরীয়া অনুমোদন করে। তবে যেকোনো শরীয়া প্রোডাক্ট ডিজাইন করার আগে তার জন্য অবশ্যই শরীয়া বোর্ড থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

দুটি বিশেষ বিকল্প প্রস্তাবনা

১. খেলাপি গ্রাহকদের মধ্যে যাদের কোম্পানি আছে তাদেরকে এই প্রস্তাব করা যেতে পারে যে, তাদের পাওনার বিপরীতে তাদের কোম্পানির ইক্যুইটি প্রদান করতে। ধরা যাক, স্কয়ার কোম্পানির কাছে ব্যাংকের ৫ কোটি টাকা পাওনা। তাকে প্রস্তাব করা হবে, এই ৫ কোটি টাকার বিপরীতে কোম্পানির ওই পরিমাণ ইক্যুইটি ব্যাংকের নামে দিয়ে দিতে। এরপর ব্যাংক সেটা সেল করে নগদ টাকা পেতে পারে।

শারয়ী দৃষ্টিতে এটি Sale of debt এর Sale of Debt to the Debtor-এর মধ্যে পড়ে। দায়গ্রস্ত ব্যক্তি তার পাওনা বা ঋণের বিনিময়ে দাতার কাছেই তার অন্য সম্পত্তি ট্রান্সফার করে দিয়েছে। এটি সকলের নিকটই বৈধ। এর এরাবিক টার্ম 'বাইউদ দাইন মিনাল মাদয়ুন' (بيع الدين من المديون)।[৪১৪]

২. যে পরিমাণ পাওনা আছে, এর বিপরীতে দায়গ্রস্ত গ্রাহকের কোম্পানির ওই পরিমাণ শেয়ার মর্টগেজ হিসেবে গ্রহণ করা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংককে ওই শেয়ারের ব্যাপারে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি প্রদান করা। যেন ব্যাংক যেকোনো সময় তা মুদ্রায়ন/নগদায়ন করতে পারে। এর মাধ্যমেও ব্যাংক নগদ টাকা পাবে। এটিও বৈধ।

কম্পেনসেশন ফান্ড : শরীয়া গভর্নেন্স

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব আলোচিত 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' হিসেবে যে ফান্ড গ্রহণ করে, সংক্ষেপে এর শরীয়া গভর্নেন্স তুলে ধরা হলো—

---

৪১৪. AAOIFI, Shariyah Standard 59;

এটি বৈধ হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত হলো—এ লেনদেনে কোনো রিবা সৃষ্টি না করা। সুতরাং ঋণ ও সম্পদের ভ্যালু সমান সমান হতে হবে। বিনিময়টি নগদ হতে হবে। সেটিও নতুন ঋণ বা দায় হতে পারবে না।

১. এই টাকা ব্যাংক ব্যতীত তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকবে। সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এটি সম্পূর্ণ আলাদা ট্রাস্টি বডি হবে। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকের কাছে থাকবে না। এটি ছিল ১৯৯২ সালে উলামায়ে কিরামের মৌলিক সিদ্ধান্ত। এটি যে কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত ছিল, তা বর্তমানে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। এ ফান্ড ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণেই আজ এর অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃতীয় প্রতিষ্ঠান এই টাকা সরাসরি গরিবদের দান করবে অথবা মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে।

৩. টাকায় কোনো মুনাফা যুক্ত হলে সেটিও দান করে দিতে হবে।

৪. এই টাকা ব্যাংকের মূল ইনকাম অ্যাকাউন্টে যুক্ত করা যাবে না। ব্যাংকের ন্যূনতম কোনো স্বার্থেও ব্যয় করা যাবে না।

৫. ব্যাংকের কোনো কাজে এই তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা যাবে না।

৬. ব্যাংকের প্রভিশন সংরক্ষণের জন্যও এ অর্থ ব্যয় করা যাবে না। যেখানে উলামায়ে কিরাম দান করতে গিয়ে ব্যাংকের নামও ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে সরাসরি ব্যাংকের স্বার্থে ব্যবহার করা কীভাবে বৈধ হবে! তা ছাড়া এর মাধ্যমে এ টাকা একটি ঝুঁকিতে পড়ে যায়। ব্যাংক কখনও দেউলিয়া হলে এ টাকা তখন সরাসরি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। সেখান থেকে ডিপোজিটরদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

৭. শরীয়া বোর্ডের কোনো সদস্যের দরিদ্র কোনো আত্মীয়কে এ টাকা প্রদান করা যাবে না। তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানকেও দেওয়া যাবে না।

৮. অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নাম, খ্যাতি সুনাম কিছুই ব্যবহার করা যাবে না।[৪১৫]

৯. উক্ত টাকা যোগ্য প্রাপকদেরকে কর্জে হাসানা বাবদ প্রদান করা যাবে।[৪১৬]

১০. ব্যাংকের প্রয়োজন দেখিয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আত্মসাৎ করা যাবে না।

---

৪১৫. উসমানী, *গায়র সুদি ব্যাংকারি*, পৃ. ২৮১

৪১৬. উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকারি কী বুনিয়াদি*, পৃ. ৭৭

বিশেষভাবে যা করা যাবে না

- পেমেন্ট আদায়ের সর্বশেষ তারিখকে এক্সপায়ার ডেট হিসেবে না দেখিয়ে, অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারে একে আরও বিলম্বিত করে দেওয়া অথবা নামেমাত্র নতুন চুক্তি করে ডোনেশনকে মূল মূল্য হিসেবে দেখানো। এটি যে স্পষ্ট সুদ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

- ডোনেশন ফান্ডের টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ, এটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে আলাদাভাবে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নেই। ব্যাংক নিজেই এই ফান্ডের পরিচালক। সুতরাং ঋণ আদায় প্রক্রিয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করি।

পাওনা আদায়ে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও পাওনা আদায় না করা

ঋণগ্রহীতা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনা আদায় না করলে, গড়িমসি করলে ঋণদাতা বা পাওনাদার ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার সঙ্গে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে পারে। যথা—

১. বারবার চাওয়া, কড়া কথা বলা। হাদীসে এসেছে, لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ-'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পাওনা আদায়ে গড়িমসি করে, তার সম্মানহানি করা যাবে এবং তার ওপর শাস্তি আরোপ করা যাবে।'[৪১৭]

২. ঋণদাতা যে ধরনের সম্পদ ঋণ দিয়েছিল, সেটার সমজাতীয় কোনো সম্পদ পেয়ে গেলে ঋণ পরিমাণ নিতে পারবে। এর জন্য অনুমোদন লাগবে না। যদি অন্য জাতীয় সম্পদ পায়, তাহলেও কিছু ফকীহের মতে নিতে পারবে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক খেলাপি গ্রাহকের কোনো অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা ঋণ পরিমাণ ডেবিট করতে পারবে।

৩. বিচারক বা আদালত খেলাপি ব্যক্তির ঋণের সমজাতীয় সম্পদ ঋণদাতার পক্ষে ঋণ পরিমাণ ফায়সালা দিতে পারবে। তদ্রূপ তার ঋণ ভিন্ন অন্য জাতীয় স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের ফায়সালাও দিতে পারবে। ঋণদাতা সেটা কিনে বিক্রয় করে তার পাওনা উসুল করতে পারবে। তদ্রূপ খেলাপি ব্যক্তির সম্পদ ভাড়ায় খাটানোর ফায়সালাও দিতে পারবে।

---

৪১৭. ইবনু হাম্বল, ইমাম আহমদ, *আল মুসনাদ*, হা. নং : ১৭৯৪৬

৪. খেলাপি ব্যক্তির নাম ব্ল্যাক লিস্টেট করা হবে। সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার সঙ্গে লেনদেন পরিত্যাগ করবে। বর্তমানে আধুনিক ব্লক চেইন টেকনোলজি ব্যবহার করে তা করা খুবই সহজ। তদ্রূপ তার সাক্ষ্যদানের ক্ষমতা খর্ব করা হবে। তার সঙ্গে কোনো ব্যাংক লেনদেন করবে না। তার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। তাকে বয়কট করা হবে। এ ধরনের আইন ও ফায়সালা দেওয়া যাবে।

৫. তাকে বন্দী করা যাবে; সরকারি প্রশাসন প্রহার করতে পারবে। তার যাবতীয় বিদেশ সফর মুলতবি করা হবে।

৬. তার ঋণ আদায়ের সকল কিস্তি সুবিধা রহিত করা হবে। সকল পাওনা নগদ আদায়যোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে।

৭. ঋণ উসুল করার জন্য যেসব খরচ হবে—আদালতে মামলা খরচ—, অন্যান্য যোগাযোগ খরচ ইত্যাদি খরচের টাকা ঋণখেলাপি থেকে আদায় করা হবে। তবে সেগুলো বাস্তবসম্মত হতে হবে।[৪১৮]

৮. মুরাবাহা লেনদেনে পণ্য যদি বহাল থাকে, তাহলে সেই পণ্য ব্যাংক ফিরিয়ে নিতে পারবে।

৯. চুক্তির শুরুতেই যথাসময়ে পাওনা আদায় না করা হলে ব্যাংকের চ্যারিটি ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে দান করার চুক্তি করা যাবে, যা 'ইলতিযাম বিত-তাবাররু' নামে পরিচিত।

১০. কোনো ফকীহ এ অনুমোদন দিয়েছেন, ঋণদাতা/পাওনাদার ঋণগ্রহীতার ওপর এরূপ শর্ত করতে পারবে যে, খেলাপি হলে, সে তৃতীয় কোনো তাবাররু-বেইসড ইসলামী বিমা কোম্পানিতে দান করে দেবে। সেখান থেকে উভয়ে উপকৃত হবে।[৪১৯]

---

৪১৮. AAOIFI, *Shariyah Standard*, 3Section 2/1/4

৪১৯. যুহাইলী, *দিরাসাতুল মাআয়ির*, পৃ. ২৩৮

অধ্যায় : ১২

বিবিধ

১. ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে যেসব গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তন্মধ্যে অন্যতম হলো—ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং (Fractional-reserve banking)।

উল্লেখ্য, রিজার্ভের দিক থেকে ব্যাংকগুলো দুটি সিস্টেমে কাজ করে থাকে—

ক. Full-reserve banking (সম্পূর্ণ রিজার্ভ ব্যাংকিং)। এটি 100% reserve banking (শতভাগ রিজার্ভ ব্যাংকিং) ও sovereign money system (সার্বভৌম অর্থব্যবস্থা) নামেও পরিচিত।

খ. Fractional-reserve banking (ভগ্নাংশীয় রিজার্ভ ব্যাংকিং)।

'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং' হলো একটি ব্যাংকিং সিস্টেম, যেখানে ব্যাংক 'ডিমান্ড ডিপোজিট' ধার দেয় না; পুরোটাই জমা রাখে। এর পরিবর্তে কেবল 'টাইম ডিপোজিট' থেকে ধার দেয়। এর বিপরীতে 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'-এ ব্যাংক সকল ডিপোজিটের ওপর ফান্ড ধার দিতে পারে। যেখানে ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ে ব্যাংককে প্রতিটি গ্রাহকের ডিমান্ড ডিপোজিটের সম্পূর্ণ অ্যামাউন্ট নগদে রাখতে হয়, যাতে তা তাৎক্ষণিক তোলা যায়, সেখানে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ে ব্যাংককে কেবল তাদের আমানত দায়গুলোর একটি ভগ্নাংশ রিজার্ভ হিসেবে রাখতে হয়। তদুপরি ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং ব্যাংককে তাদের রিজার্ভের চেয়ে বেশি অর্থ ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ তৈরি করতে দেয়।

দুটি পদ্ধতিরই সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিংব্যবস্থা ব্যাংক চালানোর ঝুঁকি দূর করে; তবে এটি ব্যাংকগুলোর মুনাফা অর্জন এবং ব্যাবসা ও ব্যক্তিদের ঋণ প্রদানের ক্ষমতাকেও সীমিত করে। অপরদিকে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রেডিটের বর্ধিত প্রাপ্যতা, যা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে পারে, সেইসঙ্গে ব্যাংকগুলোর মুনাফা অর্জনের এবং আমানতকারীদের রিটার্ন প্রদানের সম্ভাবনা। ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের রান এবং আর্থিক সংকটের ঝুঁকি, সেইসঙ্গে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ ঋণদানের অনুশীলনে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা। ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে আমানতকারীদের জন্য স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা, সেইসঙ্গে ব্যাংক রানের ঝুঁকি দূর করা। ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ঋণের সীমিত প্রাপ্যতা, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মন্থর করতে পারে, সেইসঙ্গে ব্যাংকগুলোর অদক্ষ এবং অলাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' পদ্ধতিটি সারা বিশ্বজুড়ে প্রচলিত এবং এটিই প্রামাণ্য ব্যাংকিংব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। এর অধীনে ব্যাংকগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতগুলোর একটি অংশ রিজার্ভ হিসেবে তরল সম্পদে রাখে, সাধারণত বাকি বেশির ভাগ আমানত ঋণগ্রহীতাদের ধার দেয়। ব্যাংকের রিজার্ভগুলো ব্যাংকে নগদ হিসেবে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স হিসেবে রাখা হয়।

উল্লেখ্য, ফুল ব্যাংকিং রিজার্ভ ব্যাংকগুলো তাদের রিজার্ভের চেয়ে বেশি অর্থ ধার দিতে পারে না। তাদেরকে প্রধানত গ্রাহকদের ওপর চার্জ করা ব্যাংকিং ফিগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং ও ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য হলো—টাকা তৈরিতে তাদের ভূমিকা। অর্থাৎ ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ পদ্ধতির অধীনে ব্যাংকগুলো 'নাই' (nothing) থেকে অর্থ সৃষ্টি করে। ব্যাংকগুলো অভিনব প্রক্রিয়ায় তাদের কাছে আমানত হিসেবে রাখা মোট অর্থের দশগুণের বেশি ঋণ প্রদান করতে পারে। আমানত থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো কৃত্রিম মুদ্রা সৃষ্টি করতে পারে। ধরুন, একটি ব্যাংক ১০০ টাকা আমানত পায়, ব্যাংক উক্ত জমা থেকে ১০ টাকা তারল্য রেখে বাকি ৯০ টাকা ধার দেয়। পুনরায় যে ৯০ টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে জমা হয়, যার মধ্যে ৯ টাকা তারল্য রাখা হয় এবং বাকি ৮১ টাকা ধার দেওয়া হয়। এভাবে একটি ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ আমানত থেকে বারবার ঋণ দিয়ে প্রায় দশগুণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ যদি এই প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে তাহলে প্রায় ১০০০ টাকা তৈরি হবে, ফিজিক্যাল বিলে নয়; ডিপোজিটে তৈরি হবে।[৪২০]

---

৪২০. https://www.linkedin.com/pulse/fractional-reserve-vs-full-banking-mustafa-qureshi

এ উদাহরণটাকে আরও একটু খোলাসা করি, ধরুন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেট করল, ব্যাংককে ডিপোজিটের ১০% ক্যাশ রিজার্ভ রাখতে হবে। এই ক্যাশ রিজার্ভ রাখা হয় দৈনন্দিন উত্তোলনের জন্য। ধরুন, ক্যাশ রিজার্ভ আছে ১০০%। ১০০০ টাকা ডিপোজিটের বিপরীতে ১০০০ টাকা ক্যাশ রিজার্ভ। যেহেতু ডিপোজিটের শুধু ১০% ক্যাশ রিজার্ভ রাখা লাগবে, তাই ব্যাংক ডিপোজিট বৃদ্ধি করতে থাকবে, যতক্ষণ না ক্যাশ রিজার্ভ ১০০০ ডিপোজিটের ১০% হয়। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে ব্যাংক ডিপোজিট বৃদ্ধি করবে? এর সহজ উত্তর হলো—লোনের মাধ্যমে! কেউ যখন লোন নিতে আসবে, তখন ব্যাংক লোন বৃদ্ধি করবে আর ডিপোজিটও সম পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেবে। এই কাজটা ব্যাংক করে প্রতিবার লোন দেওয়ার সময়। এখন ১০০০০ ডিপোজিটের ১০% ক্যাশ রিজার্ভ আছে ১০০০। এভাবেই ব্যাংক তৈরি করল ৯০০০ টাকা। এইভাবে ১০০০ টাকা ডিপোজিট নিয়ে ব্যাংক আরও ৯০০০ টাকা ডিপোজিট ক্রিয়েট করতে পারে, (১০০০/.১০)। লক্ষণীয় এই ৯০০০ টাকা ইকোনমিতে প্রবেশ করল সম্পূর্ণ লোন হিসেবে, যার ওপর সুদ চার্জ করা হবে। ধরলাম, ডিপোজিটের ওপর সুদের হার ৫% আর লোনের ওপর ১০%। এই দুই সুদের ব্যবধানটাই ব্যাংকের প্রফিট। ৯০০০ টাকা লোনের ওপর ১০% সুদ ৯০০ টাকা এবং ডিপোজিট ১০০০০-এর ওপর ৫% সুদ ৫০০ টাকা। ব্যাংকের প্রফিট (৯০০-৫০০) = ৪০০ টাকা। ব্যাংকের মুনাফা ৪০০ টাকা প্রকৃত ডিপোজিট ১০০০-এর ৪০%! এভাবে ব্যাংক হাওয়া থেকে টাকা তৈরি করে মানুষকে লোন দেয় এবং এর ওপর সুদ চার্জ করে।

অনেকেই এই ব্যাপারটা ধরতে পারেন না। কীভাবে ব্যাংক ১০০০ টাকার বিপরীতে ৯০০০ টাকা লোন দেয়! আমি লোন নিলে তো পুরো টাকা তুলে খরচ করব। ব্যাংককে তো আমাকে প্রকৃত টাকাই দিতে হবে। ধরুন, আপনি লোনের টাকা দিয়ে ১ কেজি কমলালেবু কিনেছেন। এখন আপনি যার কাছ থেকে কিনলেন, সেও তার টাকা ব্যাংকেই ডিপোজিট করবে। এবার একটু বড়ো লেভেলে চিন্তা করুন। ১০০০ টাকা নয়; ১০০০ কোটি টাকা। কেউ কি এই টাকা নিজের হাতে রাখবে? না। এই টাকা ব্যাংকে জমা দেবে, আর নিজের প্রয়োজনে উত্তোলন করবে প্রতিদিন কিছু অংশ। পুরো ইকোনমিতে এই অংশটা হলো ১০%, মোট ডিপোজিটের। এই টাকাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাপায় বা ইস্যু করে। ইকোনমিতে যেই টাকা একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে লেনদেন হয়, আমরা দেখি, তা হলো ১০%। বাকি ৯০% টাকার, যা ব্যাংক

তৈরি করে, আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই, এমনকি তা পেপার মানিও নয়। ব্যাংক যা তৈরি করে তা কম্পিউটারের এক্সেল শিটে কিছু অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড। কিন্তু এই অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডই মানুষ লোন নেয় এবং এর ওপর ইন্টারেস্ট দেয়![৪২১] এই যে ব্যাংকের কাছে থাকা টাকার অতিরিক্ত টাকা ঋণ দিয়ে দিলো—এটিই হলো 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং' মূলত একটি সহজ-সরল ব্যাংকিং প্রক্রিয়া। ধরুন, ব্যাংকের হাতে ১০০০ টাকা আছে, তন্মধ্যে ডিমান্ড ডিপোজিট হলো ৬০০ টাকা; বাকি ৪০০ (চারশত) টাকা টাইম ডিপোজিট। ব্যাংকটি যদি ফুল রিজার্ভ ব্যাংক হয়, তবে সে ১০০০ টাকার মধ্যেই ৬০০ টাকা হাতে রেখেই সর্বোচ্চ ৪০০ (চারশত) টাকা ধার দিতে পারবে। পক্ষান্তরে 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' হলো একটি অত্যন্ত লাভজনক কূটকৌশল। ধরুন, ব্যাংকের হাতে ১০০০ টাকা আছে, ব্যাংকটি যদি ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংক হয়, তাহলে সে পুরো ডিপোজিটের ওপর ফান্ড ধার দিতে পারে; তাকে ডিমান্ড ডিপোজিটের সম্পূর্ণ অ্যামাউন্ট নগদে জমা রাখতে হয় না। অধিকন্তু, এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক এমন টাকা তৈরি করতে পারে, যার মালিক সে নিজেও নয় এবং সে বানানো টাকা ঋণ দিয়ে তার ওপর সুদও নিতে পারে।

এ ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভের হার, যাকে 'রিজার্ভ রেশিও'-ও বলা হয় সারা বিশ্বে এক সমান নয়। একেকটি দেশের রিজার্ভ রেশিও একেক রকম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এটি নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুযায়ীই ব্যাংকগুলো তাদের হাতে সঞ্চিত টাকাগুলোকে বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, যে দেশের রিজার্ভ রেশিও যত কম, সেই দেশের ব্যাংকগুলো তত বেশি টাকা তৈরি করতে পারে এবং যে দেশের রিজার্ভ রেশিও যত বেশি, সেই দেশের ব্যাংকগুলো তত কম টাকা তৈরি করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর জন্য বর্তমান রিজার্ভ রেশিও হচ্ছে ৫%। এর অর্থ দাঁড়ায় বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাংক ১০০ টাকাকে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকাতে রূপান্তর করে ঋণ দিতে পারবে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান রিজার্ভ রেশিও যদি ১০% হতো, তাহলে ব্যাংকগুলো ১০০ টাকাকে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকাতে রূপান্তর

---

৪২১. https://www.muslimmedia.info/2016/01/09/fractional-reserve-banking-how-bank-create-money

করতে পারত এবং রিজার্ভ রেশিও ১% হলে ১০০ টাকাকে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকাতে রূপান্তর করে ঋণ দিতে পারত এবং তার ওপর সুদ অর্জন করতে পারত।

সুতরাং দেখা যায়, বাজারে সরবরাহকৃত মুদ্রার সিংহভাগই ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম অর্থ। এখানে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল অর্থের পরিমাণ খুবই কম। বর্তমানে অনেক দেশে সরকারের ইস্যুকৃত প্রকৃত অর্থের অনুপাত কমে যাচ্ছে; বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক 'নাই' থেকে সৃষ্টি করা কৃত্রিম অর্থের অনুপাত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে সে দেশে মোট অর্থ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬৮০ বিলিয়ন পাউন্ড; এর মধ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ ছিল ২৫ বিলিয়ন পাউন্ড, যা মোট অর্থের ৩.৬% মাত্র। বাকি ৬৫৫ বিলিয়ন পাউন্ডই ছিল ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম মুদ্রা। অর্থাৎ মোট অর্থ সরবরাহের ৯৬.৪% হচ্ছে কৃত্রিম বা উদ্ভূত অর্থ। এটি কেবল সংখ্যা; কম্পিউটার দিয়েই এ সংখ্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পেছনে বাস্তব দ্রব্যসামগ্রীর কোনো অস্তিত্ব নেই।[৪২২] একে বলা যায়, শূন্যের ওপর সৃষ্ট শূন্যের বুদ্‌বুদ। এই বুদ্‌বুদ যেকোনো মুহূর্তে ফেটে গলে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মহাসংকট।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকগুলোও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর এত 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ' নীতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য, এরূপ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা শরীয়া আইনে মোটেই সিদ্ধ নয়। হাদীসে এসেছে, لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ-"যা তোমার অধিকারে নেই তা তুমি বিক্রি করো না।"[৪২৩] এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রিজার্ভে টাকা নেই—এ অবস্থায় টাকা বিনিয়োগ করা বৈধ হবে না। অনেক গবেষক এ পদ্ধতিকে চুরির সাথে তুলনা করেছেন। ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণও এটা স্বীকার করেন যে, এটা বৈধ পদ্ধতি নয়; তবুও ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণ সুদি ব্যাংকের এত 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ পদ্ধতি' চালিয়ে যাচ্ছে।[৪২৪]

---

৪২২. তকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ*, পৃ. ৮৮; রহমতুল্লাহ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ১৬২

৪২৩. আবু দাউদ, *আস সুনান*, হা. নং : ৩৫০৫; হাদীসটি সহীহ।

৪২৪. পাটোয়ারি, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শুভঙ্করের ফাঁকি*, পৃ. ৬১-৬২

শরীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের পর্যালোচনা করে ইতোমধ্যেই কিছু গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে, ফ্র্যাকশনাল রির্জাভ ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক থেকে কিছু গুরুতর আপত্তি রয়েছে। যেমন—

প্রথমত, যেহেতু ব্যাংকগুলোই মানুষের লেনদেনে ব্যবহৃত টাকার একমাত্র উৎস, তাই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম সমগ্র অর্থনীতিতে পণ্য এবং মানুষের প্রচেষ্টাকে একধরনের মূল্যহীন করে তুলে। শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য হলো যে, একটি বিনিময় বৈধ হওয়ার জন্য তা দুটি মূল্যমানসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে পরস্পর বিনিময় হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে যেকোনো ব্যত্যয়কে কৌশলবাজি ও প্রতারণার একটি রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সিদ্ধ নয়।

কাজেই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম প্রক্রিয়ায় তৈরি কম্পিউটার ইনপুটগুলো যেহেতু সত্তা বা মূলগতভাবে মূল্যমানসম্পন্ন নয়; মূল্যের একটি কৌশলমাত্র, তাই এ জাতীয় সিস্টেম শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হবে না।

দ্বিতীয়ত, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে মুদ্রা সৃষ্টি করা ইসলামী আইনের পরিপন্থি। কারণ, সেই সৃষ্ট মুদ্রা ন্যূনতম কোনো প্রচেষ্টা ও ঝুঁকি ছাড়াই শূন্য থেকে সংঘটিত হয়। উপরন্তু, এই মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা রয়েছে, এর মানে হলো—শূন্য থেকে সম্পদ তৈরি করা। কাজেই ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতিতে যে সমস্ত মুদ্রা তৈরি করে তা প্রকৃতপক্ষে কোনো সম্পদ নয়; বরং তা হলো কেবল কম্পিউটারের কতিপয় ইনপুট, যার কোনো মূল সত্তাগত মূল্য নেই বা প্রকৃত কোনো পণ্য দ্বারা সমর্থিতও নয়।

তৃতীয়ত, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম সেই মুদ্রা লেনদেনের মধ্যে পড়ে, যা কার্যত ব্যাংকের মালিকানাধীন নয়। এ সিস্টেমকে সেই নিয়মের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যেখানে ইসলাম এমন কিছু ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় নিষিদ্ধ করেছে, যা আমাদের কার্যত মালিকানাধীন নয়।

চতুর্থত, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে মুদ্রা তৈরির প্রক্রিয়াটি সুদের চেয়ে আরও বিপজ্জনক অনুশীলন। কারণ, সুদ থেকে যা বাড়তি অর্জন করা যায় তা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের বিপরীতে, আর ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম থেকে যা বাড়তি অর্জন করা হয় তা বিনিময়বিশেষ; কিন্তু কোনোকিছুর বিপরীতে নয়।

ইসলামী ব্যাংকগুলো অন্যান্য সুদি ব্যাংকের এত যেহেতু শূন্য থেকেই মুদ্রা তৈরি করতে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম ব্যবহার করে, তাই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত লেনদেন এবং চুক্তিও ইসলামে নিষিদ্ধ হবে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদের লেনদেনের ক্ষেত্রে যে পাপ করবে, এ প্রক্রিয়ায় মুদ্রা তৈরিতে তার চেয়েও বড়ো পাপ করবে। কারণ, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ প্রতারণা ও জালিয়াতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। এ দিক বিচারে ইসলামী ব্যাংকগুলো মোটেই ইসলামিক নয়।

অন্য অনেকের মতে, ইসলামী ব্যাংকগুলোকে যদি মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থার অধীন করা না হয় এবং ব্যাংকগুলো নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে চলে, তবে কোনোরূপ শারয়ী বাধা নেই।

পক্ষান্তরে কোনো কোনো গবেষক আইনগত রিজার্ভের বৈধতার কথা উল্লেখ করে বলেন, যদি আমরা আইনগত রিজার্ভের প্রকৃতি বিবেচনা করি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে দুটি মাসলাহাতের মুখোমুখি হতে দেখতে পাই। একটা মাসলাহাত হলো বিশেষভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য, যা বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটি নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক মাসলাহাত। অপর মাসলাহাত হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত, যা মুদ্রাস্ফীতি নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটি একটি পাবলিক মাসলাহাত (জনস্বার্থ)। যেহেতু দুটি মাসলাহাতই ইসলামী আইন অনুসারে বিবেচনা করা হয় এবং উসুল শাস্ত্রে তারজীহ-এর স্বীকৃত নীতিমালা অনুসারে দুটি মাসলাহাতের মধ্যে তারজীহের পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, তাই নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক মাসলাহাতের চেয়ে পাবলিক মাসলাহাত (জনস্বার্থ) প্রাধান্য পাবে।

এ কারণে কেউ কেউ বলেন—কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলক রিজার্ভ প্রক্রিয়ার অধীনে তাদের আমানতের একটি অংশ তার কাছে জমা রাখার জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জনস্বার্থে শরীয়া অনুসারে অনুমোদিত।

বিজ্ঞ গবেষকগণ মনে করেন যে, দু-পক্ষের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্র অভিন্ন নয়। কারণ, যাদের মতে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ নিষিদ্ধ তাদের নিষিদ্ধকরণ নীতিগতভাবে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভের কারণে নয়; বরং তা থেকে উদ্ভূত ক্রেডিট প্রদান ও মুদ্রা সৃষ্টির কারণে অথবা উৎপন্ন আমানতের কারণেই। অন্যায়ের পথ রুদ্ধকরণের নিমিত্ত এ সিস্টেমটিকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অন্যথায় নীতিগতভাবে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভের অধীনে আমানতকারীদের আমানত সংরক্ষণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঈপ্সিত বিবেচ্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে দু-পক্ষের মধ্যে কোনোরূপ মতবিরোধ নেই। অর্থনীতিবিদ মুরীস আলীহ দু-পক্ষের মতবিরোধের ক্ষেত্র প্রসঙ্গে বলেন—

> ক্রেডিট মেকানিজম—বর্তমান প্রচলনানুসারে—নির্ভর করে আমানতের ফ্র্যাকশনাল কভারের ওপর, শূন্য থেকে মুদ্রা তৈরির ওপর, স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে গৃহীত সম্পদ থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণের ওপর। এসবের অবস্থা হলো—নানা স্পষ্ট ত্রুটিসমেত সম্পদের বড়ো ধরনের বৃদ্ধি ঘটানো। বাস্তবতা হলো, ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে সকল বড়ো বড়ো সংকটের উদ্ভব ঘটেছে ক্রেডিটের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি, ঋণ প্রদানের অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি ও তাদেরকে মুদ্রায় রূপান্তর থেকে।

মোটকথা, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভে মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত বিষয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার মতটি যথার্থই এবং এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। অনেকেই এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কেবল 'ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং' পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেন; আমরা মনে করি, কষ্ট হলেও ফুল রিজার্ভের ভিত্তিতে ব্যাংক পরিচালনা করা সম্ভব। টাকা তৈরি করেই বিনিয়োগ করতে হবে—এমন কোনো শর্ত নেই। তবে সমস্যা হলো—ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি শতভাগ রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট মেইনটেন করে এবং অন্য ব্যাংকগুলো এভাবে লোন দিতে থাকে আর টাকা তৈরি করতে থাকে, তবে ইসলামিক ব্যাংকগুলো কম্পিটিশনে পিছিয়ে যাবে এবং অর্থনীতিতে তাদের টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে। এ কারণে আধুনিক ফকীহদের অনেকেই যেহেতু এ সিস্টেমটা মুসলিমদের পক্ষে সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তাই তারা সাময়িকভাবে এটাকে বৈধ বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা الضرورات تبيح المحظورات-'একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে নিষিদ্ধ বস্তুও বৈধ হয়ে যায়'—ফিকহের এ প্রসিদ্ধ সূত্রকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তবে তারা সাথে এ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন, যেন মুসলিমরা এটা চর্চা করতে গিয়ে কোনোরূপ রিবা (সুদ), গারার (অনিশ্চয়তা) ও কিমার (জুয়া)-এর এত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর সাথে জড়িত না হয়।

২. কলমানি/কল ডিপোজিট

'কলমানি' বলতে বোঝায় আন্তঃব্যাংক ঋণ প্রদান এবং গ্রহণকে। অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্য এক ব্যাংক অন্য ব্যাংক থেকে চাহিবামাত্র পরিশোধ করার শর্তসাপেক্ষে যে ঋণ গ্রহণ করে তাই কলমানি। এটা এক দিনের জন্যও হতে পারে। এর বেশি দিনের জন্যও হতে পারে। ব্যাংকগুলো সাধারণত তিনটি মাধ্যমে একে অপরের কাছ থেকে অর্থ ধার করে। এক দিনের জন্য কলমানি ঋণ, দুই থেকে ১৪ দিনের জন্য স্বল্প নোটিশ ঋণ, ৯০ থেকে ১৮০ দিনের জন্য মেয়াদি ঋণ।

ব্যাংকগুলোতে নগদ অর্থের চাহিদা বেড়েছে। এর ফলে আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে স্বল্প সময়ের জন্য ধার করা অর্থের সুদের হার বা কলমানি রেটও বেড়েছে। ২০১৬ সালের মে মাসের পর এখন সর্বোচ্চ লক্ষ করা যাচ্ছে কলমানি রেট। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৮ সালের মে মাসে কলমানি গড় সুদহার ছিল ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ওই বছর শেষে কলমানি মার্কেটের গড় সুদহার ৩ দশমিক ৭৩। ২০১৭ সালের শেষে ছিল ৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। ২০১৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪ দশমিক ৬১ শতাংশে। ২০১৯ সালের শেষে এ হার ছিল ৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে শেষে এ হার ৯.১৩ শতাংশ পর্যন্ত ওঠেছে।

ব্যাংক-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ সুদহার বাড়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে একদিকে ব্যাংকগুলো গ্রাহকের পর্যাপ্ত আমানত পাচ্ছে না, অপরদিকে নগদ টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকগুলোর ধার করার পরিমাণ বাড়ছে। তা ছাড়া ব্যাংকগুলোর ব্যাপক নগদ তারল্য ডলার কিনতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে গেছে। সেজন্য কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংকে নগদ টাকার টান পড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে কলমানি বাজারে।

উল্লেখ্য, প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো পরস্পর যেখানে নির্দিষ্ট হারে সুদে টাকা ধার নেয়, সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলোও পরস্পর, আবার প্রয়োজনে কখনও প্রচলিত সুদি ব্যাংকগুলো থেকেও নির্দিষ্ট মুনাফা পরিশোধের শর্তে টাকা ধার নিয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা দাবি রাখে : ক. প্রচলিত সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও খ. নির্দিষ্ট মুনাফা প্রদানের শর্তারোপ।

ক. প্রচলিত সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন

প্রচলিত সুদি ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন বৈধ হবে কি না—তা একান্তই গবেষণার বিষয়। ক্লাসিক্যাল ফিকহের কিতাবসমূহে 'অমুসলিমের সাথে মুদারাবা' শিরোনামে বিশিষ্ট ফকীহগণ এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। হানাফী ও হাম্বলী ফকীহগণের মতে, অমুসলিমদের সাথে মুদারাবা মোটের ওপর বৈধ। অর্থাৎ অমুসলিম 'সাহিবুল মাল'/ক্যাপিটাল প্রোভাইডার/মূলধন জোগানদাতা অথবা 'মুদারিব'/ম্যানেজার/উদ্যোক্তা হওয়া বৈধ।

বিশিষ্ট ফকীহ আল-কাসানী রাহ. বলেন, মুদারাবার ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয় যে, রব্বুল মাল বা মুদারিব (উদ্যোক্তা) কোনো পক্ষ মুসলিম হতে হবে। তাই মুসলিম এবং যিম্মী (দেশীয় অমুসলিম নাগরিক) অথবা দেশীয় অমুসলিম নাগরিক এবং নিরাপত্তাশ্রিত বিদেশি অমুসলিম নাগরিক (আল-হারবী আল-আল-মুস্তাামিন)-এর মধ্যে মুদারাবা বৈধ। এমনকি, যদি ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো অমুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে এবং সে কোনো মুসলিম নাগরিককে মুদারাবায় তার সম্পদ বিনিয়োগ করে অথবা কোনো মুসলিম তাকে মুদারাবার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করে, তবে তা বৈধ হবে। কেননা, আমাদের দেশে নিরাপত্তাশ্রিত অমুসলিম দেশীয় অমুসলিম নাগরিকের পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু দেশীয় অমুসলিম নাগরিকের সাথে মুদারাবা কারবার বৈধ, তাই অমুসলিম বিদেশি নাগরিকের সাথেও মুদারাবা কারবার বৈধ।[৪২৫]

পক্ষান্তরে শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবের ইমামগণের মতে, অমুসলিমদের সাথে মুদারাবা বা মুশারাকা কারবারে অংশগ্রহণ মাকরূহ। মালিকী মাযহাবের একটি মতানুযায়ী যিম্মী তথা দেশীয় অমুসলিম নাগরিকের সাথে মুদারাবা কারবার হারাম বা নিষিদ্ধ। ইমাম মালিক রাহ. বলেন—

> لا أحب للرّجل أن يقارض رجلاً إلا رجلاً يعرف الحرام والحلال, وإن كان رجلاً مسلماً فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئاً من الحرام.

> কেবল হালাল-হারাম সম্পর্কে অবহিত লোক ছাড়া অন্য কারও সাথে মুদারাবা করা আমি পছন্দ করি না, এমনকি সে মুসলিম হলেও। কাজেই কারও এমন কারও সাথে মুদারাবা করা আমি পছন্দ করি না, যে ব্যক্তি কোনো হারামকে হালাল মনে করে।[৪২৬]

---

৪২৫. কাসানী, *বদায়িউস সানাই*, খ. ৬, পৃ. ৮১

৪২৬. *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩৮, পৃ. ৪৩

কোনো কোনো গবেষক উপর্যুক্ত মতামতের ভিত্তিতে এ কথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে, উপরিউক্ত হানাফী ও হাম্বলী ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে কনভেশনাল ব্যাংকের সাথে মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে লেনদেন করা বৈধ। ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল প্রোভাইডার হোক বা মুদারিব দুটির যেকোনো ভূমিকা রাখতে পারে। কনভেনশনাল ব্যাংকও মুদারাবার যাবতীয় বিধিবিধান অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংক থেকে ক্যাপিটাল/মূলধন নিতে পারে। অন্তত থিউরিটিক্যাল কোনো সমস্যা নেই, যদি অপারেশনাল প্রবলেম সমাধান করতে পারে।

আমরা মনে করি, বিষয়টি নিয়ে যেহেতু মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, তাই পারতপক্ষে কনভেনশাল সুদি ব্যাংকগুলোর সাথে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুদারাবা বা মুশাকারা কারবারে অংশগ্রহণ করা সমীচীন নয়। এটি প্রকারান্তরে কনভেনশনাল সুদি ব্যাংকগুলোকে সমর্থন-সহযোগিতা করার নামান্তর। দ্বিতীয়ত, যিম্মী বা হারবী-মুস্তামিনের সাথে মুদারাবার ওপর কিয়াস করে এরূপ সাধারণ বিধান প্রতিপাদন করার চেষ্টাও সমীচীন নয়। কারণ, যিম্মী বা হারবী-মুস্তামিন হলেই যে তারা সবসময় সুদি কারবার করে তা নয়; তারা অনেক সময় সুদবহির্ভূত সাধারণ কারবারও করে থাকে।

কাজেই ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে পরস্পর একে অপর থেকে ধার নেবে—এটাই সাধারণত নীতিগতভাবে একান্ত কাম্য; তবে একান্ত প্রয়োজনে অনন্যোপায় অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি কনভেনশাল ব্যাংকগুলো থেকে মুদারাবায় ধার নেয়, তবে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এরূপ ধার নেওয়ার ক্ষেত্রে কেস টু কেস শরীয়া বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে। তারা এ ক্ষেত্রে দেখবেন, এ প্রয়োজন কতটুকু; অধিকন্তু, এ সমস্যা তৈরির প্রকৃত কারণ কী এবং এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনো গাফলতি বা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা আছে কি না—তাও যাচাই করে দেখবেন।

খ. নির্দিষ্ট মুনাফা পরিশোধের শর্তারোপ

ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুদ বা নির্দিষ্ট হারে মুনাফার বিপরীতে কোনো ধরনের আমানত সংগ্রহ বা ধার নিতে পারে না—এটাই স্বীকৃত বিষয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসলামী ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট হারে মুনাফা

পরিশোধের শর্তে যে ধার নেয়, তা সুদি ইন্সট্রুমেন্ট নয়; বস্তুত তা ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট স্কিমের আওতায় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যা হলো—

- সুদি ঋণ ও মুদারাবা ডিপোজিট : সুদ হচ্ছে, ক্যাপিটাল ওনার কর্তৃক কোনো রিস্ক ছাড়া গ্রহীতা থেকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে পূর্বনির্ধারত হারে অর্থ লাভ করা। প্রচলিত ব্যাংকের এমন অর্থলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া লোন বা ঋণ এবং সময়ান্তে আর্নিংকে সুদ বলা হয়। পক্ষান্তরে মুদারাবা হচ্ছে, ক্যাপিটাল ওনারের মূলধন এবং উদ্যোক্তার লেভার/শ্রম দিয়ে যদি প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জিত হয়, তবে তা পূর্বনির্ধারিত হারে উভয় পক্ষের মাঝে বন্টনের চুক্তি করা। একইসাথে মুনাফা অর্জিত না হয়ে পুঁজির ক্ষতি হলে ক্যাপিটাল ওনার মূলধন এবং লেভার তার শ্রমের ক্ষতি মেনে নেওয়া।

- মুদারাবা এসএনডি : সাধারণত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারল্য সংকট হলে 'কলমানি' বা মানি মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে সংকট পূরণ করে। প্রচলিত ব্যাংকগুলো এ কাজ সুদের ভিত্তিতে করে থাকে। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক থেকে ব্যাংক স্বল্প সময়ের অর্থের প্রয়োজন পূরণে 'মুদারাবা এসএনডি' অ্যাকাউন্ট ওপেন করে থাকে। মুদারাবার ভিত্তিতে ডিসাইন করা অনেকগুলো ইন্সট্রুমেন্টের মাঝে 'মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট' ইসলামী ব্যাংকের একটি শরীয়া অনুমোদিত প্রোডাক্ট। কোনো কোনো ব্যাংক 'মুদারাবা শর্ট নোটিশ ডিপোজিট' নামে তা পরিচালনা করে।

- প্রভিশনাল রেট এডজাস্টাবল আফটার ফাইনালাইজেশন : মুদারাবা চুক্তির দু-পক্ষ প্রথমে একটি প্রাক্কলিত হার ঘোষণা করে, যাতে শরীয়ার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। তবে হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর তা অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী দু-পক্ষ তাদের মুনাফা এডজাস্ট করবে। ইসলামী ব্যাংকগুলো 'মুদারাবা এসএনডি' অ্যাকাউন্ট শরীয়ার বিধি মেনে মুনাফা সমন্বয় করে থাকে।[৪২৭]

---

৪২৭. তাজাম্মুল হক, ইসলামী ব্যাংক : সুদি ঋণ গ্রহণের অভিযোগ ও জবাবের শরঈ প্রেক্ষিত, দ্র. https://www.mohioshi.com/report/ ইসলামী-ব্যাংক-সুদি-ঋণ-গ্রহণ

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবার যাবতীয় বিধি অনুসরণ করে 'মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট' পরিচালনা করতে পারে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সমস্যা হলো— প্রাক্কলিত মুনাফার হার, যা বছরান্তে হিসাব-নিকাশ শেষে ফ্ল্যাকচুয়েট করে সেই অনুসারে তা অনেক সময় সমন্বয় করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত মুনাফার হারটিই ঠিক রেখে কারবার সম্পন্ন করা হয়।

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আমানত/ঋণ সংগ্রহ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে মোট আমানতের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদে দৈনিক ন্যূনতম ৩ শতাংশ এবং দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ৪ শতাংশ হারে সিআরআর (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও) রাখতে হয়। এ ছাড়া আমানতের সাড়ে ৫ শতাংশ রাখতে হয় 'বিশেষ বিধিবদ্ধ জমা—এসএলআর' হিসেবে। এ দু-ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জরিমানার মুখে পড়তে হয় ব্যাংকগুলোকে।

সম্প্রতি দেখা গেছে, এ দুটি ক্ষেত্রেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি-তে ঘাটতি দেখা দেয় এবং কোনো বিকল্প না পেয়ে সংকট ও জরিমানা এড়াতে 'ডিমান্ড প্রমিজরি নোট'[৪২৮] ব্যবস্থার আশ্রয় নেয় ব্যাংকটি। এ ব্যবস্থার আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট মুনাফা পরিশোধের শর্তে ব্যাংকটিকে ঋণ নেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি দেশে প্রথমবারের মতো ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোর কলমানি মার্কেট থেকে ধার নেওয়ার সুবিধা দিতে 'ইসলামিক ব্যাংকস লিক্যুডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)' নামে তহবিল চালু করে। সরকারের ইসলামিক সুকূক বন্ডে (বিজিআইএস) থাকা বিনিয়োগ জামানত হিসেবে রেখে এ তহবিল থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে অর্থ ধার নিতে পারে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রচণ্ড তারল্য সংকটে পড়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি প্রচলিত ধারার ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য সুদের চেয়ে বেশি হারে মুনাফায় অর্থ ধার নিয়েছিল। এ ছাড়া এ ব্যাংকটির আর কোনো বিকল্পও ছিল

৪২৮. এ নোটের অর্থ হলো কোনো কারণে ব্যাংকটি দেউলিয়া হলে তার সম্পদ বিক্রি করে যে অর্থ আসবে, তা থেকে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায় মেটানো হবে।

না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নগদ টাকা ধার করার অন্য পদ্ধতিটিও (যেমন—সুকূক বন্ডের মাধ্যমে টাকা নেওয়ার সুযোগ) ব্যাংকটি আগেই নিয়ে ফেলেছিল। আবার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নগদ টাকার চাহিদা মেটাতে অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের এত রেপোতে[৪২৯] ধারের সুযোগ নেই শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলোর, যে কারণে 'ডিমান্ড প্রমিজরি নোট' নেওয়া ছাড়া বিকল্প ছিল না ব্যাংকটির।

আমরা মনে করি, ইসলামী ব্যাংকগুলো একান্ত প্রয়োজনে নিজস্ব নীতিমালা অনুসারে নির্দিষ্ট হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আমানত সংগ্রহ বা ধার নিতে পারে—যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সমস্যা হলো—মুনাফার যে হার চুক্তিতে নির্ধারণ করা হয়, তা অনেক সময় কাগজে-কলমে প্রাক্কলিত বলা হলেও কার্যত সেটাই চূড়ান্ত রূপ পায়। এরূপ অবস্থায় তা সুদি কারবারে পরিণত হবে।

আমরা আরও মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এরূপ ধার নেওয়ার ক্ষেত্রে কেস টু কেস শরীয়া বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে। তারা এ ক্ষেত্রে দেখবেন, এ প্রয়োজন কতটুকু; অধিকন্তু, এ সংকট তৈরির প্রকৃত কারণ কী এবং এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনো গাফলতি বা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা আছে কি না—তাও যাচাই করে দেখবেন।

৩. ইসলামী আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেটে লেনদেন

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে চালু হয়েছে ইসলামী আন্তঃব্যাংক মানি মার্কেট, যা ইসলামী ব্যাংকগুলোর একে অপরের মধ্যে অতিরিক্ত তারল্য লেনদেনের পথ প্রশস্ত করবে। তবে এই ইন্সট্রুমেন্টগুলো কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোর সাথে তারল্য লেনদেনে ব্যবহার করা যাবে না।

---

৪২৯. রেপো হলো একধরনের স্বল্পমেয়াদি ঋণ, যা জামানত হিসেবে বন্ড দ্বারা সমর্থিত। যখনই একটি ব্যাংকের তহবিলের ঘাটতি থাকে, তখন ব্যাংকটি সাধারণত মুদ্রানীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে। সাধারণত রেপোর মাধ্যমে ঋণ নেওয়া হয়। রেপো রেট হলো সেই হার, যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিকিউরিটিজের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে স্বল্পমেয়াদি অর্থ ধার দেয়। যখন বাজারে তারল্য সংকট থাকে, তখন এটি আরও প্রযোজ্য।

ইসলামী শরীয়াভিত্তিক তফসিলি ব্যাংক কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার তফসিলি ব্যাংক কোম্পানির ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর সুসংহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামী আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেটে লেনেদেনের নীতিমালা নিম্নরূপ :

ক. ইসলামী শরীয়াভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলো তাদের উদ্‌বৃত্ত তহবিল ইসলামী বন্ড ফান্ডের (আইবিএফ) কাছে দৈনিক ভিত্তিতে হস্তান্তর করতে পারে।

খ. জিম্মাদার হিসেবে 'ইসলামী বন্ড ফান্ড' এই তহবিল গ্রহণ করবে। দৈনিক প্রোডাক্টের ভিত্তিতে মোট প্রাপ্ত তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর অর্জিত মুনাফা তহবিল সরবরাহকারীদের মধ্যে আনুপাতিকহারে সাময়িকভাবে বণ্টিত হবে। সাময়িকভাবে বণ্টিত মুনাফা বছর শেষে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) তহবিল গ্রহীতা কর্তৃক ঘোষিত চূড়ান্ত মুনাফার হার অনুসারে সমন্বিত হবে। 'ইসলামী বন্ড ফান্ড' কাস্টডিয়ান হিসেবে কাজ করায় প্রদত্ত তহবিল বিনিয়োগ করা সম্ভব না হলে তহবিলদাতাগণ কোনো মুনাফা প্রাপ্য হবে না।

গ. সব লেনদেন মুদারাবা ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে।

ঘ. 'ইসলামী বন্ড ফান্ড' কর্তৃক নির্ধারিত প্রোফিট-লস শেয়ারিং রেশিও (পিএলএসআর) অনুসারে আবেদনকারীকে (ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা) ফান্ডের পর্যাপ্ততাসাপেক্ষে আবেদনকৃত তহবিল সরবরাহ করা হবে।

ঙ. তহবিলগ্রহীতা কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের সাময়িক মুনাফার হার অনুসারে মুনাফার হার নির্ধারিত হবে। ইসলামী বন্ড ফান্ড কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদি আমানত কোনো তহবিলগ্রহীতার না থাকলে পরবর্তী মেয়াদের সাময়িক মুনাফার হার ব্যবহৃত হবে।

চ. মেয়াদান্তে তহবিলগ্রহীতাকে নির্ধারিত পিএলএসআর অনুসারে মুনাফাসহ (যদি হয়) মূল টাকা পরিশোধ করতে হবে। সাময়িকভাবে পরিশোধিত মুনাফা বছর শেষে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) তহবিলগ্রহীতা কর্তৃক ঘোষিত চূড়ান্ত মুনাফার হার অনুসারে সমন্বিত হবে।

ছ. গৃহীত তহবিলের মেয়াদ ১ দিন (ওভারনাইট) হবে; তবে ছুটি থাকলে তা পরবর্তী কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত হবে।

জ. তহবিল লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী বন্ড ফান্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নীতিমালা পরিপালন করতে হবে।

এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহ তার অতিরিক্ত তারল্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী বন্ড ফান্ড হিসাবে স্থানান্তর করতে পারবে। তবে মুদারাবা নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত ফান্ড বিনিয়োগ করার পর কোনো লোকসানের সম্মুখীন হলে সাহিবুল মাল হিসেবে তা ইসলামী ব্যাংকসমূহকে বহন করতে হবে।[৪৩০]

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রণোদনা/বিশেষ তহবিল গ্রহণ

বাংলাদেশ ব্যাংক কখনও বিশেষ পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট কিছু খাতকে গতিশীল করার জন্য সুনির্দিষ্ট সুদ/মুনাফা নির্ধারণ করে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আসলসহ ফেরত প্রদানের শর্তে আর্থিক প্রণোদনা/বিশেষ তহবিল ঘোষণা করে থাকে। যেমন—নভেল করোনা (COVID-19) ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সেক্টরের গ্রাহকদের জন্য সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা তহবিলের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে খাতভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঘোষণা করেছিল।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক এ জাতীয় প্রণোদনা তহবিল প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন কিছু শর্তারোপ করে, যা শরীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর। যেমন—গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রদত্ত তহবিলের ক্ষেত্রে কোনোরূপ ঝুঁকি গ্রহণ না করা, লোকসান বহন না করা; নির্ধারিত হারে মুনাফা, প্রভৃতি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজস্ব নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ ধরনের তহবিল গ্রহণ করতে পারে এবং নিজস্ব

---

৪৩০. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৭২-৭৩

বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে উক্ত তহবিল থেকে নির্দিষ্ট খাতগুলোতে বিনিয়োগ করতে পারে।

কাজেই ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়ে সময়ে ঘোষিত প্রণোদনা/বিশেষ তহবিলগুলো গ্রহণ করতে চায়, তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করে তা গ্রহণ করত বিনিয়োগ করতে পারে :

ক. শর্তযুক্ত মুদারাবা (Restricted Mudaraba)

এ ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত মুদারাবা পদ্ধতি অনুশীলন করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সাহিবুল মাল হিসেবে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মুদারাবা ভিত্তিতে তহবিল প্রদান করবে এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত তহবিল নির্বাচিত গ্রাহককে বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি মুনাফাভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট খাতগুলোতে বিনিয়োগ প্রদান করবে। মেয়াদান্তে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকদেরকে প্রদত্ত বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তার কাঙ্ক্ষিত মুনাফা প্রদান করবে।

তবে এ ক্ষেত্রে চুক্তি থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে মুদারাবা নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো (যেমন—নির্ধারিত হারে প্রফিট, লোকসান বহন না করা এবং দেনা বিলম্বে আদায়ের জন্য অতিরিক্ত মুনাফা চার্জ করা প্রভৃতি) বাদ দিতে হবে।

খ. ওয়াকালাহ বিল ইস্তিসমার (Investment Agency)

এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চুক্তি শরীয়া অনুমোদিত ‘ওয়াকালাহ বিল ইস্তিসমার’ পদ্ধতিতেও সম্পাদন করা যেতে পারে। ‘ওয়াকালাহ বিল ইস্তিসমার’ (বিনিয়োগ প্রতিনিধিত্ব) এমন একধরনের চুক্তি, যেখানে তহবিলদাতা কোনো নির্দিষ্ট লেনদেন বা বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তার এজেন্টকে ক্ষমতা প্রদান করেন এবং এর বিনিময়ে এজেন্ট ওয়াকালাহ ফি গ্রহণ করতে পারেন। উল্লেখ্য, কোনো ফি/বিনিময় ছাড়াও এজেন্ট তার কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন।

পর বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রথমে নির্বাচিত গ্রাহকদেরকে নিজস্ব তহবিল হতে বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি নির্ধারিত মুনাফাভিত্তিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করবে। মেয়াদান্তে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা হতে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করবে, যার পরিমাণ অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুদারারা সঞ্চয়ী হিসাব ও ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম তার সমান হবে এবং মুনাফার অবশিষ্ট অংশ ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এজেন্সি ফি হিসেবে গ্রহণ করবে।

৫. অন্য ব্যাংকের দায় স্থানান্তর

কোনো কোনো গ্রাহক অন্য ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ অথবা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করে, অতঃপর ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে পূর্বোক্ত দায় পরিশোধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরূপ অবস্থায় অন্য ব্যাংকের দায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে :

ক. স্থাবর সম্পত্তি/মেশিনারিজের ক্ষেত্রে

অন্য ব্যাংক থেকে গৃহীত মেয়াদি বিনিয়োগ/ঋণের বিপরীতে যেসব স্থায়ী সম্পদ যেমন—বিল্ডিং, ট্রান্সপোর্ট ও মেশিনারিজ অন্য ব্যাংক অথবা গ্রাহকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, তার ওপর প্রকৃত বাজারমূল্য নির্ধারণকরত উক্ত সম্পদের ওপর ইসলামী ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হওয়ার পর তা গ্রাহককে প্রচলিত হারে এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়ায় প্রদান করা যেতে পারে, তবে কোনো অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের কাছে কনভেনশনাল ব্যাংকের প্রাপ্য সুদ (যদি থাকে) পরিশোধ করতে পারবে না। যদি কোনো সুদ পরিশোধযোগ্য হয় তা গ্রাহক নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করবেন।

খ. চলতি মূলধন (প্লেজ)-এর ক্ষেত্রে

- ইসলামী ব্যাংক শুরুতেই মালামালের তালিকা তৈরি ও মূল্য নির্ধারণ করবে।

- গ্রাহক তার প্যাডে উক্ত মালামাল বিক্রয়ের জন্য তার বর্তমান ব্যাংককে ক্ষমতা অর্পণ করবে।
- গ্রাহকের বর্তমান ব্যাংক গ্রাহকের প্রদত্ত ক্ষমতা ও তার আইনগত অধিকার বলে তার ঋণ/বিনিয়োগের সমপরিমাণ মালামালের স্টক লিস্ট তৈরি করে ইসলামী ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করবে।
- ইসলামী ব্যাংক স্টক লিস্ট অনুসারে উক্ত মালামালের মূল্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে পরিশোধের মাধ্যমে ক্রয় করে গ্রাহকের কাছে বাই মুরাবাহা/বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয় ও হস্তান্তর করবে।
- শাখা আলোচ্য ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রালাপ ও তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করবে।

উল্লেখ্য, যে ক্ষেত্রে কোনো সম্পদ বা মালামাল আদৌ নেই, সে ক্ষেত্রে গ্রাহককে কর্জে হাসানা ছাড়া কোনো প্রকার বিনিয়োগ-সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

গ. চলতি মূলধন (হাইপোথিকেশন/টিআর)-এর ক্ষেত্রে

যদি কোনো গ্রাহক সুদি ব্যাংকের সিসি হাইপোর মাধ্যমে ঋণ-সুবিধা গ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংকে হালাল পদ্ধতিতে ব্যাবসা করতে আগ্রহী হন, সে ক্ষেত্রে সিসি হাইপোর বিপরীতে যেহেতু কোনো মালামালের অস্তিত্ব থাকে না, তাই প্রথমে ওই গ্রাহককে সাময়িক সময়ের জন্য কর্জ দিয়ে সুদি ব্যাংকের প্রিন্সিপাল টাকা সমন্বয়ে ইসলামী ব্যাংক সহযোগিতা করতে পারে। ওই ব্যাংকের সুদের টাকা গ্রাহককেই পরিশোধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির ১৪৬তম ও ১৭৮তম অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়—

> অন্য ব্যাংকের হাইপোথিকেশন/টিআর-এর বিপরীতে যে সমস্ত মালামাল অন্য ব্যাংক বা গ্রাহকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, তার বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান করতে শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির কাছে কেস-টু-কেস অনুমোদন নিতে হবে। যেক্ষেত্রে কোনো সম্পদ বা মালামাল আদৌ নেই সে ক্ষেত্রে গ্রাহককে কর্জে হাসানা ছাড়া কোনো প্রকার বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে না।[৪৩১]

---

৪৩১. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ২৬-২৭

৬. সুদি অর্থব্যবস্থার সাথে জড়িত কোম্পানিকে বিনিয়োগ প্রদান

সাধারণত সুদি অর্থব্যবস্থার সাথে জড়িত কোনো ফিন্যান্স/লিজিং কোম্পানিকে বিনিয়োগ প্রদান করা বৈধ নয়। তবে যদি উক্ত কোম্পানির প্রচলিত ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার পৃথক দুটি উইং/উইন্ডো বিদ্যমান থাকে, সে ক্ষেত্রে ইসলামী উইং/উইন্ডোর-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যেতে পারে এই শর্তে—ব্যাংককে নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত ফিন্যান্স/লিজিং কোম্পানির বিনিয়োগ কার্যক্রম শরীয়াসম্মত হবে। চুক্তি মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি না—ব্যাংক কর্তৃক তা যথাযথ মনিটরিংও করতে হবে।

৭. লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয়

লাইসেন্স সাধারণত দুই ধরনের—ক. পেশাগত লাইসেন্স (profesional license) ও খ. ব্যাবসায়িক লাইসেন্স (commercial license), যা আবার দুই ভাগে বিভক্ত; যথা : ১. সুদি বা অবৈধ ব্যাবসার লাইসেন্স ও ২. বৈধ ব্যাবসার লাইসেন্স।

প্রথম প্রকারের লাইসেন্স (পেশাগত লাইসেন্স) বিশেষ যোগ্যতা অর্জনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। ফলে তা অন্যের কাছে কোনোভাবে হস্তান্তর বা স্থানান্তর বৈধ নয়। আর ব্যাবসায়িক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সুদি বা অবৈধ লাইসেন্সও ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়া বৈধ নয়।

ট্রেড লাইসেন্সের বিপরীতে কোনো ফি প্রদান করা হোক বা না হোক তা ভাড়াযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বৈধ ব্যাবসার লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়া প্রসঙ্গে ওআইসি ফিকহ অ্যাকাডেমির অভিমত হলো—

ক. কমার্শিয়াল নাম, কমার্শিয়াল এড্রেস, ট্রেডমার্ক, স্বত্ব, আবিষ্কার, উদ্ভাবন—এগুলো মালিকদের বিশেষ অধিকার এবং এর জন্য বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আর্থিক মূল্য প্রদান করতে হয়। এগুলো ব্যবহারের জন্য লোকদেরকে মূল্য প্রদান করতে হয়। শরীয়া অনুযায়ী এসব অধিকার স্বীকৃত। সুতরাং এসব অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

খ. কমার্শিয়াল নাম, কমার্শিয়াল অ্যাড্রেস, ট্রেডমার্ক, স্বত্ব, আবিষ্কার, উদ্ভাবন—এগুলো লেনদেন করা এবং আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে এগুলো হস্তান্তর,

স্থানান্তর বৈধ, যদি তাতে গারার, প্রতারণা, দোষত্রুটি গোপন করা থেকে মুক্ত থাকে। এ বৈধতা এ হিসেবে যে, এগুলো বর্তমানে আর্থিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

গ. লিখন, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের অধিকার শরীয়া অনুযায়ী সংরক্ষিত বিষয় এবং এদের মালিক এগুলো ব্যবহার করতে পারে। এসব অধিকার ক্ষুণ্ন করা জায়িয নেই।

ওআইসি ফিকহ অ্যাকাডেমির উপর্যুক্ত মতামতের ভিত্তিতে লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা যেতে পারে :

- রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন থাকলে লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করা যাবে।
- ফটকাবাজারি, গারার, কোনো রকম অস্পষ্টতা বা প্রতারণাকে উৎসাহিত করবে—এমন কোনো লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়া বৈধ নয়।

ব্যাংকের নামে মালিকানা অর্জন করা যায় না বলে তাতে মুরাবাহা বৈধ হবে না; তবে হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের যৌথ মালিকানায় লাইসেন্স ক্রয় করে তা গ্রাহকের (অংশীদারের) কাছে ভাড়ায় প্রদান করা যাবে। কারণ, লাইসেন্সের নাম ট্রান্সফারের মাধ্যমে এতে গ্রাহকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি ব্যাংকের একজন অংশীদার। আর অংশীদারের মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে শারয়ীভাবে ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৩২]

৮. বিনিয়োগের বিপরীতে জামানত

ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ বা ঋণ নিতে হলে ব্যাংককে জামানত বা সিকিউরিটি দিতে হয়। জামানত দু-প্রকার : ক. প্রাইমারি জামানত বা প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ জামানত ও খ. সেকেন্ডারি জামানত। সেকেন্ডারি জামানতকে কোনো কোনো ব্যাংকে বলা হয় Collateral Security, বাংলায় সহায়ক জামানত।

---

৪৩২. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৩১-৩২

প্রাথমিক ও সহায়ক জামানত

কোনো ব্যাংক যে বস্তু ক্রয় বা প্রস্তুত করার জন্য বিনিয়োগ দিয়ে থাকে তা ব্যাংকের কাছে জামানত রাখার বিধান আছে। এ ধরনের জামানতকে প্রাইমারি জামানত বলা হয়। ধরুন, ১০ হাজার বস্তা সিমেন্ট ক্রয়ের জন্য কোনো ব্যাংক বিনিয়োগ অনুমোদন করল। এ ১০ হাজার বস্তা ক্রয়কৃত সিমেন্ট জামানত হিসেবে ব্যাংকের গোডাউনে অথবা ক্লায়েন্টের গোডাউনে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে প্লেজ রাখবে। এখানে ১০ হাজার বস্তা সিমেন্ট হলো প্রাইমারি বা প্রাথমিক জামানত। পণ্য প্লেজের বা জামানতের বিপরীতে বিনিয়োগ দেওয়া টাকা প্রথম কিস্তি ফেরত পাওয়ার পর ব্যাংক সমপরিমাণ মূল্যের সিমেন্ট গ্রাহককে বিভিন্ন কিস্তি বা ইন্সটলমেন্টে সরববরাহ দেবে। এভাবে সমগ্র পাওনা আদায় করবে।

উল্লেখ্য, ব্যাংকের গোডাউনে ১০ হাজার বস্তা সিমেন্ট গ্রাহকের পক্ষ থেকে ব্যাংক সংরক্ষণ করল। ব্যাংক সিমেন্টের ব্যাবসা করে না; গ্রাহক সিমেন্টের ব্যাবসা করে। গ্রাহক ব্যাংক থেকে কিস্তিতে সিমেন্ট নিয়ে যাবে—এ আশ্বাসে এবং চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ হয়ে সিমেন্ট ক্রয় করে নিজের গোডাউনে রাখল এবং যে টাকায় সিমেন্ট ক্রয় করল সেই পরিমাণ অর্থ গ্রাহকের নামে বিনিয়োগ হিসেবে দেখাল।

গ্রাহকের পক্ষ হয়ে ব্যাংক কর্তৃক সিমেন্ট ক্রয়ের পর গ্রাহক দেখল যে, বাজারে সিমেন্টের দাম পড়ে গেছে। তাই গ্রাহক ব্যাংকের গোডাউন থেকে সিমেন্ট ডেলিভারি নিতে রাজি হলো না। ভাবটা এই—ব্যাংকের টাকায় ক্রয় করা সিমেন্ট ব্যাংকের গোডাউনে রয়েছে। এ নিয়ে লেখালেখি, দেনদরবার হলো। এর মধ্যে বছরাধিক কাল চলে গেল। গোডাউনের সিমেন্ট জমাট হয়ে পাথর হয়ে গেল। এক কোটির সিমেন্ট হয়তো দশ লক্ষ টাকায়ও বিক্রি হবে না। এ ধরনের অবস্থা প্রতিহত করার জন্য ব্যাংক প্রাথমিক জামানত ছাড়াও সেকেন্ডারি বা সহায়ক জামানত রাখতে পারে। এ জামানতকে বলা হয় Collateral Security। প্রাইমারি জামানতের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়ে গেলেও ব্যাংক Collateral বিক্রি করে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেয়।

সাধারণত প্রাইমারি সিকিউরিটি বা প্রাইমারি জামানত মার্চেন্ডাইজ বা ব্যাবস-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি হয়। জমি, ইমারত উক্ত মার্চেন্ডাইজের Collateral বা সহায়ক জামানত হয়; তবে অবস্থাভেদে এর বিপরীতটাও হতে পারে। Collateral এমন সম্পদ হতে পারে, যা টেনিজবল অর্থাৎ যা ধরাছোঁয়ার মধ্যে পড়ে। বাড়ি বা জমি সাধারণত Collateral বা সহায়ক জামানত হিসেবে গৃহীত হয়; কিন্তু

সবসময় নয়। যদি কোনো জমি ক্রয় বা বাড়ি তৈরির জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ দিয়ে থাকে, তবে ওই জমি বা বাড়ি হবে প্রাইমারি সিকিউরিটি বা প্রাথমিক জামানত। কারণ, মূলত উক্ত জমি বা বাড়ির জন্যই ব্যাংক বিনিয়োগ দিয়েছিল। যদি ব্যাংক মনে করে, যে জমি ক্রয় বা বাড়ি তৈরির জন্য বিনিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা নিরাপদ নয়, তবে ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত বা সহায়ক জামানত হিসেবে আর একটি বাড়ি বা অন্য কোনো দ্রব্য (যেমন—স্বর্ণালংকার, কারখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, যানবাহন ইত্যাদি) অথবা ফিন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট গ্রহণ করতে পারে।

সহায়ক জামানত হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফিন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন—অন্যান্য ব্যাংকের এফডিআর ও এমটিডিআর; বিনিয়োগদানকারী ব্যাংকের এমটিডিআর, এমএসবি (মুদারাবা সেভিংস বন্ড), এমএসএস (মুদারাবা স্পেশাল সেভিংস স্কিম ইত্যাদি; সরকারি প্রতিজ্ঞাপত্র (Government Promissory Notes), শেয়ার সার্টিফিকেট, ঋণপত্র (Letters of Credit), সরকারি বন্ড, ব্যাংক গ্যারান্টি, ইনস্যুরেন্স গ্যারান্টি, বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিল, প্রাইজ বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি।[৪৩৩]

উল্লেখ্য, বিনিয়োগদানকারী ব্যাংকে বিনিয়োগগ্রহীতার সব মেয়াদি জমাকে সহায়ক জামানত হিসেবে গণ্য করে জমাকারীকে অন্যান্য সাধারণ গ্রাহকদের এত বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। অপরদিকে মেয়াদি জমার বিপরীতে জমাকারীকে কর্জে হাসানাও দেওয়া যেতে পারে, তবে শর্ত হলো—তার কাছ থেকে এর বিনিময়ে কোনো অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না।[৪৩৪]

অন্যান্য ব্যাংকের এফডিআর ও এমটিডিআর সহায়ক জামানত হিসেবে গ্রহণ করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, এ ক্ষেত্রে জমাদানকারীর স্বাক্ষর ভেরিফিকেশন করতে হয়। যে ব্যাংকের এফডিআর ও এমটিডিআর সেই ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

‘সুরক্ষিত লেনদেন (অস্থাবর আইন)- ২০২৩’ অনুসারে কেবল স্থাবর সম্পত্তিই নয়; স্থায়ী আমানত কিংবা স্বর্ণ-রৌপ্য ও মেধাস্বত্বের এত অস্থাবর সম্পত্তির

---

৪৩৩. শামসুল আলম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৫৩-৫৫

৪৩৪. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৩৭

বিপরীতেও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়া যাবে। এ নতুন 'সুরক্ষিত লেনদেন' আইনের ফলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে দৃশ্যমান সম্পত্তির বদলে অন্যান্য যেসব ভাসমান সম্পত্তির বাজারমূল্য আছে সেগুলোও ব্যাংক বন্ধক হিসেবে রাখতে পারবে। এ আইনের ফলে এখন থকে কারও প্রয়োজন হলে ব্যাংকে রাখা ফিক্সড ডিপোজিট, সোনা-রুপা বা দেশের বাইরে রপ্তানির উদ্দেশ্যে রাখা কাঁচামালের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। কপিরাইট আছে এমন কিছুও চাইলে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা যেতে পারে। এ ছাড়াও দাম নির্ধারণ সাপেক্ষে আসবাবপত্র, ইলেকট্রিক পণ্য, সফটওয়্যার, অ্যাপসের এত পণ্যও ঋণ নেওয়ার সময় ব্যাংকের কাছে রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া পুকুরের মাছ, বাগানের গাছ, গবাদি পশুর বিপরীতেও ব্যাংক ঋণ দেবে।

তৃতীয় পক্ষ জামানতদার (Third Party Guarantor)

সহায়ক জামানতের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জামানতও থাকতে পারে। যিনি বিনিয়োগ/ঋণ গ্রহণ করেন, তিনি তার সহায়-সম্পদ জামানতদার হিসেবে জামানত দিয়ে থাকেন। গৃহীত বিনিয়োগ বা ঋণের পরিমাণ বা মূল্য যদি বিনিয়োগ ও ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত জামানতের মূল্য থেকে বেশি হয়, ব্যাংক তখন অতিরিক্ত গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা চায়। এ অবস্থায় বিনিয়োগ বা ঋণগ্রহীতার পক্ষ হয়ে কোনো সদাশয় ব্যক্তি যদি ব্যাংককে এ গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দান করেন, তিনি হলেন এ কারবারের তৃতীয় পক্ষ বা থার্ড পার্টি। তিনি এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, বিনিয়োগ/ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি টাকা পরিশোধ না করেন তাহলে তিনি নিজেই তা পরিশোধ করবেন।

উল্লেখ্য, থার্ড পার্টি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন। এ ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে তার ব্যক্তিত্ব, দেহ, সহায়-সম্পদ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকে। ব্যাংক ইচ্ছা করলে তার সম্পত্তির যেকোনোটিতে হাত বসাতে পারে। যদি বিনিয়োগ বা ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ না করেন, তাহলে চুক্তি মোতাবেক ব্যাংক তার পাওনা আদায়ের জন্য থার্ড পার্টির সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, থার্ড পার্টির সম্পত্তি নিলামে ওঠাতে পারবে, থার্ড পার্টির অকশানে বিক্রয়কৃত সম্পদ যদি ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে থার্ড পার্টিকে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যভাবে নাজেহাল করতে পারে, এমনকি জেল খাটাতে পারে।[৪৩৫]

---

৪৩৫. শামসুল আলম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৫৯

সুদভিত্তিক বন্ড/সিকিউরিটিজকে সহায়ক জামানত হিসেবে গ্রহণ

বিনিয়োগের বিপরীতে সুদভিত্তিক বন্ড/সিকিউরিটিজকে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে সহায়ক জামানতরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. সুদভিত্তিক বন্ড/সিকিউরিটিজের অভিহিত মূল্যই (Face Value) সহায়ক জামানত হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. সুদভিত্তিক বন্ড/সিকিউরিটিজ থেকে অর্জিত কোনো সুদই ইসলামী ব্যাংক গ্রহণ করতে পারবে না।

গ. প্রয়োজনে এগুলো নগদায়নে বাধ্য হলে অভিহিত মূল্যই ব্যাংক গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ. ব্যাংকের প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট জামানতদারকে ফেরত দিতে হবে।[৪৩৬]

বন্ধকি মালের ব্যবহার

বিনিয়োগ বা ঋণের বিপরীতে যে জিনিস বন্ধক রাখা হয় তার দ্বারা বন্ধকগ্রহীতার উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে—ঋণ দিয়ে বিনিময়ে বা দেনার বিপরীতে বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া রিবার অন্তর্ভুক্ত। ঋণচুক্তিতে ঋণগ্রহীতা থেকে শর্ত করে কোনো অতিরিক্ত নেওয়াই সুদ। সে অতিরিক্ত টাকা হতে পারে, উপকারিতা হতে পারে, বন্ধকি সম্পত্তির ব্যবহার হতে পারে।

বিশিষ্ট তাবিঈ ইবনু সীরীন রাহ. বলেন, এক ব্যক্তি সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর নিকট এসে বলল, এক লোক আমার নিকট একটি ঘোড়া বন্ধক রেখেছে, অতঃপর আমি তাতে আরোহণ করেছি। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বললেন, ما أصبت من ظهرها-'তুমি উক্ত ঘোড়ার ওপর যে পরিমাণ আরোহন করেছ তা সুদ হয়েছে।'[৪৩৭]

তবে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি বস্তুর জন্য যতটুকু ব্যয় করবে—সেই পরিমাণ উপকার গ্রহণ করতে পারবে। যেমন—বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি জন্তুর দুধ পান বা তাকে

---

৪৩৬. *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, আইবিবিএল, পৃ. ৩৬

৪৩৭. আবদুর রাযযাক, *আল মুছান্নাফ*, হা. নং : ১৫০৭১

বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। সে বন্ধকি জন্তুর জন্য যে পরিমাণ খরচ করবে সেই পরিমাণই ব্যবহার করবে। এটা তখনই, যখন বন্ধকদাতা কোনো খরচ দেবে না এবং বন্ধকগ্রহীতা অপারগ হয়ে খরচ করবে।

জামানতের পরিমাণগত বৈষম্য

জামানতের পরিমাণ সাধারণত এমনটাই হওয়া উচিত, যা অন্তত ঋণ বা বিনিয়োগ হিসেবে প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থকে কভার করে, যাতে বিনিয়োগ বা ঋণগ্রহীতা যদি ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করে, তবে ব্যাংক ওই জামানত বিক্রি করে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে।

ব্যাংকগুলোতে এ ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়ম হলো—যত কম বিনিয়োগ তত সিকিউরিটি কভারেজ বেশি, আর যত বিনিয়োগ বেশি তত সিকিউরিটিজ কভারেজ কম। অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত ছোটো বিনিয়োগ বা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমান বা বেশি মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু জামানত রাখতে হয়। আর বড়ো পরিমাণ বিনিয়োগ বা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক কম মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু জামানত রাখতে হয়। যেমন—ইসলামী ব্যাংকে বাই মুরাবাহা/এমপিআই/ফান্ডেড ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে (আরএমজি ব্যতীত) ২০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের জন্য ১০০% সিকিউরিটি কভারেজ; ৫০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ২০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ২৫%; ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ২৭৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ২০%; ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ৩৭৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ১৫% সিকিউরিটি কভারেজ দিতে হয়।

অনুরূপভাবে বাই মুরাবাহা টিআর/এমপিআই-টিআর ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে (আরএমজি ব্যতীত) ২০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের জন্য ১৫০% সিকিউরিটি কভারেজ; ৫০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ৩০০ মিলিয়ন টাকার ঊর্ধ্বে ৫০%; ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ৪৫০ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ৩০%; ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ৬০০ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ১৫% সিকিউরিটি কভারেজ দিতে হয়।

ইন্ডাস্ট্রিজের বিপরীতে নন-ফান্ডের ইনভেস্টমেন্ট (আরএমজি ব্যতীত)-এর ক্ষেত্রে ২০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের জন্য ২৫% সিকিউরিটি

কভারেজ; ৫০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ৫০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০০ মিলিয়ন পর্যন্ত টাকার জন্য ১৫%; ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ৯৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ১০%: ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ১৪৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ০৫% সিকিউরিটি কভারেজ দিতে হয়।

ট্রেডিং বিজনেসের বিপরীতে নন—ফান্ডেড ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ২০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের জন্য ৩০০% সিকিউরিটি কভারেজ; ৫০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ৬০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০০ মিলিয়ন পর্যন্ত টাকার জন্য ২০%; ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ১২০ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ১৫%; ১০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে ১৯৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০০০ মিলিয়ন টাকার জন্য ১০% সিকিউরিটি কভারেজ দিতে হয়। ...

অথচ ঋণখেলাপির ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো বিনিয়োগ বা ঋণগ্রহীতার চেয়ে বড়ো বড়ো বিনিয়োগ বা ঋণগ্রহীতারাই এগিয়ে। ছোটো ছোটো বিনিয়োগ বা ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ঋণখেলাপির ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে, পক্ষান্তরে বড়ো বড়ো বিনিয়োগ বা ঋণগ্রহীতাদের অনেকেই ঋণখেলাপির সাথে জড়িত এবং এদের কেউ কেউ ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বিদেশেও পাচার করে, নানা জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। ১৫ বছর আগে ২০০৮ সালে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। সেটি বাড়তে বাড়তে গত মার্চ ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকায়। তদুপরি ঋণ নিয়ে চলমান মামলাসহ নানা ইস্যু মিলিয়ে এ পরিমাণ মোট ৪ লাখ কোটির টাকার বেশি হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদগণ। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, এ ঋণখেলাপি ও আত্মসাৎকারীদের প্রায় সকলেই বড়ো বড়ো বিনিয়োগ ও ঋণগ্রহীতা।

৯. মুদ্রাস্ফীতিজনিত ক্ষতিপূরণ ও ব্যাংকিং সুদ

বর্তমানে দেশের প্রচলিত ব্যাংকগুলো ডিপোজিটের ওপর সুদ দিয়ে থাকে, যা অনেক সময় দেশে প্রচলিত মুদ্রাস্ফীতির হারের সমান হয়ে থাকে, আবার কখনও কমও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন সুদের হার হয় ৭%, তখন মুদ্রাস্ফীতির

হার ৭% বা ৮% অথবা ৯% কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় (যদিও সরকার অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির প্রকাশ না করে কম দেখায়)। এ অবস্থায় ব্যাংকে টাকা রেখে প্রকৃত লাভ তো নয়ই; বরং গ্রাহকের ক্ষতি হচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হতে পারে, ব্যাংক যদি মুদ্রাস্ফীতি হারের সমান কিংবা তা থেকে কম সুদ দেন, তা কি নিষিদ্ধ সুদের মধ্যে গণ্য হবে?

এ প্রসঙ্গে আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে কারও কারও অভিমত হলো, ঋণের অতিরিক্ত গ্রহণ করা সুদ; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি অর্থের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয় বলে ঋণ পরিশোধের মেয়াদকালে ঋণদাতা মুদ্রাস্ফীতির কারণে যে পরিমাণ ক্ষতির শিকার হন, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুদের একটি যৌক্তিক হার বৈধ হতে পারে।

এ অভিমতের সমর্থনে তারা ঋণদাতাকে পূর্বনির্ধারিত সুবিধা না দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির সমহারে 'সুদ' দেওয়া যেতে পারে বলে অভিমত দেন। কেননা, মুদ্রাস্ফীতি ঋণদাতার আর্থিক সম্পদ ক্ষয় করে ফেলে। অথচ এখানে তার কোনো দোষ নেই। তাই ঋণের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণদাতার আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্য অক্ষুণ্ন রাখা যেতে পারে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলাম ঋণগ্রহীতার প্রতি ন্যায়পরায়ণতার আহ্বান জানায়; কিন্তু ঋণদাতার প্রতি অবিচারের অনুমতি দেয় না। মুদ্রাস্ফীতি নিঃসন্দেহে সুদহীন ঋণদাতার প্রতি অবিচার করে। কারণ, এতে তার হিতৈষী ঋণের প্রকৃত মূল্য ক্ষয় হয়ে যায়।[৪৩৮] কাজেই ঋণের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকলে ঋণদানের ওপর একটি অন্তরায়মূলক প্রভাব পড়বে। এর ফলে অর্থনীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাসের প্রভাব প্রতিরোধ করতে সুদের একটি যৌক্তিক হার বৈধ হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শরীয়া-বিশেজ্ঞগণের বক্তব্য হলো—প্রকৃতপক্ষে সুদের হার মুদ্রাস্ফীতির ওপর নির্ভরশীল নয়। সুদ যদি মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণই হতো তাহলে মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সংগতি রেখে সুদের হার নির্ধারণ করা হতো। কিন্তু বাস্তবে ঋণের চুক্তি সম্পাদনের সময় তা করা হয় না; বরং সুদের হার নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা। যদি কখনও সুদ ও

৪৩৮. উমর চাপরা, *টুওয়ার্ডস জাস্ট মানিটারি সিস্টেম*, লিচেস্টার, ১৯৮৬, পৃ. ৪০

মুদ্রাস্ফীতির হার সমান হয়, তাহলে তা কেবল ঘটনাচক্রেই হতে পারে; নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণেই নয়। কাজেই সুদকে মুদ্রাস্ফীতিজনিত ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

ঋণের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা শরীয়াসম্মত কি না—সেই প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুশীলন বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, ব্যাংক আমানতকারীদের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে মূলধন গঠিত করে, আবার সেই মূলধন পুনরায় ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ হিসেবে দেয়। এখন মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে উভয় পক্ষের নিকট থেকেই ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির একই হারে ব্যাংক তার আমানতকারীদের আমানতের ক্ষতিপূরণ যেমন করবে, তেমনি ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকেও ব্যাংক একই হারে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে; কারণ উভয়ের হার নির্ধারণের মানদণ্ড একই, অর্থাৎ—মুদ্রাস্ফীতির হারের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিজনিত ক্ষতিপূরণের কারণে আমানতকারীদেরকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ এবং ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের হার একই হওয়ার কারণে ব্যাংকের আয় অবশিষ্ট থাকবে না, যা ব্যাংকিং দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবসম্মত নয়।

শরীয়া-বিশেষজ্ঞগণ আরও বলেন, সুদ আরোপ করে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের মানে হলো—একটি বড়ো মন্দ কাজ দিয়ে একটি ছোটো মন্দ কাজ মোকাবিলা করা। আর ইসলাম কখনও প্রচলিত একটি মন্দ কাজ প্রতিরোধের জন্য নতুন আরেকটি মন্দ কাজ চালুর অনুমোদন করে না। এ পর্যন্ত সব মুসলিম আইনবিদের সাধারণ অভিমত হলো 'ঋণ ইনডেক্সেশন'-এর বিরুদ্ধে। কারণ, এখানে আর্থিকভাবে হলেও ঋণের একটি ইতিবাচক মুনাফার নিশ্চয়তা থাকে।[৪৩৯]

তাই ইসলামে আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো—সুদমুক্ত অর্থনীতি বিনির্মাণ এবং মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা; ঋণ ও সম্পদের ইনডেক্সেশন নয়।[৪৪০]

---

৪৩৯. উমর চাপরা, *টুওয়ার্ডস জাস্ট মানিটারি সিস্টেম*, লিচেস্টার, ১৯৮৬, পৃ. ৪০

৪৪০. রহমতুল্লাহ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, পৃ. ১৮৯-১৯০

অধ্যায় : ১৩

ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা : মূল্যায়ন

১. তত্ত্ব ও পদ্ধতিগত সাফল্য

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানী সম্প্রদায় ও সচেতন জনগণের মধ্যে এ অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, সুদি কারবারের নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্প একটি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভাবন সময়ের দাবি। আল্লাহ্ তায়ালার শোকর যে, এই সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠীর আন্তরিক প্রচেষ্টা তাদের কল্পনার চেয়েও বেশি সাফল্য লাভ করেছে। ঈমানি চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ কিছু আল্লাহর বান্দা কর্তৃক এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়; বরং ইউরোপ-আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা নিজের স্থান করে নিয়েছে। এ ব্যবস্থা যে কার্যত শুধু সম্ভব তা-ই নয়; বরং এ ব্যবস্থাই যে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর কল্যাণকর তাও প্রমাণিত হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা ইতোমধ্যে যেমন নীতি ও তত্ত্বগতভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও অপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি পদ্ধতিগতভাবেও যে এটি একটি অধিকতর কল্যাণকর ও সুষম ব্যবস্থা, তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। অন্য কথায়—আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিংপদ্ধতি এখন কোনো তত্ত্বকথা নয়; বরং পরম বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল। শুধু তা-ই নয়; একটি সঠিক অর্থব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সময়ের প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করতে সক্ষম।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্জন বা সাফল্য কী—তার একটি যথার্থ ও সঠিক চিত্র তুলে ধরতে আমাদেরকে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল আগে যেতে হবে, যখন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে সুদভিত্তিক ব্যবস্থাই সর্বত্র বিরাজমান ছিল এবং সুদবিহীন

ব্যাংকিং সিস্টেম পরিচালনা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। লাভ-লোকসানের অংশীদারত্ব, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণের মতো বিষয়গুলো তখন সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার ছিল। নিদেনপক্ষে অবাস্তব স্লোগান মনে করা হতো। সেদিনকে পেছনে ফেলে আজকে ইসলামিক ব্যাংকিং সুদের অপরিহার্যতা থেকে বেরিয়ে এসে তার সক্ষমতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং স্বীয় অস্তিত্ব ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে ভোক্তাদের পারস্পরিক অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ব্যাবসা, লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ, মৌল উৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহে অংশগ্রহণের ধারণার সাথে কার্যকরভাবে খাপ খাওয়ানো এবং সাথে সাথে ব্যাংকের অন্যান্য প্রয়োজনসমূহ মেটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী অবস্থানে চলে এসেছে। অধিকন্তু, নতুন নতুন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট উদ্ভাবন, সক্রিয় সেকেন্ডারি মার্কেট, যৌথ বিনিয়োগ ফান্ডের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ প্রভৃতি কার্যক্রমকে ইসলামী ব্যাংকগুলো বর্তমানে দক্ষতার সাথে উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সৌদি আরবের 'আল বারাকাহ ব্যাংকিং গ্রুপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা শাইখ সালিহ কামিল ইসলামিক ব্যাংকিংয়ে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৭ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)-এর একটি পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতায় বলেন—

> ...বিগত বিশ বছর ধরে চলমান ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ, যাকাতের কিছু প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত, আর্থিক বাজার ও ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর সম্প্রতি আইএমএফের একটি সংবাদ-প্রতিবেদন আমার নজরে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে— 'ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারার চেয়ে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।' এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমন এক প্রপঞ্চে পরিণত হয়েছে, যা বৈশ্বিক স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেতে শুরু করেছে। যদিও এটা একটা নতুন বিষয় এবং একে নানা বাধাবিপত্তি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তা বিশ্ব ব্যাংকিংব্যবস্থায় নিজের অবস্থান গেড়ে নিতে পেরেছে।[৪৪১]

---

৪৪১. Salih kamal, Development of Islamic Banking Activity : Problems and prospects, 'IDB prize lecture series no.12' Jeddah : Islamic Development Bank, 2000 : 2nd ed.

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন নিয়ে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও অব্যাহত বিরূপ প্রচারণা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। বৃহদায়তন পুঁজি নিয়ে নতুন নতুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আধুনিক ব্যাংকগুলোও ইসলামিক শাখা (উইন্ডো) প্রতিষ্ঠা করছে। এমনকি অমুসলিম মালিকদের বিদেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিট খুলেছে এবং অধিক হারে মুসলিমদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অনেকেই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এরূপ প্রসার দেখে প্রতিনিয়ত চমকিত হচ্ছেন।

লন্ডনভিত্তিক অর্থনৈতিক সাময়িকী *দ্য ইকোনমিস্ট*-এর ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'সার্ভে অব ইসলাম' শীর্ষক দীর্ঘ এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতে বিশ্ববাসী মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিল এবং ইসলামের কাছ থেকে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। আর এখনকার বিশ্ব ইসলামের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আইডিয়া গ্রহণ করতে পারে। পত্রিকাটির দৃষ্টিতে মুসলমানদের অতীত গৌরব তার শিক্ষা-সংস্কৃতি। আর দীর্ঘকাল পর মানবজাতির প্রতি ইসলামের বর্তমান উপহার 'ইসলামী ব্যাংকিং'। ২০০৯ সালে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু ভ্যাটিকানের পোপ তার এক বাণীতে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে সম্পদভিত্তিক ব্যাংকিং করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন—

> তোমাদের ব্যাংকিং হলো 'ঋণভিত্তিক'। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিং হলো 'সম্পদভিত্তিক'। তোমাদের ব্যাংকিং হলো Greed Based 'লোভভিত্তিক'। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিং হলো Necessity Based 'প্রয়োজনভিত্তিক'। তোমাদের ব্যাংকিংয়ে মুনাফা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো আদর্শ নেই। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিং এক মহান আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।[৪৪২]

এক প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৫০টির মতো অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসহ সারা বিশ্বের ৮০টি দেশে প্রায় ৫০০টি ইসলামিক

---

৪৪২. নূরন্নবী, আবু নুসাইবা মুহাম্মাদ, *প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং*, https://www.dailynayadiganta.com/diganta-islami-jobon/756695/- প্রচলিত-ব্যাংকের-ইসলামী-ব্যাংকিং-

ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি শিল্প এবং যার সম্ভাব্য আকার প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০০৮-২০০৯ সালব্যাপী গোটা বিশ্বে যখন আধুনিক সুদি ব্যাংকগুলো একের পর এক দেউলিয়া হয়ে পড়ছিল, ব্যাংকগুলোকে যখন সরকার নানা প্যাকেজ ও আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে কোনো রকমে টিকিয়ে রাখছিল, তখনও কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েনি; বরং সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকগুলো মেরুদণ্ড খাড়া করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে বিস্ময়করভাবে। বহু সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছে। বর্তমানে বিশ্বে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশ, অথচ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশের ওপরে।

বলতে গেলে, এখন ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা বিশ্বে এক সফল বাস্তবতা। বাংলাদেশেও ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামিক ব্যাংকিংব্যবস্থা শক্তিশালী অর্জন অক্ষুণ্ন রেখেছে। যদিও এখানে ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশের বেশি অর্জন করেছে, তবে এই ব্যবস্থার আরও বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমতে, দেশি-বিদেশি মিলে দেশে মোট তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ৬৩টি। এর মধ্যে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের মোট ১৬৭০টি শাখা, ১৫টি প্রচলিত ব্যাংকের ৩০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও ৫৪টি উইন্ডো রয়েছে। ১২টি প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী উইন্ডো পরিচালনা করে। তাদের উইন্ডো রয়েছে ৫৩০টি। সর্বমোট ১৭০০ শাখা ও ৬৩০ টি উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের মোট ব্যাংকিং শাখার ২০ শতাংশেরও কম শাখা/উইন্ডো নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বর্তমান মার্কেট-শেয়ার দেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের ইসলামিক ব্যাংকিং সেলের তথ্যমতে—মার্চ ২০২১ শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১২ লাখ ৯৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা, যা মোট ব্যাংকিং খাতের সাড়ে ২৭ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে এটি ছিল সাড়ে ২৫ শতাংশ। ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে পৌনে ১০ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৬২ শতাংশ। মোট

১১ লাখ ৬৩ হাজার ২৬ কোটি টাকার ঋণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ ছিল ৩ লাখ ২২ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা, যা মোট ব্যাংকিং খাতের ২৭ দশমিক ৭২ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০২০ শেষে এটি ছিল ২৫.৬৯ শতাংশ।

মালয়েশিয়াভিত্তিক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইসলামিক ফিন্যান্স নিউজ সরবরাহকারী, ইসলামিক ফিন্যান্স নিউজের (আইএফএন) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে ইসলামিক ব্যাংকিং শিল্পের সম্পত্তির বাজার অংশ বাংলাদেশের মোট ব্যাংকিং সম্পদের প্রায় ২৫ শতাংশ। ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের দেশীয় বাজারে অংশীদারত্বের দিক থেকে শীর্ষ ৩৫টি খাতের মধ্যে বাংলাদেশ দশম স্থানে রয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, খাতটিতে দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে ইসলামিক ব্যাংকিং ও অর্থায়নে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। এ ছাড়া ইসলামিক ব্যাংকিং যখন বিশ্বব্যাপী দ্রুত বর্ধনশীল ব্যাংকিংব্যবস্থায় পরিণত হচ্ছে, বাংলাদেশ এরই মধ্যে এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং এর জনপ্রিয়তার রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা অপ্রচলিত ঋণ হ্রাস করে, ফটকা ব্যাবসাকে নিরুৎসাহিত করে এবং সমাজের কল্যাণকে উৎসাহ দেয়, সম্পদ ও ইক্যুইটিভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা সরবরাহ করে। এতৎসত্ত্বেও ইসলামিক ব্যাংকিং দেশে ও বিদেশে আরও টেকসই পরিচালনার জন্য স্বল্পমেয়াদি অর্থবাজারের সমর্থনের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট ইসলামিক ব্যাংকিং আইন প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে একমাত্র আইবিবিপিএলসি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ব্যাংক হিসেবে গ্লোবাল ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড জয় করেছে অনেকবার। গতানুগতিক ব্যাংকিং ধারণার বাইরে এসে সাধারণ জনগণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা ও জীবনমান উন্নয়নে ব্যাংকটি প্রান্তিক দরিদ্রদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করছে; স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই উদ্যোগটি আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এই দরিদ্র জাতির শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের জন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এই ব্যাংক। সিএসআরের মাধ্যমে দেশের দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যাংকটির রয়েছে বড়োসড়ো অবদান।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল। কারণ, বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় যে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান তাতে এই উপলব্ধি আসবে যে, এ পদ্ধতিতে কৃত্রিম পরিবর্তন এনে এই অস্থিতিশীলতা দূর করা

সম্ভব নয়; বরং ইসলামী অর্থব্যবস্থার মতো বৃহত্তর বাজার শৃঙ্খলার পদ্ধতি এতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলেই তা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।[৪৪৩] বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে কোনো ইসলামী ব্যাংক বন্ধ না হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স আন্তঃ ও বহিঃঅভিঘাত আত্মকরণে দৃঢ়ভাবে সক্ষম।[৪৪৪]

আমরা মনে করি, ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংক যা কিছু সাফল্য অর্জন করেছে তা সত্যিই অনেক বৃহৎ ও বিস্ময়কর; কিন্তু তাই বলে এই সাফল্যকে আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ কি নেই? এই প্রশ্নে প্রয়োজন নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মসমালোচনা। এর উদ্দেশ্য হলো—সন্তুষ্টি ও আত্মপ্রসাদ লাভের পরিবর্তে ব্যাংকিং কার্যক্রমে এখনও যেসব ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে তা সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করা এবং কার্যক্রমগুলোকে ঢেলে সাজানো। এর উদ্দেশ্য অবশ্যই পূর্ববর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে দোষারোপ করা বা অবমূল্যায়ন করা নয়। অন্যান্য সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতোই এরও বিকাশ ঘটা বাঞ্ছনীয়; স্থবির থাকা আদৌ কাম্য নয়। আমাদের কর্তব্য হলো—এর ভুল-ভ্রান্তিগুলো ধামাচাপা না দিয়ে কিংবা অস্বীকার না করে সেগুলোর সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কতিপয় বিশেষ অবদান

ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিশেষ অবদান হলো—

ক. বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকগুলো মুসলমানদের হালাল লেনদেনের পথকে সুগম করেছে। সুদি ব্যাংকসমূহের সঙ্গে লেনদেন করা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছে।

খ. সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং মুসলমানদের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আস্থার বীজ বপন করেছে। আর সামষ্টিক ইচ্ছা যখন ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয় তখন তা একটি সহজ ব্যাপার; কঠিন কিছু নয়।

---

৪৪৩. ড. এম. ওমর চাপরা, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ২৮

৪৪৪. *বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা*, ৩৭ খণ্ড, সংখ্যা ৭, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৪

গ. সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহ যখন সম্পদশালী ছাড়া অন্যদের সাথে খুব কমই লেনদেন করে, তখন ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক বিরাটসংখ্যক লোককে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকসমূহ যাকাত ফান্ড, কল্যাণ ফান্ড ও কর্জে হাসানার মাধ্যমে দরিদ্র লোকজন এবং দাতব্য ও ইসলামী সংস্থাসমূহকে সাহায্য করার সুযোগ তৈরি করেছে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংকসমূহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও প্রসারে অংশগ্রহণ করেছে।

চ. এগুলো পাশ্চাত্যের বিমা কোম্পানিসমূহের বিপরীতে ইসলামী বিমা (তাকাফুল) কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে ।

ছ. এগুলো এমন কিছু কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে, যেগুলো জাতীয় ও ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

জ. ইসলামী ব্যাংকসমূহ 'ফিকহুল মুআমালাত' (লেনদেন-সম্পর্কিত ফিকহ)-কে পুনর্জীবিত করেছে, যা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নের অভাবে ফিকহী পুস্তকসমূহের পাতায় পরিত্যক্ত বা স্থবির অবস্থায় ছিল। ফলে ব্যাপক জনগণ আবার মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মুরাবাহা, বাই সালাম, বাই ইসতিসনা, কর্জ, মুদ্রা বিনিময়, গ্যারান্টি ইত্যাদি বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে শুরু করেছে।[৪৪৫]

অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী অর্থনীতি মানেই 'ইসলামী ব্যাংক'। এ ধারণা সর্বার্থে সঠিক নয়; তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কয়েকটি কারণে ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম অর্জন। কারণগুলো হলো—

ক. ব্যাংকগুলো নিজেরাই বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের রক্তপ্রবাহের মতো, যা অর্থনীতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে।

---

৪৪৫. ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী, *ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুবারাহা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১২৫-১২৬; নুরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৯৭

খ. ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন নীতিমালার মধ্যে ইসলামী ব্যাংককেই বলা হয় একমাত্র বিষয়, যা বাস্তবতার মুখ দেখেছে এবং কিছুটা হলেও স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছে। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকিং তার অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গ. ইসলামী ব্যাংকগুলো আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে স্থানীয় অর্থনীতির একটি কার্যকর উদাহরণে পরিণত হয়েছে এবং গণচাহিদার ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠেছে, যা পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারে, যদি ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

২. দুর্বলতা ও অক্ষমতা/সীমাবদ্ধতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা ইতোমধ্যে যেমন নীতি ও তত্ত্বগতভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও অপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি পদ্ধতিগতভাবেও যে এটি একটি অধিকতর কল্যাণকর ও সুষম ব্যবস্থা —তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার আদর্শ রূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতির আর্থিক ব্যবস্থা অনুশীলন; কিন্তু শরীয়াভিত্তিক অর্থায়নের আদর্শিক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠত্ব (Empirical Superiority) প্রমাণ করা ইসলামী ব্যাংকগুলোর পক্ষে এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং সেবার মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় এখনও অনেক সীমিত। বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থায়ননির্ভর নানা ধরনের সেবা চালু হওয়া সত্ত্বেও কুয়েত অ্যান্ড মিডলইস্ট ফাইনান্সিয়াল কোম্পানির সম্পদ বণ্টনবিষয়ক পরিচালক আমরিথ মুক্তামালার মতে—তা এখনও সীমিত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিনিয়োগকারীদের জন্য ইসলামী অর্থায়নের সেবার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় এখনও অনেক সীমিত। এর সম্ভাবনাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উচিত। .. ইসলামিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের আরও বেশি গতিশীল হওয়া উচিত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাবসা নতুন নতুন কৌশলে পরিচালনা করতে হবে। ..'

এ অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো—গবেষণার স্বল্পতা ও গতিহীনতা; ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত জ্ঞান ও

প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার ঘাটতি, অদক্ষতা ও স্থবির মনোভাব; প্রয়োজনীয়তা পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার অভাব; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি।

সনাতন ব্যাংকিংব্যবস্থার অনুকরণ ও এর পরিণাম

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার একটি বড়ো দুর্বলতা হলো—অতিমাত্রায় সনাতন ব্যাংকিংব্যবস্থার অনুকরণ। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সৌদি আরবের 'আল বারাকাহ ব্যাংকিং গ্রুপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা শাইখ সালিহ কামিল-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

> ... আমি আপনাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, আমাকে যদি সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু করতে হতো, তাহলে অর্থনীতি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা প্রয়োগের জন্য আমি ব্যাংকব্যবস্থাকে কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করতাম না। বরং ভিন্নতর এমন একটি কাঠামো খুঁজতাম, যেখানে বিনিয়োগ কার্যক্রমকে পুরোপুরি শরীয়তের মূলনীতির ভিত্তিতেই পরিচালনা করা হতো। এর কারণ হলো, বর্তমানে আমরা কেবল 'ব্যাংক' নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট হইনি, বরং সনাতন ব্যাংকিংয়ের মূল ধারণা তথা 'আর্থিক মধ্যস্থতাকারী' হিসেবেও একে গ্রহণ করেছি। ফলে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা এমন কোনো ধারণা বা পদ্ধতি দেখতে পাই না, যা প্রচলিত 'আর্থিক মধ্যস্থতাকারী'র ধ্যানধারণাকে অতিক্রম করেছে। ফলে বাস্তবতা এমন হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংগুলোর গৃহীত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ ঋণ ও বিনিয়োগের একটি মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। এতে সুদভিত্তিক ঋণের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী পদ্ধতির ক্রটিসমূহ বিদ্যমান। ফলে এটি ইসলামী বিনিয়োগের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ঝুঁকির অংশীদারত্ব এবং প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ওপর ভিত্তিশীল। ইসলামী পদ্ধতি পুঁজি ফেরত বা মুনাফা প্রদানের কোনো গ্যারান্টি অনুমোদন করে না।
>
> এই অবস্থার গভীরতা ও চলমান ধারা একটি বিষয় দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, তা হলো—আমাদের ব্যাংকের যে 'অর্গানাইজেশনাল চার্ট' রয়েছে, যা আমরা সনাতন ব্যাংকসমূহের অনুসরণে তৈরি করেছি, তা পরিমাপ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে 'পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট'-এর দিকে কোনো নজর

রাখে না, যা সকল প্রকার উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আত্তীভূত করতে পারে। এভাবে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে একটি কাঠামো তৈরি করে নিজেদেরকে তুষ্ট করেছি এবং আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ এমনভাবে তৈরি করেছি, যা সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর ফলাফল হিসাবে আমরা যা পেয়েছি তা হলো, পাশ্চাত্য আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে যথেষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও বাস্তবিকপক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র ও মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমরা কোনোরূপ সফলতা দেখাতে পারিনি। আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড থেকে বড়োজোর সুদকে পরিহার করতে পেরে পরিতৃপ্তি বোধ করেছি। কিন্তু সুদভিত্তিক ব্যাংকিংব্যবস্থার বাস্তবতা ও প্রভাব থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি।

এই ভুল প্রবণতার স্বাভাবিক ফলাফল হলো, ফাইন্যান্স চলে যায় সচ্ছল ও ঋণ ফেরত দানে সক্ষম লোকদের নিকট, যারা সকল প্রকার নিশ্চয়তা দানের ক্ষমতা রাখেন। আর আমরা ব্যাংকের কোনোরূপ অংশগ্রহণ না রেখে বিনিয়োগ ঝুঁকি এককভাবে চাপিয়ে দিচ্ছি বিনিয়োগকারীর ওপর। কোনো গ্রাহকের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে গিয়ে আমরা এটা বিবেচনায় নেই না যে, প্রকল্পটির অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা কতটুকু। আমরা কেবল গ্যারান্টি ক্ষমতার নিশ্চয়তা নেই। ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ মুদ্রাস্ফীতির জটিলতা সৃষ্টি করছে কি-না কিংবা তা অগ্রাধিকার ও চাহিদা নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কি-না তার প্রতি নজর দেই না। এভাবে আমরা আমাদের অজান্তেই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল ধারণা এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি, যা সুদের প্রশ্ন ছাড়াই মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারত।

সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পেছনে যুক্তি হলো, ইসলাম ঝুঁকি গ্রহণকে উৎসাহিত করে। কারণ ঝুঁকি গ্রহণ ও মুনাফা হাত ধরাধরি করেই চলে। সুনির্ধারিত গ্যারান্টিযুক্ত মুনাফার ওপর নির্ভর করার জন্য ইসলাম নয়। বিষয়টি কোনো মেয়াদের সাথেও সম্পর্কিত নয় যে, কারবার সম্পন্ন হওয়ার আগে বা পরে সময় নির্দিষ্ট করে মুনাফা প্রদান করা হবে। কেননা ইসলামী ব্যাংকের দুটি বিশেষ

নীতি রয়েছে- মুরাবাহা ও ইজারা। এই ঝুঁকি গ্রহণের পেছনে কী দূরদর্শিতা রয়েছে তা পরিষ্কার। কেননা, দেশের উন্নতি যা কি না ইসলামে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য, তা অর্জিত হয় আবশ্যকীয় উৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণ করার মাধ্যমে। এতে যেমন জনগণের কর্মসংস্থান হয়, তেমনি পণ্যের উৎপাদন ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

বস্তুত সুদকে পরিত্যাগ করাই সুদের বিরোধিতা করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারও অর্থ বা তহবিলকে সুদ থেকে পরিচ্ছন্ন করার অর্থ হলো, যে ত্রুটি ছিল তা থেকে উলটো ফিরে আসা। যাহোক সত্যের দাবি হলো–ব্যাবসায়িক উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষকেই সমানভাবে ঝুঁকি বহন করতে হবে এবং প্রাপ্তি ও ঝুঁকির ভিত্তিতে অর্জিত লাভ লোকসান ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এটাই হলো 'ইক্যুইটি' বা সুদবিহীন স্টক শেয়ার, যা প্রচলিত সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান পদ্ধতি থেকে মুশারাকাকে পৃথক করে দেয়। প্রচলিত সুদি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সর্বাবস্থায় তার প্রদত্ত অর্থ সুদসহ ফেরত পাবে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতা সকল দায়দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করবে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রায় সমুদয় কার্যকলাপে ঝুঁকিমুক্ত থাকার প্রবণতা, সাথে সাথে গ্যারান্টিযুক্ত মূলধন বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই পথ খোলা রাখলে অচিরেই তা সংশয়বাদীদেরকে এই ব্যাংক সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও প্রতারণার বীজ বপনের সুযোগ করে দেবে। তারা সনাতন ব্যাংকের সুদকে হালাল প্রমাণ করার জন্য আপাতদৃষ্টিতে অনেক যৌক্তিক প্রশ্ন অবতারণা করার সুযোগ পাবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি বর্তমানের পথ ধরে চলা অব্যাহত রাখি, তাহলে ইসলামী ব্যাংকগুলো খুব শীঘ্র তাদের প্রতিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় ভিত্তিই হারিয়ে ফেলবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে ব্যাবসা করছে। এখানে শেয়ারহোল্ডারদের তহবিলের পরিমাণ খুবই সামান্য। অথচ তা সত্ত্বেও আমরা দেখি, শেয়ারহোল্ডাররা ব্যাংকিংব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে আমানতকারীদের চেয়ে অধিকতর মুনাফা উঠিয়ে নিচ্ছে। যিনি সঞ্চয়কারী অর্থাৎ এই পুঁজির মালিক, তার ক্ষমতা নেই যে, তিনি

'মুদারিব'-কে (এখানে ব্যাংকারকে) কাজে রাখবেন, না বিদায় করে দেবেন। তার ক্ষমতা নেই যে, তিনি মুদারিবকে এই বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা দেবেন, যদিও ইসলামী ফিকহ পুঁজির মালিককে সে অধিকার দান করেছে।...[৪৪৬]

কাজেই এ বিষয়ে বিকল্প কিছু ভাবার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। শাইখ সালিহ কামিল এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দুটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছেন—

ক. আমানতকারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পর্যবেক্ষক ও দিকনির্দেশনা প্রদানকারী বোর্ড গঠন করা।

খ. ইসলামী ব্যাংকসমূহের আইনগত কাঠামোকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে পার্টনারশিপ কোম্পানিতে রূপান্তর করা।

সুদের সংশ্লিষ্টতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো বিশেষত দুটি ক্ষেত্রে সুদি লেনদেন করে থাকে—

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাধ্যতামূলক সঞ্চিতি (SRR) এবং Foreign Currency Clearing Account-এ জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রার ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদ দেয়।

খ. বিদেশি ব্যাংগুলোর সাথে ইসলামী ব্যাংকগুলোর যে Nostro Account থাকে, সেখান থেকে চলতি হিসাব হলেও Overnight Lending-এর ভিত্তিতে তারা সুদ লাভ করে থাকে।

উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এ কারণে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত আমদানি-রপ্তানি ব্যাবসাকে আমরা নির্ভেজাল ইসলামী বলতে পারি না। বড়োজোর সমস্ত প্রক্রিয়া আংশিকভাবে ইসলামী বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুদি প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে ব্যাংককে হয়তো বৈদেশিক বাণিজ্য ত্যাগ করতে হবে অথবা সীমিত করতে হবে; কেবল বিদেশি ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে বাণিজ্যিক

৪৪৬. Salih kamal, Development of Islamic Banking Activity: Problems and prospects, 'IDB prize lecture series no.12' Jeddah : Islamic Development Bank, 2000 : 2nd ed.

সম্পর্ক রাখা যাবে। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর পক্ষে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা দুরূহ হবে। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসআরআর এবং Foreign Currency Clearing Account -এ জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রার ওপর যে সুদ দেয় তাকেও ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থন করা যায় না।

এসব কারণে এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, বর্তমান বিশ্বে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ নির্ভেজাল ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, এ সুদগুলো ইসলামী ব্যাংকগুলোর আয়ের একটি অংশ। সুদের এ অংশকে অবশ্যই তারা আয় হিসাবে দেখায় না; অন্য জনকল্যাণমূলক তহবিলে স্থানান্তরিত করে দেয়।

প্রচলিত ব্যাংকিং নর্মস লঙ্ঘন

বিনিয়োগ পোর্টফলিওসহ ইসলামী ব্যাংকিং সামগ্রিকভাবে শরীয়াভিত্তিক হতে হলে অবশ্যই প্রচলিত ব্যাংকিং নিয়মাচার মেনে চলতে হবে। এটি সালাতে ওজুর মতো। সালাতের ভেতরে-বাইরে তেরো ফরজের কোথাও অজুর কথা নেই। কিন্তু অজু লাগবেই, এতে কম্প্রোমাইজ নেই। তেমনি শরীয়া হোক আর নন শরীয়া—সব ব্যাংককেই ব্যাংকিং নর্মস মানতেই হবে। নিম্নে শরীয়া ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকিং নর্মস কতটুকু মানছে- তা উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পয়েন্টে তুলে ধরা হলো—

ক. সর্বশেষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী দেশের ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ-আমানত অনুপাতের (আইডি রেশিও) সর্বোচ্চ সীমা ৯২ শতাংশ। এ ধারার ব্যাংকগুলো ১০০ টাকা আমানত পেলে তা থেকে সর্বোচ্চ ৯২ টাকা ঋণ (বিনিয়োগ) দিতে পারে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের মার্চে এসে শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আইডি রেশিও ৯৯ শতাংশে ঠেকেছে।

খ. যেকোনো সময়ে একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রুপকে দেওয়া ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণ-সুবিধা আসল অঙ্কের মোট পরিমাণ কোনোভাবেই সেই ব্যাংকের মূলধনের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না। আর একক কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে দেওয়া ফান্ডেড ঋণ-সুবিধা আসল অঙ্কের মোট পরিমাণ ব্যাংকের মোট মূলধনের ১৫ শতাংশের বেশি হবে না। এ নীতি কোনো ইসলামী ব্যাংকই মানতে পারেনি বলে পত্রিকার খবর।

গ. ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোনো একটি ব্যাংকে একক ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা নিতে পারে। সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ দখলের পর নামে-বেনামে ২৪ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩১ কোটি ৮৯ লাখ ১২ হাজার ১৬৫টি শেয়ারের মালিকানা নিয়েছে চট্টগ্রামের একটি গ্রুপ, যা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের ৮১ দশমিক ৯২ শতাংশ। এটিও চরম পর্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন।

ঘ. সেঞ্চুরি ফুড প্রোডাক্ট, ইউনাইটেড সুপার ট্রেডার্স এবং মুরাদ এন্টারপ্রাইজ ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রামের তিনটি শাখার গ্রাহক। এসব প্রতিষ্ঠানের নামে গত জুলাই, ২০২৪ শেষে ব্যাংকের ঋণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। কাগজপত্রে চট্টগ্রামের আসাদগঞ্জের যে ঠিকানা ব্যবহার করে এসব ঋণ নেওয়া হয়েছে, সেখানে পাওয়া গেছে আবাসিক ভবন ও ঢেউটিনের দোকান। ঢাকার গোপীবাগে টপটেন ট্রেডিং নামে আরেক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৪৮ কোটি টাকা। এ ঠিকানায় রয়েছে বাস কাউন্টার। এভাবে বেনামে ইসলামী ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে বহুল সমালোচিত গ্রুপটি।

ঙ. সাম্প্রতিক সময়ে নগদ অর্থ সংকটে থাকা ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকিং নীতিমালা লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকসহ কেন্দ্রীয় থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকগুলো সুদ গ্রহণ বা পরিশোধ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে জানামতে, ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজেদের মধ্যেই এ জাতীয় ধারদেনা মুদারাবা ভিত্তিতে করত। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী নীতিমালা দিয়েছে জানা যায়নি। বলার অপেক্ষা রাখে না, তাদের সাথে মুদারাবা চুক্তির কোনো সুযোগ নেই।[৪৪৭]

বিনিয়োগে ভারসাম্যহীনতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য হলো— বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা; সমাজের নিম্নবিত্ত দরিদ্র ও অভিজাত ধনীদের

৪৪৭. শামসুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকে শরিয়া পরিপালন নিশ্চিত কল্পে শরীয়া কমিটির ভূমিকা প্রসঙ্গে, ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট এ শরীয়া পরিপালন কতটুকু হয়?*, সপ্তম পর্ব : তৃতীয় অংশ, https://www.facebook.com/share/p/j2d7D2JXwN2odr3L/?mibextid=oFDknk

মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য তৈরি না করে ইনসাফ ও ন্যায্যতার বিস্তার সাধন। অথচ আমরা লক্ষ করি, ইসলামী ব্যাংকগুলো বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে গুটিকতক শিল্পগোষ্ঠীকে সহজ শর্তে এবং কম মুনাফায় বেশি বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে থাকে, পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ে ব্যবসায়ীদেরকে তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে থাকে, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বেলায় শর্তও কঠিন। এটা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে নীতি মেনে চলে তাও বৈষম্যপূর্ণ; ছোটো বিনিয়োগ গ্রহণকারীদের থেকে অনেক বেশি জামানত গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে বড়ো বিনিয়োগ গ্রহণকারীদের থেকে অনেক কম জামানত গ্রহণ করে। অথচ দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে ছোটো বিনিয়োগ গ্রহীতারা এগিয়ে; তার পরে মাঝারি, অতঃপর বড়ো বিনিয়োগ গ্রহীতারা।

এ বৈষম্যের নিশ্চিত ফলাফল হলো, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর এত ইসলামী ব্যাংকগুলোর ফাইন্যান্সও অত্যধিক পরিমাণে চলে যাচ্ছে সচ্ছল ও ধনাঢ্য লোকদের নিকট। আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে যেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখার কথা ছিল, সেখানে কার্যত ইসলামী ব্যাংকগুলোও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতোই পুঁজিপতিদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে বেশি। এ ধরনের কার্যক্রম শরীয়ার উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, ছোটো বিনিয়োগগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকে প্রচলিত জামানতের বিধিবদ্ধ নিয়ম যেভাবে অনুসরণ করা হয়, বড়ো বিনিয়োগগ্রহীতার ক্ষেত্রে তা-ও ঠিক সেভাবে অনুসরণ করা হয় না। অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষকে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতি অল্প কিংবা নামেমাত্র জামানত গ্রহণ করে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। জানা গেছে, ২০২০ সালে মাত্র আট লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যাবসা শুরু করেন ইনহেরেন্ট ট্রেডিং এন্ড ইমপেক্স লিমিটেড। ব্যাংকে জমা দেওয়া নথিপত্রে ভোজ্য তেল ও ঘি উৎপাদন এবং ট্রেডিং ব্যাবসা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের (তেলের রিফাইনারি) ভিত্তি পাওয়া যায়নি। এই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরুর দুই বছরের মধ্যেই ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রামের চাক্তাই শাখা থেকে এক হাজার ২৮৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ঋণ নেয়। ব্যাংক থেকে চার কিস্তিতে ছাড় করা হয় এসব ঋণ। ২০২১ সালের অক্টোবরে ছাড় হওয়া এই বিশাল অঙ্কের ঋণের বিপরীতে

ব্যাংকে জামানতের পরিমাণ খুবই সামান্য। ইনহেরেন্ট ট্রেডিং এন্ড ইমপেক্স লিমিটেডের ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জমা দেওয়া আয়করের নথিপত্রে ব্যাংক থেকে নেওয়া এক হাজার ২৮৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ঋণ কোথায় বিনিয়োগ করেছেন এর বর্ণনা নেই।[৪৪৮]

ব্যবসায়কে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা

অনেক গ্রাহকের নগদ টাকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তারা যেহেতু সরাসরি ইসলামী ব্যাংক নগদ টাকা দেয় না, তাই তারা ব্যবসায়কে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এরূপ কর্মপদ্ধতি একান্তই নিন্দনীয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহ. ব্যবসায়ে সুদকে হালাল করার কৌশলের বিরুদ্ধে একটি যুগান্তকারী ফাতওয়ায় বলেন, 'আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কিছু ব্যবসায়ী কাপড় প্রস্তুত করে রেখেছে সুদকে হালাল করার জন্য। যখন কারও কাছে কেউ ১০০০ টাকা ঋণ নিতে আসে ১২০০ টাকার বিনিময়ে, তখন সে চলে যায় ওই হালালকারী কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে। অতঃপর ঋণদাতা তার নিকট থেকে কাপড় কিনে এবং সেটি ঋণগ্রহীতাকে দিয়ে দেয়। অতঃপর গ্রহীতা সেটি কাপড় ব্যবসায়ীকে ফেরত দিয়ে আসে। ওই ব্যবসায়ী ওই কাপড় সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত। কেননা সে জানে যে, এর মাধ্যমে সে সুদকে হালাল করছে। অবশ্যই এটি কোনো ব্যাবসা নয়।' হিল্লা বিবাহের নিন্দা করার পর ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ রাহ. সূদের হিল্লার উক্ত ফাতওয়া প্রদান করেন।[৪৪৯]

৩. উদ্দেশ্যগত সাফল্য ও ব্যর্থতা

ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা কাঠামোগত দিক থেকে প্রচলিত ব্যাংকিংব্যবস্থার এত মনে হলেও আদর্শ ও মূল্যবোধের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাম্য ও

৪৪৮. https://bangla.thedailystar.net/economy/bank/news-611531

৪৪৯. ইবনু তাইমিয়াহ, *ইক্বামাতুদ দলিল আলা ইবত্বালিত তাহলীল*, বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তা.বি., পৃ. ২২১

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, অপচয় ও অপব্যয় রোধ ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থ নয়; দেশের উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের আদর্শই মূল চালিকাশক্তি। নৈতিক মূল্যবোধের বিধান অনুসরণ করে সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা এ ব্যবস্থার অন্যতম কর্মকৌশল। সম্পদ অর্জন ও এর সুষ্ঠু বণ্টন সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। শুধু সম্পদ উৎপাদন নয়; উৎপাদিত সম্পদের বণ্টনে সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ অনুসরণ ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় প্রাণশক্তিরূপে কাজ করে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক মানবকল্যাণে কাজ করে।

ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা আর্থিক মধ্যস্থতার এমন এক পদ্ধতি, যা তার কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করে, যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন তথা অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা আর্থিক লেনদেন ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থসামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারা ব্যাপকভাবে জনগণের কল্যাণে নেবেদিত। এ ব্যবস্থা গুটিকয়েক মানুষের লোভের চাহিদা পূরণের জন্য লাভকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য না দিয়ে সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। এভাবে আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা কাজ করে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা সম্পদ আবর্তনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ নীতি মেনে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে উৎপাদিত পণ্যের সামাজিক বণ্টনের নীতিকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ, সম্পদ উৎপাদনই লক্ষ্য বা শেষ কথা নয়। কী ধরনের সম্পদ কার জন্য উৎপাদন করা হবে এবং সেই উৎপাদিত সম্পদ কীভাবে বেশিসংখ্যক উপকারভোগীর কাছে পৌঁছানো হবে—এটি ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, উপর্যুক্ত সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতির বিচারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আজও আশানুরূপ সাফল্য প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১০ সালে আজারবাইজানের বাকুতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ৩৫তম বার্ষিক সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের (CIBAFI) চেয়ারম্যান শাইখ সালিহ কামিল বলেছেন—

গত দশকগুলোতে ব্যাংকার, গবেষক ও শরীয়া-বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পদ্ধতিগত দিকে বেশি জোর দিয়েছেন। লেনদেনে প্রণালি পদ্ধতি অনুসরণে কিছুটা সফলতাও এসেছে; কিন্তু ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যগত দিকটি যথাযথ অগ্রাধিকার পায়নি।

তা ছাড়া প্রায়োগিক দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধানের পরিপালন আজও কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত হয়নি। এ কারণে অনেকেই নানা সময় ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য ও সমালোচনা করে থাকেন।[৪৫০]

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো—আমরা এ কথা দাবি করছি না যে, তাদের সমালোচনা একেবারেই অমূলক; বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সমালোচনার সত্যতা পাওয়া যায়; তবে এর এমন কিছু বাস্তবসম্মত কারণও রয়েছে, যা আমরা মোটের ওপর উপেক্ষা করতে পারি না। যেমন—

প্রথমত, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থান সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মধ্যে এক ফোঁটা পানির সমতুল্য। সুতরাং অল্প কয়েক দশক সময়ের মধ্যে অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো উদ্দেশ্যগত দিক থেকে যে একটা বড়ো বিপ্লব ঘটাবে—এরূপ কিছু আশা করা যথার্থ নয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনও তাদের শৈশবকাল অতিক্রম করছে। তাদেরকে অনেক বাধাবিঘ্ন ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। ফলে ওই সকল ব্যাংকের মধ্যে কোনো কোনো ব্যাংক তাদের সকল চুক্তিতে শরীয়তের সকল শর্ত যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হয় না। এজন্য এটা বলা যাবে না যে, এসব ব্যাংকে প্রচলিত সকল চুক্তি ও লেনদেনই শরীয়ত মোতাবেক যথার্থ প্রক্রিয়ায় সুসম্পাদিত হয়।

তৃতীয়ত, ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার, কর ব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথাযথ সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এমন কিছু বিশেষ সুযোগ (রুখসাত ও রেয়াত) প্রদান করা হয়, যা শরীয়তের মৌলিক ও আদর্শিক নিয়মনীতিভিত্তিক নয়।

৪৫০. বিনিয়োগনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ম্যানুয়াল, পৃ. ১৯

উল্লেখ্য, শরীয়তের মধ্যে দু-ধরনের বিধিবিধান রয়েছে। একধরনের বিধিবিধান হলো—শরীয়তের মূল লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ও আদর্শভিত্তিক, যেগুলোর ওপর সাধারণ অবস্থায় আমল করা হয়। অপর একধরনের বিধিবিধান হলো—রুখসাত তথা সুযোগ-অবকাশভিত্তিক, যেগুলোর ওপর কেবল জরুরি ও অস্বাভাবিক অবস্থায় আমল করার অনুমতি দেওয়া হয়। সত্যিকার ইসলামী ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হলো প্রথম ধরনের বিধিবিধান, যেগুলো দ্বারা ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র ও সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হয়। আর দ্বিতীয় ধরনের বিধিবিধান হলো, যা একান্ত প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু এর দ্বারা ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুটিত হয় না।

অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বর্তমানে সাধারণত দ্বিতীয় প্রকারের বিধানসমূহ তথা রুখসাতের ওপরই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনতে পারছে না, নিজস্ব দ্যোতি ছড়াতে পারছে না। তবে যদি পুরো অর্থায়ন-পদ্ধতি ইসলামের আদর্শ ও মৌলিক নীতির ওপর পরিচালিত হয়, তাহলে অবশ্যই অর্থব্যবস্থার ওপর এর স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।[৪৫১]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পদ্ধতি ও পরিচালনাগত দিক থেকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার অনেক ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে; কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, বর্তমানে তার প্রাগসর পদযাত্রা থমকে দাঁড়িয়েছে। সামসময়িক সময়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত নামে-বেনামে নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ নেওয়া এবং অর্থ তছরুপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগত কারণেই প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে, বাংলাদেশে এই সফল ব্যাংকিংব্যবস্থা কি মুখ থুবড়ে পড়বে? লাখ-লাখ বিনিয়োগকারীর শেয়ার এবং আমানতের নিরাপত্তা নিয়ে গোটা দেশবাসী আজ শঙ্কিত।

বর্তমান যে অভিযোগের কথা প্রচারমাধ্যমগুলোতে শোনা যাচ্ছে তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তার জন্য অবশ্যই ইসলাম এবং ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা তো দায়ী নয়ই; এমন কি ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরাও কোনোভাবেই ব্যর্থ নয়।

---

৪৫১. তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি..*, পৃ. ২৬-২৭

প্রচারমাধ্যম অনুযায়ী ব্যর্থতা যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা ইসলামবিদ্বেষী ও স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র ও লোভের বহিঃপ্রকাশ, যা দেশের অন্যান্য অনেক খাতেও হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশের সচেতন মহল বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। অধিকন্তু, ইসলামে যে ব্যাংকিংব্যবস্থা রয়েছে এবং সেটা যে সফল ব্যাংকিংব্যবস্থা তা জাতির কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে।

৪. কর্পোরেট কালচার : তত্ত্ব বনাম বাস্তবতা[৪৫২]

মানুষের এত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রতিষ্ঠানের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহই তার সংস্কৃতির ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে এই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। কর্পোরেট কালচার বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি একটি অদৃশ্য কিন্তু বলিষ্ঠ শক্তি, যা প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির আচরণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি শুধু লিখিত বিধান, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (Standard Operating Procedure-SOP) বা সংবিধান নয়, যা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকীয় নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে; বরং কর্পোরেট কালচার বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি হলো প্রতিষ্ঠানের প্রাণ এবং এমন বৈশিষ্ট্য যা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্যকলাপে প্রতিনিয়ত অঙ্কিত থাকে।

যেহেতু ইসলামী ব্যাংক গতানুগতিক কোনো প্রতিষ্ঠান নয়; ইসলামী শরীয়াভিত্তিতে পরিচালিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাই এর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতেও ইসলামী শরীয়ার ভাবধারার প্রতিফলন ঘটবে—তা-ই একান্ত কাম্য। শরীয়া পরিপালন বিশ্ব মানবতার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের মূল চাবিকাঠি। ইসলামী ব্যাংক একটি বিশ্বাসনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাওহীদ, রিসালত, আখিরাতে বিশ্বাস ইসলামী ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির মূলভিত্তি।

---

৪৫২. এতৎসংক্রান্ত আলোচনাটি ‘ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট কালচার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪-৭৫ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা), পৃ. ১০৯-১২৭ থেকে সংগৃহীত (সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত); DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.246

ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়ানীতির কঠোর অনুশীলন ইসলামী ব্যাংকের প্রথম অগ্রাধিকার। তাকওয়া, আদল, ইহসান ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি। ব্যাংকিং কার্যক্রমে নৈতিকতা অনুশীলন ও যেনতেন প্রকারে মুনাফা সর্বাধিকরণের পরিবর্তে শরীয়াসম্মত পন্থায় মুনাফা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অংশ।

ইসলামী ব্যাংকের কর্পোরেট কালচারের বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ

নিম্নে একটি ইসলামী ব্যাংকের কর্পোরেট কালচার তথা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উপাদান সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

ক. লোগোতে ইসলামী সংস্কৃতির ফোকাস

লোগো হলো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রাথমিক অভিব্যক্তি। কোনো চমৎকার লোগো সামনে আসলে দর্শকের চোখ আটকে যায়, একবারের দর্শনে তা মনে গেঁথে যায়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে এবং দর্শকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। ইসলামী রীতি ও নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যতিক্রমী লোগো বেছে নেয়, যাতে তার সংস্কৃতিকে ফোকাস করা হয় এবং এতে ইসলামী রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থি কোনো উপাদান থাকে না।

খ. ভিশন ও মিশন বিবৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধের প্রকাশ

যেহেতু ভিশন ও মিশন প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে, এমনকি তা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও একটি স্পষ্ট এবং কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করে। তাই ইসলামী ব্যাংকের ভিশন ও মিশন বিবৃতি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা তার কর্মীদের অভিন্ন ও মহৎ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির একটি সাধারণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

গ. যোগ্য জনশক্তি নিয়োগ, উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ ও কর্মী সুরক্ষার সংস্কৃতি

একটি মহৎ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় নিয়োগ এবং বাছাই কার্যক্রমের মাধ্যমে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণ এবং শরীয়া জ্ঞানসমৃদ্ধ শীর্ষ

প্রতিভা বাছাই করে। তারা এমন কর্মী নিয়োগ দেয়, যাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং যোগ্যতা রয়েছে এবং ব্যাংকের সংস্কৃতি ও নীতির সাথে সবচেয়ে ভালো মানানসই হয়।

ইসলামী ব্যাংক তাদের কর্মীদেরকে মূলধন হিসাবে বিবেচনা করে। কর্মীদের জন্য উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠানকে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য একটি আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন। আইনগত ন্যূনতম বয়সের নিচে কর্মীদের নিয়োগ না করা, জোরপূর্বক কাজ না করানো, বয়স, লিঙ্গ, জাতি বা আর্থসামাজিক পটভূমির ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য না করা-এসব মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

একটি ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সকল স্তরের কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ, সহনশীল, স্বাস্থ্যকর, যত্নশীল, উৎপাদনশীল এবং ঝুঁকিমুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এটিকে 'সেরা স্থান' হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিকল্পনা এবং পরিবর্তনকে গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেয়। উন্নত শ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীদের সাথে সম্পর্কের দ্বন্দ্ব নিরসনের ব্যবস্থা করা হয়, যা প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। ইসলামী ব্যাংক তাদের কর্মীদের সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য ধারাবাহিকভাবে কিছু করার চেষ্টা করে এবং কর্মী কল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তার মান এবং কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষতিপূরণ কৌশলের মধ্যে রয়েছে কর্মীদের অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা, ন্যায্য মজুরি প্রদান, প্রণোদনা, ডিসকাউন্টেড হারে বিনিয়োগ এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান, যা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নিয়মিত বেতন প্যাকেজ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক-এর কর্মীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে, যাতে তারা চাকরির মেয়াদ শেষে তাদের জীবনকে সুরক্ষিত করতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অবসরকালীন সুবিধা পেতে অনেক প্রতিষ্ঠানে ভোগান্তির নানা কাহিনি প্রায়শই শোনা যায়। প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত কর্মী অবসর গ্রহণের পর একসময়ের চেনা [illegible]

বাড়েনা এবং অনেক ক্ষেত্রে নিট্রেন আকর্ষণ করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসমূহে এ প্রবণতা ব্যতিক্রম। ব্যাংকগুলোর প্রতি মহিলাগণ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন যা ইসলামী ব্যাংকিং এর সংস্কৃতি।

৫. মাকাসিদ আশ-শরীয়াহর আলোকে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তন

মাকাসিদ আশ শরীয়া বা শরীয়াতের এর মূল উদ্দেশ্য হলো— মানবজাতির কল্যাণ (মাসলাহাহ) সাধন করা এবং তাদেরকে ক্ষতি (মাফসাদা) থেকে রক্ষা করা। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করতে সচেষ্টকর, যাতে শরীয়ার লক্ষ্য অর্জিত হয়।

ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কল্যাণ বৃক্ষের মতো, যার সর্বোচ্চ কল্যাণ থেকে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রকৃতি, পরিবেশ সব কিছুই উপকৃত হয়।

সর্বস্তরের মানুষকে ব্যাংকিং সেবাদান ও জনকল্যাণসাধনের নিমিত্তে ইসলামী ব্যাংক রিবা, গারার, মাইসির ও অন্যান্য শরীয়া-নিষিদ্ধ উপাদানমুক্ত কল্যাণধর্মী সেবা ব্যাংকিং প্রোডাক্ট প্রবর্তন ও অনুশীলন করে।

৬. ইসলামী সম্ভাষণ রীতি :
প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে এক ভিন্ন মাত্রার সংযোজন

ইসলামী ব্যাংকসমূহের গ্রাহক ও জনশক্তি পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, অফিসিয়াল চিঠি বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত 'হাই-হ্যালো'র পরিবর্তে সালাম এবং হ্যান্ডশেকের পরিবর্তে মুসাফাহাসহ ইসলামী অভিবাদনের সংস্কৃতি চালু করে। বর্তমানে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই এ সংস্কৃতি অনুসরণ করছে। উক্ত অভিবাদনের তাৎপর্য হচ্ছে, একজন ব্যক্তিকে তা এই মর্মে সচেতন করে তোলে যে, তিনি যেখানেই থাকুন না যেখানেই যান সেখানেই তাকে ভালোবাসা এবং শান্তি জড়িয়ে দিতে হবে।

৭. অফিস চলাকালে জামায়াতে সালাত আদায় :
ইসলামী ব্যাংকসমূহের এক অনন্য সংস্কৃতি

জামায়াতে সালাত আদায় প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্যই আবশ্যক। প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্মদিবসে অফিস প্রাঙ্গনে সালাতুজ জামায়াত আদায়ের ব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু করেছে। ব্যাংকিং কর্মচারী, গ্রাহক সাধারণ জামায়াতে [illegible]

গ্রাহকদের জন্য আলাদা ওয়েটিং রুম, ওয়াশরুমসহ সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের উক্ত সংস্কৃতি অনুসরণ করে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান এখন অফিস প্রাঙ্গণে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করেছে।

ছ. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, সহজীকরণ ও নমনীয়তার সংস্কৃতি

কর্পোরেট কালচারের উন্নতির জন্য আধুনিককালে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। যদিও কর্পোরেট কালচারের উন্নয়নে প্রযুক্তি সর্বদা প্রয়োজনীয় নয়, তবে নিঃসন্দেহে তা চূড়ান্তভাবে সহায়ক। আধুনিককালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এমনভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা আচরণগত অর্থনীতি (Behavioral economics)-কে অন্তর্ভুক্ত করে মানুষকে ইতিবাচক আচরণের দিকে চালিত করতে পারে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করেছে। আর সহজীকরণ ইসলামী শরীয়ার লক্ষ্য। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাংকিং কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্পোরেট কালচারের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগসমূহ ব্যর্থ হতে পারে, যদি ব্যবহৃত প্রযুক্তি মানুষের সত্যিকার আচরণকে অনুধাবন করতে না পারে। কেননা, সাধারণত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো প্রায়শই এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যেভাবে আমরা মানুষকে দেখতে চাই; সত্যিকার অর্থে তারা কেমন সেভাবে নয়।

জ. প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি

কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বা প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন হলো আদর্শ কর্পোরেট কালচারের সূতিকাগার, যেখানে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, কর্তব্য এবং কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধশালীরূপে গড়ে তোলা এবং তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন অব্যর্থভাবে অনুসরণ করা হয়।

কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতার পূর্বশর্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এই নীতিগত নির্দেশের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদ, ঘুস, দুর্নীতি অন্যায়, আত্মসাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা, জুয়াড়ি কার্যক্রম ইত্যাদিতে জড়িত হয় না কিংবা কোনো ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে না। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে সেবা নিতে কোনোরকম ঘুস-দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয় না

সুনাগরিক বা নৈতিকতাসম্পন্ন নাগরিক যেকোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ইসলামী ব্যাংকসমূহে গ্রাহক এবং ব্যাংকের মধ্যে প্রথাগত দেনাদার-পাওনাদার সম্পর্কের পরিবর্তে গ্রাহককে ব্যাবসায়িক অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করে একটি ব্যতিক্রমী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। তাকওয়া, ইহসান, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, সহমর্মিতা, সহজিকরণ, লেনদেনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক রাখেন-এমন অনেক গ্রাহককে বলতে শুনা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ মঞ্জুরি বা লিমিট পাশ করাতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের এক কাপ চা-ও খাওয়াতে হয়নি। এটাই ইসলামী ব্যাংকের সংস্কৃতি।

একটি স্বচ্ছ কর্পোরেট সংস্কৃতি পুরো প্রতিষ্ঠান এবং এতে কর্মরত জনশক্তিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ, ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী এবং চুক্তি সম্পাদন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক পক্ষগুলোর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বচ্ছতা বজায় রাখে।

শরীয়া রিভিউ/অডিট সিস্টেম (অফ-সাইট ও অনসাইট) এবং শরীয়া পরিপালনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকমূেহের কর্পোরেট সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ঝ. টিমওয়ার্ক, শক্তিশালী বন্ধন এবং 'এক প্রতিষ্ঠান এক পরিবার' সংস্কৃতি

সম্মিলিত প্রচেষ্টা বা টিমওয়ার্ক আদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। 'একটি প্রতিষ্ঠান একটি পরিবার' ধারণাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো টিমওয়ার্কের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পটভূমি থেকে আসা কর্মীদের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ইসলামী ব্যাংকের কর্মীরা একটি পরিবারের সদস্যদের এত কাজ করে এবং তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয়। পারস্পরিক বন্ধন, আন্তরিকতা, কর্মীদের উচ্চ মনোবলের দিকে পরিচালিত করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং একটি অনুকূল কর্ম পরিবেশ তৈরি হয়।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে জুনিয়দের প্রতি স্নেহ-মমতা, সিনিয়রদের প্রতি ভক্তি-সম্মান ও প্রাক্তনদের প্রতি যথাযথ মর্যাদার ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক তার কর্মীদের প্রতিভা এবং অবদানকে স্বীকৃতি দেয়, যা তাদেরকে সেরা হতে সক্ষম করে তোলে। সকল কর্মীর সাথে ইনসাফভিত্তিক আচরণ একটি অনুকূল, পরিবর্তনভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি তৈরি করতে সক্ষম, যেখানে কর্মীরা অনুপ্রাণিত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। ব্যাংকের জনশক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনোদন ও তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান তার প্রাক্তনদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। ইসলামী ব্যাংকমূহ বিদায়ী কর্মীদের ভুলে যায় না, তাদেরকে সুসজ্জিত বিদায় দান ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অংশ। কর্মরত অবস্থায় কোনো কর্মী মৃত্যুবরণ করলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নভাবে খোঁজখবর রাখে; বিশেষ করে তাদের সন্তানদের, যাতে তারা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।

ঞ. চাকরি নয়; ইবাদাতের মানসিকতা এবং প্রতিষ্ঠানকে আপন করে নেওয়ার মহান সংস্কৃতি

ইসলামী ব্যাংকের কর্মীদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সকলে যেন এখানে শুধু চাকরি নয় বরং ইবাদতের মানসিকতা নিয়ে কাজ করে। তারা তাদের অফিসিয়াল দায়িত্বকে আমানত হিসেবে গণ্য করেন এবং কোনো প্রকার দায়িত্ব অবহেলাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ন্যায় অপরাধ মনে করেন। ইসলামী ব্যাংকের কর্মীরা প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করে এবং তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সম্পদের যত্ন নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এমনকি তারা ব্যাংকের তথ্যের গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততা রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকে। তারা তাদের কর্তব্য পালনে মনপ্রাণ নেবেদন করে এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময়, শ্রম প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকে। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক সর্বদা তার কর্মীদের প্রতি প্রতিশ্রুতি বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং কর্মীরাও তাদের চাকরিতে নিরাপদ বোধ করে।

প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যাংক আইবিবিএল-এ এমন অনেক এমপ্লয়ির দেখা মেলে, যারা এই প্রতিষ্ঠানে তাদের পেশাগত

জীবন শুরু করার পর অন্য প্রতিষ্ঠানে আরও উচ্চ পোস্ট বা বিস্তর সুযোগ-সুবিধার অফার পেয়েও এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেননি। এমনকি সরকারি চাকরি, বিসিএস-এ সুযোগ পেয়েও ব্যাংক ছেড়ে যাননি-এমন দৃষ্টান্তও অনেক। একই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগদানের পর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে অবসরে গেছেন-এমন বিরল দৃষ্টান্তও এই ব্যাংকে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানকে আপন করে নেওয়ার এ সংস্কৃতি এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উন্নতি ও অগ্রগতির এক অন্যতম সোপান হিসেবে কাজ করছে।

ট. কর্মীদের পেশাগত উন্নয়ন ও মানোন্নয়নমূলক কর্মসূচি

কর্মীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও পেশাগত উন্নয়ন ছাড়া একটি উন্নত কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রত্যাশা করা যায় না। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সূচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, যোগ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতিটি কর্মদিবসে নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন-হাদিস বা কর্মীদের মানোন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে, কর্মীরা প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কর্মীদের দক্ষতা বিকাশের জন্য নিজস্ব ট্রেনিং অ্যাকাডেমির মাধ্যমে অনসাইট/অফসাইট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স/প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে ব্যাংকের প্রতিটি ওয়ার্কিং ইউনিটকে লার্নিং সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কারণ তা কর্মীদের আচরণ গঠনে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি বিকাশে প্রভাব বিস্তারকারী মূল্যবোধ তৈরিতে সহায়তা করে।

ইসলামী ব্যাংকের সংস্কৃতি হলো শরীয়ার নীতি ও লক্ষ্য অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা। কারণ, একটি নতুন আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রয়োজন পূরণে কার্যকরী ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও প্রচলনে নিবিড় গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

ঠ. গ্রাহকের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ ও উত্তম গ্রাহক সেবা

ইসলামী ব্যাংকমূহের কর্পোরেট সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হলো ফেয়ার ডিলিং (Fair Dealing)। গ্রাহকদের সাথে দায়িত্বপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে পলিসি অনুসরণ করে তার মধ্যে রয়েছে :

- গ্রাহকের ওপর কঠিন শর্তের কোনো বোঝা চাপানো হচ্ছে কি না তা যাচাই করার জন্য ব্যাংকের সব ধরনের ফরম ও চুক্তিপত্র শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ড/কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
- ব্যাবসা সম্প্রসারণ ও ব্যাংকিং প্রোডাক্ট মার্কেটিং-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট নৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণকরণ। শুধু মুনাফার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান না করা।
- ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রাহকের অধিকার ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ।
- ব্যাবসা পরিচালনা ও ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে গ্রাহকের যোগ্যতা এবং গ্রাহকের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক কল্যাণে বিনিয়োগের প্রভাব বিবেচনা।
- মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার ওপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করার ক্ষেত্রে শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ডের মতামত ও আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের হিসাব সংরক্ষণ।
- অসচ্ছল গ্রাহকের নিকট থেকে পাওনা আদায়ে বিলম্বের নীতি।

এ ছাড়া বিনিয়োগ গ্রাহককে অতিরিক্ত ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ একদিকে বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে যেমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Ex Ante Measures) গ্রহণ করে, তেমনি গ্রাহক আর্থিক অসচ্ছলতায় পতিত হলে তখনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Ex Post Measures) গ্রহণ করে। কারণ, ইসলামে ভ্রাতৃত্বের ধারণা সকল মানুষের সাথে মর্যাদাপূর্ণ ও সুন্দর আচরণ করতে শেখায়। শুধু পেশাগত বাধ্য-বাধকতার কারণে নয় বরং ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরত জনশক্তি সকল শ্রেণির গ্রাহকদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব ও পুণ্যের কাজ বিবেচনা করে থাকে। ফলে গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ীদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং আদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে।

ঙ. অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রবণ সংস্কৃতি

ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেখানে কর্মীদের মতামত/পরামর্শ বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং কর্মীদের পদ-পদবী নির্বিশেষে ভালো আইডিয়াগুলো গ্রহণ করা হয়।

ঢ. Greed Free, Need Based ব্যাংকিং অনুশীলনের সংস্কৃতি

লোভ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধু মুনাফার লোভ না করে মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাই সামাজিকভাবে, পরিবেশগতভাবে ও নৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত প্রকল্পগুলোতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ করে না, এমনকি তা আর্থিকভাবে টেকসই এবং লাভজনক হলেও নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে, "...the banks make financial transactions based on human necessities and embark upon productivity-oriented projects or activities to reduce the incidence of poverty." অর্থাৎ (ইসলামী) ব্যাংকসমূহ মানুষের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে লেনদেন পরিচালনা করে এবং উৎপাদনশীল প্রকল্পে অথবা দারিদ্র্যের হার হ্রাসমূলক কার্যক্রমে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।[৪৫৩]

ণ. আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক Mass ব্যাংকিংয়ের সংস্কৃতি

ইসলামী ব্যাংকের সংস্কৃতি হলো–দরিদ্র ও ব্যাংকিং সেবাবিহীন জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং ছাতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। ডিপোজিট গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বড়ো বড়ো ডিপোজিট গ্রহণ করার পাশপাশি ছোটো ছোটো ডিপোজিটকেও অবহেলা করে না। অন্যদিকে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রেও শুধু বড়ো বড়ো বিনিয়োগ নয় বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকদের চাহিদার দিকেও লক্ষ রাখে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের রয়েছে অনেক সামাজিক প্রোগ্রাম।[৪৫৪]

---

৪৫৩. BB, Bangladesh Bank. 2016. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, Bangladesh Bank, Oct-Dec 2016 issue. https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/oct _dec _2016.pdf

৪৫৪. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যাংক আইবিবিএল ১৯৯৫ সাল থেকে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প (RDS) এবং ২০১২ সাল থেকে নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (UPDS)-এর মতো প্রোগ্রাম চালু করেছে। যা বর্তমানে প্রায় ২৬ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তেরো লাখেরও বেশি প্রান্তিক মানুষের জীবন পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করছে যার বেশিরভাগই নারী। (IBBL's Annual Report 2020, P-99.) এ ছাড়া আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের আছে Grameen Small Investment Scheme (GSIS), এক্সিম ব্যাংক লি.-এর এক্সিম কিষাণ, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর রয়েছে Rural Investment Program (RIP), ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর কৃষি বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদি।

দেশের বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলিম যারা রিবা বা সুদের নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহ পরিণতির কারণে প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিলেন, ইসলামী ব্যাংক চালু হওয়ায় তারা ব্যাংকিং লেনদেনে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। এভাবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

ত. পরিবেশ রক্ষায় 'গো গ্রিন' ব্যাংকিং সংস্কৃতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহে যেকোনো ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমাতে এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। অধিকন্তু, ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির মূলনীতি হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের সুরক্ষা। পরিবেশ রক্ষাকারী খাতসমূহে বিনিয়োগের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে নীতিমালা অনুসরণ করে তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

- পরিবেশ সংরক্ষণ
- পরিবেশকে উন্নয়নের প্রভাবমুক্ত রাখা
- প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান
- নবায়নযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

পরিবেশবান্ধব বিপণন, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য তহবিলের সদ্ব্যবহার, অনলাইন ব্যাংকিং, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিপালন, সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ের প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অগ্রাধিকার প্রদান করে। পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ বিতরণ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিবেশ সুরক্ষা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।[৪৫৫]

---

৪৫৫. সবুজ স্বদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তর ইসলামী ব্যাংক (আইবিবিএল) প্রতিবছর বর্ষাকালে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে থাকে। প্রকল্পের প্রতি সদস্যকে ব্যাংক একটি চারা প্রদান করে এবং সদস্যকে আরও দুটি চারা নিজে সংগ্রহ করে রোপণ করতে উৎসাহিত করে। ২০০৩ সাল থেকে শুরু করে ব্যাংকটি এ পর্যন্ত প্রায় ৮৫,৭১,৩৫২টি গাছের চারা বিতরণ করেছে (Annual Report 2016-2019)। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পালন করেছে 'এফএসআইবিএল সবুজ উপকূল ২০১৬'-এর মতো পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি (Annual Report 2016, 44)।

থ. প্রচার, প্রকাশনা ও বিপণনে নৈতিকতা অনুশীলনের সংস্কৃতি

একসময়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনায় নারী-পুরুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা হতো। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের প্রচার, প্রকাশনা ও বিপণনে ব্যতিক্রমধর্মী ও নৈতিকতার সংস্কৃতি চালু করেছে। ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, কার্ডসহ বিভিন্ন প্রকাশনায় ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, কুরআন-হাদিসের বাণীভিত্তিক ক্যালিওগ্রাফির ব্যবহারের মাধ্যমে নান্দনিকতার পাশাপাশি তা শিক্ষণীয় উপকরণে পরিণত করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকসমূহের এই সংস্কৃতিকে অনুসরণ করছে।

প্রচার ও বিপণনের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ মিথ্যা, বিভ্রান্তি, অতিরঞ্জন, প্রতারণা, জোর-জবরদস্তি বা অবৈধ প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত থাকে।

দ. টোটাল কমপ্লায়েন্স কালচার

আধুনিককালে আমরা শুনছি টোটাল কম্প্লায়ান্স (Total Compliance)-এর কথা। অথচ ইসলামী ব্যাংক-এর নামের মধ্যেই টোটাল কমপ্লায়ান্স-এর তাৎপর্য নিহিত। কারণ, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে মানতে হয়। ইসলামী শরীয়ার মৌলিক বিধানের পরিপন্থি নয়, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের এমন যেকোনো নির্দেশনা পরিপালন করাও ইসলামী শরীয়া মতে অবশ্য কর্তব্য। তাই ইসলামী ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে উঠে ইসলামী শরীয়া ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা—এ দুয়ের সমন্বিত পরিপালনের মাধ্যমে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সকল স্তরের নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, কর্মী এবং ব্যাবসায়িক অংশীদারদের আইনের বিধান পরিপালন এবং নৈতিক আচরণ করতে উৎসাহিত করে। সমস্ত ব্যাংকিং লেনদেন অভ্যন্তরীণ এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা ভালোভাবে যাচাই এবং নিরীক্ষিত হয়।

ধ. প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের মডেল

দেশের কর্পোরেট সিটিজেন হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুরু থেকেই তাদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় দেশের যেকোনো দুর্যোগ বা সংকটে দুস্থ-মানবতার পাশে থাকার চেষ্টা করে। শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, বন্যা,

খরা, আইলা, সিডরসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন মানুষের পাশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকে।

সমাজের অসহায় ও দুর্দশাগস্ত মানুষের সহায়তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আলাদা ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। বর্তমানে এসব ফাউন্ডেশনের কোনো কোনোটি দেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট কালচার : তত্ত্ব বনাম বাস্তবতা

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক কালচার গড়ে তোলা ও তা বিকশিত করা মোটেও সহজ কোনো কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্টদের নিয়তের পরিশুদ্ধতা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ইসলামী মূল্যবোধের অনুশীলন এবং সর্বোপরি ব্যাবসায়িক স্বার্থে ইসলামের নাম ব্যবহারের প্রবণতা পরিহার। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং দেশের সকল শ্রেণি-পেশা, ধর্ম-বর্ণের মানুষের নিকট ব্যাপক গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত সম্প্রসারণ ও ক্রমবর্ধমান মার্কেট শেয়ার এর বড়ো প্রমাণ। তবে কোনো জিনিসের সংখ্যা (Quantity) যত বাড়তে থাকে, মান (Quality) তত কমতে থাকে—এই বাস্তবতা দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক হলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দুর্বল পারফরমেন্স ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, এমনকি তা চূড়ান্তভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং, ইসলামী ব্যাংকের কার্যকারিতা শুধু দৃশ্যমান (Tangible) বিষয়সমূহ (যেমন ব্যবস্থাপনা, সুযোগ-সুবিধা এবং সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি) দ্বারা নির্ধারিত হয় না; বরং অদৃশ্য (Intangible) বিষয়সমূহ দ্বারাও নির্ধারিত হয়, যেমন ব্যাংকসমূহে শরীয়া পরিপালন বা ইসলামিক মূল্যবোধ কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সেই মূল্যবোধগুলো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে কতটা মজবুতভাবে মিশে আছে ইত্যাদি। সুতরাং, একটি নির্ভরযোগ্য ইসলামী ব্যাংকিং বিকশিত করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির আদর্শ মডেল গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি শরীয়াভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যথাযথ অনুশীলনের বিষয়ে ঘাটতি থাকলে কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে না। উক্ত ঘাটতি দূরীকরণে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর অনেক করণীয় রয়েছে।

ব্যাংকসমূহে একটি আদর্শ কর্পোরেট কালচার তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন তথা কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের অন্যতম উপাদান শরীয়া গভর্ন্যান্স। কার্যকর শরীয়া গভর্ন্যান্সের জন্য শরীয়া সুপারভাইজারি বোর্ড বা কমিটিতে উপযুক্ত সদস্য নিয়োগ এবং তাদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিশ্চিত করা না হলে ব্যাংকের শরীয়া-সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের বিষয়টি অনিশ্চিত হতে পারে, বিশেষ করে যদি তা ব্যাংকের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।

ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া গভর্ন্যান্সের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটি স্বাধীন ও কার্যকর শরীয়া অডিটিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা। স্বতন্ত্র শরীয়া অডিটের মাধ্যমে ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা ইচ্ছাকৃত শরীয়া লঙ্ঘন চিহ্নিত করা এবং শরীয়া অননুমোদিত কোনো মুনাফা অর্জিত হয়ে থাকলে তা আলাদা করা ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি। কিন্তু বাস্তবে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শরীয়া অডিটর (মুরাকিব)-এর অপ্রতুলতা, ফলপ্রসূ শরীয়া পরিদর্শন পরিচালনার এত যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুরাকিবের অভাব, প্রয়োজনীয় আইটি ও লজিস্টিক সাপোর্টের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা চোখে পড়ার মতো।

ইসলামী ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য উপাদান প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ড্রেস বা পোশাক। কর্মীদের পোশাক-পরিচ্ছদকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির দৃশ্যমান অনয়ন হিসেবে উল্লেখ করে AAOIFI-এর ভাষ্য, "The way that employees dress can also be called an organization's artifact" অর্থাৎ, (প্রতিষ্ঠানের) কর্মীরা যেভাবে পোশাক পরেন তাকে একটি প্রতিষ্ঠানের (সংস্কৃতির) দৃশ্যমান অনয়ন (artifact)-ও বলা যেতে পারে।[৪৫৬]

৪৫৬. AAOIFI, *Shari'ah Standards & Shari'ah Governance (SSGN), CIPA Study Text book*, Manama, Bahrain, 2017, P. 283

দেশের কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকের এমপ্লয়িদের পোশাক-পরিচ্ছদে শালীনতা রক্ষার বিষয়ে অনেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। তাদের মতে, ইসলামী ব্যাংকিং সেবাদানাকারী কোনো কোনো শাখা বা উইন্ডোতে ঢুকে বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের বেশভূষা দেখে বোঝা কঠিন যে, এটি ইসলামী ব্যাংক-এর কোনো ওয়ার্কিং ইউনিট। আদর্শ কর্পোরেট কালচার উন্নয়নে এ ক্ষেত্রে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের আরও আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন।

ইসলামী ব্যাংকসমূহে একটি আদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিষেবা কেমন হওয়া উচিত—এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক গ্রাহকদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের অনেক করণীয় বাকি। ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা এমন হওয়া উচিত, যেন তা গ্রাহকদের প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যায়। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লোক নিয়োগের ব্যাপারটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আদর্শের প্রতি নিবেদিত না হলে তার মাধ্যমে সেই আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে না।

মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। তা ছাড়া মহিলা গ্রাহকগণ মহিলা কর্মকর্তাদের কাছ থেকেই সার্ভিস নিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন—এটাই স্বাভাবিক। তবে শর্ত হলো প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা ও ইসলামী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যেমন—মহিলা কর্মকর্তা ও মহিলা গ্রাহকদের জন্য শরীয়াসম্মতভাবে বসার ব্যবস্থা, বাথরুম/টয়লেট ইত্যাদি ব্যবস্থাকরণ সাপেক্ষে পর্দা তথা ইসলামী পরিবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে, যেসব শাখায় মহিলা সংখ্যা বেশি—এমন শাখাগুলোতে একাধিক মহিলা কর্মকর্তা পোস্টিং দিয়ে মহিলা কাউন্টার বা মহিলা গ্রাহকদের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা যেতে পারে। পুরুষ সহকর্মী ও পুরুষ গ্রাহকদের মাঝে দু-একজন মহিলা কর্মকর্তা পোস্টিং দেওয়া সমীচীন নয়।"[৬৫৭]

---

৬৫৭. শরীয়া সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি, আইবিবিএল, পৃ. ১০৩-১০৪

উল্লেখ্য, যতটুকু জানা যায়, প্রথম দেশে প্রথম ১৯৯৮ সালে মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর থেকে নিয়মিত ব্যাচে মহিলাদের নিয়োগ অব্যাহত আছে। শুরুতে তাদের কর্মপরিবেশ, বাথরুম/টয়লেট ও নামাযের স্থান ইত্যাদির নিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে বাছবিচারহীন মহিলা নিয়োগ হতে থাকে। ইসলামী ব্যাংকে চাকরি করে—এমন বহু মহিলা এখন পর্দার জরুরত অনুভব করে না। এমন শাখাও রয়েছে, যেখানে মহিলা ফ্রন্ট ডেস্কের এত ব্যস্ত টেবিল সামলাচ্ছে, অথচ তার নিজেরই পর্দা নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

শেষ কথা

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের ভাবধারা অতি প্রাচীন হলেও মধ্যযুগে, বিশেষত ইউরোপের শিল্পবিপ্লবকালে পাশ্চাত্যের শোষণমূলক নীতি, মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থনীতি বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা ও ইসলামী অর্থনীতি প্রয়োগে কার্যকরী উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এ সুযোগে পাশ্চাত্যের শোষক শ্রেণির উদ্ভাবিত ও চাপিয়ে দেওয়া সুদভিত্তিক ব্যাংকিং গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে গ্রাস করে নেয়। সেই বিবেচনায় সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে, তদুপরি নবীন হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পথচলা সহজ ছিল না। বহুমুখী সংকট ও সমস্যা মোকাবিলা করেই তাকে প্রতিনিয়ত এগোতে হয়েছে ও হচ্ছে। এতৎসত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশোর্ধ দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে তাদের কার্যক্রম আঞ্জাম দিচ্ছে। তাদের এ অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে অভিবাদনযোগ্য। এ অগ্রযাত্রায় ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা ও শ্রম অনস্বীকার্য।

সাফল্য ঈর্ষণীয় হলেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এ অভিযোগগুলো দু-ধরনের। কিছু অভিযোগ একান্তই ইলমী ও ফিকহী জ্ঞাননির্ভর; ইসলামী অর্থায়ন নীতিমালা ও তার আধুনিক রূপায়ন-বিষয়ক। বাকি ব্যাপক ও মূল অভিযোগ হচ্ছে প্রায়োগিক। অধিকাংশ আলিম ও সাধারণ্যে এ ধারণা বিরাজমান ও বদ্ধমূল যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি মোটামুটিভাবে শরীয়াসম্মত হলেও বাস্তবে ও কার্যত এর যথার্থ প্রয়োগ নেই। অপর দিকে আরেকটি শ্রেণি কিছু সমস্যা রয়েছে স্বীকার করে একে সামগ্রিকভাবে ইসলামী ব্যাংক হিসেবেই মূল্যায়ন করেন। পক্ষের কেউ কেউ আবার এতে শতভাগ ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন হচ্ছে বলে দাবি করেন।

তবে বিদগ্ধ জনের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষেরই এখানে কিছু বাড়াবাড়ি রয়েছে। তাদের মতে, এতে শতভাগ শরীয়া পরিপালন এখনও হয়ে ওঠেনি; এটা সত্য। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনেক ক্ষেত্রেই শারয়ী নীতিমালা লঙ্ঘিত হয়; কিন্তু তাই বলে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সুদভিত্তিক ব্যাংকের সমতুল্য বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়। ইসলামীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

যাহোক, বিরোধীদের সকল অভিযোগ সঠিক না হলেও ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজেদের দায় এড়াতে পারে না। তাদের সাফল্যের পেছনে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির সুবিধাদি ছাড়াও ইসলামপ্রিয় আমানতকারীদের ভাবাবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুদমুক্ত, নির্ভেজাল অবৈধ মুনাফা অর্জনের প্রেরণা থেকেই মানুষ তাদের অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা করে। কর্মচারীরাও হালাল জীবিকা কামাইয়ের উদ্দেশ্যেই তাদের এখানে চাকরি করে। সে হিসেবে ব্যাংকের নীতি নির্ধারকগণ এদের নিকট দায়বদ্ধ। কাজেই তাদের কর্তব্য হচ্ছে, সমস্যাগুলোকে উড়িয়ে না দিয়ে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অভিযোগগুলোকে আমলে নেওয়া এবং সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তার সমাধানে ব্রতী হওয়া।

নিম্নে সমস্যার কিছু উৎস, কারণ এবং এগুলো দূরীকরণের লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা হচ্ছে। আন্তরিকতার সাথে এগুলোকে আমলে নেওয়া হলে আমরা আশাবাদী, পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও সমস্যাদি অনেকাংশে কেটে যাবে।

সমস্যার উৎস ও কারণ

১. সুদের ভয়াবহতা ও কুফল সম্পর্কে ধারণার অভাব : সর্বসাধারণের মধ্যে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার জাগতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে ধারণার অভাব এবং এ ধরনের সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান ও ভয় না থাকা।

২. অনৈসলামিক ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বহুল প্রচলন : রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনৈসলামিক ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রচলন এবং এর সর্বত্র অনৈসলামিক ও শরীয়া পরিপন্থি চুক্তি ও লেনদেনের অবাধ বিস্তার।

৩. ইসলামী ব্যাংকিং আইনের অভাব : দেশে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রসার বাড়লেও এখন পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

৪. দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যাংকার ও কর্মকর্তার অভাব : ইসলামী অর্থায়ন-পদ্ধতি ও লেনদেনের শারয়ী রূপরেখা বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাংকার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব।

৫. ইসলামী জ্ঞানের অভাব : শরীয়া ও আধুনিক বিষয়ের সমন্বিত জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব; গ্রাহক পর্যায়ে ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতা; সুদ ও মুনাফার পার্থক্য না বোঝা; ইসলামী অর্থনীতিকে যুগোপযোগী ও সহজভাবে উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত কৌশলের অপ্রতুলতা।

৬. সুদভিত্তিক লেনদেনে তুলনামূলক পদ্ধতিগত সহজতা : পদ্ধতিগতভাবে শরীয়াভিত্তিক লেনদেনের তুলনায় সুদভিত্তিক লেনদেন অধিকতর সহজ হওয়া।

৭. দায়বোধ ও জবাবদিহিতার অভাব : ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের সার্বিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দায়বোধের অভাব; শরীয়া পরিপালনে অবহেলা; অধিক ও দ্রুত মুনাফা অর্জনের প্রবণতা; শরীয়া লঙ্ঘনে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা না থাকা বা এর কমতি থাকা।

৮. সহযোগী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা : দেশে-বিদেশে কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোর বহু সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেই তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান খুবই স্বল্প, যা নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা ও সমস্যা তৈরি করে।

৯. আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সমন্বয়ের অভাব।

১০. পর্যাপ্ত গবেষণা ও গবেষকের অভাব : ইসলামী ব্যাংকগুলো গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করে না। বলাবাহুল্য যে, গবেষণার অভাবেও অনেক শরীয়া লঙ্ঘন ঘটে: কিছু পণ্যের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি হ্রাস করা যায় না। বিপরীতভাবে যদি ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হয়, তবে অনেক ধরণের ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

১১. মূলধারার আলিমদের সাথে ইসলামী ব্যাংকারদের দূরত্ব ও সমন্বয়হীনতা।

মুফতী তকী উসমানী হাফি. ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশে বর্তমান সময়ে যেসব চ্যালেঞ্জ ও বাধা রয়েছে, তার কিছু তুলে ধরেন :

১. অধিকাংশ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন না হওয়া। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা ও নীতিমালা—যা সুদি ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য—ইসলামী ব্যাংককেও অনেক জায়গায় মানতে হয়। তিনি তুলে ধরেন যে, অনেক সময় ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকের লাভ বেশি হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারের হিসেবে লাভ বণ্টন করতে বলে, যেন সুদি ব্যাংকগুলোর ক্ষতি না হয়।

২. লাইবর-আইবর ইত্যাদি বেঞ্চমার্কের অতিরিক্ত অনুসরণ—এমনকি মুদারাবা-মুশারাকা ও মুরাবাহার মাঝেও। ফলে এমন শর্ত করা হয় যে, বেঞ্চমার্ক থেকে বেশি লাভ হলে অপর পক্ষ লাভের ক্ষেত্রে তার অধিকার ছেড়ে দেবে (তানাযুল) ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রভাবমুক্ত বেঞ্চমার্ক থাকতে পারে।

৩. আন্তর্জাতিক ব্যাবসার ক্ষেত্রে বিদেশি আইনি প্রতিবন্ধকতা। যেমন ব্রিটিশ আইন, ফ্রেঞ্চ আইন—তাদের সাথে ব্যাবসা করতে চাইলে বা তাদের কোর্টে মামলা এলে ইসলামী শরীয়া অনুসারে এর ফয়সালা সম্ভব হয় না।

৪. গবেষণার অপ্রতুলতা : গবেষণা বাড়াতে হবে, বিশেষ করে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ওপর গবেষণা করতে হবে। ব্যাংকগুলো তাদের লাভের একটি ক্ষুদ্র অংশ গবেষণার জন্য বরাদ্দ রাখতে পারে। হতে পারে তা ০.৫% বা এমন কিছু।

৫. মাকাসিদে শরীয়া বা শরীয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে ফিকহুল মুআমলাতের বিস্তর অধ্যয়ন। এখানে মুআমলাতের মাকাসিদ, মুকাল্লফদের মাকাসিদ এবং মাআলাতুল আফআল ইত্যাদি প্রসঙ্গ আসবে।

প্রস্তাবনা ও সমাধান

মূলত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও তাকে ইসলামী শরীয়ত মতে পরিচালনা করা নিছক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের দায়িত্ব নয়। বরং প্রত্যেক মুসলিমেরই দায়িত্ব, এ লক্ষ্যে নিজের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা। এজন্য সকলেরই বিত্তশালী হওয়া জরুরি নয়। সমর্থন, জনমত গঠন, জ্ঞানার্জন

ইত্যাদির মাধ্যমেও অনেকেই এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। দায়িত্ব যেহেতু সবার, কাজেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সবারই ইসলামী ব্যাংকের সমস্যা সমাধানকল্পে কিছু দায়িত্ব ও করণীয় রয়েছে।

ক. সরকার পর্যায়ে করণীয়

১. ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন।

২. একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ড গঠন : বর্তমানে যে কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ড আছে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদিত নয়। তার কার্যক্রম সে কারণে তদারকিমূলক নয় এবং শরীয়া ব্যত্যয় হলে কোনো ব্যাংকের বিরুদ্ধে সেই বোর্ড না সংশোধন করতে পারে, আর না শাস্তি কার্যকর করতে পারে! তাদের মূল কাজ কেবল জনশক্তির প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি বৃদ্ধি; প্রয়োজনে পর্যবেক্ষক নিয়োগ।

৪. দেশীয় আইনি অবকাঠামো মুদারাবা-মুশারাকার পক্ষে সহনীয় করা। যেমন, মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগধারীদের সরকারি টেক্স সহনীয় পর্যায়ে রাখা ইত্যাদি আইনি অবকাঠামো সহজ করা।

খ. উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে করণীয়

১. সচেতনতা বৃদ্ধি : সুদি অর্থনীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে, বিশেষত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সদা সতর্ক রাখার জন্য তাদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনা জাগ্রত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে ওয়াজ মাহফিল, এতৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রচার, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংলাপ, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; আখিরাতের ভয় আনয়ন ও তা জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত তালীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা রাখা; রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদ বজর্নের উপায় সর্ম্পকে চিন্তাভাবনা করা এবং এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে এ বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করা; সুদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করা।

২. দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল নিয়োগ করা : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সর্ম্পকে ওয়াকিফহাল যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা। এ ক্ষেত্রে বিশেষত ইসলামী ও আধুনিক—উভয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের বিবেচনা করা

যেতে পারে। তাদের জন্য তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে উপযোগী কার্যক্ষেত্র নির্বাচন করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইসলামী ব্যাংকি ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবগত করার উদ্দেশ্যে নিয়মিত ফিকহী সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. স্বচ্ছতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা : রিক্রুটমেন্ট, প্রমোশন ও বিহেভিআর—সর্বক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও ইনসাফভিত্তিক সার্ভিস রুল কার্যকর করা; নিয়োগের ক্ষেত্রে শতভাগ মেধা, দক্ষতা ও আদর্শিক কমিটমেন্ট নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করা।

৪. গবেষণা ও প্রচারণা বৃদ্ধি : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের খুঁটিনাটি সর্ম্পকে জানার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক গ্রন্থাবলি সংবলিত গ্রন্থাগার ও উন্মুক্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা; ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে গবেষণাগার নির্মাণ, বাস্তব অর্থে গবেষক নিয়োগ ও গবেষণার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা; ইসলামী ব্যাংকিং সর্ম্পকে লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক গ্রাহক, অনুসন্ধানিৎসু ও শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে বিতরণ করা।

৫. গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় : আমানতকারী ও বিনিয়োগগ্রহীতাদের অভিযোগ-অসন্তোষ জানা ও তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উন্মুক্ত গ্রাহক সভার ব্যবস্থা করা; শরীয়া পরিপালনে গ্রাহকরা কী জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়—তা সরাসরি তাদের থেকে জেনে নিয়ে সমস্যার সমাধান করা।

৬. বোর্ড অব ডিরেক্টরসে ডিপোজিটরদের অংশগ্রহণ : বিনিয়োগকারী হিসেবে ডিপোজিটরদের মনোনীত অন্তত কয়েকজন প্রতিনিধি ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরসে রাখা।

৭. সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : ইসলামী বিমা কোম্পানি, ইসলামিক এজেন্সি ইত্যাদি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠনে অর্থায়ন করা।

৮. কার্যকরী ও দায়বদ্ধতাসম্পন্ন শরীয়া বোর্ড গঠন : শরীয়া বোর্ডে কেবল নিজ অঙ্গনের লোক বা হাইলাইটস লোক নিবার্চন না করে গ্রহণযোগ্য, মুখলিস, দায়বোধসম্পন্ন এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা; তাদের কর্মক্ষমতা ও পরিধি বৃদ্ধি করা;

শরীয়া পরিপালন যথাযথভাবে হচ্ছে কি না—তা যাচাইয়ের জন্য অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা; শরীয়া পালনে অবহেলা ও শরীয়া লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।

৯. অর্থায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ শারয়ী নীতিমালার অনুসরণ নিশ্চিত করা : যথাসম্ভব মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতি অনুসরণের প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা এবং ক্রমান্বয়ে এ দুটি পদ্ধতিতে ডিপোজিটের সিংহভাগ বিনিয়োগের কার্যকর উদ্যোগ বাড়ানো, প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের অন্তত একটি ব্রাঞ্চে বিশেষ মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগ-ডেস্কের ব্যবস্থা করা; মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা, সালাম বা ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে এতৎসংক্রান্ত শারয়ী নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করা; মুদারাবা ও মুশারাকার ক্ষেত্রে গ্রাহক সঠিকভাবে ব্যাবসা পরিচালনা করছে কি না—তা যাচাই করা এবং ব্যাবসার যাবতীয় হিসাব যথাযথভাবে রাখতে গ্রাহককে বাধ্য করা; মুরাবাহা চুক্তির জন্য আলাদা বিক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া; ওয়াকালা চুক্তির ক্ষেত্রে ওয়াকিল স্বীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কি না পর্যবেক্ষণ করা।

১০. শরীয়া মাকাসিদ (উদ্দেশ্যাবলি)-এর আলোকে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা : ধনসম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়ে তা যেন সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হয়—সেই দিকে খেয়াল রেখে সম্পদ সমাজের উৎপাদনক্ষম মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া; মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত করার পরিবর্তে আকৃতি, প্রকৃতি ও খাত এবং ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেওয়া; ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের সব এলাকায় সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১১. সুদ ও সংশয়মূলক আয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন : কোনো বিশেষ পর্যায়ে সুদি লেনদেনে জড়িত হতে বাধ্য হলে তার জন্য আলাদা হিসাবের ব্যবস্থা করা; বাধ্যতামূলক সুদ, অন্য কোনো অবৈধ খাত থেকে অর্জিত অর্থ এবং জরিমানার বিকল্প বাধ্যতামূলক দানের অর্থ বৈধ, প্রশ্নমুক্ত ও জনকল্যাণমুখী খাতে ব্যয় নিশ্চিত করা; এ জাতীয় খাতের অর্থ শেয়ারহোল্ডার ও আমানতকারীদের মাঝে বণ্টিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

১২. জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা : সকল পর্যায়ে শতভাগ সততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে গোঁজামিল ও এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস পরিহার করা; গুরুত্ব সহকারে অভিযোগ আমলে নিয়ে তা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

১৪. প্রতিটি ব্রাঞ্চে একটি বিশেষ শরীয়া ডেস্ক চালু রাখা, যাতে সার্বক্ষণিক শরীয়া প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

১৫. দ্বীনি পরিবেশ নিশ্চিত করা : মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা; জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈতিক ও মানবিক প্রশিক্ষণের জন্য নিয়মিত কুরআন ও হাদীস পাঠের ব্যবস্থা; ..।

গ. গ্রাহক, বিনিয়োগগ্রহীতা ও অন্যদের করণীয়

ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক ও বিনিয়োগগ্রহীতাদের করণীয় হলো :

১. ব্যাংকের পরিচয় জানা : গ্রাহকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় নির্ধারণ করা এবং কোনো ব্যাংক ইসলামী হওয়ার জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়—সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা, ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় নির্ধারণ করতে না পারলে গ্রাহকের বিনিয়োগ ও লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে ঝুঁকিমুক্ত হবে না; সংশয় থেকে যাবে। এটা তার ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. অনুসন্ধান : পরিচয় লাভ করার পর গ্রাহক শরীয়া পরিপালনে আন্তরিক ও সচেষ্ট—এমন ব্যাংক অনুসন্ধান করবে। ব্যাংকের লেনদেন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়ার পর তার সঙ্গে যুক্ত হবে। কেননা, শরীয়ত সংশয় পরিহারের নির্দেশ দেয়। শরীয়তের নির্দেশ হলো, 'যা তোমার মনে সংশয় তৈরি করে তা পরিহার করে সেটা গ্রহণ করো, যা সংশয় তৈরি করে না।'

৩. পারস্পরিক আলোচনা : ব্যাংকের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে গ্রাহক সরাসরি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। গ্রাহকের উচিত হবে না, কোনো ধরনের পূর্ব ধারণা থেকে কোনো ব্যাংককেই ইসলামী বা অনৈসলামিক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা। কেননা, পূর্ব ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত নিলে তা ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪. আস্থা রাখা : মুমিন সংশয় ও অবিশ্বাসের পথ পরিহার করে বিশ্বাসের পথে পরিচালিত হবে। সংশয় ও অবিশ্বাস দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা। সুতরাং গ্রাহক প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর যখন কোনো ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত হবেন, তখন তিনি আস্থা রেখেই ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করবেন।

৫. বিশ্বাস রক্ষা করা : ব্যাংক যেমন গ্রাহকের কাছে দায়বদ্ধ, তেমনি গ্রাহকও ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ। ব্যাংক প্রদত্ত অর্থ গ্রাহক শরীয়াসম্মত পদ্ধতিতে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবে। অন্যথা করলে গ্রাহক আমানত বিনষ্ট ও বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

৬. যোগাযোগ রক্ষা : গ্রাহক ব্যাংকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে। কেননা, এতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের দায়িত্ববোধ সতেজ থাকবে এবং পরস্পর দ্বারা আরও বেশি উপকৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালাগুলো এই ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

৭. পরামর্শ গ্রহণ : প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক বহু অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞ কর্মীকে ধারণ করে। তাই গ্রাহক আর্থিক ঝুঁকি থেকে বাঁচতে ব্যাংকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। ব্যাংকের পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

৮. অভিযোগ দায়ের : প্রায় সব ইসলামী ব্যাংকেই অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ আছে। গ্রাহক যদি ব্যাংকের কোনো শাখা বা কর্মকর্তার ভেতর নৈতিকতা ও সততার অভাব দেখেন এবং তাদের মধ্যে শরীয়া পরিপালনে শিথিলতা দেখা যায়, তবে গ্রাহক যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তা অবগত করতে পারেন। এসব অভিযোগ ব্যাংকের শরীয়া পরিপালন ও সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

৯. সমস্যা উপলব্ধি : ক্ষেত্রবিশেষে শরীয়া পরিপালনে ব্যাংকের ক্ষমতার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। গ্রাহক এরূপ কিছু দেখলে সেটাকে সাময়িক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। কোনো পর্যায়ে যদি প্রাপ্ত মুনাফা তার কাছে সন্দেহপূর্ণ ও অবৈধ সাব্যস্ত হয়, তবে সে তা যথাযোগ্য খাতে সদকা করে দেবে।

১০. জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি : গ্রাহক শুধু ব্যাংকের ওপর নির্ভর না করে নিজেও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে, যেন সে নিজস্ব পরিধিতে শরীয়তের অনুসরণ করতে পারে এবং ব্যাংকেও প্রয়োজনীয়

পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনা করতে পারে, আলিমদের পরামর্শ নিতে পারে, সম্ভব হলে সংক্ষিপ্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারে।

১১. নৈতিক উন্নতি : একজন মুসলিম শুধু জাগতিক আইনে উতরে যাওয়াকে যথেষ্ট মনে করে না; বরং পরকালীন মুক্তিই তার প্রধান লক্ষ্য। তাই একজন গ্রাহক হিসেবে গ্রাহক তার আচার-আচরণ ও নৈতিকতার উন্নয়নে মনোযোগী হবে। আর নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি হলো আখিরাতে আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতার ভয়।

সর্বসাধারণের কিছু করণীয় হলো :

১. ইসলামী অর্থনীতির সাধারণ নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা; ইসলামী অর্থনীতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুফল সম্পর্কে ও সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল সম্পর্কে নিজে জানা এবং অন্যকে জানানো।

২. বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থায়ন নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া। যেনতেনভাবে অর্থ প্রাপ্তির প্রবণতা পরিহার করা।

৩. পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এরূপ মনোবৃত্তি হৃদয়ে লালন করা।

৪. কেবল ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং স্বীয় গোটা অর্থনৈতিক জীবনেই ইসলামী অর্থনীতি অনুসরণ করা এবং ইসলামী অর্থনীতির প্রসারে ভূমিকা রাখা।

৫. সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং মেধা ও মেহনতের সর্বাত্মক নিয়োগ করা।

৬. মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতির পাশাপাশি এর আধুনিক রূপায়ন এবং আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের পরিভাষার সাথে পরিচিতি করানো; কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিভাগ চালু করা; তাখাসসুস প্রতিষ্ঠান ও ভার্সিটিগুলোতে এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা।

৭. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কে না জেনে বা নিছকই সমালোচনার অভ্যাস বর্জন করা। জেনেশুনে বাস্তবতা উপলব্ধি করে গঠনমূলক সমালোচনা ও পর্যালোচনা অব্যাহত রাখা।

৮. দীর্ঘমেয়াদি বৃহত্তর লক্ষ্য ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা। 'বৃহত্তর স্বার্থে তুলনামূলক ক্ষুদ্র বিষয়ে সাময়িক ছাড়'—এ মূলনীতির বিষয়ে সচেতন থাকা।

মোটকথা, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা গবেষণা, সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা পর্যায় পেরিয়ে প্রায়োগিক সফলতা অর্জন করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ও নৈতিক মানের গভীরতা এ ব্যবস্থাকে আগামী বিশ্বের মূল ধারার নিরাপদ আর্থিক মডেল হিসেবে তুলে ধরবে—এ আশাবাদ ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী ভূমিকার মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা আর্থিক খাতে যে কল্যাণমুখী ধারা সৃষ্টি করেছে সেই ধারা বেগবান করার জন্য আইনি সুবিধা, কাঠামোগত সংস্কার ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য নীতিনির্ধারণী উদ্যোগ ও নানাবিধ প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ও প্রচার-প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা তার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে কল্যাণমুখী ব্যাংকিংয়ে আপন অবদান আরও প্রসারিত করতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জি

❖ আল কুরআন

❖ তাফসীর

- জাসসাস, ইমাম আবু বাকর, *আহকামুল কুরআন*, লাহোর : সোহাইল অ্যাকাডেমি, পাকিস্তান, ১৯৮০
- তাবারী, তাবারী, আবু জাফর, *জামিউল বায়ান ফী তাভীলিল কুরআন*, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০

❖ আল হাদীস

- আবু দাউদ, সুলাইমান, *আস-সুনান*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা. বি.
- আহমাদ, ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : শুআইব আল-আরনাউত, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৯
- ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আবদুলাহ, *আল-মুছান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আছার*, তাহকীক : মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, ভারত : আদ-দারুস সালাফিয়্যাহ, তা. বি.।
- ইবনু মাজাহ, আবু আবদুলাহ মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.
- তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*, বৈরুত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরবী, তা.বি.
- দারা-কুতনী, আলী ইবনু উমর, *আস-সুনান*, বৈরুত : দারুল মাআরিফাহ, ১৯৬৬
- বাইহাকী, আবু বাকর আহমাদ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফ, ১৩৪৪ হি.
- বাযযার, আবু বাকর আহমাদ, *আল-বাহরুয যাখির (মুসনাদুল বাযযার)*, তাহকীক : আলী ইবনু নায়িফ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ

- বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আল-জামি আস-সাহীহ*, তাহকীক : ড. মুস্তাফা দেব আল-বুগা, বৈরুত : দারু ইবনি কাসীর, ১৯৮৭
- মালিক, ইমাম, *আল-মুওয়াত্তা*, (রিওয়ায়াত : ইমাম মুহাম্মাদ), তাহকীক : তকী উদ্দীন আন-নাদভী, দিমাশক : দারুল কলম, ১৯৯১
- মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সাহীহ*, বৈরুত : দারুল জীল, তা. বি.
- হাকিম, মুহাম্মাদ আন-নাইশাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন*, তাহকীক : মুস্তাফা আবদুল কাদির আতা, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০
- আজালূনী, ইসমাঈল আল-জাররাহী, *কাশফুল খাফা বৈরুত : দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরবী*
- আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *আস-সিলাসিলাতুস সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, তা. বি.

❖ ফিকহ, ফাতাওয়া ও উসুল

- আওদাহ, আবদুল কাদির, *আত তাশরীউল জিনায়ী আল ইসলামী বিল কানুনিন ওয়াদয়ী*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী,
- আতাসী, মুহাম্মাদ খালিদ, *শারহ আল মাজাল্লাহ*, কুয়েটা : মাকতাবা রশিদিয়্যাহ
- আবু মুহাম্মাদ আল বাগদাদী, *মাজমাউদ দামানাত*, আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ
- আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ*, করাচি : সদফ পাবলিশার্স, ১৯৮৬
- ইবনু আবদিল বার, *আল ইস্তিযকার*, বৈরুত : দারু কুতাইবাহ, ১৯৯৩,
- ইবনু আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২১ হি.
- ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর ফী ইলমিল উসূল*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৬
- ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.
- ইবন কুদামা, *আশ শারহুল কাবীর আলা মাতনিল মুকনা*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.
- ইবনু জাযযী আল কালবী, *আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ*, আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ
- ইবনু তাইমিয়াহ, আহমাদ, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, রিয়াদ : দারুল ওয়াফা, ২০০৫
- ইবনু রুশদ আল-হাফীদ, আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ (মৃ. ৫৯৫ হি.), *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*, কায়রো : মাতবাআতু মুস্তাফা.., ১৯৭৫

- ইবনুল কাইয়িম, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন*, রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ২০০২ খ্রি.
- উলাইশ, মুহাম্মাদ, *মিনহুল জলীল শারহু মুখতাসিরি খলীল*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি.
- উসমানী, মুহাম্মাদ তকী, *বুহূছ ফী কাদায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ*, দিমাশক : দারুল কলম, ২০১১
- উসমানী, মুফতী তকী, *ফিকহুল বুয়ূ*, করাচি : মাকতাবাতু মাআরিফিল কুরআন, ২০১৫
- কাযিম আল মুস্তাফাভী, *মিয়াতু কায়িদাতিন ফিকহিয়্যাহ*, availabled at: https://mail.almerja.com/reading.php?idm=61623
- কাসানী, *বদাইয়ুস সানাই* , *বদায়িউস সানাই*, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুল মাআরিফ, ২০০০
- কুনুভী, কাসিম ইবনু আবদিল্লাহ, *আনীসুল ফুকাহা ফী তারীফাতিল আলফাযিল মুতাদাওয়ালাহ বাইনাল ফুকাহা*, জেদ্দা: দারুল ওয়াফা, ১৪০১ হি.
- খুলাইফী, ড. রিয়াদ, *আল মিনহাজ ফী ইলমিল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ*, https://www.noor-book.com/كتاب-المنهاج-في-علم-القواعد-الفقهية
- দারদীর, আবুল বারাকাত, *আশ-শারহুল কাবীর* বৈরুত : ইহয়াউল কুতুবিল আরবিয়্যাহ
- বাজী, আবুল ওয়ালীদ সুলাইমান, *আল-মুনতাফা ফী শারহি মুওয়াত্তা*, তাবি
- বুহূতী, মানছুর, *কাশশাফুল কি না*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.
- বুহূতী, মানছূর, *শারহু মুনতাহাল ইরাদাত*, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৯৯৬
- মাওয়ারদী, আবুল হাসান, *আলহাভী*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.
- মারগীনানী, মারগীনানী, বুরহানুদ্দীন আলী, *আল-হিদায়াহ*, দেওবন্দ : কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ *আল হিদায়াহ*, ২০০০
- যারকা, আহমাদ, *মাদখাল আল-ফিকহ আল-আম*, ১৯৫৯
- যুহাইলী, ড. ওয়াহবাহ মুস্তাফা, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতহু*, দিমাশক, দারুল ফিকর, চতুর্থ সংস্করণ
- রমলী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৪ হি.
- রুআইনি, শামসুদ্দীন আল হত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল*, বৈরুত : দারু আলমিল কুতুব, ১৪২৩ হি.

- রুহাইবানী, *মাতালিবু উলিন নুহা*, বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৬১
- লুদয়ানাভী, মুফতী রশীদ আহমাদ, *আহসানুল ফাতওয়া*, করাচি : এইচএম সাঈদ, ২০০৩
- শারবীনী, মুহাম্মাদ আল খতীব, *মুগনিউল মুহতাজ*, বৈরুত : দারুল ফিকর
- সারাখসী, আবু বাকর মুহাম্মাদ, *আল মাবসূত*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল আলামিয়্যাহ, ২০০১
- সালুস, ড. আলী আহমাদ, *মাওসূআহ আল কাদায়া আল ফিকহিয়্যাহ আল মুআসিরাহ ওয়াল ইকতিসাদিল ইসলামী*, কাতার : দারুস সাকাফাহ
- হাত্তাব, তাহরীরুল কালাম ফী মাসায়িলিল ইলতিযাম, বৈরুত, ১৪০ ৪হি.
- *আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ .., ১৪০৪ হি.
- *মারকাযুল ফাতাওয়া*, আবদুল্লাহ আল ফকীহ, ফাতওয়া নং : ৬৮২৭৬ (المكتسب الربح من استثمار الأمانة) , তাং ১৪ রামাদান, ১৪২৬

❖ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

আরবী ও উর্দু

- আওফি, *আল মাআয়ির আশ শারঈয়্যাহ, আল-মাআঈর আশ শারঈয়্যাহ*, বাহরাইন : হাইয়াতুল মুহাসাবাহ ওয়াল মুরজাআহ লিল মুআসসাসাতিল মালিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০১৪
- আহমাদ সালিম মুলহিম, *বাঈ আল-মুরাবাহা ওয়া তাতবীকাতুহু ফীল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাহ*, আম্মান : দারুছ ছাকাফাহ, ২০০৫ খ্রি.
- আহমাদ ইবন হাসান আল-হুসনা, *আল অদায়িউল মাসরাফিয়াহ*, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯৯ খ্রি.
- আলী, ইবন নায়িফ আশশাহুদ, *আল মুফাসসাল ফি আহকামির রিবা*, বৈরুত : দারুল জীল, তা.বি.
- উসমানী, মুফতী মুহাম্মাদ তকী, *গায়র সুদি ব্যাংকারি*, করাচি : মাকতাবায়ে মাআরিফুল কুরআন, ২০০৯
- উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকারি কী বুনিয়াদি*, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা আল আরিফী, ২০১১
- উসমানী, *আহকামুত তাওয়াররুক ওয়া তাতবীকাতুহুল মাসরিফিয়্যাহ*, ১৪০৯ হি.

- নাজ্জার ও অন্যান্য, *১০০ সওয়াল ওয়া ১০০ জওয়াব হাওলাল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো : আল ইত্তিহাদু দুওয়ালী লিল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৮
- মুমতাজ, আহমাদ, *চার মাসাঈল : ব্যাংকারি, তাকাফুল, ডিজিটাল তাসভীর, কারেন্সি*, করাচি : তামীরে মুশাআরা
- মুস্তফা শামসুদ্দীন, *আকদুল ইজাবাহ ছুম্মাল বাই : দিরাসাহ নাকদিয়্যাহ*
- মুহাইসীন, *আস-সুকূক আল-ইসলামিয়্যাহ (আত-তাওরীক) ওয়া তাতবীকাতুহাল মুআসারাহ ওয়া তাদাউলুহু*
- যুহাইলী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফা, *দিরাসাতুল মাআয়্যির*, ২০০০
- সাওয়া, ড. আলী মুহাম্মাদ, *আশ শারতুল জাযাঈ ফিদ দুয়ূন*
- সামী হাসান হামুদ, *তাতভীরুল আমাল আল-মাসরাফিয়্যাহ বিসা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, আম্মান : মাতবাআতুশ শরক ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হি.
- হাইতি, আবদুর রাযযাক, *আল মাসারিফুল ইসলামিয়্যাহ বাইনান নাযরিয়্যাতি ওয়াত তাতবীক*, আম্মান : দারুল উসামাহ, ১৯৯৮
- হাম্মাদ, ড. নাজীহ, *মুজামুল মুস্তালাহাতিল মালিয়্যাহ ওয়াল ইকতিসাদিয়্যাহ ফী লুগাতিল ফুকাহা*, ২০০৮
- *আল কারারাতু ওয়াত তাওসিয়াতু হাওলাল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল মালিয়্যাহ*, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দা
- *আল ফাতাওয়া আশ শরীয়াহ ফিল মাসায়িলিল ইকতিসাদিয়্যাহ*, কুয়েত : কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ
- *আল ফাতাওয়া*, দুবাই : ব্যাংক দুবাই, ১৯৮৫,

বাংলা

- আবদুর রকীব ও অন্যান্য, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি*, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০৪
- আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮
- আযীযুল হক, এম., *ইসলামী ব্যাংক : কতিপয় ভ্রান্তিমোচন*, অনুবাদ : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬
- আশরাফী, *ফজলুর রহমান*, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কী কেন কীভাবে, ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮

- উসমানী, মুফতী তকী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন-পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান*, অনুবাদ : মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৭
- উসমানী, মুফতী তকী, *The historic judgment on interest delivered in the Supreme Court of Pakistan* (অনুবাদ : মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়), ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৭
- কারাদাভী, ড. ইউসুফ, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুবারাহা, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৯
- জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ, আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা, (পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, অপ্রকাশিত)
- তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৪
- নাজ্জার, আবদুল আযীয ও অন্যান্য, ইসলামী ব্যাংক : কী ও কেন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ১৯৮৪
- নুরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১২
- মোহন, ইকবাল কবীর, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, ঢাকা : প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ২০০৮
- মোহাইমিন পাটোয়ারী, *ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার শুভংকরের ফাঁকি*, ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০২২
- রহমতুল্লাহ খন্দকার, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা*, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ২০২০
- রহমতুল্লাহ খন্দকার, মুহাম্মাদ, *সুদ : সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ২০২৪
- শরীফ হুসাইন, মুহাম্মাদ, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জনসংযোগ বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রি.
- শরীফ হুসাইন, মুহাম্মাদ, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, ঢাকা : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২০২০
- শামসুজ্জামান, মুহাম্মাদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : আমার পেশা আমার ঘর*, (অপ্রকাশিত)
- শামসুদ্দোহা, মুহাম্মাদ, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা, ঢাকা : ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২০০৪
- শামসুল আলম, এ. জেড. এম., *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, ১৯৯৯

- হাফিয রহমান, প্রচলিত মুদারাবা পদ্ধতি: প্রসঙ্গ শরীয়া নীতি লঙ্ঘনের ধরন, https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/hafizrahman/30190955
- হাবীবুর রহমান, শাহ মুহাম্মাদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯
- হাবীবুর রহমান, শাহ মুহাম্মাদ, ইসলামী ব্যাংকিং : পেছনে ফিরে দেখা, ঢাকা : বিক্রম পাবলিকেশন্স, ২০০৪
- হাবীবুর রহমান, এ.এ.এম., *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : হক প্রিন্টার্স, ২০১০
- হায়দার আলী মিঞা, মুহাম্মাদ, তারল্য ব্যবস্থাপনায় শরীয়া ভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ, ঢাকা : আইবিসিএফ, ২০১৮ খ্রি.
- হুদা, মুহাম্মাদ শামসুদ ও দুহা, মুহাম্মাদ শামসুদ, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরীয়ার নীতিমালা*, ঢাকা : আইবিবিএল, ২০১১
- বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, *ইসলামের ব্যবসায়-বাণিজ্য-২*, ঢাকা, ২০১৬
- *শরীয়া সুপারভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১৫
- *কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) : সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ, ঢাকা, ২০১৭
- *তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রমের ষান্মাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-জুন ২০১৯)*, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

ইংরেজি

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instititions), *Governance Standard for Islamic Financial Instititions* (GSIFI), 2010
- *Farooq, Mohammad Omar, The Riba-Interest Equation and Islam: Re-examination of the Traditional Arguments, 2005*
- Hassan, Zulkifli, *Tawarruq: A Methodological Issue in Shariah Compliant Finance*, 2009
- Shawki Ismail Shahatah, *Muhasabat Zakat al-Mal,'Iman wa Amalan*, 1/e
- Usmani, Muftī Taqi *Causes and remedies of the present financial crisis from Islamic perspective*

- Usmānī, Muftī Taqī, *An Introduction to Islamic Finanace*. Pakistan: Quranic Studies Publishers, 1428H,
- *Capital Adequacy Standard for institutions offering only Islamic financial services (IIFS),* Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2005,
- *Guidelines for conducting Islamic Banking*, Dhaka: Bangladesh Bank. 2009

  https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/islamicbanking/guideislamicbnk.pdf
- *Quarterly Report on Islami Banking,* Islamic Banking Wing, Research Department, Bangladesh Bank
- Securities Commission Malaysia, *The Islamic Securities (Sukuk) Market*
- *The Repot of Economic Crisis Committee,* Southampton Chamber of Commerce, 1933

❖ অভিধান

- ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনু মুকরিম, *লিসানুল আরব*, কায়রো : দারুল মাআরিফ
- ফাইয়ুমী, আহমাদ, *আল মিসবাহুল মুনীর ফী গরীবিশ শারহিল কাবীর,* বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ
- *Oxford advanced learner's dictionary*, 2010, New 8th Edition.

❖ বিবিধ

- আবুল মুযাফফর ইয়াহয়া আশ-শায়বানী, *ইখতিলাফুল আয়িম্মাতিল উলামা,* বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.
- ইবনু তাইমিয়াহ, *ইক্বামাতুদ দলিল আলা ইবত্বালিত তাহলীল*, বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তা.বি.গাযালী, আবু হামিদ মুহাম্মাদ (৪৫০-৫০৫ হি.), *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন,* বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তা. বি.।
- ইবনু সাদ, মুহাম্মাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরুত : দারু সাদির, ১৯৬৮
- ইবনুল কাইয়িম, *ইগাছাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শায়তান,* তাহকীক : মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিকী, বৈরুত : দারুল মারিফাহ, ১৩৯৫ হি

- সাফারীনী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, *গিযাউল আলবাব ফী শারহি মানযূমাতিল আদাব*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.
- Hassan, Syed Riazul. *The Reconstruction of Legal Thought in Islam.* Lahore: Iman Abu Hanifa Academy, 1983

❖ পত্র-পত্রিকা

আরবী

- আহমাদ শাহদাহ ও অন্যান্য, মুদারাবাতুল মুদারিব বি-মালিল মুরারাবাহ.., *আদ দিরাসাত*, জর্দান : কুল্লিয়াতুশ শরীয়াহ, খ. ৪০, ২০১৩
- ইবনু ফাহাদ, বন্দার, আল গরামাহ আত তাযীরিয়্যাহ, *Arab Journal of Security Studies and Trainin,* খ. ২৫
- নাজ্জার, ড. আহমাদ, *আল মুরাবাহাহ আসওয়াউ উসলূবি লি-আমালিল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ*, উমান : মাজ্জালাতুশ শরীয়াহ, ১৯৮৪
- বেলতাজী, মুহাম্মাদ, *নাহভা বিনায়ি নামূজাযিন মুহাসিবিয়িন লি-তাকভীমি ওয়াসায়িলিল ইস্তিসমারি ফিল বুনূকিল ইসলামিয়্যাহ*, দুবাই : ইসলামিক ব্যাংকিং সেমিনার, ২৯ রজব-শাবান, ১৪২৬/ ৩-৫, ডিসেম্বর ২০০৫
- সাফিয়্যাহ আহমাদ আবু বকর, আস-সুকূক আল-ইসলামিয়্যাহ, আল-মাসারিফ আল-ইসলামিয়্যাহ বাইনাল ওয়াকি ওয়াল মামুল কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, দুবাই : দায়েরাতুস শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল আমালিল খায়রী, ৩১ মে-৩ জুন, ২০০৯
- *জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স*, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস, করাচি : করাচি আঞ্চলিক অফিস প্রকাশিত জার্নাল, ভলিউম ৪:১
- *মাজাল্লাতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী*, জিদ্দা : ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), ইস্যু-৪, খ. ৩, ১৯৮৮ খ্রি.
- *আল ফাতাওয়া আশ শরীয়া ফিল আমালিল মাসরাফিয়্যাহ*, দুবাই : ইসলামী ব্যাংক, সংখ্যা : অক্টোবর ৮৫

বাংলা ও ইংরেজি

- আবদুল্লাহ মাসুম, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহাঃ প্রায়োগিক জটিলতা ও উত্তরণ ভাবনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, খ. ১৩, সংখ্যা : ৫০, এপ্রিল-জুন, ২০১৭
- আবদুল্লাহ মাসুম, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল ও তা ব্যবহারের শরীয়াহ নীতিমালা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, সংখ্যা : ৬'

- আহমাদ আলী, ক্যাশ ওয়াকফকারীর লভ্যাংশ ভোগ ও মূল টাকা উত্তোলন : একটি ফিকহি বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪-৭৫,এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)
- ওমর চাপরা, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই ২০০৪
- গোলজারে নবী ও অন্যান্য, টেকসই উন্নয়ন অর্থায়নে সুকূকের ব্যবহার: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪ ও ৭৫ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা), ২০২৩
- তরীকুল ইসলাম, ড. আ. ছ. ম., *ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশ-শিরা' : একটি শারয়ী বিশ্লেষণ*, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬, এপ্রিল-জুন : ২০১৬
- মাসুম, আবদুল্লাহ ও হাম্মাদ, ওবায়দুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে সঞ্চয়নীতি ও মুনাফা বন্টন পদ্ধতি : সমস্যা ও উত্তরণ উপায়, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪-৭৫,এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)
- মিসবাহ উদ্দীন, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত মুশারাকা বিনিয়োগ: একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৫১-৫২,এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭
- রহমতুল্লাহ খন্দকার, 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত মূল্যায়ন ও হিসাবায়ন পদ্ধতি', *ইসলামী আইন ও বিচার*, সংখ্যা : ৭৪ ও ৭৫ (ইসলামিক ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)
- রুহুল আমীন, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত হায়ার পারচেজ: একটি শরয়ী বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭ জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬
- সরকার, লুতফুর রহমান, *সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা*, দৈনিক সংগ্রাম, আইআইবিএল-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪
- সানাউল্লাহ, ইক্যুইটি ভিত্তিক অর্থায়ন : গুরুত্ব ও বর্তমান প্রেক্ষিত, *ইসলামী আইন ও বিচার*, খণ্ড : ১৬, সংখ্যা : ৬৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০
- হাবীবুর রহমান ও রুহুল আমীন, সুকূক ইস্যুকরণ ও এতে বিনিয়োগের শরয়ী নীতিমালা : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৬, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

- হাবীবুর রহমান, মুহাম্মাদ, ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট কালচার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ : ১৯, সংখ্যা : ৭৪-৭৫ (ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা)
- Bouheraoua, S., Zakat Obligations on Islamic Financial Institutions, International Shariah Research Academy (ISRA) Research Paper, 2012
- Zakat_on_Legal_Entities_Towards_Concept_Perfection.pdf, https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/734
- *ইসলামী ব্যাংকিং*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., ডিসেম্বর ২০১৪
- *বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা*, ৩৭ খণ্ড, সংখ্যা ৭, জানুয়ারি ২০১০
- দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২১ জানুয়ারি-২০২০
- *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ এপ্রিল ২০২৪

❖ ওয়েবসাইট

- https://www.sbp.org.pk/ibd/faqs.pdf
- https://www.alkawsar.com/bn/article/1358/
- https://www.amarsangbad.com/today-newspaper/news/274245
- https://bonikbarta.net/home/news_description/334595/বাংলাদেশে-ইসলামী-ব্যাংকিংয়ের-সংকট-ও-উত্তরণের-পথ
- https://binbaz.org.sa/fatwas/19002/حكم-استثمار-الوديعة-دون-علم-صاحبها
- https://binbaz.org.sa/fatwas/18710/لا-يجوز-تعيين-الربح-بمبلغ-معلوم-في-المضاربة-او-غيرها
- https://islamqa.info/ar/answers/319978/متى-يقسم-الربح-في-المضاربة-وحكم-اشتراط-المشاركة-في-الخسارة-على-عامل-المضاربة
- https://bonikbarta.net/home/news_description/357430/মুদারাবা-গ্রাহককে-সাময়িক-হারে-মুনাফা-প্রদানের-সমস্যা-ও-কিছু-কথা
- https://bangla.bdnews24.com/economy/article1300586.bdnews
- https://www.teachers.gov.bd/blog/details/634786?page=4073&islami-bzangk-ki-loksaner-vag-ney

- https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/hafizrahman/30190955
- https://at-tahreek.com/article_details/1025
- http://alkafeel.net/islamiclibrary
- https://dictionary.cambridge.org/bn/dictionary/english/rollover
- https://binbaz.org.sa/fatwas/3252/حكم-بيع-الذهب-بالدين-مع-التقسيط
- https://www.elbalad.news/5503948#
- https://www.aliftaa.jo/Research/203/الإجارة-الموصوفة-في-الذمة
- www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&ID=50
- https://bonikbarta.net/home/news_description/254072#
- https://m.priyo.com/articles/ইসলামি-ব্যাংকগুলোর-অন্যতম-দায়িত্ব-কর্জে-হাসানা-প্রদান-করা
- https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/734516.details
- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/460276/-حكم-إعطاء-القروض-الحسنة-من-الزكاة#
- https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/jun102021brpd11.pdf
- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/133503/-حكم-الفائدة-إذا-أخذت-مرة-واحدة-على-اعتبار-أنها-نفقات-إدارية#
- https://islamqa.info/ar/answers/97268/الكفالة-على-الاجرة-اخذ-يجوز-ا#
- https://binbaz.org.sa/fatwas/4479/البيع-في-الوكالة-على-الاجرة-اخذ-حكم#
- https://www.linkedin.com/pulse/fractional-reserve-vs-full-banking - mustafa-qureshi
- https://www.muslimmedia.info/2016/01/09/fractional-reserve-banking-how-bank-create-money
- https://www.mohioshi.com/report/ ইসলামী-ব্যাংক-সুদি-ঋণ-গ্র/
- BB, Bangladesh Bank. 2016. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, Bangladesh Bank, Oct-Dec 2016 issue. https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/oct _dec _2016.pdf

****

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরীয়া পরিপালন ও লঙ্ঘন

সমস্যা ও উত্তরণ ভাবনা

ড. আহমদ আলী

প্রচ্ছদ
প্রকাশন